সংখ্যা - ১-১২

১৯শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

শিক্ষা

১৩৬৭ - ৬৮
অগ্রহায়ণ
মাসিক

CALCUTTA UNIVERSITY
3705
Sh61

অনন্তের সুরে

এশিয়া পাবলিশার্স

১৫৮–বি লিণ্টন ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১৪

মূল্য তিন টাকা মাত্র

শিক্ষা : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

সূচী

আলোচনা ১

"সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি" ৩
মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

গ্রাম্যমাণ শিক্ষকের ডায়েরী-১ ৭
লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

মৌখিক শিক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষা ১৩
শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

বর্ষার ফুল ২১
শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হয়। বার্ষিক চাঁদা ৩ টাকা ৫০ নয়া পয়সা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ৩১ নয়া পয়সা মাত্র। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ।

শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

২। প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা'সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৩। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। পিছনের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৫৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৪। টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

গতবর্ষের লেখকসূচী

১৩৬৪-৬৫

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীআদিনাথ সেন	পরিদর্শনে বিভ্রাট	৬২
„ অনাথনাথ বসু	পরীক্ষা সংস্কার	২,২১
ইতিহাস রসিক	ইতিহাস কি বিজ্ঞান, না কলা-বিদ্যা ?	৫৬
ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী	মেয়েদের শিক্ষা	১৪৮
ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়	সহজ ও সরল	১০৩
ভট্টর কল্যাণী মল্লিক	আদর্শ শিক্ষা	১৬৫
শ্রীকুমুদবন্ধু সেন	শিক্ষার আদর্শ	৭
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শিক্ষা ও শাসন	৪২
শ্রীগৌরী প্রসাদ ভট্টাচার্য	এক শিক্ষক পরিবার	১৫১
জ্ঞানাদেবী	সংযুক্ত রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়	১৪১,১৫৬,১৬৯
শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী ও দিলীপকুমার বিশ্বাস	পাঠক্রম নির্ণয় সমস্যা	১১
„ দিলীপকুমার বিশ্বাস	আমেরিকায় গ্রীষ্মাবকাশ	৭৭,৮৭
„ দেবীপ্রসাদ (ওয়ার্দা)	কলা-শিক্ষা কেন ?	২৭,৪৩,৫০
„ ঐ	কলা-শিক্ষা : শিশুর দৃষ্টিতে	৭২
„ নীরদেন্দু সান্যাল	ছাত্রগণের উচ্ছৃঙ্খলতা	১১৫
„ ঐ	পরীক্ষার পরীক্ষা	১৮২
শ্রীমতী নীহারিকা বন্দ্যোপাধ্যায়	শিশু জীবনের আত্ম-বিকাশ	১৩৮
শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন	পুস্তক সমালোচনা	৬৫
„ ঐ	পুস্তক পরিচয়	৪৭,১৬০,১৭৫,১৮৯
„ ঐ	প্রাথমিক শিক্ষক	৮৪
„ ঐ	শিক্ষা সংস্কারে গান্ধীজী	১৭১
„ প্রমথ চৌধুরী	শিক্ষক ও গুরু	১৭৬
শ্রীমতী বকুলমালা সেন	শ্রীঅরবিন্দ ও মানসিক শিক্ষা	৩৮
„ ঐ	শ্রীঅরবিন্দ ও আন্তরাত্মিক শিক্ষা	১৩১
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	উন্নয়ন-পরিকল্পনায় শিক্ষকের ভূমিকা	৩৫
„ ঐ	"গুরু চরণ-ধূলি আমার মাথায়"	৮৩
ভূদেব মুখোপাধ্যায়	শিক্ষক ও ছাত্রের সম্বন্ধ	৫৫
শ্রীমতী মমতা রায়	বিদ্রোহত গণতান্ত্রিক দেশের শিক্ষানীতি	২৩
„ ঐ	শিক্ষণ-বিদ্যালয় ও শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা	৬৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য	অনাদৃত	১০৭
যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি	বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা	১৪৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শিক্ষক ও গুরু	৪১
অধ্যাপক রামমূর্তি	মন্ত্রীতালিম কোন্ পথে ?	১৮৪
ঐ	মন্ত্রী তালিমের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী	৪
ডক্টর ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়	প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যা	৯৯
শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ	শিক্ষা ও যুবসেবা	১২৪
ঐ	যুক্তরাজ্যের বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষা	১৬২
শ্রীসুধময় ভট্টাচার্য	মহাভারতে স্ত্রী-শিক্ষা	১১৭
ঐ	মহাভারতে চিত্রিত তিনটি বিদ্যাপীঠ	১৯
শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়	ভারতের আদিবাসী ও অনুন্নতদের শিক্ষা	৯১,১০৪,১২০,১৩৪
সেনাস	ছেলেবেলার কথা	১২৭
সম্পাদক	আলোচনা	১,১৭,৩৩,৪৯,৬৫,৮১,৯৭, ১১৩,১২৯,১৪৪,১৬১,১৭৭
অজ্ঞাত	ডিসিপ্লিন	১৪

CUTTA
CENTRAL
LIBRARY

শিক্ষা

ম হি কল্যাণকৃৎ কস্তিন্ প্রগতিং তাত গচ্ছতি

১৯শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ | ১ম সংখ্যা

আলোচনা

নূতন উদ্যম

বহু দ্বিধা দ্বন্দ্ব বিতর্কের পর স্থির করা হইয়াছে, 'শিক্ষা' পত্রিকা আরও চলিবে। চালাইবার মূল আমাদের পুরাতন লেখকলেখিকারা—তাঁহারা মনে করেন যে, 'শিক্ষার' যদি কিছু বলার থাকে তবে ইহাই তো তাহার শুভ অবসর। পঞ্চবার্ষিকীর পর পঞ্চবার্ষিকী চলিয়াছে, ভারতের উন্নতির বেগ দ্রুত—আরও দ্রুত—হউক, এবং সেই ইচ্ছা প্রবল করিবার জন্য, সেই চাহিদা মিটাইবার জন্য শিক্ষাকেও করিতে হইবে দূরপ্রসারী, আরও ব্যাপক। যুগধর্ম পরিবর্তন আমরা এড়াইতে পারিব না, দ্রুত পরিবর্তন আসিলেই কি করিয়া তাহার মধ্যে একটা সামঞ্জস্যে আসা যায়, সেই পরামর্শ চাই, সেই বিশ্লেষণ চাই। যৌবনজলতরঙ্গের মত শিক্ষাপ্রবাহ যদি না সংহত করিতে পারি, যাহা চাই তাহা যদি ভুল করিয়াই চাই, এমন কি ভুল বুঝিবার পরেও যদি ঠিক পথে না ফিরিতে পারি! চলার পথে ভুল অবশ্যই কিছু হইবে, কিন্তু কে পথ দেখাইবে? শিক্ষা পণ্ডিতদের, যোদ্ধাদের দিকে এখন তাকাইয়া আছে, তাঁহাদের নিবন্ধণ জানাইতেছে, শিক্ষায় যাহা হিতকর, তাহা করুন। 'এখন পথ চলিবার সময় আসিয়াছে, হিসাব নিকাশের সময় নয়'। তবু বলি, প্রতি পদক্ষেপে দিগ্‌দর্শনও করিতে হইবে—কোন দিকে চলিতেছি তাহা বুঝিতে হইবে। তাই 'শিক্ষা'কে নূতন উদ্যমে চলিতে হইবে।

কিন্তু চলিতে গেলে পুষ্টিও চাই। আমাদের আয়তন দুই ফরমার মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া তিন ফরমা করাই আমাদের ইচ্ছা। কাগজ দুষ্প্রাপ্য বা দুর্মূল্য ছিল। এই কারণেই আমরা আয়তন কমাইয়া দিয়াছিলাম। ভরসা করি এবার পুনরায় কমাইতে হইবে না। তবে আমাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য গ্রাহক ও পাঠকদের সহযোগিতা প্রার্থনা করি। লেখকেরাও যদি আমাদের জন্য প্রবন্ধ রচনা করেন, তবেই উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা।

বিদ্যালয়ের ভাষা শিক্ষা

বহুদিন ধরিয়া আমাদের বিদ্যালয়ে কি কি ভাষা অবশ্য শিখাইতে হইবে তাহা লইয়া বিতর্ক

চলিতেছে। মেকলের সময় হইতে কি তাহারও পূর্ব হইতে ইংরাজির মোহিনী বাঁশী শুনিয়া আমরা মুগ্ধ। ইংরাজি তো বিদ্যালয়ে শিখাইতেই হইবে। প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্‌গণের সুচিন্তিত মত, অভিজ্ঞ ভূপর্যটকদের মত, নিষ্ঠাবান বৈজ্ঞানিক সাধকের মত, ইংরাজি ছাড়া চলিবে না। কিন্তু ইংরাজি ছাড়িয়া দিবার—একান্ত বর্জন করিবার—কথা তো কেহ বলে নাই। কোন বয়সে কোন শ্রেণীতে আরম্ভ করা হইবে, তাহাই হইল কথা। শুনিতেছি, বাংলা দেশে নাকি তৃতীয় শ্রেণী হইতেই ইংরাজি শেখানো আরম্ভ হইবে! ভারতের কোনও প্রদেশে পরবর্তী স্তরে ইংরাজি শেখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, ফল হইয়াছে, ছাত্রেরা সকল বিষয়ে কাঁচা। অবশ্য এই ইংরাজির অভাবেই কাঁচা কি না তাহার খোঁজ কে রাখে! কে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে! যাহা হউক, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষাও জানা চাই, আর বাংলা তো সকল শিক্ষার মাধ্যম! মাধ্যম বলিয়া শুধু নয়, আমাদের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিই তো আমাদের সকল শিক্ষার মূল।

কিন্তু হিন্দী মৌখিক শিখিতে হইবে, তাও এক বৎসরের জন্য—যদি এরূপ সত্য হয় তাহা হইলে এ পরিকল্পনা যে আন্তরিক তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। মৌখিক পড়ানো ও মৌখিক পরীক্ষা করা অবশ্যই সকল বিদ্যার পক্ষেই ভাল, সকল ভাষা শিক্ষার পক্ষেও ভাল। পরীক্ষা না নেওয়া তো আরও ভাল। কিন্তু সকল বিদ্যার পক্ষে সকল ভাষার পক্ষে এই নিয়ম বা রীতি খাটানোই তো উচিত ছিল। শুধু হিন্দীর বেলায় কেন?

আসল কথা, হিন্দী শিখিবার প্রয়োজনীয়তার কথায় আমাদের প্রাণের সাড়া নাই। কিন্তু কেন?

ধীরে, রজনী, ধীরে

বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস 'রজনী'র ঐ কথাটি বার বার মনে পড়িতেছে। হিন্দী ধীরে ধীরে শিখাইতে হইবে। উত্তর ভারতে ও দক্ষিণ ভারতে সম্প্রতি এ বিষয়ে সতর্ক বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে ভারতের মন্ত্রী বি. গোপাল রেড্ডী মহাশয় দক্ষিণ ভারত হিন্দী প্রচার সভায় এই কথাই বলিয়াছেন। উত্তর ভারতে হিন্দুস্থানী একাডেমীর সুযোগ্য প্রবীণ অধ্যক্ষ ডক্টর ধীরেন্দ্র বর্মাও ঐ একই কথা বলিয়াছেন। ভাষা মনের ভাব প্রকাশের জন্য, যতই লোকে রহস্য করিয়া বলুক না কেন যে মনের ভাব গোপন করাই তো ভাষার উদ্দেশ্য। সুতরাং স্পর্শদোষ ভয়ে ভীত হইলে চলিবে না, ছুঁইলে তৎসম শব্দ ধরিয়া থাকিলে চলিবে না। হিন্দী যতই দেহাতী ও আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ করিবে ততই জোরালো হইবে। অবশ্য ভয়ে ভয়ে বলি, বাংলা ভাষা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। আমাদের ভাষাতঙ্ক দূর হইবে কবে? আবার বলি, শিক্ষার অবশ্যই মাতৃভাষার উপর চরম নির্ভর।

গুরুবিদায়

সংবাদপত্রে পড়িয়া আনন্দিত হইলাম যে বীরভূম জেলার দাতপুর বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়কে তাঁহার গুণমুগ্ধ ছাত্রেরা একটি বসতবাটী নির্মাণ করিয়া দিয়াছে। বসতবাটী প্রাসাদও নয় কুটিরও নয়—শিক্ষক মহাশয়ের উপযোগী করিয়া ছাত্রব্যয়ে নির্মিত। এই ছাত্র অভিনন্দনের যুগে জড়বাদের ধ্বনিতে মুখরিত সংসারে শিক্ষক ও ছাত্রের এই প্রীতি-বিনিময় অভিনব। বস্তু সেই ছাত্রেরা যাহাদের কর্মে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা এইরূপে নিবেদিত হইয়াছে, বস্তু সেই শিক্ষক যিনি তাঁহার আদর্শ জীবন দ্বারা ছাত্রদের এইভাবে সাধুকর্মে অনুপ্রাণিত করিতে পারিয়াছেন।

বারভাঙ্গা বিশ্ববিদ্যালয়

সিদ্ধান্তের পরিকল্পনানুযায়ী বারভাঙ্গায় বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর উমেশ মিশ্র এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি বারভাঙ্গারই অধিবাসী,

এলাহাবাদে অধ্যাপক ছিলেন। মিথিলায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য সংস্কৃত ভাষার প্রবীণ—ইহা খুবই সঙ্গত হইয়াছে। আমরাও বিশ্ববিদ্যালয় পণ্ডিত মিশ্রের নেতৃত্বে প্রসিদ্ধি লাভ করুক, কামনা করি।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন হইবে, শুনিয়া আসিতেছি। ইহা যুগান্তকারী ব্যাপার। তোজরাজের রাজ্যে যাহারা লেখাপড়া জানিত না, লোকে বলে তাহারা নাগরিক অধিকার লাভ করিত না। পূর্ব ইউরোপেও এক রাজ্যে ঐ রূপ নিয়ম ছিল।

কিন্তু এই যুগান্তকারী পরিবর্তনের প্রস্তুতি কোথায়? যদি প্রস্তুতির জন্য আরও দুই এক বৎসর কাটিয়া যায়, তাহা হইলে তো মূল পরিকল্পনার গতিও ব্যাহত হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের পূজার বোনাস

সংবাদপত্রে পড়িয়া সংবাদ বা তাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। এক এক স্কুল বোর্ডে এক এক নিয়ম কেন? পূজার বাসে অগ্রিম বেতন যদি নীতিহিসাবে স্বীকৃত হয় তবে সকল বিদ্যালয়েই তো তাহা গৃহীত হওয়া উচিত। সেইমত সকল শিক্ষককেই দেওয়া উচিত? অর্থের অনটনে জর্জরিত হইয়া শিক্ষক আত্মহত্যা করিবেন, এরূপ সম্ভাবনা সর্বপ্রকারে দূর হওয়া উচিত। কিন্তু আত্মহত্যার কথা বাদ দিয়াই বলি। আশানিরাশার দোলায় কেন শিক্ষকদের দুলিতে দেওয়া? আনিতে ইচ্ছা করে, ইহার জন্য দায়ী কে, দোষ কাহার? সর্বশেষ পরীক্ষায় সমাজই দোষী, সমাজই দায়ী, কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দিয়া অন্য কেহ দায়ী থাকিলে ভবিষ্যতে কি করিয়া এরূপ অবস্থার প্রতিরোধ সম্ভব, তাহা সমাজের শুভানুধ্যায়ী মাত্রেরই চিন্তনীয়।

"সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি"

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য

ম্যাণ্ডাউন রোড ছাড়িয়ে আরও বেশ খানিকটা যেতে হবে। রাস্তার ডানহাতি একটা গলির মোড় ছাড়িয়ে একটা একতলা বাড়ী, তারপর দু'একটা খোলার বাড়ী—তারপর বাড়ীটা পাওয়া যাবে। বাইরের দিকে রেলিং ঘেরা—ঢোকবার ফটকের উপরে একটা মাধবীর বাড়। কতদিন অনেকরাত্রে ঐ বাড়ী থেকে বেরিয়ে বাড়ী ফেরবার মুখে তার তলীর খানিকটা দাঁড়িয়ে তারপর রওনা হয়েছি, একটু মিষ্টি গন্ধের লোভে। রেলিংয়ের ধারে ধারে দু'একটা দর্বজবার গাছ। গাড়ী বারান্দায় অধ্যাপক মৈত্র মহাশয়ের পুরানো গাড়ীটা—যেটার হুড অষ্টপ্রহরই তোলা থাকত। এ গাড়ীটা এখন নেই। গাড়ী বারান্দার তলা দিয়ে ঢুকে প্রথমেই লোকা কোচ ইত্যাদি দিয়ে আধুনিকতায় সুসজ্জিত বৈঠকখানা, সেকালের বনেদী বাড়ী যেমন হয়ে থাকে। সেখানে আরও ছিল দুটো কারুকার্যখচিত বুককেস আলমারী—তাতে ঠাসা বই। বৈঠকখানা পেরিয়ে চওড়া বারান্দা, তারপর বাঁধান উঠান, উঠানের একপাশে বাসস্থান, উপরে যাবার সিঁড়ি ইত্যাদি—আর অন্য পাশে তার মধ্যেই খিড়কীতে যাবার দরজা। উঠান পার হয়ে একফালি লম্বা বারান্দা, বারান্দার পর অধ্যাপক মৈত্র মহাশয়ের

নিজস্ব দুটি কক্ষ। অধ্যাপক মহাশয়ের কক্ষের এপাশে আরও ঘর, কিন্তু সেগুলিতে কখনও যাইনি।

ওই ঘর দুটো যেন এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে। কোনের ঘরটার দক্ষিণ দিকে দেওয়াল, দেওয়ালের গায়ে তাকে সাজান ঘরকন্নার টুকিটাকি জিনিস, নিত্য পড়বার বই, খাতাপত্র ইত্যাদি। তারপরে গদি-পাতা ও তাকিয়া-দেওয়া একালে সাদা রঙ লাগানো একটা তক্তপোষ, ঠিক তক্তপোষ নয়, কারণ তার দুদিকে পাড় দেওয়া, অধ্যাপক মহাশয়ের দিবানিদ্রার জন্য। অধ্যাপক মহাশয় কলেজকেন্দ্রিক একটু ঘুমোতেন। পূবের জানালার ধারে চকচকে বার্নিশ করা প্রকাণ্ড টেবিল, বই-খাতা, কাগজ-কলম দিয়ে সাজানো,—কোথাও একটু বেমানান নেই, নিখুঁত, আর একটুও ধুলো নেই। চেয়ার টেবিলের এ পাশে পিছনের উঠানের দরজা। দরজার ধারে ঘুরো, তাতেও বইপত্র ইত্যাদি। টেবিল ও তক্তপোষের মাঝে আলমারী ভর্তি বই। তক্তপোষের পাশে ভিতরের বারান্দা থেকে ঘরে ঢোকবার দরজা, দরজার পাশে আলনায় পরিপাটি করে কোঁচানো ধুতি—পাঞ্জাবী, চাদর। ওঘর থেকে এঘরে আসার দরজা সব সময়ই খোলা। এঘরে এপাশের জানালার ধারে বিরাট আরাম কেদারা, অধ্যাপক মহাশয়ের ঘরে পৌঁছেই বেটা আগে দখল করা আমার অভ্যাস। ঐ আরাম কেদারাটি ৺প্রমথ চৌধুরীরও প্রিয় ছিল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওতে বসে কত কি সরস আলোচনা করেছেন। এপাশে আবার বইয়ের আলমারী, টেবিল, চেয়ার, একটা গদী-মোড়া চেয়ার, চায়ের ছোট টেবিল। এ পাশে তার পরে ভিতরের বারান্দা দিয়ে ঢোকবার দরজা, ওপাশে আরাম কেদারার পর ওদিকের দরজা; ঘরের ওকোনে ওদিকে পালঙ্ক, পালঙ্কের ওপাশে দেওয়ালে অধ্যাপক পত্নীর প্রকাণ্ড ছবি। খাট ও দেওয়ালের কোনে ঢাকা দেওয়া সেতার একটা ছোট টেবিলের উপর, আর একটা ছোট টেবিলে আরও কিছু বই। একটা কেবিনেট মডেল গ্রামোফোন; একটা খুদদানি; ছাইদানি। দুটি ঘরেই জমজমে কার্পেট পাতা।

ঘরের পিছনে একফালি কাঁচা উঠান। উঠানের একপাশে জালের দেওয়াল ঘেরা টিনের ছাত একটা কলঘর; জলের বড় চৌবাচ্চা। টিনের ছাতের উপর একটা কুমড়োর গাছ এঁকে বেঁকে উঠেছে, উঠানের শেষে অন্য বাড়ীর ইঁট-বারকরা মোনা-ধরা দেওয়াল ঘেঁসে কয়েকটা টগর জাতীয় গাছ। অন্য বাড়ীর দেওয়ালটাই এ বাড়ীর সীমানা, দেওয়ালের বালিকাজের উপর বৃষ্টির জল পড়ে পড়ে শ্যাওলা গজিয়েছিল, এখন শুকিয়ে গিয়ে কাল কাল লাইনের মত দেখাচ্ছে। তারি ফাঁকে একটা আগাছা হাওয়ায় দুলছে, তার সবুজ পাতার উপরে রোদ পড়ে চিক্ চিক্ করছে।

এই ঘরদুটো আমার উপরে একটা মস্তবড় প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে বললে অত্যুক্তি হবেনা। জীবনের মহত্তম দিনগুলির সম্বন্ধে কিছু বলতে বললে এইঘর দুটির কথা অন্যতম হবে।

ইংরেজী atmosphere কথাটার ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ এখন মনে আসছে না,—কাজেই atmosphere কথাটাই ব্যবহার করা যাক। এই ঘরদুটির এমন atmosphere ছিল যার ফলে সেখানে ঢুকলেই মনটা অন্যরকম হয়ে যেত। অধ্যাপক মৈত্র মহাশয়ের ব্যক্তিত্ব একটা কারণ, একটা কেন, অন্যতম প্রধান কারণ নিশ্চয়, কিন্তু সেইটাই সব নয়। সজ্জিকে পড়েছিলাম সাদা রং, মিষ্টত্ব, দানা বাঁধা আকার, এসব গুণ যদি চিনি থেকে বাদ দেওয়া যায় তবুও চিনি নামে একটা বস্তু আছে যা বোঝা যায়। সেইরকম মৈত্র মহাশয়ের ব্যক্তিত্ব, বিদ্যা, সৌজন্য, প্রীতি, স্নেহ সবকিছু বাদ দিলেও এই ঘর দুটিতে এমন একটা কিছু ছিল

যার ফলে আমরা আমাদের বিক্ষিপ্ত মন কুড়িয়ে একজায়গায় করে পলকাটা কাঁচের ভিতর দিয়ে আলো দেখার মত এর মধ্য দিয়ে জীবনকে দেখতে পেয়েছি—তার সাতরঙা রঙীন বাহার প্রত্যক্ষ করেছি। তাই ছাত্রজীবনে যে সম্পদ পেয়েছি তার অন্যতম এই-ঘরে-কাটানো দিনগুলি।

নূতন ছাত্র হিসাবে নূতন পরিচয়ের সঙ্কোচ ঘুচতে খুব বেশী সময় লাগেনি। ক্রমে যতই পুরানো হয়ে গেলাম এবং আমাদের সম্পর্ক নিবিড় থেকে নিবিড়তর হতে লাগল, তাঁর ঘরে সোজা চলে যেতাম, তিনি বাড়ীতে থাকুন আর নাই থাকুন, একেবারে সাদা বাংলায় যাকে হড়মুড় হুড়হুড় করে বলে সেই ভাবে। হয়তো গিয়ে দেখলাম, তিনি নেই; তাতে কি? গাদা গাদা বইতো আছে! একটা বই বেছে নিয়ে সেই আরাম কেদারায় বসলে সময় কোথা দিয়ে চলে যাবে বলতেই পারা যাবে না। হয়তো তিনি গভীর নিদ্রামগ্ন—আগেই বলেছি, কলেজ থেকে ফিরে বিকেলে একটু ঘুমানো তাঁর অভ্যাস ছিল—বই খোঁজার খুট খাট শব্দে ঘুমভাঙা বিস্ময়ে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আমাকে দেখে একটু হেসে চাদর সরিয়ে উঠে পড়লেন,—"বোস, বোস, কতক্ষণ এলে? চা দিয়েছে তোমাকে? এখনও দেয়নি? ওহে হরি, হরি, বহিমাকে এখনও চা দাওনি? শীগ্‌গির কর, শীগ্‌গির কর। আর শোন, রাত্রে খেয়ে যাবে। এই বইটা পড়েছ? কাল এনেছি, পড়ে দেখ, নূতনত্ব পাবে।"

অধ্যাপক মশায় এরপরে হুবার বাড়ী বদলিয়েছেন, এবং বেশ কিছুদিন হল কর্মক্ষেত্র থেকে অবসরও নিয়েছেন। এখনও তাঁর বাড়ীতে গেলে পুরানো দিনের মতই হৈ হৈ হয়, কিছুক্ষণের জন্য তিরিশ বত্রিশ বছর আগেকার দিনে ফিরে যাই। কিন্তু পদ্মপুকুর রোডে সেই বাড়ীটির ঘর দুটোতে যে দিনগুলো ফেলে এসেছি সে দিনগুলো আর ফিরে পেলাম না। 'সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি'!

ক্লাসে আর অধ্যাপক মৈত্রকে কতটুকু পেয়েছি? আর সত্য কথা বলতে গেলে, ছেলেরা অধ্যাপকদের কতটুকু পায়? তাঁরা পড়ান, আর ভালছেলেরা ঘাড় হেঁট করে নোট করে নেয়, আর আমার মত যারা, তারা আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মিনিট গোনে। সুতরাং অধ্যাপক মৈত্রর নিকট-সান্নিধ্য সেখানে পাওয়া অন্তত: আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু এই দুটো ঘরে দুজনের সম্পর্ক স্নেহ ও প্রীতির আরক রসে তীর্ণ হয়ে বন্ধুত্বের নিবিড় বন্ধনে পরিণত হয়েছে। তিনি অধ্যাপক, আমি ছাত্র, সুতরাং আমাদের সম্পর্কটা "বন্ধুত্বের নিবিড় বন্ধনে পরিণত" হয়েছে বলাতে আপনারা বোধহয় asorilege গোছের একটা ইংরেজী কথা বলবেন ভাবছেন বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সত্যই তাই হয়েছিল, বয়স, সম্পর্ক, বিদ্যা সব কিছু ভুলে আমরা নিবিড় ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম, এবং আজও তাই আছি। নইলে শরতের বৃষ্টির কয়েকটা ফোঁটা জানলার শিক বেয়ে নেমে এসে যখন টগর গাছের পাতার উপর দুলত, আর তাদের উপর রোদ পড়ে চিক চিক করত, তাদের সেই নীরব গান যখন জানালার ধারে আরাম-কেদারায় বসে আমি শুনতে পেতাম, অধ্যাপক মৈত্র কি করে তা বুঝতে পারতেন? সকালের সোনা-গলানো রোদে কুয়ড়ো-লতার হলুদ ফুল যখন নাচতে নাচতে চড়াই পাখীর সঙ্গে খেলা করত আর তাদের হাসির সঙ্গে আমার মনও হাসতে সুরু করত, অধ্যাপক মৈত্রও আমার সঙ্গে কেমন করে সেই আনন্দের ভাগ নিতেন?

ওই পদ্মপুকুরের ঘরে জীবনকে দেখবার শিক্ষা পেয়েছি বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। জীবনে দুঃখ কষ্ট শোক অসম্পূর্ণতা অনেক কিছু আছে, কিন্তু তারি মধ্য থেকে রস আহরণ করে মনকে বাঁচিয়ে

রাখার সার্থকতার শিক্ষা খুব কম লোকেই দিতে পারে। পদ্মপুকুরের ওই ঘর দুখানা আমাদের সেই আনন্দ আহরণের শিক্ষা দিয়েছিল।

সব চেয়ে মজার কথা এই, চারিদিকে ওই দেয়াল-ঘেরা শিহনের ছোট কাঁচা উঠানের দিকে তাকিয়ে প্রকৃতিকে আমরা ভালবাসতে শিখেছিলাম। প্রকৃতিকে ভালবাসতে গেলে নীল আকাশ, সবুজ বন, দূরের পাহাড়, কলস্বনা স্রোতস্বতী উচ্ছল প্রস্রবণের ছড়াছড়ির প্রয়োজন, কই আমারে তো তা মনে হয়নি! ওই উঁচু-বারকরা নোনা-ধরা পাঁচিলের দেওয়ালে অতি ক্ষুদ্র পাতার মত দেখতে বুনো গাছটা আমাদের প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রহস্যের যে সন্ধান দিয়েছিল, বোধহয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বাড়াবাড়ির মধ্যে থাকলে সে সন্ধান লাভ করতাম না, হয়তো বৃক্ষের প্রাচুর্যে বনই খুঁজে পেতাম না! আর অধ্যাপক মৈত্র সেই রহস্যের চাবি কোথায় আছে চিনিয়ে দিয়েছিলেন। সেই আরাম কেদারায় বসে ওই বুনো গাছটার দিকে চেয়ে আমরা ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের হ্রদ অঞ্চলে বেড়িয়েছি, ড্যাফোডিলের নাচ দেখেছি, টেনিসনের lotos-eater দের সঙ্গে নেশাগ্রস্ত তন্দ্রায় আমেজে যৌজ করছি, কালিদাসের সঙ্গে উজ্জয়িনীর প্রাসাদ-শিখরে চড়ে দূর দূরান্তের শোভা উপভোগ করেছি, আবার জোড়াসাঁকোর দক্ষিণের বারান্দায় বসে বাগানের টলটলে পুকুরের জলে হাঁসের সাঁতার ভাসতে দেখেছি। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত সেই সবদৃষ্ট আজও মনের কোটায় বন্ধ আছে, জীবনের রস শুকিয়ে আসলে সঞ্জীবন সুধার কাজ করবে।

শুধু কি তাই? মানুষ বলে যে দুহাত তুলে-ওয়ালা জীব আছে, আমরা অহরহ যাদের নিন্দা করে সুখ পাই, বোধহয় তারা আমাদের স্বজাতি বলে, এই বয়সটোতে বলেই আমরা শিখেছিলাম মানুষকে চিনতে হলে তার মনের গহনে ডুবতে হবে, তলাতল পাতাল চুঁড়তে হবে, তবেই রত্ন পাওয়া যাবে। ওখানেই শিখেছিলাম, জীবনকে উপভোগ করতে গেলে রস আহরণ করতে আসা চাই, আর রস মানে শুধু মধুর রস নয়। মিষ্টি খেলে স্বাস্থ্য থাকে না, একটু উচ্ছে একটু নিম একটু তেতও খেতে হয়; আবার মুখ বদলাবার জন্য একটু টক ঝালও চাই। তাই জীবনের তাল-টুকুই নেব আর সেইটুকুই উপভোগ করব, এমন বললে তো চলবে না! মনের প্রসার বাড়িয়ে তার আর একটা দিককেও বুঝতে এবং ভালবাসতে হবে।

দিনে দিনে মানুষের sophistication বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও ধারা দুটোই বদলেছে, বদলাচ্ছে, বদলাবে, ভালর দিকে কি মন্দর দিকে জানি না। আমরা কি সাহিত্যে, কি রাজনীতিতে, কি কাজে, কি মনে, কি বাক্যে, কি চিন্তায়, কি ব্যবহারে—এতটা নূতনত্ববাদী হয়ে উঠেছি যে (ধর্ম আর নীতি তো উঠিয়েই দিতে চাই) আগেকার দিনে যে জিনিষের যে মূল্য দিতাম, আজ আর তা দিই না। অনেক জিনিষের মূল্য কমেছে, আবার অনেক জিনিষের মূল্য বেড়েছে যার দাম আগে কাণাকড়িও ছিল না। এই নবমূল্য নির্ধারণের ফলে যে আমাদের "হাজার টাকার বাগান খাইল পাঁচসিকার ছাগলে" তা দেখেও দেখছি না,—চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও দেখতে পাই না। আগেকার দিন হলে পথের ধারে শুচ্ছ শুচ্ছ ন্যাষ্টার্শিয়ম ফুল দেখলে থমকে দাঁড়িয়ে দেখতাম, নিতান্ত বেরসিক হলে বলতাম, 'আহা কি সুন্দর!' আর রস আহরণের কিঞ্চিৎ ক্ষমতা থাকলে সেই সোনালী হলুদ ফুলগুলির সঙ্গে অন্তরের সংযোগ আপনা থেকেই হয়ে যেত। কিন্তু আজ হয়তো মনে হবে, ওই বাগানে যদি একটা বোর্ড বসিয়ে নিয়ে আলো দিয়ে অমুক জিনিষের বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, রাস্তায় আলোও হবে, বিজ্ঞাপনও হবে, আমার যাহারও খুলবে। ওই

ছাই ফুলের গাছে কি হবে; একুশি করে পড়ে রাস্তা নোংরা করবে! মানুষের অবশ্য নারীরিক আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে উন্নত হয়েছে, কিন্তু মনটুকু যে কর্পূরের মত উপে যাচ্ছে!—মনের আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাস কই? নিশ্চয়ই কোথাও কিছু গলদ আছে, নইলে এ জিনিষটা হচ্ছে কেন? কেন বসে বসে ভাবতে হচ্ছে, "বিশ্ব হতে হারিয়ে গেছে স্বপ্নলোকের চাবি"?

পদ্মপুকুরের ওই ঘর দুটোতে সেই স্বপ্নলোকের চাবি ছিল অধ্যাপক মৈত্রের জিম্মায়, আর সেইজন্য ওই ঘর দুটোকে কোন দিনই ভুলতে পারব না। প্রেসিডেন্সী কলেজে তখনকার দিনে সেন্ট্রীতিমত ভাল পড়াশুনা হত, কিন্তু সেখানে পেতাম পুঁথির বিদ্যা, আর সেই বিদ্যাকে সার্থক করে তুলত এই ঘর দুটোর অন্তর চেনাশোনার পাঠশালা। যে দময় কৈশোর তার শেষ পা ফেলে যৌবনকে ধরে ফেলেছে, সেই সময় এই পাঠশালায় পাঠ নিয়েছি। আজ শঙ্করাচার্যের ভাষায় বলতে গেলে অতিদূরাগত "মহিষগলঘণ্টাস্বন" একটু একটু শুনতে পাবার বয়স হয়েছে। কিন্তু সেই পাঠ আজও ভুলিনি, কোন দিনও ভুলব না।

ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকের ডায়েরী

(১)

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

এই ডায়েরীর পটভূমিকা এইরূপ

১৯১৮ সালের প্রথমে শিক্ষাশিল্প সম্পর্কে জ্ঞান-লাভের উদ্দেশ্যে প্রথম সুইডেনে যাই। প্রথম দুবৎসর সে দেশে আমার শিক্ষানবিশীতেই কাটিয়াছিল। রাত্রিবেলা অবসর সময়ে তখন আমি আন্তর্জাতিক ভাষা এসপেরাণ্টো (Esperanto) শিখিয়াছিলাম। এই ভাষা-প্রবর্তকের মহান জীবনী পড়িয়া এবং এই ভাষাভাষী লোকদের সঙ্গে মিশিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল যে আন্তর্জাতিক ভাষার মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীতে একটি সত্যিকার নির্বিরোধী আন্তর্জাতিক মানবসমাজ গড়িয়া উঠিতেছে, যে সমাজের জাতীয়তাবোধ সংকীর্ণ ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ নয়, যে সমাজের একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ, ভাষার মাধ্যমে হৃদয়ের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান ও পরস্পরকে জানা। বস্তুতঃ এসপেরাণ্টো ভাষার মাধ্যমে পৃথিবীর বহু দেশের লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছিল, কাহারো কাহারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। সম্প্রতি এসপেরাণ্টো ভাষার প্রবর্তক ডক্টর জামেন হফির শতবার্ষিকী ইউনেস্কো প্রতিপালন করিয়াছেন। আমার সুইডেনের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দুই বৎসর পর স্বদেশে ফিরিবার পূর্বে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণের ইচ্ছা হইয়াছিল। সুইডেনের এসপেরাণ্টো ফেডারেশনের প্রধান আমার আকাঙ্ক্ষা জানিয়া আমাকে সুইডিশ জনশিক্ষা সংস্থার দেশব্যাপী শাখাগুলিতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করেন। রাষ্ট্রের অর্থসাহায্যে পুষ্ট এই সমিতির শাখা সমগ্র দেশের পল্লীতে পল্লীতে সহরে সহরে ছড়াইয়া আছে। বক্তৃতা সূত্রে সমগ্র দেশটি আমার দেখার ও জানার সুবিধা হইবে এবং একই সূত্রে পরাধীন ভারতের দুঃখের কথাও কিছু

প্রচার করা যাইবে, এই ভাবিয়া আমি এই আবরণ গ্রহণ করি। এই ভাবে আমি সমগ্র দেশটি পরিক্রমণ করি। সেই দেশের শিক্ষা, কৃষি, ভূগোল, শিল্প ও সর্বোপরি লোক-জীবনের সঙ্গে আমার নিকট পরিচয় ঘটে। পরে এসপেরান্টো ভাষায় "ভারতীয়ের দৃষ্টিতে সুইডেন"(Hindorigardes Svedlandon) নামক একখানা গ্রন্থও লিখিয়াছিলাম। ১৯৩১ সালে দেশে ফিরি। আবার ১৯৩৩ সালে ইউরোপে যাই এবং ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত অবস্থান করি। প্রথম-বারে আমি এস্টোনিয়া, লাটভিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ঘুরিয়াছি, দ্বিতীয়বারে ডেনমার্ক, নরওয়ে, আইসল্যাণ্ড, জার্মানী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ ঘুরিয়া ছিলাম। আমার ভ্রমণকাহিনী এক সময়ে প্রবাসী মডার্নরিভিউ প্রভৃতি পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। বিদেশের বহু জার্ণেলেও আমার ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯৪৩ সালে UNO-এর ফেলো নির্বাচিত হই এবং সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক ও যুক্তরাজ্যের (U.K.) যুদ্ধোত্তর কালের সমাজমঙ্গল ব্যবস্থাদি ও বিভিন্ন ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঘুরিয়া দেখি। এই শেষোক্ত বারের অভিজ্ঞতাই 'শিক্ষা'র পাঠকদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। কোন দেশের সমাজ-মঙ্গল ব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে সেই দেশের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই তাহা সম্ভব। ১৯৪৩ সালে এই ডায়েরী লিখিয়া-ছিলাম, এখন তাহা 'শিক্ষা'র পাঠকদের জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে।

সুইডেন :

স্কানডেনাভীয় দেশ সমূহের মধ্যে বৃহত্তম সুইডেন আকারে ইউরোপের চতুর্থতম বৃহৎ দেশ। ইহার ঐতিহাসিক বিভাগ তিনটি। যথা : উত্তরাংশ নরল্যাণ্ড (Norrland); ইহার উত্তর ভাগ সুমেরু রেখার উত্তরে অবস্থিত এবং ল্যাপল্যাণ্ড বলিয়া পরিচিত। নরল্যাণ্ডের আয়তন ২৬১,৩০০ বর্গ কেলোমিটার এবং দেশের অন্য দুই অংশ অপেক্ষাও আয়তনে বড়। দেশের মধ্যাংশের নাম স্বেয়াল্যাণ্ড (Svealand) আয়তনে ৮৫,১০০ বর্গ কিলোমিটার। দেশের রাজধানী স্টকহলম্ এই অংশেই অবস্থিত। দক্ষিণাংশের নাম গোতাল্যাণ্ড (Gotaland) আয়তনে ৯২,৬০০ বর্গ কিলোমিটার। এই তিন অংশকে যোগ করিলে দেশের স্থলভাগের আয়তন পাওয়া যায়। দেশের জলভাগের আয়তনও কম নহে; তিনটি সুবৃহৎ হ্রদ যথা—ভেনের্ণ (Vanern) ভেস্তের্ণ (Vattern) ও মেলারেন (Malaren), তিনটির আয়তন একুনে ৯,১০০ বর্গ কিলোমিটার, (ইংরাজী মাইলে সমগ্র দেশের আয়তনে ১৭৩,৩৬৮ বর্গ মাইল)। দেশে চাষবাসের জমির পরিমাণ শতকরা ৯'১ ভাগ, গোচারণ ভূমির পরিমাণ শতকরা ২'৪, বনভূমির পরিমাণ ৫৪'৫ ভাগ ও অন্যান্য ভূমির পরিমাণ শতকরা ৩৩'১ ভাগ। নদী হ্রদ প্রভৃতি ৮'৭ ভাগ।

১৯৫০ সালের গণনায় দেশের লোকসংখ্যা ৭,০৪৬,৯২০ জন অর্থাৎ প্রতি বর্গ মাইলে ৪৩ জনের বাস। ১৮৫০ সালে জন সংখ্যার শতকরা ১০ জন সহরবাসী ছিল, বর্তমানে সহরবাসীর সংখ্যা শতকরা ৪৩ জন। শ্রমশিল্পে বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহরের অধিবাসীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে।

জাতিগত ও ধর্মগত মতবাদের পার্থক্য দেশে নাই। ধর্মমত খ্রীষ্টান লুথেরান। দেশে ৩৪ হাজার ফিন্‌ল্যাণ্ড অধিবাসী ও ১০,২০০ ল্যাপ আছে।

সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৩৮ জন কারখানায় ও শিল্পে নিয়োজিত, কৃষি ও কৃষিজাত অন্যান্য কর্মে শতকরা ২৮ জন, ব্যবসাতে শতকরা ১২ জন, সিভিল সার্ভিস ও অন্যান্য পেশাতে শতকরা ৯ জন, 'কমুনিকেশনে' শতকরা ৮ জন ও অন্যান্য পেশায় শতকরা ৫ জন নিয়োজিত।

কৃষি : আমি বহু কৃষিবিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছি এবং কৃষক পরিবারে বাস করিয়াছি। চাষজমির শতকরা ১০ ভাগ কৃষকদের দখলে আছে। কৃষি ও গোরক্ষণ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে তেমন লোকের সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ। দেশে খামারের সংখ্যা ৪১৪,০০০ ; ইহার তিন-চতুর্থাংশ খামার প্রতিটি ২৫ একরের অধিক নয় ; মাত্র ১.৪ ভাগের প্রতিটি ১২৩ একরের অথবা ততোধিক আকারের।

ক্ষুদ্র চাষীদের পক্ষে একমাত্র কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ কঠিন ; সেজন্য অবসর সময়ে বিশেষতঃ শীতকালে বনেরও কাজ করিয়া থাকে। দেশের প্রায় সমস্ত কৃষককুল কো-অপারেটিভ সংস্থার সদস্য (Producers' Co-operatives)। চাষযোগ্য ভূমির অল্পতা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকভাবে চাষের উন্নতির ফলে মৌলিক খাদ্যবস্তুতে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। রাষ্ট্রের নীতি ও উদ্দেশ্য এই যে খাদ্যে যেন দেশ সর্বদাই আত্মনির্ভরশীল থাকিতে পারে।

মৎস্য ব্যবসা : ১০,০০০ মৎস্যজীবি একমাত্র মাছের ব্যবসা করিয়াই জীবিকার্জন করে, ১০,০০০ আংশিকভাবে মৎস্য ব্যবসার উপর নির্ভরশীল।

শ্রমশিল্প : লৌহখনি, বন ও বৈদ্যুতিক শক্তি দেশের অর্থ সম্পদের প্রধান উৎস। ইহার শতকরা ১৫ ভাগ ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্থাৎ রাষ্ট্র-পরিচালিত নয়।

বনসম্পদ : বন দেশের বৃহত্তর সম্পদ। দেশের অর্ধেকেরও অধিক ভূভাগ বনে আবৃত।

কলকারখানা : দেশের কলকারখানার সামান্য অংশ সহরতলীতে অবস্থিত কিন্তু বৃহত্তম অংশ দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। ইহার ফলে সমগ্র দেশটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সহজ হইয়াছে। কলকারখানার মজুরদের অবকাশ বিনোদনের উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে মনোরম করা সহজ হইয়াছে।

জাহাজ : দেশে ১৫০২টি জাহাজ, ইহাদের গ্রস টন ২,০০০,০০০। দেশের আমদানী রপ্তানীর অর্ধেক সুইডিশ জাহাজেই হয়। দেশে আমদানী করিবার বন্দর স্টকহলম, রপ্তানীর বন্দর গোথেনবার্গ। মালমো তৃতীয় বৃহৎ বন্দর।

সংবিধান : সংবিধান অনুযায়ী দেশে রাজা আছেন, কিন্তু রাজার ছেলে মাত্র রাজা হইতে পারেন। রাজার ক্ষমতা সংবিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ।

সমগ্র দেশ ২৪টি কাউন্টিতে বিভক্ত। রাজধানী স্টকহলম একটি পৃথক মেট্রোপলিটন কাউন্টি। প্রত্যেক কাউন্টির একজন শাসক আছেন, শান্তিরক্ষার সর্বময় দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত। তাছাড়া মিউনিসিপ্যাল বা টাউন কাউন্সিল আছে। দেশের পার্লামেন্ট (Riksdag) একমাত্র টেক্স নির্ধারণে সমর্থ। কেবিনেট ও পার্লামেন্ট একযোগে আইন বিধিবদ্ধ করেন।

কাউন্টিগুলি কমিউনস্ (Communes)-এ বিভক্ত। কমিউনসের উপর সমাজ কল্যাণের সর্ববিধ ব্যবস্থার ভার অর্পিত আছে। চিকিৎসা, রিলিফের কাজ, শিশুমঙ্গলের কাজ, শিক্ষা, স্থানীয় টেক্স ইত্যাদি কমিউনস্ পরিচালনা করেন।

সমাজ কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা : সমাজমঙ্গল ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাকে পুষ্ট করা সুইডেনবাসীরা সর্বোত্তম রাষ্ট্রের কাজ বলে করেন ; অর্থাৎ নীরোগ, সুশিক্ষিত, সবল, স্বয়ং-পরায়ণ ও দুর্ভাবনাহীন জাতির ভবিষ্যৎও সমুজ্জ্বল মনে করেন। বস্তুত ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সোসিয়ালিজমের এরূপ বাস্তব প্রকাশ অন্য রাষ্ট্রে বড় দেখা যায় না। শান্তিপ্রিয় সুইডেরা গত দুইটি মহাসমরে লিপ্ত হয় নাই ; ফলে এই রাষ্ট্র জন-সাধারণের শিক্ষা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য সমগ্র শক্তি দিতে সমর্থ হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে আর একটি তথ্যও পাঠককে মনে করিতে হইবে। সুইডেনের কোন কলোনী ছিল না। একমাত্র দেশবাসীর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের বলে দেশের বিরাট উন্নতি

সম্ভব হইয়াছে। সামগ্রিক সমাজকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার ভিত্তি চারিটি বীমা আইন :—যথা (১) জাতীয় পেনসন আইন (The National Pension Law), দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বীমা আইন (The Accident Insurance Law), স্বাস্থ্যবীমা আইন (Voluntary Health Insurance) এবং বেকার বীমা আইন (The Voluntary Unemployment Insurance)।

দেশের সমগ্র অধিবাসী এই সকল নিরাপত্তা আইনের অধীন, এবং সেজন্য রাষ্ট্র হইতেও প্রচুর ব্যয় করা হয়।

প্রয়োজন থাকুক আর নাই থাকুক ৬৭ বৎসরের অধিক বয়সের সকলের জন্য জাতীয় পেনসন আইনের বলে মুক্তহস্তার জীবিকা ও পরিচর্যার সুব্যবস্থা আছে।

দৈনন্দিন কর্মজীবনে কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে দ্বিতীয় আইনের বলে সম্পূর্ণ মজুরী দেওয়ারও এবং পরিবারের সাহায্য লাভের ব্যবস্থা আছে।

১৯৪৬ সালে "আবশ্যিক—স্বাস্থ্য-বীমা-আইন" পাশ হয়। ১৯৫১ সাল হইতে এই আইনের বলে সর্বসাধারণের চিকিৎসার ব্যবস্থা বহাল করা হইয়াছে।

বেকার বীমা দ্বারা বেকার জীবনের জীবিকার পথ প্রশস্ত করা হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ান বেকার বীমার সামান্য অংশ বহন করে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় সাহায্যই অধিক।

শিশুমঙ্গল : ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩ : সমাজ-মঙ্গল ব্যবস্থার একটা বৃহৎ অংশ শিশুমঙ্গল ব্যবস্থা। আজ সকাল বেলাটা স্টকহলমের নিকটবর্তী এক শিশুগৃহে কাটিয়াছে। এই শিশুগৃহের (Nybodo) উদ্দেশ্য ও কাজ এইরূপ :—(ক) যে সকল শিশুকে সাধারণ শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাখা চলে না তাহাদিগকে এখানে ভর্তি করা এবং (খ) পর্যবেক্ষণ দ্বারা তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষার পথ নির্দেশ করা।

মাতাপিতার অসুস্থতা হেতু যে সকল শিশুর সাময়িক যত্ন ও পরিচর্যার প্রয়োজন, যে সকল শিশু মাতাপিতার যথোচিত যত্নলাভে বঞ্চিত, যে সকল শিশু বিদ্যালয়ের শাসন ভঙ্গ করে—সেই ধরণের শিশুকে এ জাতীয় শিশুগৃহে ভর্তি করা হয় এবং প্রত্যেকটি শিশুর অসুস্থতার কারণ বা রোগ নির্ণয় করা হয়। উপযুক্ত কাল পর্যবেক্ষণের পর কোন কোন শিশুকে ভিন্ন পরিবেশে শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়। আমি যে দিন এই শিশুগৃহ পরিদর্শন করি সেদিন সেই গৃহে ২২৯ জন শিশু ছিল। এই গৃহে চার পাঁচ মাস বয়সের অনেকগুলি মাতৃহীন শিশুও ছিল। এই গৃহে এদের উপযুক্ত পরিচর্যার সকল ব্যবস্থা আছে। সমগ্র গৃহের শিশু পরিচর্যা ও শিক্ষার ব্যবস্থা অতি আধুনিক। সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি ঘুরিয়া দেখার পর আমি শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে লাঞ্চ খাইতে বসিয়া এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সকল তথ্য জানিতে পাই। সমস্যা সম্পর্কেও আলোচনা হইয়াছিল।

এইরূপ শিশুগৃহ এদেশের সর্বত্রই বিদ্যমান। সমগ্র জাতির শিশু ও শিক্ষার এই সকল ব্যবস্থা দেখিলে অনুভব করা যায়—কেন সুইডেনকে "সমাজ-কল্যাণ-রাষ্ট্র" বলা হয়। রাষ্ট্রীয় সমাজ-কল্যাণ সমিতির একটি প্রধান কাজ, শিশুমঙ্গলের কাজ পরিচালনা করা। সহর হোক, আর পল্লী হোক, সর্বত্রই শিশুমঙ্গল সমিতি (Child Welfare Board) আছে। যে সকল মাতাপিতা সন্তানের ভার লইতে অপারগ, অবিবাহিত মাতা ও তাহাদের সন্তান—উভয়কে আর্থিক সাহায্য দান ও তাহাদের সামাজিক সমস্যা সমাধানে শিশুমঙ্গল সমিতি কাজ করেন। আর প্রয়োজন হইলেই স্থানীয় সমিতি নিকটবর্তী এরূপ শিশুগৃহে শিশুদিগকে পাঠাইয়া দেন।

শিশুপালন ব্যয়: ছোট বড় নির্বিশেষে দেশের সকল পরিবারের শিশু যাহাতে বয়সোচিত যত্ন ও শিক্ষা পায় সেজন্য "শিশু সাহায্য আইন" (Child Allowance Act) আছে। এই আইনের বলে শিশুমাতার আর্থিক অবস্থার তারতম্য বিচার না করিয়াই প্রতি বৎসর শিশুপ্রতি ২৬০ ক্রাউন শিশুর মায়ের হাতে দেওয়া হয়। স্থানীয় শিশু কল্যাণ সমিতির মাধ্যমে এই অর্থ মায়ের হাতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। অন্যান্য ষোল লক্ষ পঞ্চাশ হাজার শিশু এইভাবে আর্থিক সাহায্য পায়। এ বাবত ১৯৫০ সালে গবর্ণমেণ্টকে ৪৪০ মিলিয়ন ক্রাউন (এক ক্রাউন প্রায় এক টাকার সমান) ব্যয় করিতে হইয়াছিল। এখন এই ব্যয়ের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিধবার সন্তান, অথর্ব শিশুমাতার সন্তান ও পিতৃমাতৃহীন শিশুদের জন্য পৃথক আর্থিক বরাদ্দের ব্যবস্থা আছে। তদুপরি গ্রীষ্মাবকাশ বিনোদনের জন্য, দাঁতের চিকিৎসার জন্য ও বিদ্যালয়ে খাদ্য পরিবেশনের জন্য রাষ্ট্রকোষ হইতে প্রচুর পৃথক ব্যয় করা হয়। দশ বৎসর বয়স্ক শিশুদিগকে গ্রীষ্মকালে স্থানান্তরে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়। উহাদের পাথেয় রাষ্ট্রই বহন করেন।

গৃহ-কল্যাণ: সুইডিশ পার্লামেণ্ট গৃহ-কল্যাণ নীতিকে আইনের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করেন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, সমগ্র জাতির শিশুদের যথার্থ পরিচর্যা এবং যে সকল পরিবারে সন্তানসন্ততির সংখ্যা অধিক—সেই সকল পরিবারকে—বিশেষ করিয়া মাতাকে অর্থ, প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা দ্বারা সাহায্য করা। এ খাতে যে অর্থ দান করা হয়, সেই অর্থের উপর টেক্স্ বসে না।

যাহারা বিবাহ করিয়া ঘর সংসার পাতে, তাহাদিগকে বিনা আয়াসে আর্থিক সাহায্য করা হয়। বিবাহিতের সংসার কি ভাবে চালনা করা উচিত, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য "গৃহ পরিচালনা কোর্স"-এর প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে এবং অধিকাংশ অধিবাসী এই কোর্সে যোগ দেয়। আয় অনুযায়ী গৃহ বাজেট তৈরি করার পদ্ধতি, খরচ করার পদ্ধতি, রান্নাবান্না ও গৃহ পরিষ্করণ পদ্ধতি, জীবনের যাবতীয় দৈনন্দিন কার্য পদ্ধতি এই কোর্সের মাধ্যমে শেখানো হয়। কাপড়চোপড় ধুইবার পৃথক সমাজ-ব্যবস্থা আছে—যাহাতে গৃহে কাপড় ধুইবার ঝামেলা না থাকে। মাতৃমঙ্গলের যাবতীয় ব্যয় রাষ্ট্র বহন করে। যে সকল ঘরের বৌ আর্থিক অনটনের জন্য গ্রীষ্মাবকাশে ভ্রমণ অসমর্থ, তাঁহারা ছেলেমেয়ের সহ ছুটির দিনে রাষ্ট্রের খরচে ভ্রমণে যাইতে পারেন। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সবল রাখার জন্য এই ব্যবস্থা। এরূপ পরিবারের ছেলেমেয়েরা ক্যাম্পে থাকে, আবার অনেকে এরূপ ছেলেমেয়েকে অতিথিরূপে গ্রহণ করেন। দিবাকালীন নার্শারী বিদ্যালয়ে কর্মরত মায়ের প্রতিবৎসর ৩৫,০০০ শিশুর ভার লওয়া হয়।

শিশু ও মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান: দেশের সর্বত্রই ছোট বড় শিশু ও মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান আছে। আমি দশ বারোটি প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ দেখিয়াছি। ইদানীং স্টকহলমের একটি শিশু ও মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান দেখিয়াছি। ইহার নাম Maria Husmoderskola। এরূপ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ইউরোপে বেশী নাই। প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগের কাজ দেখিতে আমার ছয় ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। স্টকহলম-নগর-সংস্থা পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষা ও শিশু পরিচর্যা বিভাগ দুইটির ব্যবস্থাদি অতি আধুনিক। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর নির্দেশে এবং তাঁহাদের প্রয়োজনমত গৃহের পরিকল্পনা ও ক্লাসের ব্যবস্থাদি হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানে নিম্নলিখিত বিভাগ আছে:—

এক—তিন মাস হইতে দুই বৎসর বয়স্ক শিশুদের নার্শারী আছে। যে সকল পরিবারের

যাহারা দিনের বেলা স্থানান্তরে কাজ করেন, তাঁহাদের সন্তানেরাই এই নার্শারী বিদ্যালয়ে সকাল সাড়ে ছয়টা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত যাপন করে। শিশুদের খাওয়ানো, স্নান করানো, চিকিৎসা ও খেলা দিবার ব্যবস্থা আছে, অসুস্থ শিশুকে রাখিবার পৃথক ঘর, অফিসের ঘর, শুইবার ঘর সকলই পৃথক। তিন মাস হইতে এক বৎসর বয়সের শিশুদের নার্শারীটি পৃথক।

দুই—একটি কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয় আছে। ইহাতে তিন হইতে পাঁচ বৎসরের শিশুরা দিনে তিন ঘণ্টা করিয়া বয়সোচিত শিক্ষা পায়। এই সেক্শনে একটি "খেলার রাস্তার" ও পৃথক অফিস ঘর আছে। শিশুদের খেলার জন্য তিনটি বৃহৎ হল আছে। সেখানে বহুবিধ খেলনা ও খেলার ব্যবস্থা আছে। শিশুদের খেলা নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ করেন শিক্ষয়িত্রী।

তিন—দুই হইতে সাত বৎসরের শিশুদের খেলার জন্য একটি সুবৃহৎ হল আছে। ইহার সঙ্গে একটি স্নানাগার, একটি বিশ্রামাগার ও অসুস্থ শিশুদের থাকার পৃথক ব্যবস্থা আছে।

সহরের দক্ষিণাংশে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত এবং সেই অঞ্চলের শিশুদের জন্যই এই ব্যবস্থা। প্রতিষ্ঠানটি এক মহিলার উদ্যোগে ১৯০৯ সালে স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯৩০ সালে আমি প্রতিষ্ঠানটি প্রথম দেখিয়াছিলাম কিন্তু বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের কলেবর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ইহার ব্যবস্থাদিও অতি আধুনিক বলা চলে। এখন ইহা সিটি কাউন্সিলের আর্থিক সহায়তা পাইতেছে। শিশু শিক্ষা ও শিশু সেবার সঙ্গে সঙ্গে এখানে তিনটি পৃথক পৃথক কোর্স চলে।

১। "গৃহ বিজ্ঞান ও শিশু পরিচর্যা" কোর্স ছয় মাসের। পনের হইতে বিশ বৎসর বয়স্ক মেয়েরা এই কোর্সে যোগ দান করে। মোট ছাত্রীর সংখ্যা ৭২। শিক্ষণীয় বিষয়:—চৌদ্দ সপ্তাহ রান্নাবান্নার কাজ; চৌদ্দ সপ্তাহ কাপড় ধোয়া, গৃহ সংরক্ষণ ও চালনা পদ্ধতি, সূচের কাজ, রিপুর কাজ আর চৌদ্দ সপ্তাহ হাতে কলমে শিশু পরিচর্যা শিখিতে হয়। তা ছাড়া নিম্নোক্ত বিষয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞান দেওয়া হয়, খাদ্য, রান্না, গৃহচালনা, সূচের কাজ, শিশু-শিক্ষার সহায়ক বস্তু তৈরির পদ্ধতি, শিশু শিক্ষা, ব্যক্তি-স্বাস্থ্য ও সমাজ-স্বাস্থ্য, সমাজে পরিচালনা ও গৃহস্থালীর সুব্যবস্থা।

মেয়েরা বিদ্যালয়ের আবশ্যিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া জীবন আরম্ভ করার পূর্বে দলে দলে এই কোর্সে যোগ দেয়। সকলকে পরিপূর্ণ নাগরিক করিয়া তোলাই এই সকল কোর্সের মূল উদ্দেশ্য।

২। সতের হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স্কদের জন্য অনুরূপ পাঁচ মাসের একটি পৃথক গৃহবিজ্ঞান কোর্স আছে। এই কোর্সেও ছাত্র সংখ্যা ৭২।

৩। যাহারা শিশুপরিচর্যাকে জীবনের ব্রত বা পেশা করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের জন্য পৃথক ছয় মাসের কোর্স আছে। আঠারো হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স্কগণ এই কোর্সে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু এই কোর্সে যোগ দিবার পূর্বে পূর্বোক্ত পাঁচ মাসের কোর্স পাশ করা প্রয়োজন, এবং শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের কাজে এক হইতে দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। এই কোর্সে মাত্র ষোল জন ছাত্র ভর্তি করা হয়।

উপরে বর্ণিত কোর্স তিনও সারা বৎসরই পৃথক সান্ধ্য ক্লাশ পরিচালনা করা হয়। সান্ধ্য ক্লাশে এক সঙ্গে বারোজনের বেশি লওয়া হয় না। সান্ধ্য ক্লাশ প্রতি সপ্তাহে চারি ঘণ্টা চলে। এই প্রতিষ্ঠানে একটি সুবৃহৎ হলঘর আছে। সেখানে তাত্ত্বিক ক্লাশ, সমবেত প্রার্থনা ও উৎসবাদি হইয়া থাকে।

এই ধরনের ছোট বড় প্রতিষ্ঠান—দেশের বহু স্থানে আছে। মধ্য সুইডেনের বোরলেঞ্জে (Borlange) নামক স্থানে সুইডেনের একটি বৃহৎ

লৌহ কারখানা আছে। এই কারখানার মজুর পরিবারের শিশুদের জন্য আকারে ছোট অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে দুই দিন ছিলাম। মফস্বলের শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানগুলি বেশ ঘরোয়াভাবে পরিচালিত হয়।

দেশের সমস্ত শিশুবণ্টীর শিশুমঙ্গল কাজ স্ল্যান করিয়া করা হয়। মাতৃলি আবশ্যিক বিদ্যালয়ের জীবনের বাহিরেও ছেলেমেয়েদের রক্ষা লইবার ব্যবস্থা সেই দেশে প্রচলিত আছে। এই ব্যবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করা চলে—যেমন খেলার স্কুল, দিনের বেলার নার্শারী বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের পড়া তৈরির জন্য শিক্ষাগৃহ। ইংরাজীতে শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে After-school homes বলা হয়।

খেলার স্কুল : চারি হইতে সাত বৎসরের ছেলেমেয়েকে উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে বয়সোচিত খেলাধূলা শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ শিক্ষানৈতিক ও সামাজিক, অর্থাৎ গৃহে শিশুদের মাতাদিগকে অবসর দান।

দিনের শিশু বিদ্যালয় বা নার্শারী : যে সকল মা জীবিকার জন্য সারাদিন বাহিরে কাজ করেন তাঁহাদের সন্তানদের (তিন মাস হইতে সাত বৎসর বয়সের) বারো ঘণ্টা নার্শারীতে রাখিয়া যত্ন লওয়া হয়। মাতারা সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিবার পথে সন্তানদিগকে বাড়ীতে লইয়া আসেন। এই ব্যবস্থাও সার্বজনীন।

শিক্ষাগৃহ (After-school homes) : বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদিগকে এই সকল গৃহে রাখা হয়—যাহাতে তাহারা উপযুক্ত বিশ্রাম ভোগ এবং বিদ্যালয়ের পড়া তৈরি করিতে পারে। শিক্ষাগৃহে একবেলা খাবারও দেওয়া হয়।

শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস :

আবশ্যিক বিদ্যালয়ের বাহিরে জাতির শিশুদের শিক্ষা, যত্ন ও পরিচর্যার প্রতিষ্ঠানিক উদ্যোগ সুইডেনে প্রথম বে-সরকারী ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল। ১৮৩০ সালে সুইডেনের প্রধান শহর স্টকহল্মে ও দ্বিতীয় শহর গোথেনবার্গে প্রথম শিশুবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আধর্মবাদী সমাজসেবীরাই এই কাজ প্রথম সুরু করেন। ১৯০৪ সালে প্রথম 'নার্শারী' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই সময় হইতে নার্শারী বিদ্যালয় রাষ্ট্রের অর্থসাহায্যে দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। কিণ্ডারগার্টেনের নীতিই এই সকল প্রতিষ্ঠানে অনুসৃত হইত। সেই সময়ে "প্রাইভেট কিণ্ডার-গার্টেন" স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে, কিন্তু প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিশুদের জন্য প্রচুর খরচ করিতে হইত এবং সেজন্য ছাত্রসংখ্যা বেশী হইত না। ১৮৫৪ সালে "দিনের নার্শারী" স্টকহলমে স্থিতি লাভ করে। ব্যক্তিবিশেষের প্রচেষ্টার ফলেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য ছিল শিশুমঙ্গল কাজের মাধ্যমে সমাজের সেবা করা। এই নার্শারী অবৈতনিক ছিল। আর্থিক অসচ্ছল পরিবারের শিশুদিগকে এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হইত। শিক্ষাগৃহের প্রবর্তনও একই ভাবে দেশে স্থিতিলাভ করে।

সুইডেনে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটি কমিশন আছে। এই কমিশন ১৯৩৮ সালে শিক্ষা-গৃহের উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুসন্ধানের কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৪১ সালে অনুসন্ধান কাজ সমাপ্ত হয় এবং ১৯৪৩ সালে এই কমিশন 'শিক্ষাগৃহ' ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য আর্থিক সাহায্য দানের সুপারিশ করেন। ১৯৪৪ সাল হইতে রাষ্ট্র এই শিক্ষাগৃহসমূহকে উন্নত করিবার জন্য অর্থ সাহায্য দিতে আরম্ভ করেন। ১৯৪৬ সালের বিবরণীতে দেখা যায় যে ঐ সালে শিক্ষাগৃহের সংখ্যা ৫১৬টি ছিল। পরবর্তীকালে এই সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। শিক্ষাগৃহ বাবদ রাষ্ট্রকোষ হইতে কি পরিমাণ ব্যয় করা হয় নিম্নে দেখান গেল :—

১৮৪৩—৪৪ সালে ব্যয় হইয়াছিল ২০০,০০০ ক্রাউন
১৯৪৫—৪৬ " ৪০০,০০০
১৯৪৬—৪৭ " " " ১০০০,০০০ "

সর্বপ্রকার শিশু-শিক্ষার জন্যই রাষ্ট্র বর্তমানে অধিকতর অর্থ ব্যয় করিতেছেন। আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায় এরূপ ব্যয় করা নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া দেশের সকলেই মনে করে। কারণ শিশুর মঙ্গলের উপরই জাতির ভবিষ্যত সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

শিশুগৃহের রাষ্ট্রব্যয়ের কতকগুলি বিষয় আছে। শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রে অন্ততঃ দুই বৎসরের কোর্স সমাপ্ত করিয়াছেন এমন শিক্ষক শিশুগৃহে নিয়োগ করিতে হইবে। শিক্ষকদের বেতনের এক-তৃতীয়াংশ এবং প্রতি শিশুর খাদ্যের জন্য ৩০ ঘরা পয়সার মত রাষ্ট্রকোষ হইতে দেওয়া হয়। শিশুগৃহের বাসভবন নির্মাণের জন্য পৃথক ব্যয়ের ব্যবস্থা আছে, তাহা উপরের হিসাবে দেখান হয় নাই।

ছোট বড় নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল শিশুকে জাতির উপযুক্ত প্রতিনিধি ও নাগরিক করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাহিরে সমগ্র ছাত্রজীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সেই দেশের অধিবাসী সদা জাগ্রত। ১৯৪০ সালে পূর্ববর্তী শিশুমঙ্গল আইনের সংস্কারের জন্য একটি কমিটি বসিয়াছিল। এই কমিটির রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, সুইডেনে অন্যূনাধিক সত্তর লক্ষ লোকের বাস; আর দেশের ২০,০০০ শিশু সমাজমঙ্গল আইনের বলে সম্পূর্ণ আর্থিক সাহায্য শিক্ষা ও পরিচর্যা লাভ করে। শিশুশিক্ষার জন্য ছয়টি বিশেষ "শিক্ষক-শিক্ষণ" প্রতিষ্ঠান আছে। প্রতি বৎসর ১৭৫ জন শিক্ষক শিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত করিয়া শিশু শিক্ষার কাজে যোগ দিয়া থাকেন।

• • •

বর্তমান যুগে উন্নত দেশ মাত্রই সমাজকল্যাণ কাজে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু সত্যকার সমাজকল্যাণ রাষ্ট্র (Welfare State) বলিতে যাহা বুঝায়, সুইডেন তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে দেশটি ইউরোপীয় প্রাচীনতম দেশের মধ্যে একটি—যাহার স্বাধীনতা কখনও লুপ্ত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ ইতিহাসের শিক্ষা সুইডেরা ভালভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল, অর্থাৎ যুদ্ধ ও অস্ত্রবল দ্বারা কেহ লাভবান হয় না এই সত্য তাহারা অতীতে নানা ঐতিহাসিক সংঘাতের ফলে জাতি হিসাবে অনুভব করিয়াছিল। বস্তুতঃ ১৮১৪ সালের পর সুইডেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন যুদ্ধ বিগ্রহ করে নাই। ১৯০৫ সালে নরওয়ে বিনা যুদ্ধে পৃথক রাজ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্ক নির্লিপ্ত ছিল। দ্বিতীয় মহাসমরে ডেনমার্ক অধিকৃত হইয়াছিল, নরওয়ে যুদ্ধ এড়াইতে পারে নাই, কিন্তু সতর্কতা সহকারে সুইডেন যুদ্ধকে এড়াইয়াছে। এই সকল কারণে শিক্ষা ও সর্বাঙ্গীণ সমাজমঙ্গলের জন্য দেশবাসী ও রাষ্ট্র নিজের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সোশিয়ালিজম ও ডেমক্রেসির অদ্ভুত ও সার্থক সমন্বয় সুইডেরা সম্ভব করিয়াছে। আটলান্টিক প্যাক্টে ডেনমার্ক ও নরওয়ে যোগ দিয়াছে, কিন্তু সুইডেন নিরপেক্ষ রহিয়াছে। নিজের আত্মরক্ষার সর্ববিধ ব্যবস্থাও সুইডেন গ্রহণ করিয়াছে, অপর পক্ষে সমগ্র জাতির সমাজকল্যাণ কাজ চিন্তা করিয়া অগ্রসর হওয়ায় ইহার প্রত্যক্ষ ফলও সেই দেশে দেখা যায়। যেমন ১৮৭১ সাল পর্যন্ত দেশবাসীর আর্থিক জীবন কৃষির উপর নির্ভর করিত। ১৮৭০ সালে শতকরা ৫০ জন কৃষি কার্যে, ১০ জন শ্রমশিল্পে ও মাত্র ২ জন ব্যবসাবাণিজ্যে করিত। ১৯২০ সালে উপরোক্ত হার যথাক্রমে শতকরা ৩৮·৪, ৩১·৪ ও ১২·৮৩ পৌঁছায়, কিন্তু কৃষির উৎপাদন অপর পক্ষে বাড়িয়াই চলিয়াছে। জাতীয় আর্থিক

সমৃদ্ধি ক্রমশ মুষ্টির পথে চলিয়াছে। জাতীয় সমৃদ্ধি বাড়াইতে হইলে সর্বসাধারণের সুখসমৃদ্ধি ও কর্মক্ষমতা বাড়াইতে হয়, ইহা জাতি হিসাবে সুইডেনরা অনুভব করিয়াছিল। ১৮৭১-৮০ সাল মধ্যে শিশু-মৃত্যুর হার (এক হইতে তিন বৎসরের শিশু) হাজার প্রতি ৩৩·৩৫ ছিল। ১৯২২ সালে তাহা কমিয়া হাজার প্রতি ৮·৪৪ দাঁড়াইয়াছিল। এখন শিশুমৃত্যুর হার আরও কম। বর্তমান পৃথিবীতে ডেমক্রেসি ও কমিউনিজমের মধ্যে আদর্শগত সংঘাত প্রবল, কিন্তু সুইডেন এবং অন্যান্য স্কানডিনাভীয় দেশ রাশিয়ার প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তি-স্বাধীনতার ও ডেমক্রেসির দেশ, এবং কমিউনিজমের প্রভাব হইতে মুক্ত। ইহার প্রধান কারণ, সেই সব দেশের সমাজকল্যাণ কাজের ব্যাপকতা এবং ক্রমবর্ধমান অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি ও দেশবাসীর নিরাপত্তাবোধ।

• • •

আমাদের ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতর করিতে হইলে সমগ্রজাতির ধনী দরিদ্র ও জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে শিশুর শিক্ষার কথা আমাদিগকে ভাবিতেই হইবে। সমাজপ্রগতি নির্ভর করে শিশুমঙ্গল কাজের নীতি ও পদ্ধতির উপর। সুদীর্ঘকালের পরাধীনতার ফলে আমরা সকল ক্ষেত্রে মনে করিয়াই এ বিষয়ের অবতারণা করা বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের নির্দেশের উপর নির্ভর করি। হইয়াছে।

অতীতে প্রজারঞ্জন ছিল আমাদের দেশের রাজার কর্তব্য, রাজ্যের শিশুদের অকল্যাণ হইলে তাহা রাজার দোষে হইত বলিয়া নির্দেশিত হইত। আজ আমাদের লোকায়ত্ত সরকার। এখন সকলকেই শিশুশিক্ষার কথা ভাবিতে হইবে। প্রাক্-স্বাধীনতার আমলে বহু সহস্র লোক স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়া ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর সমাজকল্যাণ কাজে ততখানি আদর্শবাদ দেখা যাইতেছে না। আমরা প্রতিযোগিতা-মূলক শিক্ষাধারায় অভ্যস্ত, কিন্তু প্রতিযোগিতার মনোভাব সমাজ-মঙ্গলের পরিপন্থী হইলে সমাজ-প্রগতি বিপর্যস্ত হয়। প্রতিযোগিতার একটা নৈতিক সীমা আছে, সেই সীমাকে লঙ্ঘন করিলে প্রতিযোগিতা ভয়ের সৃষ্টি করে, আর ভয় হইতে হিংসার জন্ম। মনে ও জীবনে হিংসাবৃত্তি একবার স্থিতিলাভ করিলে অহিংস উন্নত সমাজ গঠন অতীব সুকঠিন হইয়া দাঁড়ায়। পরস্পরের সাহচর্যে সমাজের মঙ্গলবিধান, এ যুগের আহ্বান। এই আহ্বানে সাড়া দিতে না পারিলে সামগ্রিক শিশু-ও সমাজ-মঙ্গলের পথ কখনই এ দেশে প্রশস্ত হইবে না। উন্নত দেশের শিশুশিক্ষা ও সামগ্রিক শিশুমঙ্গল কাজের ইতিহাস আমাদের প্রেরণা দিতে

মৌখিক শিক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষা

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

অনেক পশুই ভাষা ছাড়া চিন্তা করিতে পারে, কিন্তু মানুষ তা পারে না। সুতরাং ভাষা আবিষ্কারের দলে মানুষ ভাষার দাস হইয়াছে। নব নব আবিষ্কারের সঙ্গে মানুষ অনেক রকমেই দাস হইয়া পড়িয়াছে বলা যায়। পূর্বে মানুষ শত শত মাইল হাঁটিয়া যাইত, কিন্তু রেল, বাস আবিষ্কারে বর্তমান মানব তাহাতে অক্ষম। লোকে দীর্ঘকাল রচিত বৃহৎ সাহিত্য পূর্বে শুনিয়া ও আবৃত্তি করিয়াই স্মরণ রাখিত, লিপির আবিষ্কারে মানুষ সে শক্তি হারাইয়াছে। যেরূপ অক্ষর শ্রবণশক্তি অধিক তীক্ষ্ণ হয় সেইরূপ যখন মানুষের স্মৃতিশক্তির উপর বেশী নির্ভর করিতে হইত তখন তাহাও তীক্ষ্ণ হইত। লিখনকলার আবিষ্কারের পরেও, গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা পাপ বলিয়াই হউক আর কষ্টসাধ্য বলিয়াই হউক, লোকে অধিকতর শ্রবণ ও মনন দ্বারাই বিদ্যালাভ করিত। সূত্রাকারে গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্যই ছিল লোকে যাহাতে কথাগুলি সহজে মনে রাখিতে পারে। সূত্রগুলি ক্রমশ দুর্বোধ্য হইয়া পড়িলে কয়েক শতাব্দী পরে তাহাদের ব্যাখ্যা রচনার প্রয়োজন হইয়াছিল। পূর্বে সব শাস্ত্রই যে শ্লোকে রচিত হইত তাহারও উদ্দেশ্য, মনে রাখার সুবিধা। বহু শাস্ত্র ও পুরাণ সম্বন্ধে কথিত বলিয়াছেন যে এই শাস্ত্র অমুকে অমুককে দিয়াছিলেন বা কহিয়া ছিলেন এবং অমুকে অমুক হইতে পাইয়াছিলেন বা শুনিয়াছিলেন, কখনও 'লিখিয়াছিলেন' বা 'পড়িয়াছিলেন' নহে। এমন কি যে 'হিতোপদেশ' পুস্তক বহু প্রাচীন নয়, তাহার প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে যে এই হিতোপদেশ 'শুনিলে' নীতিবিদ্যা ও সংস্কৃত ভাষায় পটুতা দেয়।

বর্তমানে মুদ্রাযন্ত্রের যুগে শুনিয়া শিখার আর সময় নাই। যে পুস্তক ছাপা হয় নাই, তাহা হইতেও বিদ্যা আহরণ অসম্ভব। যে সকল প্রাচীন পুঁথি এখনও মুদ্রিত হয় নাই, পণ্ডিতেরা তাহাদের লোপের ভাবনায় ভীত। অথচ তাহারা বিনা মুদ্রণেও কত শতাব্দী চলিয়া আসিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কত কাহিনী নিরক্ষর নরনারীরাও মাতৃক্রোড় হইতে শুনিয়া এতদিন রক্ষা করিয়াছে, যাহা আজ দেড়শত বৎসরের 'সভ্যতা'ই ভুলাইয়া দিতে বসিয়াছে।

৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় 'একাল ও সেকাল' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে সেকালের পড়ুয়ারা রাত্রির অন্ধকারে ভাত রাঁধিতে রাঁধিতেই নৈনিক পাঠের পুনরাবৃত্তি করিত। যখন কোথাও আটকাইত তখন উনানে ২।৩টি শুষ্ক পত্র ফেলিয়া তাহার আলোতে পুঁথির সেই অংশ দেখিয়া লইত। তাহাদিগকে স্বাবলম্বন ও কষ্টসহিষ্ণুতা শিখিতে হইত। পূর্বে কোন দেশেই পরীক্ষা গ্রহণের রীতি ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। বিদ্যার্থীরা শুধু বিদ্যাই চাহিত এবং তজ্জন্য বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া গুরুগৃহে দূরদেশে চলিয়া যাইত। অল্প ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ কামনা করিয়া কেহ পড়িতে যাইত না এবং তাহাদের যোগ্যতা জীবনের কার্যক্ষেত্রেই নির্ণীত হইত। পরে আমাদের দেশে পরীক্ষার যে রীতি অবলম্বিত হয় তাহাকে শাস্ত্রার্থ বা শাস্ত্রবিচার বলে। ইহাতে শিষ্যেরা গুরুর নিকট সমবেত হইয়া গুরুর বা পরস্পরের উত্থাপিত প্রশ্নসকলের উত্তর দিত। গুরু তখনই প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিতেন না, বরং শিষ্যদের নিজেদের মধ্যেই

শাস্ত্র হইতে প্রমাণ সহ পরস্পরের প্রশ্নের উত্তর-প্রত্যুত্তর ও খণ্ডন-মণ্ডন হইত। ইহা হইতেই গুরু শিষ্যদের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাহাদিগকে উপাধি দিতেন। কথিত আছে, রঘুনাথ মিথিলায় তাঁহার অতিথ পরীক্ষার দিনে একে একে সকলকেই পরাজিত করেন। অবশেষে গুরু পক্ষধর মিশ্র নিজে তাঁহার উত্তর দিতে ও পাল্টা প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করেন ও অবশেষে শিষ্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহাকে 'শিরোমণি' উপাধি প্রদান করেন। এরূপ পরাজয়ে গুরুরা দুঃখিত হইতেন না, বরং তাঁহাদের মতো ছিল "অস্তু শিষ্যাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্।"

বর্তমানে পাঠ্যপুস্তকের রীতি হওয়ায় ছাত্রেরা গুরুর শিক্ষা ভাল করিয়া শুনে না। বিষয়ের শিক্ষা অপেক্ষা পুস্তকের শিক্ষাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে—তাহা হইতেও important বাছিয়া পঠন-পাঠন হয়। পাঠ্যপুস্তকের প্রস্তুত প্রণালীও বড়ই রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষার মাধ্যমে পরিবর্তন হইতেই কিছু লেখক ও প্রকাশক বুঝিলেন যে এখন নূতন নূতন পুস্তকের প্রয়োজন হইবে, সুতরাং এই সুযোগ হাত হইতে যাইতে দেওয়া উচিত নয়। তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে স্তূপ প্রকাশের প্রয়োজন হইল। নির্বাচক মণ্ডলীর কোন ব্যক্তির স্বার্থও এই সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িল, বা কোন স্থলে সরকারই নূতন পুস্তক প্রকাশনের ভার গ্রহণ করিলেন; সুতরাং পুস্তকের যোগ্যতা সম্বন্ধে ভাল করিয়া অনুসন্ধান করার সময় হইল না। কোথায়ও শুধু লেখকের নাম দেখিয়াই পুস্তক নির্বাচিত হইল—যদিও অনেকেই জানিল যে উক্ত লেখকের লেখা নয়। হল ও মিত্রের, যাদব চক্রবর্তী, গৌরীশঙ্কর দে প্রভৃতি লেখকের যুগান্তর-কারী ও কালজয়ী গ্রন্থগুলিও বর্জিত হইল। অনসাধারণের পক্ষে নূতন পুস্তক মঞ্জুর করাইতে অনেক বাধা ও শর্ত উপস্থিত হইল। আমার একখানি পুস্তক পেশ করিতে অভিলাষী হইয়া আমি পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পর্ষদে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম। উত্তরে পর্ষদ গেজেট দেখিতে নির্দেশ করিয়াছেন এবং পুস্তক "সিলেবাস অনুসারে লিখিত হইলে" তাহা পর্ষদ কর্তৃক বিবেচিত হইবে বলিয়াও আশ্বাস দিয়াছেন। আমি কখনও সিলেবাস দেখি নাই। এমন কি, পশ্চিম বঙ্গে ঐ বিষয় অন্তর্ভুক্ত introduced হওয়ার পূর্বেই আমার পুস্তক লিখিত হইয়াছিল। শুধু জানিতাম যে কোন প্রয়োজনীয় বস্তুই তাহাতে ছাড়া হয় নাই। আমার ধারণা এই যে, কোন কড়া (rigid) সিলেবাস অনুসরণ করিলে সেই সকল করমাইসী বই ভাল হয় না। লেখকের স্বাধীনতা থাকা উচিত। যাদবপুর পাটিগণিতে বা বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণে কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের সিলেবাস অনুসৃত হয় নাই। জিজ্ঞাসু ছাত্র ঐ সকল পুস্তক হইতে সিলেবাসের বাহিরেও অনেক কিছু শিখিতে পারে এবং ঐ সকল পুস্তক এখনও সফলতার সহিত চলিতেছে।

আবার আর এক বিপদ, অনেক লেখক মনে করেন পুস্তকে নূতন কিছু না থাকিলে সহসা স্বীকৃত হইবে না। সুতরাং "বর্তমান প্রণালী অনুসারে (written according to new method)" প্রভৃতি বিজ্ঞাপনে পুস্তক চালিত হইতেছে। দুই পাতা উদাহরণের পরে হয়তো দেখা গেল "ইহাকেই বিশেষ্য বলে।" আমি বর্তমান প্রণালী সকলের নিন্দা করি না, কিন্তু আমার মতে ক্লাসে পাঠন প্রণালী ও পুস্তক লেখন প্রণালী একরূপ হওয়া উচিত নয়। ক্লাসে বিশ্লেষ প্রণালী inductive method উপযোগী হইলেও তাহার মহত্ত্ব ও চমৎকারিত্ব একবার প্রদর্শনের পরই বিগত হয়। ঘরে অভ্যাস ও পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ছাত্রেরা যাহা পড়িবে তাহা সংক্ষিপ্ত ও অনুলোম

প্রণালীতে (deductive method) লিখিত হইলেই ভাল হয়।

আজকাল পাশ্চাত্য জগৎ হইতে নূতন নূতন শিক্ষা প্রণালী আসিতেছে। প্রণালীগুলির নিন্দা করি না। কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য যেন মনে হয়, যাহাতে পাঠ্য বিষয়গুলি আরও সহজবোধ্য হয়, আরও চিত্তাকর্ষক হয়। কাক ও শিয়ালের গল্প পড়াইতেই এত মেথডের চাঁহিদা হইয়া পড়ে, যাহা পূর্বে তর্কশাস্ত্রের ন্যায় কঠিন বিষয় পড়াইতেও আবশ্যক হইত না। কীলজীবী শিশুর যেমন ঘাঁটি দুধ সহ হইবে না ভয়েই আমরা তাহাতে জল মিশাই অথবা কুইনাইন রুচিকর হইবে না ভয়েই তাহাতে চিনির প্রলেপ লাগাই, সেইরূপ শিশুদের মেধা ও রুচির অল্পতা সম্বন্ধে আজ আমরা এত বেশী সচেতন যে শিশুরা ভবিষ্যতেও কঠিন ও অবাক্ত (abstract) বস্তু ধারণা করার শক্তি হারাইয়া ফেলে। অথচ পূর্বে লোকে ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়াই ন্যায় অথবা বেদান্ত আরম্ভ করিত।

পাশ্চাত্য জগতে পরীক্ষা চলিতেছে এইরূপ বহু 'মেথড' বা প্রণালীই আজকাল ট্রেনিং স্কুল ও কলেজগুলিতে শিক্ষকদিগকে শিখান হয়। কিন্তু একটু খোঁজ লইলেই জানা যাইবে যে ট্রেনিং শিক্ষালয় হইতে আসিয়া প্রায় কোন শিক্ষকই বিদ্যালয়ে আর সেগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ করেন না। শুধু পরিদর্শক মহাশয় আসিলে একদিনের জন্য শিক্ষণ কলার জ্ঞান প্রদর্শিত হয়। ইহার কতগুলি কারণ আছে।—(১) শিক্ষণ শিক্ষালয়ে ৩০।৪০ রকম প্রণালী যেগুলি সহ আলোচিত হয়, যাহার মধ্যে যোগ্যতম নির্ধারণ করিতে শিক্ষকেরা দিশেহারা হইয়া যান। (২) কতগুলি প্রণালীর অবলম্বন কেবল সেই ক্ষেত্রেই সম্ভব যেখানে শিশুরা চব্বিশ ঘণ্টাই নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিতে পারে। (৩) বিদ্যালয়ে নববিধানের একটা পরিবেশ না থাকিলে অর্থাৎ অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে একার পক্ষে একটা নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করা কষ্টসাধ্য। (৪) প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই আজ কাল এত বিস্তৃত পাঠক্রম (course) যে তাহা সীমিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করিতে চাহিলে প্রায় কোন প্রণালীই অনুসরণ করা যায় না। কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকগণ ইহা তত দেখিতে চাহেন না যে অনুমোদিত প্রণালী অনুসৃত হয় কিনা, যতটা শিক্ষক কোর্স সমাপ্ত করেন কিনা। (৫) আজকাল ছাত্রেরাও প্রায় ক্লাসে যে কোন প্রশ্নের উত্তর না দিতেই বদ্ধপরিকর, তা সে প্রশ্ন সহজই হউক বা কঠিন হউক। ছাত্রদের সহযোগিতার অভাবে শিক্ষকের প্রায় সব প্রণালীই ভুবিয়া যায়। তাই তিনি অথথা কালক্ষেপ না করিয়া যে কোন প্রকারে কোর্স সমাপ্ত করিতেই সচেষ্ট হন।

ছাত্রদের প্রশ্ন এড়াইবার এই ব্যাপক প্রবৃত্তির প্রতিকার কি? ক্লাসে প্রশ্ন করিলে ছাত্রেরা বেশীর ভাগ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকে, অথচ পরীক্ষায় ঐ প্রশ্ন করিলে আন্দাজে যা-তা কিছু লিখিয়া কাগজ নষ্ট করিতেও ছাড়ে না। ক্লাসে যদি বা উত্তর দেয় সেই উত্তরে (শুদ্ধ বা ভুল) কোন form থাকে না, উত্তর পূর্ণ বাক্যে হয় না। ছাত্র দুই একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিয়া যেন চাহে যে শিক্ষক নিজেই উহা পূর্ণ করিয়া লন। তাহাও এত অধিক সময়ে যে প্রত্যেক ছাত্রকে অত সময় দিলে পাঠে অগ্রগতি সম্ভব নয়। ইহার কারণ কি? কারণ ছাত্র জানে, ক্লাসে কি উত্তর দিলাম বা না দিলাম তাহাতে নম্বর পাইব না। তাই এই পরীক্ষা-কেন্দ্রিক শিক্ষায় মৌখিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাত্রেরা নিষ্প্রয়োজন মনে করে। বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য কখনও ইহা হওয়া উচিত নয় যে অমুকে যে পরীক্ষা হইবে তাহার জন্য প্রস্তুত করা। পরীক্ষার জন্য অধ্যাপনা নয়, সারা বছর কিরূপ অধ্যাপনা হইল তাহার জাঁচের জন্যই পরীক্ষা। কিন্তু আজকাল ছাত্রেরা এরূপ প্রশ্নই বেশী করে, যথা—"এরূপ প্রশ্নও

আসিতে পারে কি ?" "এরূপ উত্তর লিখিলে কি নম্বর দিবে না", ইত্যাদি। শিক্ষকও দেখেন যে পূর্বের শতকরা হিসাবের দ্বারাই তাঁহার যোগ্যতা নির্ধারিত হইবে, সুতরাং সব প্রণালী ছাড়িয়া 'এ বছর' যে যে প্রশ্ন আসিবার সম্ভাবনা আছে তাহাদের উত্তর মুখস্থ করাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। কয়েক বৎসর বোর্ডের পরীক্ষক নিযুক্ত হইলে শিক্ষকের ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে বেশী সংখ্যায় পাশ করাইতে হইলে কি কি 'কৌশল' অবলম্বন করান প্রয়োজন। (উদাহরণ স্বরূপ, কোন অঙ্কের অন্তিম উত্তর অলভ্য হইলেও যে কয় ধাপ শুদ্ধ হইয়াছে, তাহা কাটিয়া না দিলে, কিছু নম্বর আসিবেই, এবং এইরূপ তিনটি অসমাপ্ত উত্তরের মূল্য একটি পূর্ণাঙ্গানুষ্ঠিত অঙ্কের চেয়ে বেশী।)

এই সকল কারণে আজকাল লিখিত পরীক্ষার যৌক্তিকতা ও ফলদায়কতার বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী প্রশ্ন উঠিয়াছে। সকলেই এখন অনুভব করিতেছে যে এই পরীক্ষা-প্রণালী দ্বারা বিদ্যার্থীদের উচিত মূল্যাঙ্কন (valuation) হইতেছে না। এমন অনেক ছাত্র পাশ করিতেছে যাহারা কোন কালেই পাশের উপযুক্ত নয়। পাশের 'কৌশল' ছাড়া বহু অন্যায্য উপায় অবলম্বিত হইতেছে। আবার কিছু যোগ্য ছাত্রও ফেল করিতেছে। সুতরাং জগতের শিক্ষাবিদেরা এখন পরীক্ষা-প্রণালীর কোন বিকল্প (substitute) অনুসন্ধান করিতেছেন। কেহ বলেন পরীক্ষার পরিবর্তে ব্যাপক ও ঘন ঘন পরিদর্শনের (inspection) ব্যবস্থা করিতে, যাহাতে বুঝা যায় যে বিদ্যালয়ের কাজ ঠিকমত হইতেছে, এবং অন্তিমে বিদ্যালয়ের প্রধানকেই প্রমাণপত্র দিতে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর পরিদর্শক মহাশয়েরাও অনেক স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছেন। (উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৫১ সালের পরে আমার স্কুলে আর পরিদর্শন হয় নাই। কোন বিদ্যালয়ে বিশেষ ঝগড়া বা গণ্ডগোল উপস্থিত হইলে আমন্ত্রিত হইলেই এখন পরিদর্শকের শুভাগমন হয়।) কোন বিদ্যালয়ের প্রধানও স্বয়ং প্রমাণপত্র দেওয়ার অধিকার চাহিবেন না। কারণ, অনিচ্ছুক হইলেও বহুধা প্রধানকে স্থানীয় চাপের (local pressure) কাছে নতিস্বীকার করিতে হয়। অপর বিকল্পরূপে ইহা বলা হয় যে ছাত্রদের সারা বছরের কার্যকলাপ সম্বন্ধে প্রত্যেক বিদ্যালয়েই রেকর্ড থাকা উচিত এবং বৎসরের শেষে সেই রেকর্ডের অনুসারেই পূর্ণতঃ বা অংশতঃ ছাত্রদের অন্তিম মূল্যাঙ্কন করা উচিত। এই suggestionকে ভিন্ন প্রদেশের শিক্ষাবিভাগ ভিন্ন রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কোথাও মাসিক, কোথাও সাপ্তাহিক এবং কোথাও বা দৈনিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিহারে যে এসেসমেন্ট রীতি অবলম্বিত হইয়াছে তাহাতে প্রত্যেক মাসের শ্রেণীকার্য (ক্লাস নোট), গৃহকার্য ও একটা মাসিক পরীক্ষার গুণ, পরিমাণ ও পরিচ্ছন্নতার উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিমাসে A. B. C. D প্রভৃতি নম্বর দিতে হয় এবং অন্তিম পরীক্ষার শতকরা ২০ নম্বর উহা হইতেই নির্ণীত হয় এবং বাকী লিখিত পরীক্ষার প্রতি পত্রে ৮০ নম্বর পূর্ণাঙ্ক থাকে। আমার মতে লিখিত পরীক্ষা একটা প্রয়োজনীয় কুরীতি (necessary evil) রূপে থাকিবেই, কিন্তু বাকী নির্ধারিত নম্বর সাময়িক (মাসিক, সাপ্তাহিক বা দৈনিক) লিখিত কার্যের উপর নির্ধারিত না করিয়া সম্পূর্ণ মৌখিক প্রশ্নোত্তরের উপর করিতে হইবে। অতিরিক্ত পুঁথিগত বিদ্যা (bookish knowledge) যদি খারাপ হয় তো অতিরিক্ত লেখাগত বিদ্যাও ('written' knowledge) খারাপ। পরীক্ষার কুপরিণাম রোধ করিতে গিয়া আমরা পরীক্ষাই বাড়াইতেছি। ছোট ছোট অঙ্কের বা সাধারণ প্রশ্নের উত্তরও যদি ছাত্রেরা মুখে মুখে দিতে না পারে ও সেজন্য কাগজ-কলম ও আধ ঘণ্টা সময়

হইতে হয় তবে সে শিক্ষা কখনও উত্তম নয়। লিখিত পরীক্ষায় প্রায়ই বহু বৈকল্পিক প্রশ্ন থাকে, সুতরাং তাহাতে পাস করিতে, এমন কি পূর্ণাঙ্কের উত্তর দিতেও বিষয়টা সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করিতে হয় না। (আমি যখন I. A. পরীক্ষা দেই তখন এক পত্রে ১৬টা প্রশ্নের মধ্যে ৪টির উত্তর দিবার নির্দেশ ছিল এবং যদিও সেই পত্রের জন্য ৩ ঘণ্টা বই নির্দিষ্ট ছিল, তথাপি একঘণ্টা হইতেই পূর্ণাঙ্কের উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল।)

আমার মতে প্রত্যেক পরীক্ষায় কিছু অঙ্ক মৌখিক (viva voce) প্রশ্নোত্তরের জন্য নির্দিষ্ট থাকা উচিত। ছোট ছোট প্রশ্ন করিয়া উত্তর তৎক্ষণাৎ (promptly) দাবী করিতে হইবে। উচ্চতর (M. A. or Doctorate) পরীক্ষার জন্য 'শাস্ত্রবিচারের' মতও একটা কিছু ব্যবস্থা করিতে হইবে। ছাত্রেরা যখন দেখিবে যে বৈনন্দিন মৌখিক প্রশ্নের উত্তরের উপরেও নম্বর পড়িতেছে এবং তাহার অতিরিক্ত পরীক্ষাতেও সংখ্যা (count) হইতেছে, তখন তাহারা দৈনিক পাঠ প্রস্তুত করিয়া আসিবে ও ক্লাসে নীরবে দাঁড়াইয়া সময় নষ্ট করিবে না। এই প্রণালী কার্য্যান্বিত করা একটু কঠিন হইলেও ইদানীং অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে আমার suggestion নিম্নলিখিত প্রকারের। প্রত্যেক শিক্ষকের নিকট ছাত্রদের নামের তালিকা ও প্রত্যেক মাসের নম্বরের ঘর সহ এক বহি থাকিবে। আজ কোন্ কোন্ ছাত্রকে কোন্ কোন্ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন তাহা তিনি পূর্ব্বাহ্নেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া আসিবেন। যদি তিনি আজ পাঁচটি ছাত্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন তো পাঁচটি ছাত্রের নাম নির্দ্ধারিত করিবেন, কারণ তন্মধ্যে কেহ অনুপস্থিত থাকিতে পারে। প্রথমেই ক্লাসে আসিয়া ছাত্রদিগকে বলিবেন যে যাহারা পড়া তৈয়ার করিয়া আসে নাই, তাহারা যেন পিছনের বেঞ্চে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ইহাতে সময়ের অপচয় কমিবে। যাহারা শিক্ষককে ফাঁকি দিতে চায় অনেক সময়ে তাহাদের চেহারা হইতেই ধরা পড়ে। সেরূপ ছাত্রকে ধরিয়া কঠিনতর শাস্তি দিতে হইবে। যাহারা যেরূপ উত্তর দিল সেই অনুযায়ী নম্বর ক্লাসেই বা ক্লাস হইতে staff room-এ আসিয়াই তুলিয়া দিবেন। প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক ছাত্রের আঁচ হইল কিনা শিক্ষক তাহাও দেখিবেন। মাসের শেষভাগে যাহারা বাকী থাকে তাহারা একটু বেশী সতর্ক থাকিবে, সুতরাং তাহাদিগকে সেদিনের পড়া না ধরিয়া ২।৪ দিনের আগের পড়া ধরা উচিত। প্রশ্ন করা মাত্রই উত্তর আরম্ভ করিতে হইবে, নতুবা অন্য ছাত্র chance পাইবে। সময় থাকিলে সকল ছাত্রদিগকে পুনরায় chance দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সেখানেও পুরাতন পড়া ধরা উচিত। সাহিত্যে ও অঙ্কে গৃহকার্য্যের নিয়মানুবর্ত্তিতার (regularity in home tasks) উপরও নম্বর দেওয়া উচিত। কিন্তু এই বিষয়ে আমি শিক্ষককে বেশী পরিশ্রম করিতে বলি না। মাসান্তে ছাত্রদের খাতা লইয়া তিনি তাহাতে শুধু নিজের নম্বরগুলি গণিয়া দেখিবেন। নম্বর A,B.C.D.E.F. দ্বারা দেওয়া হইবে যাহার অর্থ যথাক্রমে শতকরা ৯০, ৭৫,৬০,৪৫,৩০ ও ১৫ নম্বরের অনধিক বুঝিতে হইবে। অনুপস্থিত ছাত্রেরা অনুপস্থিতির জন্যই নম্বর হারাইবে। বৎসরান্তে অঙ্কগুলির গড় মূল্যায়ন করিয়া লিখিত পরীক্ষার পূরক হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে। এই ব্যবস্থায় ছাত্রেরা অধিকতর নিয়মানুবর্ত্তী হইবে, অনুপস্থিত কম হইবে, দৈনিক পাঠ তৈয়ার করিয়া আসিবে এবং উত্তর দিবার চেষ্টা সম্বন্ধেও সজাগ থাকিবে।

নর্মাল স্কুল

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

১৮১৫ সালে পাদ্রীগণ কর্তৃক শ্রীরামপুরে প্রথম শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শ্রীরামপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রামে মিশনারী দ্বারা পরিদর্শিত ও পরিচালিত ৩৫টি পাঠশালাও স্থাপন করা হয়। শিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত গুরু মহাশয়েরা এখানে গিয়ে নিজেদের স্থাপিত বা অন্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বাঙালীদের পাঠশালায় শিক্ষা দান করতে থাকেন। পাদ্রীদের বাসনা ছিল, শিক্ষণ-প্রাপ্ত গুরু মহাশয়েরা নূতন পদ্ধতির শিক্ষা গ্রহণ করে গ্রামে গিয়ে পাঠশালা খুলবে ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দেবে। ১৮১৬—১৭ সালে দুইশত শিক্ষণ-প্রাপ্ত গুরু মহাশয় এই স্কুল থেকে উত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু পাদ্রীদের সমস্ত উদ্যোগই ১৮২৪ সালে নষ্ট হয়ে যায়। নানা কারণে।

স্কুল সোসাইটি (Calcutta School Society) ১৮১৮ সালে স্থাপিত হয়। এই সোসাইটি বা সমিতির সদস্যেরা অধিকাংশই কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির (স্থাপিত ১৮১৭ সাল) সভ্য। এঁদের অনেক উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল, ট্রেনিং বা শিক্ষক-শিক্ষণ স্কুল খোলা ; কারণেন ষ্টুয়ার্ট বর্ধমানে কতগুলো স্কুল খুলেছিলেন। এখানে ইংরেজদের মধ্যে উইলিয়ার্ড (Williard) এবং আর পাঁচ জন বাঙালী গুরুমহাশয়ের কাজ শিখবার জন্য আগমন করেন। চুঁচুড়াতেও যে পিয়ার্সন প্রভৃতি পাদ্রীরা অনেকগুলো বাঙলা স্কুল খুলেছিলেন। অবশ্য বাঙালীরাই পূর্বে এই স্কুলগুলো স্থাপন করেন (১৮১০)—কিন্তু পরবর্তীকালে এগুলো পাদ্রীদের হাতে যায়। ১৮১৫ সালে যায় সরকারের হাতে। সোসাইটি তাই স্থির করল, বর্ধমানে ও চুঁচুড়াতে শিক্ষকেরা শিক্ষণ কার্য শিখতে যোগদান করবেন। কলকাতার পাঠশালার সংখ্যা গণনা করা হ'ল। হিংপুরের পুল থেকে বিডনস্ট্রীট বা ক্যাম্বিস্ট্রালের সীমা অবধি ২০০ পাঠশালা এবং প্রতি স্কুলে গড়ে ২১ জন ছাত্র হওয়ায় প্রায় ৪০০০ ছাত্র, গুরুমহাশয়দের নাম, ধাম, সম্প্রদায়, পাঠশালার ছাত্র, বেতন প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করে রাধাকান্তদেবের বাড়ীতে এক দিন সমস্ত গুরুমহাশয়দের নিমন্ত্রণ করা হ'ল। ৪২ জন গুরুমহাশয়কে প্রথমে নিমন্ত্রণ করা হয়, উপস্থিত ছিলেন মাত্র ১৭ জন। সবাইকেই সোসাইটির প্রকাশিত পুস্তক উপহার দেওয়া হ'ল। ঐ বৎসরই পুনরায় এই বাড়ীতে পাঠশালার ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ফল সন্তোষজনক। প্রত্যেক গুরুমহাশয় ২।৵টাকা দক্ষিণা ও সোসাইটির পুস্তক প্রাপ্ত হন। এই অনুষ্ঠানকে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক নির্বাচন অনুষ্ঠান বলা যায় না। ১৮৪০ সালে শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক শিক্ষক নির্বাচন পরীক্ষাই সুরু হ'ল। বৎসরে চারবার এই পরীক্ষা হত। শিক্ষকদের চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা হ'ল। মাহিনা যথাক্রমে, ১০—৫০৲ ; ৫০—১৫০৲ ; ১৫০—২৫০৲ এবং এর উপর পর্যায়। তখন শিক্ষকেরা কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, বর্ধমান, কলিকাতা ও হুগলী এই কয়টি জায়গা ছাড়া কেউ বড় একটা যেতেন না। ১৮৪৭ সালে ৩৭ জন পদপ্রার্থী হয়, এঁদের মধ্যে ৬জন ৩য় ও ৬ জন ৪র্থ বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এই সালেই মর্যাল ও মডেল স্কুল স্থাপনের কথা কাউন্সিল প্রস্তাব করেন।

বহুবাজারের একটি বাড়ি ভাড়া ক'রে ১৮৪৭ সালে কলকাতায় প্রথম মর্যাল স্কুল স্থাপিত হয়।

সঙ্গে একটি ছোট আদর্শ বা মডেল স্কুলও ছিল। ডব্লিউ নাইটন (W. Knighton) নামে এর ইংরেজ তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent) বা অধ্যক্ষ ছিলেন। বেতন ৪০০৲। অধ্যাপকদের মধ্যে আর দুজন ছিলেন ডব্লিউ জি. থর্পিক্রাফট, মাহিনা ১৫০৲ এবং বিশ্বনাথ সিংহ মাহিনা ৯০৲। শিক্ষণ-শিক্ষকদের দু শ্রেণীতে ভাগ করা হ'ত: (১) প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ১২৲টাকা মাসিক বৃত্তি পেতেন; (২) দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র বিনা বেতনে কাজ শিখতেন। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের একটা অঙ্গীকার পত্র দিতে হত এই মর্মে যে, তাঁরা তিন বছর সরকার নিয়ন্ত্রিত স্কুলে কাজ করবেন। পাঠকাল দু বৎসর।

আদর্শ বা মডেল স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ৭৫, মাহিনা দু টাকা ক'রে। দু' বৎসর পর স্কুলটি উঠে যায়। যদিও ঐ বৎসর হুগলী কলেজে একটি শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় খুলবার কথা হয়, কিন্তু তা কাজে পরিণত হয় নি।

১৮৫৫ সালের ৬ই জুলাই আবার নর্মাল স্কুল খোলা হয়। সংস্কৃত কলেজের এক অংশে স্থানাভাবের দরুণ সকাল বেলা এই স্কুল বসত। এঁদের মধ্যে ৬০ জনের জন্য ৫৲ টাকা করে মাসিক বৃত্তি বরাদ্দ ছিল; বাকী সব বিনা বেতনে পড়তেন। এঁরা শিক্ষণ নিয়ে মডেল ভার্নাকুলার স্কুলের পণ্ডিত হ'তেন। পরীক্ষা হ'ত প্রতি মাসে। এই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন—অক্ষয়কুমার দত্ত (বেতন ১৫০৲) আর মধুসূদন বাচস্পতি (বেতন ৫০৲)। কলকাতা ছাড়া হুগলী, ঢাকা ও গৌহাটিতেও নর্মাল স্কুল খোলা হয়। ১৮৫৫ সালে দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও বগুড়া জেলায় ৮টি ক'রে মডেল স্কুল খোলা হয়। উচ্চ শ্রেণীর মডেল স্কুল খোলা হয়—নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় ৫টি করে। ২৪পরগণা বারাসত ও ঢাকার বাঙলা স্কুলগুলো চক্রবদ্ধ বা সার্কল (circle) করা হয়। প্রতি চক্রে ৪।৫টি করে স্কুল। একজন শিক্ষণ-প্রাপ্ত বা পরীক্ষায় নির্বাচিত পণ্ডিত ১৫৲ বেতনে থাকতেন। ইনি তাঁর চক্রের গুরুমহাশয়দের এবং উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা ক'রে বেড়াতেন। ছয় মাস অন্তর পরীক্ষা। পরীক্ষায় ভালো করলে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই পুরস্কার পেতেন। সেই বছর ৩৭টি চক্র খোলা হয়েছিল। বাংলা স্কুলের ছাত্রদের মাসে ৪৲ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা হ'ল। প্রতি জেলায় ১০টি করে জলপানি বা বৃত্তি। বৃত্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে ৫ জনকে বেছে নিয়ে এক বৎসর ক'রে নর্মাল স্কুলে পড়তে এবং ৫ জনকে জেলা স্কুল চার বৎসর পড়তে বাধ্য করা হত।

কলকাতা নর্মাল স্কুলের প্রবর্তন করেছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (জুলাই ১৮৫৫)। তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ ছাড়াও বাংলা স্কুলের সহকারী পরিদর্শকের পদে ব্রত হন। ১৮৫৬ সালের সেপ্টেম্বর প্র্যাট (Pratt) সাহেব চুঁচুড়ার গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর এক স্কুল স্থাপন করলেন। প্র্যাট সাহেবও স্কুল পরিদর্শক ছিলেন। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩০০৲ বেতনে। ১৮৫৭ সালে উড্রো সাহেব ঢাকাতে নর্মাল স্কুল খোলেন। এই স্কুলের কাহিনী সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করেছি। ১৮৬৩ সালে পাটনাতে চতুর্থ নর্মাল স্কুল খোলা হয়। মাদ্রাজে নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয় (মিশনারীদের প্রচেষ্টার কথা বাদ দিলে) ১৮৫৬ সালে।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় সংস্কৃত কলেজ সেনাবাসে পরিণত হওয়ায় এটি বহুবাজারে স্থানান্তরিত হয়, আর পৃথক বাড়ীতে ১৩১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে নর্মাল স্কুল চালানো হয়। দু বছর পর এইটি আপার চিৎপুর রোডে আসে। তারপর এল সিমলা ঘাট ষ্ট্রীটে (১৮৮৩)। মহামারীর জন্য এই স্কুল কিছুকাল বন্ধ থাকিবার পর ১৯০২ সালে ইণ্টালীর কনভেণ্ট রোডে এসে বসে।

(ক্রমশঃ)

শিক্ষা

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

ম হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৯শ বর্ষ | পৌষ, ১৩৬৭ | ২য় সংখ্যা

আলোচনা

সাল-তামামি

আমাদের বর্ষারম্ভ অগ্রহায়ণে, আবার ওদিকে বৎসরান্ত ডিসেম্বরে। বড়দিনের ছুটিতে (সে ছুটি আজ-কাল আর আগের মত নাই, অনেকখানি কাটছাঁট হইয়া গিয়াছে) এই সময়ে আগেকার কালে নানা সম্মেলন হইত, শিক্ষক সম্মেলনও হইত, তাহার পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের হিড়িক লাগিয়া থাকিত। এসব হইতে আমাদের শিক্ষণীয় অনেক কিছু পাওয়া যাইত। আমরা যাহা যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তাহার মধ্য হইতে পাঠকবর্গের সম্মুখে কিছু কিছু উপস্থিত করিব। আশা করি তাঁহারাও এগুলি হইতে রসগ্রহণ করিবেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী পাঠাগার

আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী ধর্মপ্রচারক ভিন্ন সাহিত্যিকও ছিলেন, নিজে শিক্ষকও ছিলেন, তাঁহার ধর্মজীবনের সঙ্গে শিক্ষকের জীবন মিশিয়া গিয়াছিল। তাঁহার জীবনের কথা এখানে উল্লেখ করা বাহুল্য। সম্প্রতি গত ১১ ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার দেশে মজিলপুর গ্রামে তাঁহার নামে পাঠাগারের দ্বারোদ্‌ঘাটন হইল। তরুণদের উৎসাহে পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা; আশা করি তাঁহাদের উৎসাহ অব্যাহত থাকিয়া পাঠাগারের উন্নতি সাধন করিবে।

দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসবে শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্রবধূ অশীতিবর্ষবয়স্কা শ্রীযুক্তা অবন্তী দেবী বলিয়াছিলেন, "অতীতের বহু স্মৃতিতে আমার অন্তর আজ উদ্বেলিত। শ্বশুরদেবের পূজনীয় পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে দেখিবার ও তাঁহাদের স্নেহাশীর্বাদ সম্ভোগ করিবার সৌভাগ্য আমি পাইয়াছি। মজিলপুরের বাড়ি আমার যে পূজনীয়া ছোটপিসি শাশুড়ী ঠাকুরাণীর অবস্থানে আমাদের নিকট আনন্দময় ও আকর্ষণের বস্তু ছিল, তিনিও কয়েক বৎসর হইল চলিয়া গিয়াছেন। শ্বশুর মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিকীর সময় এখানে সমাগত সকলে তাঁহার সম্বন্ধে অন্তর্যামীর তৃপ্ত হইয়াছিলেন।—মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে শ্বশুর মহাশয়ের যে বাণী ছিল—"জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্তব্যে দৃঢ়তা, মানবে প্রেম, ভগবানে ভক্তি" তাঁহার সেই

অমরবাণী নিজ জীবনে মূর্তিমতী হইয়া বহুজনকে এই আদর্শের পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করিয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে। প্রার্থনা করি, মনুষ্যত্ব লাভের এই আদর্শ এই পাঠাগারের সম্মুখে যেন উজ্জ্বল থাকে ও মানবসমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের পথে চলিবার সহায় হয়।"

স্বামী মহারাজের এই সতেজ বাণী আমাদের অগ্রগতির পথ নির্দেশ করুক, পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার আদর্শ বুঝিতে সাহায্য করুক।

বহরমপুরে প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির দশম অধিবেশন গত ৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর বহরমপুরে হইয়া গেল। আমরা সম্পাদকের বার্ষিক কার্যবিবরণী মন দিয়া পড়িলাম। অভিযোগ অযৌক্তিক নয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনের হার কতকাল লজ্জাকর হইয়া পড়িয়া থাকিবে? ১৯৬০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের ছেলেমেয়েদের বিনা বেতনে শিক্ষা দানের সরকারি আশ্বাস কি বাতাসে মিলাইয়া গেল? অন্ত নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন আমরা নিশ্চয়ই সমর্থন করি না, তাহাতে শিক্ষার মূলই শিথিল হইয়া যাইবে। সম্প্রতি জনৈক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষালয় দেখিতে আসিয়া আর্থিক অবস্থলতার প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া নানা কথার মধ্যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "But what prevents you from teaching well?" দশম অধিবেশনের সভাপতি শ্রীকেশবের বসু মহাশয়ও প্রকারান্তরে শিক্ষকদের প্রচলিত শিক্ষার 'বাজার দাম' বৃদ্ধির জন্ত বলিয়াছেন, গৃহশিক্ষকতা যাহাতে দূর হয় সেজন্ত চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন, পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যাধিক্য যাহাতে কমে সেদিকে দৃষ্টি দিতে বলিয়াছেন। তাঁহার অভিভাষণের আর একটি কথা আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছে, "সমস্বার্থের ভিত্তিতে আন্দোলন চালিত হলে তবেই সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহানুভূতি ও সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া যায়, শুধু নিজের দুঃখদুর্দশার কথা প্রচার করলেই নয়। প্রাথমিক মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিকোত্তর সকল শিক্ষক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে চিরাচরিত অভিযোগ যে তাঁরা নিজেদের বেতন, নিজেদের সুযোগসুবিধার কথাই চিন্তা করেন, তার জন্তেই আন্দোলন চালান—এর বিরুদ্ধে আপনারাই প্রথম সংগ্রাম ঘোষণা করুন। আপনারাই প্রথম জানিয়ে দিন যে চেতনশীল নাগরিক সম্প্রদায় হিসাবে শিক্ষকেরা কোনও শ্রেণীর চেয়ে ন্যূন নন।"

পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সম্মেলন

প্রায় একই সময়ে কলিঙ্গ ইনস্টিটিউটে পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির ৬ষ্ঠ সম্মেলন হইয়া গেল। দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে ইহাদের লক্ষ্য হইল:

(১) প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) এজন্ত বিদ্যালয়ের পরিসর বৃদ্ধি করিতে হইবে, শিক্ষার যথোপযুক্ত উপকরণের ব্যবস্থা এবং ছাত্রদের জন্ত খেলার মাঠ ও লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) কিন্তু শিক্ষার উন্নতিকল্পে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার মূলে হইতেছেন শিক্ষক। শিক্ষকের শিক্ষাদানের মান উন্নত করিতে হইলে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন শিক্ষকের অর্থ নৈতিক মান উন্নয়ন। তাহা না হইলে তাঁহারা সংসার প্রতিপালনের দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাদের কর্তব্য কিরূপে সম্পাদন করিবেন, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

(৪) সরকারী এবং বে-সরকারী বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকগণের মধ্যে বেতনের তারতম্য রহিত করা হইয়াছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী প্রধান শিক্ষকগণের ক্ষেত্রে এই

তারতম্য এখনও বজায় রহিয়াছে। সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষক অপেক্ষা বে-সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষকের মান মর্যাদা যে কোনও অংশে কম এই সমিতি তাহা স্বীকার করেন না। সুতরাং ইঁহারা যাহাতে উৎসাহী হইয়া সর্বান্তঃকরণে কর্তব্য করেন তজ্জন্য সরকারী এবং বে-সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী প্রধান শিক্ষকগণের বেতনের বর্তমান তারতম্য অবিলম্বে দূরীভূত করিতে হইবে।

(৫) প্রধান শিক্ষক সহ সকল শিক্ষকেরই বেতন সম্পর্কে কোনও প্রকার অভিযোগ থাকিলে অবিলম্বে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মনে অসন্তোষ পোষণ করিয়া কেহই সুষ্ঠুভাবে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন না।

উদ্বোধন করিতে গিয়া ডক্টর ত্রিগুণা সেনস্ক্রাসের বিদ্যালয়ের অবস্থা অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন, এবং সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার বসু মহাশয়ের অভিভাষণও অতি ব্যাপক ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। যদি সম্ভব হয়, বারান্তরে তাহা লইয়া আলোচনা করিব।

অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা সমিতি

শ্রীকুমুদবন্ধু রায়

সঠিক অবগত নহি, অনুমান আজ হইতে প্রায় আশী বৎসর বা তাহারও পূর্বে নব্যভারত সম্পাদক সুসাহিত্যিক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর উৎসাহ, যত্ন, প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ফরিদপুর সুহৃদ্ সভার প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের অধীন বালক বিভাগ, ব্যায়াম বিভাগ, গ্রামোন্নতি বিভাগ প্রভৃতি কতিপয় বিভাগ ছিল। তাহারই অন্যতম বিভাগ ছিল অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা বিভাগ। স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহ দেওয়াই ছিল এই সভার অন্যতম উদ্দেশ্য। স্কুল কলেজে না গিয়া অন্তঃপুরে থাকিয়াও যাহাতে মেয়েরা শিক্ষা লাভ করিতে পারেন তাহারই ব্যবস্থা করা ছিল ইহার কাজ। আমাদের গ্রামের অনেক মেয়েরা বাড়ীতে পড়াশোনা করিয়া সুহৃদ্ সভার এই অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা বিভাগে পরীক্ষা দিতেন। তন্মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছেন আমাদের পিসী-মাতা,—শ্রীমান্ অমরকুমার সেনের মাতা স্বর্গীয়া হেমন্তকুমারী দেবী। প্রতি বৎসর পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়া নানাবিধ মূল্যবান পুরস্কার ও পদকাদি লাভ করিতেন। হেমন্তকুমারী অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষার শেষ পরীক্ষা (অষ্টম বার্ষিক শ্রেণী) দিয়া পাশ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় গুরুদাস রায় কবিরাজ ছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্য, জ্যোতিষ ও বীজগণিতে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় ছাত্রাবস্থায় কতিপয় বৎসর গুরুদাস রায় মহাশয়ের নিকট "সূর্যসিদ্ধান্ত" পাঠ করেন। গুরুদাস যত্নপূর্বক স্বীয় কন্যা হেমন্তকুমারীকে শিক্ষাদান করেন। হেমন্তকুমারী অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন, সেও আজ ন্যূনাধিক ৬৫ বৎসর পূর্বের কথা। হেমন্তকুমারী সুকবি ও সুলেখিকা ছিলেন। তৎকাল প্রচলিত "অন্তঃপুর"

(কেবল মহিলাগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত মাসিকপত্র), "সাহিত্য ও বিজ্ঞান," "বামাবোধিনী পত্রিকা," "সব্যভারত" প্রভৃতি সাময়িক পত্রে হেমন্তকুমারীর কবিতা গল্প প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। তিনি বাংলা কবিতায় মার্কণ্ডের চণ্ডীর অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। যাক, এসব অপ্রাসঙ্গিক কথা। অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষার কথায় প্রত্যাবর্ত্তন করি।

ইহার বহুবৎসর পরে সম্ভবত বাংলা ১৩১৫ কিংবা ১৩১৬ সনে আমরা ফরিদপুর সুহৃৎ সভা তথা অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা ও দেবীপ্রসন্ন বাবুর সংস্রবে আসি। আমরা বাড়ীতে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়াইয়া এই সভার পরীক্ষা দেওয়াইতাম। আমরা তখন কলিকাতায় থাকিতাম। সুহৃৎসভার কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত মেলামেশি করিতে লাগিলাম। সুহৃৎসভার উপর সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন বাবুর একাধিপত্য দেখিয়া উঁহার ফলে খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী লোকনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সম্পাদক করিবার জন্য আন্দোলন করি। তাহাতে সফলকাম হই না। ক্রমে সভার আইনকানুন, বিধিবিধান, পরীক্ষা গ্রহণ প্রণালী প্রভৃতি বিষয় লইয়া কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত আমাদের বিরোধ বাধিয়া ওঠে। ইহার ফলে আমাদের মধ্যে আলোচনা চলিতে থাকে যে আমরা কেন এই সভার সংস্রবে না থাকিয়া নিজেরাই পৃথক একটি অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া মহিলা ও বালিকাগণের শিক্ষা বিধানের ব্যবস্থা করি না।

বাংলা ১৩১৯ সনে (আজ হইতে ৪৮ বৎসর পূর্বে)—তখন আমরা অনেকেই কলিকাতা ৪৪।৩, হারিসন রোডের মেসে থাকিতাম—সেখানে ছিলেন আমাদের এক কাকা আদর্শ চরিত্র উন্নতমনা যোগেশচন্দ্র সেন এম্. এস্. এস্. মহোদয়। তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায়, উপদেশে ও পরামর্শে অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা সমিতির অন্মলাভ হইল। সমিতির নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ, পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন প্রভৃতি কার্য্যে আমাদের বহু পরিশ্রম করিতে হয়। অন্নদাপ্রসন্ন সেন মহাশয়কে সভাপতি, সরোজকুমার সেনকে সম্পাদক ও কুমুদবন্ধু রায়কে সহকারী সম্পাদক করিয়া সমিতি গঠিত হইল। যতীশচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার সেন, অধ্যাপক গুরুদাস গুপ্ত, শরচ্চন্দ্র রায়, সত্যরঞ্জন রায় প্রভৃতি কার্য্যনির্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন।

এই সমিতি ১৩১৯ সন হইতে ১৩২৯ সন এই ১১ বৎসর কাল যে জীবিত ছিল তাহার নিদর্শন পাইতেছি। পরে কোন বছরে উঠিয়া যায় তাহা স্মরণে আনিতে পারিতেছি না। যখন উঠিয়া যায় তখন সমিতির সম্পাদক ছিলেন অজিতকুমার সেন। খুব সম্ভব ১৩২৯ সনেরও কয়েক বৎসর পর পর্য্যন্ত সমিতির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। ক্রমে এই সমিতির আবশ্যকতাও তিরোহিত হইল। কারণ প্রতি পরিবারের মেয়েরা বহুল পরিমাণে স্কুল কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে থাকিয়া এই শিক্ষা লাভের আবশ্যকতা আর রহিল না। এক সময়ে এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়—আমেরিকার প্রসিদ্ধ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকলজীর ছাত্র।

প্রধানত আড়কান্দী, লক্ষ্মণদিয়া, তেঁতুলিয়া এই কয়েকটি গ্রামের উৎসাহশীল ভদ্রমহোদয় ও যুবকগণ কর্ত্তৃক এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। যে সমস্ত বালিকা ও বধূগণের বিদ্যালয়ে যাইয়া শিক্ষালাভের সুযোগ সুবিধা নাই, তাঁহারা যাহাতে অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে অন্তঃপুরে থাকিয়াও সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে শিক্ষালাভ করিতে পারেন তাহার উপায় বিধান করাই এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণী হইতে অষ্টম বার্ষিক শ্রেণী, এই আট বৎসরের কোর্স ছিল। এই আটটি শ্রেণীতে পরীক্ষা গৃহীত হইত।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হইত :—

১। বাংলা সাহিত্য, ২। ইংরাজী সাহিত্য, ৩। গণিত, ৪। ইতিহাস ও ভূগোল, ৫। স্বাস্থ্য-বিধি, ৬। চিত্রাঙ্কণ, ৭। সূচীশিল্প। M.A.এর মত অষ্টম বার্ষিক শ্রেণীতে শুধু একটি সাবজেক্টে (সাহিত্য) পরীক্ষা দিতে হইত।

সমিতির অধীনে অভিজ্ঞ বহুদর্শী শিক্ষাব্রতী ব্যক্তিবর্গ লইয়া একটি পরীক্ষক-বোর্ড গঠিত হয়। তাঁহারা প্রশ্নপত্র তৈয়ারী করিতেন। সমিতির মুদ্রিত পাঠ্যতালিকা ও আবেদন পত্র ছিল। পরীক্ষার অন্তত তিনমাস পূর্বে আবেদনপত্র পূরণ করিয়া সমিতির কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইত। পরীক্ষা সাধারণত জ্যৈষ্ঠ মাসে হইত। কেননা এই সময় গ্রীষ্মাবকাশ হেতু স্কুল কলেজের ছেলেরা গ্রামে থাকিত। তাহাদের দ্বারা মেয়েদের শিক্ষাদান ও পরীক্ষা পরিচালনার কার্যের সুব্যবস্থা হইত।

আবেদন পত্রানুযায়ী পরীক্ষার কেন্দ্র নির্ধারিত হইত। পরীক্ষার কেন্দ্র শুধু ফরিদপুর জিলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা—ফরিদপুর ব্যতীত নদীয়া-যশোহর-দিনাজপুর— রংপুর— রাজসাহী— মজঃফরপুর— বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং প্রতি কেন্দ্রে সমিতি উপযুক্ত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচিত করিয়া তাঁহাদের নিকট প্রশ্নপত্র প্রেরণ করিতেন। তত্ত্বাবধায়ক পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষার্থীগণকে একত্রিত করিয়া পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। পরীক্ষান্তে উত্তরপত্রগুলি সমিতির কার্যালয়ে ডাকযোগে প্রেরিত হইত। যথাকালে পরীক্ষার ফল মুদ্রিত পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়া প্রতিকেন্দ্রে বিতরিত হইত। উত্তীর্ণা ছাত্রীদিগকে তপাছসারে পুরস্কার ও পদকাদি প্রদান করা হইত। উত্তীর্ণা প্রত্যেক ছাত্রীকে কিছু না কিছু পুরস্কার প্রদান দ্বারা শিক্ষার প্রতি তাঁহাদের আগ্রহ ও উৎসাহ বর্ধন করা হইত।

প্রতি বৎসর ৺বিজয়া দশমীর দিন সন্ধ্যায় আড়কান্দী গ্রামে সমিতির পুরস্কার-বিতরণী সভার অধিবেশন হইত। সভাস্থলে সঙ্গীত, আবৃত্তি বক্তৃতা ঘথারীতি হইত। তৎপর দিবস সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন। এই সভায় সমিতির কার্যনির্বাহক সভা গঠন হইত ও কর্মাধ্যক্ষ-গণ নির্বাচিত হইতেন। নির্বাচন লইয়া বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি, বাদবিসংবাদ, তর্কবিতর্ক ও ভোটাভুটি চলিত।

এই সময়ে আমি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের টোলবিভাগে পড়িতাম। আমাদের দীর্ঘদিনের জন্য গ্রীষ্মাবকাশ। প্রায় আড়াই মাস কাল আড়কান্দীর বাটীতে থাকিয়া মেয়েদের, বৌদের শিক্ষার জন্য স্কুল খুলিয়া বসিতাম এবং তাহাদের দ্বারায় সমিতির পরীক্ষা দেওয়াইতাম। আমার ছাত্রীবৃন্দের মধ্যে অনেকেই এখন পিতামহী ও নাতামহী হইয়া সংসার করিতেছেন।

সমিতির পাঠ্যতালিকাভুক্ত কতিপয় পুস্তকের নাম এবং কিছু কিছু Prize Books-এর নামের একটি ক্ষুদ্র তালিকা এইসঙ্গে দেওয়া হইল।

পাঠ্যপুস্তক :

হিতোপদেশ (ঈশান ঘোষ), পদ্যমালা, পদ্যপাঠ, শিশুরঞ্জন রামায়ণ (নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য), বোধোদয় (বিদ্যাসাগর), আর্যকীর্তি (রজনী গুপ্ত), সীতার বনবাস, চারুপাঠ, রামায়ণী কথা (দীনেশ সেন), সতী (ঐ), কথা ও কাহিনী, পলাশীর যুদ্ধ, মেঘনাদ-বধ কাব্য, প্রভাত চিন্তা, সরল শরীর পালন, স্বাস্থ্যবিধি (হরিনাথ দত্ত), শরীর স্বাস্থ্য পালন, খাদ্য (চুনীলাল বসু), ধাত্রী বিদ্যা (সুন্দরীমোহন দাস), খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ইতিহাস ইত্যাদি।

Prize Books :

রাজপুত কাহিনী। ভারতীয় বিদুষী। বেতাল পঞ্চবিংশতি। পতিব্রতা। বেহুলা। খুল্লনা। সতী। রামায়ণী কথা। সতী দাহ। বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী। কথা ও কাহিনী। রাজস্থান (কবিতায়)। শিবাজী, পৃথ্বীরাজ (যোগীন বসু) ইত্যাদি।

———

সেই যে আমার নানারঙের দিনগুলি

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য

২

বন্ধুদের বাগান

আমার ক্লাসরুমের ঠিক তলাতেই বন্ধুদের বিরাট বাড়ী ও বাগান ছিল। এই বাগান—কলকাতার এত বিস্তার এবং জমির দাম অতিরিক্ত বাড়া সত্ত্বেও—এখনও আছে। আমাদের সেই স্কুল কবে উঠে গিয়েছে, তার জায়গায় অন্য স্কুল হল, সে স্কুল উঠে গেলে আবার আর একটা স্কুল হল, জানি না, এই স্কুল আজও আছে কিনা, আর দোতলার সেই ঘরে এখনও ক্লাস হয় কিনা, হলেও আমার মত ক্লাসের পড়া ভুলে কোন ছাত্র ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওই লাগানো বাগানটির দিকে তাকিয়ে থাকে কিনা!

বাগানের চার পাশ দিয়ে লাল সুরকীর রাস্তা। বড় রাস্তা থেকে বাড়ীটা একটু ভিতরের দিকে; বড় রাস্তার উপর লোহার বড় গেট,নম্বোগ্রাম অঙ্কিত, কালো আর সোনালী রঙে রঙ করা। সুরকীর রাস্তাটা সেখান থেকে শুরু হয়ে গাড়ী বারাণ্ডার তলা দিয়ে গিয়ে, বাড়ীর দক্ষিণ দিক হয়ে বাগানটার একটা চক্কর দিয়ে আবার সেই গেটের রাস্তায় এসে মিশেছে। রাস্তাটার গায়ে পাঁচিল-বরাবর ফুলের গাছ, দিশী, বিলাতী, সুগন্ধি, গন্ধহীন, রঙীন, একরঙা। আমাদের স্কুলের দিকটায় একসারি দারোয়ান, কোচওয়ান (তখনও মোটরের যুগ আসেনি, বেশীর ভাগ বনেদি বাড়ীতে ঘোড়ার গাড়ীই থাকত), সহিস, চাকর ইত্যাদির ঘর। বাড়ীর দক্ষিণ দিকে বাগানের রাস্তা পর্যন্ত সিঁড়ি, সিঁড়ির ধাপে ধাপে টবে রাখা পাম গাছের সারি। যাস খানে খানে অতি সুন্দর ভাবে ছাঁটা ঘাসের লন, লনের চার ধারে আবার ফুলের গাছ। লনে ঢোকবার কাঁকটায় মাধবী ও হাস্নাহানার ঝাড়ের বিলাস মণ্ডপ করা।

আমি সব সময়ে চেষ্টা করতাম, পিছনের বেঞ্চির কোনের সীটে বসতে, যাতে ওই বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি। দুপুর রোদে চারদিক যখন খাঁ খাঁ করছে, ক্লাসে ছেলেরা চুলছে, শিক্ষক মহাশয়ের পর্যন্ত একটু তন্দ্রা তন্দ্রা ভাব, দারোয়ানের ঘর থেকে চাটুতে চিমটে দিয়ে রুটি চড়ানোর টুং টাং আওয়াজ ছাড়া বড় একটা আওয়াজ আসছে না, তখন দেখতাম, হঠাৎ কোথা থেকে এক জোড়া বুলবুল বাগানটার উড়ে এসে কি সব খুঁটে খুঁটে খেতে সুরু করে দিল; একবার তয় পেয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে, লড় করে কাছে-পিঠে কোথায় উড়ে গেল, আবার একটু পরে উড়ে এসে আবার লনে চরতে সুরু করে দিল। বর্ষার দিন সকাল সকাল ক্লাসে এসেছি, জল কেটে গিয়ে একটু একটু চিক্-চিকে হয়েছে; বাগানে একপাল ফড়িঙ্ উড়ে আনা-গোনা করছে; এক ঝাঁক শালিখ ক্লিক ক্লিক আওয়াজ করতে করতে মহাভোজ লাগিয়ে দিয়েছে। বিকেলের দিকে আবার আকাশ মেঘে ভরে এল,—সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া; ক্লাসরুমের নীচে যে লাল করবী গাছটা ছিল, দেখি অনভব দুলতে সুরু করেছে, এই বুঝি ভেঙে পড়ে যাবে। চট্ চট্ বৃষ্টি সুরু হল, ঘরের ভিতর ঝাপ্টা আসতে সুরু করল,—শিক্ষক মহাশয়ের হুকুমে খড়খড়ি বন্ধ করতে হল—দামীর কাঁচগুলো ছেলেদের কল্যাণে ভাঙাই থাকত—কাজেই এই দৃশ্যের শেষটুকু আর দেখা হত না। খড়খড়ি ফাঁক করে বাগানের সঙ্গে বর্ষার এই ছুটো-

পাটিটুকু দেখবার চেষ্টা করে বেলার বকুনি খেয়েছি মনে আছে।

শীতের রূপ ওই বাগানের বেশী দেখিনি, কারণ তখনকার দিনে শীতকালেই বার্ষিক পরীক্ষা হত। পরীক্ষার পর ছুটি, তারপর আবার প্রমোশন পেয়ে ক্লাসরুম বদল। কিন্তু যা রূপ দেখেছি তাই কি কম?

এই বাগান দেখবার লোভে শেষের বেঞ্চিতে বসার জন্য কি কম নিগ্রহ ভোগ করেছি? যার বকুনি, শিক্ষক মহাশয়ের শাসানি,—"তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হয় না, নইলে জিজ্ঞাসা করতাম তুমি সামনে ছেড়ে পিছনে বস কেন"—! অঙ্কের ঘরে আমি "কাবিজ" করি সন্দেহ করে আমার বই খাতা তল্লাস করলেন, এবং সত্যি সত্যি লুকানো খাতা বার করে বিজয় উল্লাসে আমাকে যতদূর সম্ভব কটু-কাটব্য করে, ম্যাট্রিক পাশ করে চাকরী খুঁজে বাপের দুঃখু ঘোচাবার উপদেশ দিয়ে খাতাগুলো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ছেলে মানুষের কাঁচা হাতের লেখার স্বাভাবিক হয় তো এমনিতেই মৃত্যু হত; আজ সে লেখা জীবিত থাকলে হয়তো আমিই লজ্জা পেতাম তার রূপ দেখে। কিন্তু এভাবে তার অপমৃত্যুর শোক আজও ভুলতে পারিনি।

দিন থাকে। কে জানে হয়তো অঙ্কের স্যারের এই নিষ্ঠুর ব্যবহার আমাকে অঙ্কের প্রতি চিরদিন বীতস্পৃহ করে দেওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ কিনা!

চারদিকের ইট কাঠের বাড়ীর মধ্যে পাঁচ ছয় কাঠার ওই ছোট্ট বাগানটুকু আমার কিশোর চিত্তের ছিল ওয়েসিস। স্কুলের শুষ্ক দৈনন্দিন রুটিন যে-টুকু মন শুকিয়ে আনত, ওই বাগানটুকু আবার সেটুকু ভিজিয়ে দিত। তাই বুদি গ্রে পড়তে পড়তে অন্য ছেলেরা যখন ব্যাকরণ, ব্যাখ্যা, ভাব-সঙ্কোচ, ভাব-সম্প্রসারণ ইত্যাদি নিয়ে হাবুডুবু খেত, আমি দেখতে পেতাম বাগানের ওই প্রান্তে চোরা গলিটা পার হয়ে ধূসর পাহাড়ের ধারে বুদি হাল্কা পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেয়ী বুদি ওই গরু-বাছুর তাড়িয়ে তাড়িয়ে আনছে; আরে, ওই যে উবাল ফেনিল তরঙ্গ তাকে গ্রাস করতে এল! বাগানের এই প্রান্তে বুদি তমসা বয়ে যাচ্ছে, যার "রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সন্মনুষ্য-মনো যথা"; ওই বাল্মীকি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে স্নান করতে আসছেন,—ওই বুদি ক্রৌঞ্চ মিথুনের একটি নিহত হয়ে মাটিতে পড়ল এবং অপরটি আর্তনাদ করে চক্রাকারে ব্যাধের মাথার উপর ঘুরতে লাগল।

পড়াশুনায় কোন দিনই ভাল ছেলে বলে নাম না কিনলেও প্রবন্ধ রচনায় আমি বরাবর ভাল নম্বর পেয়েছি। তার প্রধান কারণ এই বন্ধুদের

পরম মনে কোন কাঁটা ফুটলে তার ব্যথা অনেক বাগান।

———

নর্মাল ইস্কুল

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই নর্মাল ইস্কুলের মডেল ইস্কুলটিতে ১৮৬৪ সালে ইংরেজি বিভাগ খোলা হয়। রবীন্দ্রনাথ শৈশবে এই স্কুলের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র ছিলেন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষকদের শিক্ষণের তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। কাউন্সিল পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ ইস্কুল-কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষা ক'রে নিতেন। ১৮৬০ সালে এই প্রথা উঠে যায়।

১৮৬৩ সালের হিসাবে দেখা গেছে চারটি নর্মাল ইস্কুলে এ যাবৎ মাত্র ৫৪৭ জন শিক্ষক শিক্ষণ প্রাপ্ত প্রাপ্ত হয়েছেন। ১৮৬৪-৬৫ সালেই এইসব নর্মাল ইস্কুলে অর্থাৎ কলিকাতা, হুগলী, ঢাকা এবং পাটনাতে (বঙ্গপ্রদেশ অন্তর্গত) ইংরেজি বিভাগ খোলা হ'ল। প্রত্যেক ইস্কুলে মাসিক খরচ ২২০৲। ইংরেজি ইস্কুলের সহকারী বা নিম্নপদের (Junior Masters) শিক্ষকদের জন্য এই শিক্ষণ বিভাগ। সাধারণ নর্মাল-ছাত্র ছাড়াও সরকারী ইস্কুলের ঐরূপ শিক্ষক এখানে স্বল্পকালীন শিক্ষার জন্য আসতে পারবেন। শিক্ষা পাবেন শিক্ষকতার নীতি এবং কর্মপ্রয়োগ বিষয়ে (Principles and practice of their profession)। তাঁরা এই সময়ে বেতনের অর্ধাংশ ভোগ করতে পারবেন। ইস্কুলের ইংরেজী বিভাগের নিয়ম তখনকার (১৮৬৩) শিক্ষা অধিকর্তা ডব্লিউ এস এটকিনসন এইরূপ করলেন :

১। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা নিম্ন ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হবেন।

২। দশ টাকা করে মাসে ১২টি বৃত্তি বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ সমেত এবং বারটি অবৈতনিক ছাত্র হওয়ার সুযোগ এঁদের থাকবে।

৩। এ ছাড়া অন্যদের ২৲ মাসিক বেতনে ভর্তি হতে হবে।

৪। ভর্তি হওয়ার জন্য জানুয়ারী মাসে দরখাস্ত করতে হবে পরিদর্শকের বরাবর। তিনি শিক্ষা-অধিকর্তাকে এ বিষয়ে জানাবেন।

৫। প্রবেশিকা পরীক্ষাত্তীর্ণ হয়ে যাঁরা কলেজে সন্তোষজনক ফল করেছেন তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৬। মিম্নশিক্ষকদের (যোগ্য হলে) ইংরেজি বিভাগে পড়বার সুযোগ থাকবে অর্ধ বেতনে। ইস্কুল থেকে কর্তব্যানুরোধে বা কর্মনিযুক্তি অনুপস্থিতি (absent on duty) মঞ্জুর করা হবে।

৭। বৃত্তি বা বেতন মওকুব ১২ মাসের জন্য। কিন্তু ৬ মাসের পরীক্ষায় ভালো করলে তাঁদের চাকরী দেওয়া হবে।

৮। শিক্ষার্থীদের একটি চুক্তিপত্র থাকবে। উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিন বৎসর ইস্কুলে শিক্ষকতা করবেন, নতুবা বৃত্তি বাবদ সরকারের যে টাকা ভোগ করেছেন তা ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবেন।

৯। অসদ্ব্যবহারের দরুণ কিংবা পড়াশোনায় গাফিলতি করলে সমস্ত সুযোগ বন্ধ করা হবে। অনুপস্থিতির দরুণ বৃত্তি থেকে নির্ধারিত হার মতো কেটে নেওয়া হবে।

১০। ছাত্রেরা কিছু পাঠ নেবে বাংলা এবং সংস্কৃতে এবং প্রধান শিক্ষক বা অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক ইংরেজি সাহিত্য অধীত হবে। মিস্ত্রেরা

স্বাধীন ভাবে শিক্ষা পদ্ধতি পড়ে নেবে। সমস্ত বিষয়েই নির্দিষ্ট সময় অন্তর (poriodically) পরীক্ষিত হবে।

১১। নর্মাল আদর্শ বিদ্যালয়ে সবাই ইংরেজি ও বাংলা বিভাগে পঠন পাঠন অভ্যাস করবে।

১২। শেষ পরীক্ষা পরিদর্শক নিজে নেবেন।

১৩। সরকারী ইস্কুলের নিয়তন শিক্ষকেরা এখানে আসতে পারবে।

১৪। যাঁরা প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং নর্মাল পাঠ নিয়েছেন উচ্চপদের জন্য তাঁদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অবশ্য যদি ফার্স্ট আর্টস (First Arts Exam) উত্তীর্ণ কেউ না থাকেন।

ইংরেজি বিভাগের ছাত্রের এই ইস্কুলেরই ইংরেজি পাঠক্রম পড়তে হত, কিন্তু বাংলা অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতির জন্য নর্মাল ইস্কুলের তৃতীয় বর্ষের পাঠক্রম নিতেন।

১৮৬৪-৬৫ সালে মাতৃভাষা সংক্রান্ত পাঠক্রম (নর্মাল ইস্কুলের)—

তৃতীয়-বর্ষের

সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণ—রঘুবংশ (বিদ্যাসাগরের সংস্করণের) প্রথম পাঁচ সর্গ ; কুমারসম্ভব ১-৫ সর্গ (বিদ্যাসাগরের), ভট্টিকাব্য (অনুপাঠের তৃতীয় ভাগের), মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ (সম্পূর্ণ), বাংলা থেকে সংস্কৃত অনুবাদ।

বাংলা সাহিত্য ও অলঙ্কার—জীবন-চরিত, সাহিত্য প্রস্তাব ; মেঘনাদবধ (সম্পূর্ণ) এবং এম্. এম্. ভট্টাচার্যের বাংলা অলঙ্কার।

রচনা—বাংলা রচনা, সংস্কৃত হইতে বাংলা অনুবাদ।

ইতিহাস ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞান—ইংলণ্ডের ইতিহাস (ভূদেব মুখো), বৃটিশ ভারতের ইতিহাস (কৃষ্ণচন্দ্র রায়), ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালী, অর্থনীতির সাধারণ সমস্যা (রাজকৃষ্ণ চৌধুরী)।

ভূগোল—রাষ্ট্রনীতিক ভূগোলের সংস্কার, ভূগোল (Physical Geography) (জি. সি. ব্যানার্জীর), গ্লোব ব্যবহার, টেরেস্ট্রীয়াল গ্লোবের সংজ্ঞা ও সমস্যা।

অঙ্ক—ইউক্লিড ১-৩, ৬, ১১ (প্রথম ২১টি প্রতিজ্ঞা), ১২ (প্রথম ৪টি), ৪৩ ; পাটীগণিত (সম্পূর্ণ), বীজগণিত (সার্ড, Quadratic Equation, Varintion, Progression প্রভৃতি)।

ভূমি জরিপ এবং (Accounts)—ব্যবহারিক ভূমিজরিপ,—by the chain, Mensuration, of Planes and Surfaces, Zemindary & Mahajani Accounts.

প্রাকৃত বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষ—Easy Problems on the laws of motion, Mechanical powers, centre of gravity, Floating Bodies and specific gravity, Popular Astornomy, Explantion of the Causes of Day & Night, of the seasons, and of the Eclipses of the Sun & Moon. 'The Reason Why' half.

শারীর বিজ্ঞান—রাজকৃষ্ণবাবুর রচিত (মানব শারীর বিজ্ঞান)।

শিক্ষা-পদ্ধতি—জি. সি. ব্যানার্জী রচিত, ভূদেব বাবু রচিত পুস্তক ; মডেল ইস্কুলের অধ্যাপনা এবং অভ্যাসমূলক পাঠদান।

দ্বিতীয় বর্ষের পাঠ্যক্রম

সংস্কৃত—অনুপাঠ ২য় ও ৩য় (ভট্টিকাব্য বাদে) মুগ্ধবোধ (শব্দ থেকে আখ্যাত), বাংলা-সংস্কৃত অনুবাদ।

বাংলা—বাহ্য বস্তু (অক্ষয় কুমার), ১ম, রামকমলের বেকনের রচনা, কাদম্বরী, কুসুমাবলী ২য়, কাব্যনির্ণয় ২য়।

বাংলা রচনা—

(অন্যান্য বিষয় পূর্বের অনুরূপ তবে একটু সংক্ষিপ্ত) শিক্ষাপদ্ধতি—জি. সি. ব্যানার্জীর বই।

প্রথম বর্ষের

সংস্কৃত—অনুপাঠ ১ম, মুগ্ধবোধ।

বাংলা—চারুপাঠ ৩য়, টেলিমেকাস ১ম (বাবু রাজকৃষ্ণ), কাব্যনির্ঝর ২য় অংশ, হিতপ্রভাকর, পদ্মিনী উপাখ্যান।

বাংলা রচনা—

(অন্যান্য বিষয় পূর্বের মতো কিন্তু সংক্ষিপ্ত)

শিক্ষা পদ্ধতি—বস্তুবিচার (Lessons on objects), জি সি ব্যানার্জির পুস্তক।

ছাত্রবৃত্তি পাঠক্রম ১৮৬৫

(অন্যান্য বিষয় পূর্বের মতো কিন্তু বহুল পরিমাণে সংক্ষিপ্ত)

বাংলা—বাহ্যবস্তু ১ম, পদ্যপাঠ ২য়, সীতার বনবাস। বাংলা ব্যাকরণ, রচনা।

এই সঙ্গে সঙ্গে গুরুমহাশয়দের ট্রেনিং ইস্কুলও খোলা হয়। অবশ্য এগুলিকে গুরুদের নর্মাল ইস্কুলও বলা হত। বর্ধমান, কৃষ্ণনগর ও যশোরে এই রকম গুরুদের নর্মাল বা ট্রেনিং ইস্কুল ছিল। এই তিনটি জেলায় ১৮৬৪ সালের দিকে ১৮০টি গ্রাম্য পাঠশালা ছিল। ১৮৬৫তে হল ৩৭৭টি। ছাত্রসংখ্যা ১৮৬৪ তে ছিল ৫'৩৪৯ আর পরের বৎসরে হোল ১১,১৭৭ জন। এই পাঠশালার ছাত্রদের জন্য সরকারী ব্যয় ১৮৬৪-এ ছিল জনপ্রতি মাসিক দুই আনা, আর পরের বৎসর ৯ পয়সা।

যাই হোক, এই গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয়দের ট্রেনিং ইস্কুল সম্পর্কে আমরা খবর সংগ্রহ করি। এই খবর দিচ্ছেন তৎকালীন বিদ্যালয় পরিদর্শক ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

প্রথম প্রথম এই ট্রেনিং ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য কোন রকম পরীক্ষা ছিল না। সহকারী পরিদর্শক গ্রামবাসী যাঁকে মনোনয়ন করতেন তাঁকেই ট্রেনিং ইস্কুলে ভর্তি করতেন। কোন বয়সের একটু বাধা ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে অনেকটা প্রবেশিকা পরীক্ষার মতো এক পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা হয়। বোধ হয় ট্রেনিং ইস্কুলের ছাত্ররা বিশেষ ভালো ফল করতে পারছিল না। এইজন্য ভূদেব বাবু প্রস্তাব করেছিলেন, "ট্রেনিং ইস্কুলের ছাত্রদের প্রতি ঐ ইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব বাড়াতে হলে তাঁকে এমন সুযোগ দেওয়া হোক যাতে তিনি প্রথম থেকেই তাঁর ছাত্র বেছে নিতে পারেন।" অবশ্য এই পরীক্ষার মান খুবই নিম্ন রাখা হল, যাতে গ্রামের নির্বাচিত ব্যক্তি সহজেই উত্তীর্ণ হতে পারেন। এই সময় বর্ধমান এবং কৃষ্ণনগরে ট্রেনিং ইস্কুলের একটু পরিবর্তন ঘটে। পূর্বে বর্ধমানের প্রধান ছিলেন রামগতি ন্যায়রত্ন এবং কৃষ্ণনগরের ছিলেন নকুলেশ্বর ব্যানার্জী। এঁরা এখন কৃষ্ণনগর ও বহরমপুর কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে গেলেন। এঁদের বদলে এলেন ত্রৈলোক্যনাথ চ্যাটার্জী এবং লোহারাম শিরোরত্ন। এই ট্রেনিং ইস্কুলে ছাত্র সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে।

ছাত্রসংখ্যা

	১৮৬১-৬২	১৮৬৩-৬৪	১৮৬৪-৬৫
বর্ধমান ট্রেনিং ইস্কুল	৭৫	৯৫	১৩৩
কৃষ্ণনগর " "	৭৩	৭৫	১৪৭
যশোর " "	৭৫	১২০	৪৮১

এই জনপ্রিয়তার জন্য ভূদেববাবু অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। কারণ তিনি স্বীকার করতেন, গ্রামবাসীর সহানুভূতি ও সমর্থনের উপরই এই ট্রেনিং ইস্কুলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

এই ট্রেনিং ইস্কুলের অন্ত্যপরীক্ষার চিত্র নিম্নরূপ :

কয়েকজন ডেপুটি ইনসপেক্টর এবং শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত নন এমন শিক্ষিত ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে অন্ত্যপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হত।

ভূদেববাবুর অনুরোধক্রমে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই ইস্কুলের পরীক্ষা নিয়ে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের নাম করা যায়—প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী (সংস্কৃত কলেজের কার্যরত অধ্যক্ষ), রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, দীনবন্ধু মিত্র, যদুনাথ রায়, তারাকান্ত বিদ্যাসাগর। এঁরা সবাই মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করেছেন, ডেপুটী ইনসপেক্টরেরা নিতেন লিখিত পরীক্ষা। শ্রেণীপাঠনায় বোধোদয়, নীতিবোধ এবং অঙ্ক (সহজ যোগ থেকে অনুপাত সম্পর্কীয় অঙ্ক), শুভঙ্করী—মনকষা, কাঠা-কালি প্রভৃতি ওদের পড়াতে হত।

লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের কিছু কিছু নমুনা—

ভূগোলে—(১) গঙ্গার তীরে প্রধান প্রধান সহরগুলির নাম কি ?

(২) ভারতের স্বাধীন, করদ ও মিত্র রাজ্যগুলির নাম কি ?

(৩) রাজমহল, দিল্লী, আগ্রা, পাণিপথ, দার্জিলিং এবং অমৃতসহর প্রসিদ্ধ স্থান কেন ?

(৪) লেফ্‌টেন্যাণ্ট-গবর্ণর (বাংলাদেশের) সাহেবের অধীন জেলাগুলি ও তাদের সদর উল্লেখ কর।

(৫) বর্ধমান, কৃষ্ণনগর ও যশোর জেলার সীমারেখা কি ? মহকুমা কি ?

অঙ্কে—প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য-তালিকার অনুরূপ ; তবে ভগ্নাংশ বাদ দিলে বেশির ভাগ প্রশ্নই 'সমস্যামূলক' (problem sums)।

শিক্ষা-পদ্ধতি—(১) পাঠশালার জন্য কোন শিক্ষার উপকরণ বিশেষ ভাবে দরকার ? প্রত্যেকটির প্রয়োজন বর্ণনা কর।

(২) ছাত্র পড়ানো ছাড়া পাঠশালার গুরু-মহাশয়ের অন্যান্য কর্তব্য কর্ম বর্ণনা কর।

(৩) সাবান, সাগু এবং কর্পূর কি ভাবে প্রস্তুত করিতে হয় ? ইহাদের প্রয়োজন কিরূপ ?

(৪) 'গ্যালারী লেসন' (Gallery lesson)-এর প্রয়োজনীয়তা কি ? 'গ্যালারী' না থাকলে 'গ্যালারী লেসন' কি ভাবে দেওয়া যায় ?

ইতিহাসে—(১) কখন এবং কেন পলাশীর যুদ্ধ ঘটে ? যুদ্ধের পর নবাব এবং ইংরেজের কি অবস্থান্তর ঘটিল ?

(২) মীর কাশিম এবং ইংরেজের মধ্যে যুদ্ধ ঘটিল কেন ?

(৩) লর্ড হেষ্টিংসের প্রধান প্রধান শাসন-সংস্কার কি ?

(৪) কখন থেকে প্রথম রাজস্ব আদায়ের জন্য কর্মচারী (collector) নিযুক্ত হল ? রাজস্ব আদায়ের জন্য সরকারের পূর্বে কি ব্যবস্থা ছিল ?

উপরি উক্ত বিষয় ছাড়া ছিল ভূমি জরিপ বা সার্ভেইং। (আমরা ইংরেজিতে লিখিত প্রশ্নের বাংলা অনুবাদ ক'রে দিয়েছি। প্রকৃত বাংলা প্রশ্নপত্র বর্তমান লেখক দেখতে পান নি।)

মোটের উপর লিখিত পরীক্ষার জন্য ৯টি পত্র ছিল—(১) সাহিত্য, (২) ব্যাকরণ, (৩) অঙ্ক, (৪) শুভঙ্করী, (৫) শিক্ষাপদ্ধতি এবং বস্তুপাঠ, (৬) জরিপ, (৭) রচনা। তবে সমস্ত ট্রেনিং ইস্কুলে এক ধরণের প্রশ্নপত্র করা হ'ত না। এই জন্য কৃষ্ণনগরের প্রধান শিক্ষক লোহারাম শিরোরত্ন প্রস্তাব করছেন, "পরীক্ষাদান সর্বত্র এক হওয়া

উচিত। ছাত্রদের মধ্যে বৈষম্যের দরুণ গভীর অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে, এবং পরীক্ষকও ট্রেনিং ইস্কুলের ছাত্রদের ক্ষমতা বুঝে প্রশ্ন তৈরী করেন না—এও এক অভিযোগ। কর্তৃপক্ষ এদিক দিয়ে অবহিত হোন।" আবার ঠিক ঐ বছরই বর্ধমানের প্রধান শিক্ষক ত্রৈলোক্যনাথ চ্যাটার্জী বলেছেন, "পরীক্ষামান আরও উচ্চ করা উচিত। এইজন্য শিক্ষাকাল বাড়িয়ে দেওয়া দরকার, তবে প্রবেশিকা পরীক্ষাটি খুব কঠিন হওয়া উচিত নয়।"

মান নিয়ে এই দ্বন্দ্ব চিরকালই আছে। কারণ 'মান' যে কি তা আমরা জানলেও আমাদের সামষ্টিক এবং বৈষয়িক এক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সে সবের উপর নানা রঙ ফলিয়ে দেয়। এঁদের কি উদ্দেশ্য ছিল আজকে নিরূপণ করা কঠিন, তবে বর্ধমান ট্রেনিং ইস্কুলের প্রধানশিক্ষকের বিবরণের মধ্যে অনেকখানি জুড়ে আছে তিনি নতুন এসেই কি কি করেছেন এবং আরও কি কি করা উচিত। এই অংশ থেকে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে 'চাকুরীর উন্নতি' নামক উদ্দেশ্যটি হয়ত এই চক্রান্তিবাবের পেছনে আছে। কেবল সমাজকর্মীই যে দেশের আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চস্বরে বলেন তা নয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষীরাও ঐরূপই করেন।

১৮৬৬-৬৭ সালে শিক্ষা-অধিকর্তা এ্যাটকিন-সাহেবের বিবরণ থেকে জানা যায়, কয়েকটি নর্মাল ইস্কুল বিহার এবং আসামে যেমন রাজস তেহমি কলকাতা, ঢাকা, হুগলী নর্মাল ইস্কুল থেকে ইংরেজী বিভাগ তুলে দেওয়া হল। তিনি বললেন, "ইংরেজী বিভাগের ভবিষ্যৎ এমন দেখা যাচ্ছে না যাতে এই বিভাগে সরকারী ব্যয় করা যেতে পারে। পাটনা কলেজ থেকে ইংরেজি জানা শিক্ষক তেমন পাওয়া যাচ্ছেনা বলে সেখানকার পরিদর্শকের অনুরোধক্রমে পাটনা নর্মাল ইস্কুলে মাত্র ইংরেজি বিভাগ থাকল।

এই সময় ইংরেজি ও বাংলা বিভাগ নিয়ে কলকাতা, হুগলী, ঢাকা, পাটনার ৮টি উচ্চ শিক্ষণ ইস্কুল (সরকারী) এবং সরকারী মিশ্র শিক্ষণ ইস্কুলের সংখ্যা ১৯টি। সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ছিল (১৮৫৫-১৮৬৫ পর্যন্ত) ১৪৮৫ জন।

এ ছাড়া সাহায্যপ্রাপ্ত নর্মাল ইস্কুল ছিল—ভার্ণাকুলার এডুকেশন সোসাইটির একটি কলকাতার ইস্কুল (ছাত্র সংখ্যা—১২), কৃষ্ণনগরে চার্চ মিশনারী সোসাইটীর ইস্কুল (ছাত্র—১৮ জন), এবং চার্চ মিশনারী সোসাইটীর একটি সাঁওতালী ইস্কুল তেলগুড়িয়া (শিক্ষণ শিক্ষক এবং অন্যান্য ইস্কুলের ছাত্র সংখ্যা—৬৭)। আর একটি মিশ কর্ণওয়ালিশ বোয়ারে মহিলাদের জন্য। এখানে পঞ্চম ইয়োরোপীয় বা ইয়োরো-এশিয়া সম্প্রদায়ের ছাত্র, সংখ্যা—১০ জন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। এই সময়ে স্কুল বুক সোসাইটীর মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রচুর রচিত হচ্ছে। ভাষার মাধ্যম হচ্ছে, ইংরেজি, বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া, সাঁওতালী, খাসিয়া, আরবী, পারসী, উর্দু, এ্যাংলো-এশিয়া। সবচেয়ে বেশি পুস্তক (সংখ্যা হিসাবে) বাংলায় (১৮,৯৯৭ খানা), তারপর ইংরেজি (৮১,০৪৪), তারপর উড়িয়া (২১,৮৮৮), আরবীতে পূর্ব বৎসরে ছিল ২৯ খানা,—১৮৬৬তে একটিও নয়, সংস্কৃতে ৩,২৭৯ খানা, সাঁওতালীতে পূর্ব বৎসরে ৩ খানা, এ বছর ২২ খানা। বিভিন্ন ভাষার পাঠ্যপুস্তক সংখ্যা থেকে আর কিছু বোঝা না গেলেও একথা বোঝা যায় যে, বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের আবির্ভাব হচ্ছে। সিপাহী বিদ্রোহের পরে এই ব্যাপারটি ঘটছে, আর ঘটছে খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের প্রচেষ্টায়। এই দুটি দিক লক্ষ্য করবার মতো। হাণ্টার

কমিশনের পর নর্মাল তথা শিক্ষণ বিদ্যালয় সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠেছিল। তার মধ্যে ১৮৮৩-৮৪ সালে একটি প্রশ্ন উঠল—কেবল ভার্নাকুলার বা মাতৃ-ভাষার শিক্ষক তৈরীর জন্য প্রথম শ্রেণীর নর্মাল ইস্কুল বাবদ এত টাকা খরচ করবার প্রয়োজন আছে কি না। ইস্কুল কর্তৃপক্ষ প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করবার বেলাতেও তো শিক্ষণপ্রাপ্ত পণ্ডিত থেকে এন্ট্রান্স পাশ ছাত্রকেই বেশি পছন্দ করেন। এর পিছনে তাঁদের একটি যুক্তি হচ্ছে এই যে, এন্ট্রান্স পাশ শিক্ষক বাংলা তো ভালোই পড়ান উপরন্তু ইংরেজিতেও পড়াতে পারেন। এ অবস্থায় শিক্ষণ ইস্কুলে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে তাদেরই যারা ইংরেজি পড়াবে না। দেশের চাহিদা ইংরেজির দিকে, কিন্তু সরকারের ব্যবস্থা যেন ইংরেজির বিরুদ্ধে। তাতে হচ্ছে এই যে, শিক্ষণে এসেও অনেকে গোপনে ইংরেজি পড়ে নিচ্ছে। এ ছাড়া তাদের উপায় নেই। কারণ, পণ্ডিত হিসেবে তারা পায় ১৮৲১২০৲ টাকা, অথচ ইংরেজি জানলে তারা অনেক বেশি মাইনে পেয়ে থাকে। ইংরেজি শিখলে আর কমবেতনের ভার্নাকুলার শিক্ষক হতে হবে না। ক্লার্ক সাহেব তখন প্রেসিডেন্সী সার্কেলের পরিদর্শক। তিনি তাই প্রস্তাব করলেন, নর্মাল ইস্কুলে ইংরেজি প্রবর্তন করা হোক। কারণ? এন্ট্রান্স কোর্স যেহেতু থাকল সেহেতু অনেক ছাত্র আসবে, তাতে সরকারের খরচ কমবে। এখানে কেমিস্ট্রী, ফিজিওলোজি ও পড়ানো হবে; তা হলে সরকারকে আর বৃত্তি দিতে হবে না।

সরকার সমস্ত স্বীকার করলেও তাঁর প্রস্তাব কার্যকরী করতে চাইলেন না। সরকারের মত: সাধারণ উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র থেকে নর্মাল ইস্কুলের ছাত্র অনেক বেশি দরিদ্র। তারা বেতন দিতে অপারগ। অধিকন্তু সাধারণ ছেলেরা এই ইস্কুলে বিশেষ বিষয় যথা সাহিত্য, অঙ্ক, বিজ্ঞান পড়বে না; কারণ ইস্কুলের ভবিষ্যৎ তো যাঁরা কেবল ইস্কুলের মাস্টারীতে (মধ্য বিদ্যালয়ে)।

দ্বিতীয় কথা: পড়ানোর নির্দিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে ইংরেজি যুক্ত করলে—সেই ইংরেজি ভালো করে শেখা হয় না। ভারত সরকারেরও এই মত। শিক্ষক হিসাবে যে এই শিক্ষণ-শিক্ষকেরাই ভালো ফল দর্শাচ্ছে তার প্রমাণ তো রয়। আজ যে (তখনকার দিনে) বাংলা সাহিত্যের এত প্রসার এবং সমৃদ্ধি, তা তো এই নর্মাল ইস্কুলেরই শিক্ষাগুণে। একথা সরকার বিশ্বাস করেন যে, ভারতীয় ভাষা শিক্ষা বা সমাজ থেকে কখনই অপসারিত হবে না।

(It must not be forgotten too, that the normal schools are the only repereseniatives of vernecular College of Bengal, and serve to maintain a high standard of literary purity—quite apart from pedantic exaggeration—both in our vernacular schools and in vernacular literature. It may be asserted unhesitatingly that the vast majority of the Bengali books which issue from the press at the present day would never have existed but for the maintenance of high literary standard by means of the normal schools. The vernacular language can never disappear from society or from education.

এই সময় (১৮৮৪-৮৫) বাংলা দেশে ট্রেনিং ইস্কুলের সংখ্যা (সরকারী) ১৬টি, সাহায্যপ্রাপ্ত ৯টি। চাইবাসার ইস্কুলটি বন্ধ ক'রে দিয়ে মুর্শিদাবাদের সৈদাবাদের মডেল ইস্কুলে এই রকম একটি ইস্কুল খোলা হল। আটশীলার ইস্কুলের নাম হল হলধি-পুকুর।

১ম শ্রেণীর ট্রেনিং ইস্কুলে—৩ বছরের পাঠ;

২য় শ্রেণীর—২ বৎসর ৩য় শ্রেণীর—৬ মাস থেকে এক বছর, শুধু শুক্রদের শিক্ষণের জন্য।

উড়িষ্যা থেকে মেটকাফ লিখে পাঠালেন—শুরুদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষণ নেওয়ার পর পাঠশালার সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে বর্জন করেন। কারণ, ট্রেনিং নেওয়ার সময় তাঁদের পাঠশালার কাজ ছেড়ে আসতে হয়, কাজেই পাশ করার পর অন্য চাকরী নেন। তাঁর মতে, শিক্ষণ ইস্কুল মধ্য-বিদ্যালয়ের সঙ্গে (মিডল ইস্কুল) যুক্ত করলে এর অনেকটা সমাধান হবে।

ফরিদপুর থেকে বলা হল—কেবল মোক্তারই তৈরী করা হচ্ছে এই শিক্ষণ ইস্কুলের সাহায্যে! তখন আইন করা উচিত যাতে যেই শিক্ষণ নেবে তাকেই অন্তত ৩ বছর পাশ করার পর ইস্কুলে কাজ করতে হবে।

আসাম থেকে মার্টিন বললেন,—এই রকম চুক্তি পত্র সই ক'রে কাজ হচ্ছে: যারা ছেড়ে যাবে তারা সমস্ত বৃত্তি জমা দেবে।

সরকারী কর্তৃপক্ষ কিন্তু এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেন না।

এই বছর (১৮৮৩-৮৪) পাটনা ইস্কুল থেকে (এখানেই একমাত্র ইংরেজি বিভাগ ছিল) হেড-মাষ্টার এবং ইনস্পেক্টর বলেন, ইংরেজি বিভাগ তুলে দেওয়া হোক; কেবল ট্রেনিং ইস্কুল থেকেই নয়, মডেল ইস্কুল থেকেও। তাঁদের মতে—মধ্য বিদ্যালয়ের জন্য ইংরেজি শিক্ষক ইংরেজি ইস্কুল থেকেই ভালো পাওয়া যায়, এখান থেকে নয়।

সাহায্যপ্রাপ্ত ট্রেনিং ইস্কুলের মধ্যে প্রায় সব-গুলিই মিশনারী। তীরপুর সাঁওতাল ট্রেনিং ইস্কুল আমেরিকান ব্যাপটিষ্ট মিশন দ্বারা পরিচালিত। অনগ্রসর বা আদিবাসীদের মধ্যে এইভাবে মিশনারী শিক্ষণ ঢুকছে।

বাংলাদেশে এই সময়ে প্রথম শ্রেণীর ট্রেনিং ইস্কুল—কলকাতা, হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর পাটনা, রাঁচি (১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে) এবং কটকে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর—জলপাইগুড়ি।

তৃতীয় শ্রেণীর—মোতিহারী, পুরী, বালেশ্বর, পালামৌ, হলদিপুকুর, আঙ্গুল ও সইদাবাদ।

১৮৮৬-৮৭ সালে শুরু ট্রেনিং ব্যবস্থার নতুন পরিবর্তন করা হয়। মধ্য বিভাগের বা মিডল ইস্কুলে তাদের শিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা করা হল। মিডল ইস্কুলেই বিনা বেতনে শুরুরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন। এ বিষয়ে ডেপুটি ইনস্পেক্টর একটি সার্টিফিকেট জারী করবেন। যেসব হেড-মাষ্টার শুরুদের পড়াবেন তাঁরা প্রত্যেকে শুরুপ্রতি ১৲ টাকা ক'রে মাসিক বৃত্তি পাবেন। ইস্কুল ঘণ্টার পর তাঁরা এঁদের পড়াবেন। এই রকম ২৬টি ইস্কুল এবং ১৩৩৫ জন ছাত্র সে বছরে চলে। সরকার আংশিক ব্যয় করল ৭৬,০৭২ টাকা।

ওদিকে পটনা ইস্কুলের হেডমাষ্টার বলছেন, ইস্কুল থেকে ইংরেজি বিভাগ তুলে দেওয়াতে ছাত্র-সংখ্যা কমে গেছে।

১৮৯২-৯৭তে দেখা যায় মাদ্রাজের তুলনায় বাংলা দেশ শিক্ষণ ব্যাপারে অনেক পিছিয়ে আছে। শুধু মাদ্রাজ কেন, আসামেও শিক্ষণ বিদ্যালয় যেমন বাড়ছে—বাংলাদেশে তেমনি কমছে। সরকারী নর্মাল ইস্কুল বাংলাদেশে এই সময় কমে গিয়ে দাঁড়াল ১৩টিতে আর সাহায্যপ্রাপ্ত ৭টি। মাদ্রাজে সেই সময় সরকারী ৩৪টি আর বেসরকারী ও সাহায্য প্রাপ্ত ৩২টি। বাংলাদেশে ছাত্র সংখ্যা ৮৬৫জন, মাদ্রাজে ১৪৭৭জন। বাংলা দেশে সরকারের দাক্ষিণ্য কমছে কেন সে বিষয়ে সন্ধান দরকার। ১৮৯৬-৯৭ সালে ভারতে মোট শিক্ষণ ইস্কুল ১৪১টি (পুরুষদের) এবং ছাত্র ৪৬০৭, আর মেয়েদের ৩৫টি ছাত্রী ১১১৮, এর মধ্যে বাংলা দেশে ১টি, ছাত্রী ৪৩১ এবং মাদ্রাজে ১৯টি ছাত্রী ৩১৭।

১৮৮৬ সালে মাদ্রাজের সইদাপেত্তের শিক্ষণ

ইস্কুলটি কলেজের মর্যাদা পায়। মাদ্রাজ সহর থেকে সাইদাপেতে কলেজটি আসে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে কৃষিবিজ্ঞান কলেজ একটি ছিল। মাদ্রাজের রাজমহেন্দ্রীতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি টেসিং কলেজ খোলা হল।

কলেজ হওয়ায় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ডিপ্লোমা দিত। ১৮৯০ সালে এইজন্য পাঠ্যতালিকাও নতুনভাবে করা হয়।

সাইদাপেত কলেজে একজন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ (ভারতীয় শিক্ষাবিভাগ অন্তর্ভুক্ত) আর ছজন প্রাদেশিক চাকরীর মর্যাদাসম্পন্ন অধ্যাপক এবং অন্যান্য নিম্নচাকরীর অধ্যাপক পড়াতেন। সব ছাত্রই বৃত্তি পেত। মেয়েরাও এখানে পড়তে পেত। ছাত্র সংখ্যার দিকে ব্রাহ্মণ বেশী, তারপরই বেশী খৃষ্টান, মুসলমান ছাত্র তখনও বেশী নি।

ভর্তির যোগ্যতা ছিল, ফার্স্ট আর্টস পাশ—কিন্তু অনার্সই (বি-এ) অগ্রাধিকার পেত। ১৮৯৮-৯৭ সালে দেখা যায় একজন এম এ পাশ ছাত্রও আছে। ১২ মাসের কার্যকাল। দু রকমের পাঠ্যতালিকা, (১) লাইসেন্সিয়েট (বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত) এর জন্য একটি ব্যবহারিক (practical) ও একটি লিখিত পরীক্ষা ছিল। (২) অন্যটিকে সরকারী শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক দ্বিতীয় বিভাগীয় কলেজীয়েট টীচার্স সার্টিফিকেট দেওয়া হত। রাজমহেন্দ্রী কলেজও এই ব্যবস্থায় পরিচালিত।

ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকের ডায়েরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

সুইডেনের আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থা

ভারতবর্ষে বাধ্যতামূলক আবশ্যিক শিক্ষা প্রবর্তন এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের দেশে অনেক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। অবশ্য মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নতি প্রয়োজন, কিন্তু স্বাধীন দেশে, স্বাধীন সমাজব্যবস্থায় জনসাধারণের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য আদিবার জন্য, সর্বসাধারণের ন্যূনতম শিক্ষা অর্থাৎ আবশ্যিক শিক্ষালাভ নিতান্তই প্রয়োজন। শিক্ষায় ও সমাজব্যবস্থায় উন্নত সকল দেশেরই জাতীয় শিক্ষার বনিয়াদ হইল--সার্বজনীন আবশ্যিক শিক্ষানীতি। আবশ্যিক শিক্ষার বনিয়াদ দৃঢ় না হইলে নূতন প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের সমাজ গড়িয়া তোলাই কঠিন। আমরা দীর্ঘকাল পরাধীন ছিলাম; হয়ত সেজন্য আবশ্যিক মাধ্যমে সমাজশিক্ষার উদ্যম ও উদ্যোগের অভাব আমাদের আছে। কিন্তু সর্বসাধারণের ব্যক্তিগত ও সমবেত গঠনমূলক চিন্তা ও কর্মশক্তির সম্যক বিকাশ আমাদের কাম্য হইলে আবশ্যিক শিক্ষার প্রবাহকে সবল করিতেই হইবে!

মহাত্মা গান্ধী বুনিয়াদি শিক্ষানীতি দেশবাসীর নিকট রাখিয়া গিয়াছেন, জাতীয় কংগ্রেসও ইহা অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্তু ইহার প্রসার ও বিকাশ প্রয়োজন। এ সময়ে শিক্ষায় উন্নত দেশসমূহের সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

শিক্ষায় ও সমাজব্যবস্থায় উন্নত অন্যান্য দেশের মত সুইডেনের জাতীয় শিক্ষার বনিয়াদ হইল—সেই

দেশের আবশ্যিক শিক্ষা পদ্ধতি। বস্তুত আবশ্যিক শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়াই সমগ্র শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। সুইডেনের সমগ্র শিশুমণ্ডলীর দুই-তৃতীয়াংশ আবশ্যিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পেশাদারী শিক্ষা লইয়া কর্মজীবনে প্রবেশ করে; আর বাকী এক-তৃতীয়াংশ আবশ্যিক শিক্ষালয়ের প্রথম চারি বৎসর শিক্ষা পাইয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। সমাজকল্যাণ রাষ্ট্র সুইডেনের শক্তির উৎস - সেই দেশের আবশ্যিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং সেই দেশের আবশ্যিক শিক্ষানীতির সঙ্গে সমাজমঙ্গল নীতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

বাধ্যতামূলক আবশ্যিক শিক্ষার ইতিহাস

১৮৪২ সালে সুইডেনে বাধ্যতামূলক আবশ্যিক শিক্ষা-আইন পার্লামেন্টে পাশ হয়। এই আইনের বলে দেশের সকল শিশুর বিদ্যালয়ে যোগদান সম্ভব করিয়া তোলা হয়; কিন্তু ১৮৪২ সালের পূর্বেই সেই দেশে শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়াছিল। আবার সেই সালের পরেও আবশ্যিক শিক্ষার সংস্কার একাধিকবার ঘটিয়াছে। ১৯৫০ সালে সর্বশেষ আবশ্যিক শিক্ষার বিপুল সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। ১৯৫০ সালের পূর্বে আবশ্যিক শিক্ষা সাত বৎসরের ছিল এবং সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক শিক্ষার (continuation school) ব্যবস্থা ছিল। নূতন শিক্ষাব্যবস্থায় আবশ্যিক শিক্ষাগ্রহণের মেয়াদ নয় বৎসর করা হইয়াছে। সাত বৎসর বয়সে ছেলে-মেয়েরা আবশ্যিক বিদ্যালয়ে যোগ দেয়। সাত বৎসর বয়সের পূর্বের শিশুশিক্ষার ব্যবস্থার কথা পূর্বে লিখিয়াছি। এই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘকালের। সুইডেনের দক্ষিণতম সহর য়িস্তাদ (ystad) হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরতম সহর হাপারাণ্ডা (Haparanda), কিরোণা (kiruna) সহর মধ্যে শত শত শিক্ষালয় পরিদর্শনের সুযোগ আমার ভ্রমণকালে ১৯৩০ সালে ও পরে ১৯৩৩-৩৬ সাল মধ্যে একাধিকবার ঘটিয়াছে। ইদানীং (১৯৫৩) আমি চারিটি কাউন্টির শিক্ষাব্যবস্থা দেখিয়াছি। বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিস্থিতির মধ্যে বিশাল পার্থক্য রহিয়াছে; সেজন্য শিক্ষার বিষয় একরূপ হইলেও শিক্ষাব্যবস্থা ও আবশ্যিক শিক্ষা পরিচালনার মধ্যেও কতক পার্থক্য আছে।

আবশ্যিক শিক্ষা পরিচালনা

সমগ্র দেশটি ২৫০০ শত স্কুল ডিভিশনে বিভক্ত। এই ডিভিশনগুলি communal district-এর অনুরূপ। শেষোক্ত জেলাগুলি জেলার শিশুমঙ্গল, স্বাস্থ্যমঙ্গল, দরিদ্রের সেবা (poor relief)* ও আবশ্যিক শিক্ষায়তনের পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন। আবশ্যিক শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীর কোনই খরচ নাই। সমগ্র ব্যয়ের তিন-পঞ্চমাংশ সরাসরি রাষ্ট্রকোষ হইতে আসে, আর দুই-পঞ্চমাংশ স্কুল-ডিভিশন বহন করেন।

মোটামুটি সাত লক্ষ শিশু আবশ্যিক বিদ্যালয়ে পড়ে এবং শিক্ষকের সংখ্যা ত্রিশ হাজার। ইহার অর্থ এই যে প্রতি ২১ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক আছেন। রয়্যাল বোর্ড অফ্ এডুকেশন আবশ্যিক শিক্ষা পরিচালনার সর্বময় কর্তা। এই বোর্ড মাধ্যমিক শিক্ষাও পরিচালনা করেন। আবশ্যিক বিদ্যালয়ের কাজ পরিদর্শন করিবার জন্য সমগ্র দেশে পঁয়ত্রিশজন ইনস্পেক্টর আছেন। তাঁহাদের বিদ্যালয় পরিদর্শনের এলাকা নির্দিষ্ট আছে।

পাঠ্যপুস্তক, লেখার খাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্রী

১৯৪৬ সাল হইতে আবশ্যিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্যপুস্তক, খাতা, কাগজ ইত্যাদি যাবতীয় শিক্ষার সামগ্রী বিনামূল্যে বিদ্যালয় হইতেই পাইতেছে। দেশের কতকগুলি মিউনিসিপ্যালিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীকেও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য যাবতীয় শিক্ষার সামগ্রী দিয়া

*দরিদ্র বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা এই দেশে অচিন্তনীয়।

আসিতেছেন। সুইডেনের জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবার ফলে এরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হইতেছে, এবং অভিভাবকেরা এই খরচের দায় হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

বিদ্যালয়ে খাদ্য পরিবেশন

দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদিগকে বিদ্যালয়ে একবেলা খাদ্য দিবার প্রথা সুইডেনে বহুকাল পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। ১৯০০ সালে ও পরে ১৯৩৩-৩৬ সালে সুইডেন পরিভ্রমণ কালে আমি বহু বিদ্যালয়ে খাদ্য পরিবেশন প্রথা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। ১৯৪৬ সালে বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীকে খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থা আইনসিদ্ধ করা হয়। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য এই যে অভিভাবকদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা না করিয়াই সকল ছাত্রছাত্রীকে বিদ্যালয়ে খাদ্য দিতে হইবে। এই প্রথা সার্বজনীন হওয়ার ফলে আবশ্যিক বিদ্যালয়ের রূপই বদলাইয়া গিয়াছে। এ সম্পর্কে 'শিক্ষা'র (আশ্বিন, ১৩৬৬) পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

আবশ্যিক বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়

আবশ্যিক বিদ্যালয়ে সুইডিশ ভাষা, ধর্মগ্রন্থ (Scripture), ইতিহাস, অঙ্ক, প্রকৃতিবিজ্ঞান, ভূগোল, বিদেশীভাষা, গৃহস্থালীর কাজ, (domestic work) এবং শিল্প শেখান হয়। খেলাধূলা, ব্যায়াম সাঁতারকাটা ইত্যাদিও শেখান হয়। বড় বিদ্যালয়-গুলিতে বিরাট ব্যায়াম ও খেলার হল ও স্নানের ব্যবস্থা আছে। অভিভাবক ও প্রতিবেশীগণ, বিদ্যালয়ে সাঁতার দিতে ও ব্যায়াম করিতে পারেন।

ছাত্রছাত্রীরা নয়বৎসর বয়সে হাতের কাজ শিখিতে আরম্ভ করে এবং বিদ্যালয়ের জীবনের শেষ পর্যন্ত তাহা শেখে। নয় বৎসরের আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থায় বহু পেশাদারী কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সোদের টালজে (sodertalje) নামক শহরে আমি একটি আধুনিক নয় বৎসরের আবশ্যিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছিলাম। সেই বিদ্যালয়ের ছাপাখানার কাজ পরিচালনা, লোহা অফিসের কাজ পরিচালনা জামা কাপড়ের দোকান পরিচালনা ইত্যাদি হাতে কলমে শেখানো হয়। কোন কোন স্কুলে হাতে কলমে কৃষির কাজও শেখানো হয়।

১৯৫০-৫১ সালে আবশ্যিক বিদ্যালয়ে ১৪০,০১৪ (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার চুয়ানব্বই) জন ছেলে এবং ১০০৩ (এক হাজার তিন) জন মেয়ে বিদ্যালয়ে কার্ডবোর্ড ও কাঠের কাজ শিখিয়াছিল; আর —৩১,৩১৩টি (একত্রিশ হাজার তিন শত তিরানব্বই) ছেলে এবং ২০০,৩০৭ (দুই লক্ষ তিন-শত সাতটি) মেয়ে রন্ধন শিখিয়াছিল। শিক্ষা-নৈতিক শিল্প শিক্ষার মর্যাদা দানে সুইডেন অগ্রণী। বিদ্যালয়ে শিল্প শিখাইবার ব্যবস্থাদিও উত্তম।

জিমনাষ্টিক বিদ্যালয় জীবনের ষষ্ঠ ও সপ্তম বর্ষে সকলকেই শিখিতে হয়। বস্তুত বিদ্যালয়ের স্নানের ব্যবস্থা ও জিমনাষ্টিক শিক্ষার ব্যবস্থা জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষানীতির অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়।

আবশ্যিক বিদ্যালয়ের ক্লাশের বিভিন্ন রূপ

উত্তর দক্ষিণে লম্বা দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভৌগোলিক ও জনবসতির পার্থক্য বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। দেশের শতকরা একশত জনকেই আবশ্যিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা লইতে হয়; সেজন্য ভৌগোলিক অবস্থানুসারে বিদ্যালয়ের ও ক্লাশ গঠনেরও বিভিন্নতা রহিয়াছে। যেমন—ঘনবসতি অঞ্চলের বিদ্যালয়, বিচ্ছিন্ন ঘন-বসতি অঞ্চলের বিদ্যালয় ও স্বল্প ঘনবসতি অঞ্চলের বিদ্যালয়। ক্ষুদ্র পল্লীতে ছাত্রসংখ্যা কম হইলে মাত্র প্রথম দুইটি ক্লাশের জন্য বিদ্যালয় থাকে; এরূপ ক্লাশের, ছয় ক্লাশের বিদ্যালয় আছে। এসকল বিদ্যালয়ের আবশ্যিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য এক একটি সেন্টাল বিদ্যালয় থাকে। আবার স্বল্প অথচ

বিচ্ছিন্নবসতি অঞ্চলে বোর্ডিং স্কুল আছে। ১৯৫০ সালের হিসাব অনুযায়ী নয় বৎসরের আবশ্যিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে এবং পূর্বের রীতি অনুসারে সাত বৎসরের সঙ্গে আনুষঙ্গিক বিদ্যালয়গুলি (Continuation Schools) এখনও চলিতেছে। বিভিন্ন রকমের, যথা আট বৎসরের সাত বৎসরের, ছয় বৎসরের এবং দুই বৎসরের বিদ্যালয়গুলি A, B, B_1, B_2, a, b অক্ষরে পরিচিত।

এখানে বিভিন্ন অঞ্চলের দু'তিনটি স্কুল ডিভিশনের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্ণনা দিতেছি। ওদেবারল্যাণ্ড (Agormarland) নামক প্রদেশের ওদের-লিডেন (Ader-Liden) নামক ক্ষুদ্র স্কুল জেলার বিদ্যালয় :—

বিদ্যালয়ের নাম	বিদ্যালয়ের রকম	নিম্ন ক্লাসে শিক্ষক সংখ্যা	উচ্চ ক্লাসসমূহে শিক্ষক সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা
নেসোকার (Nasakar)	Aab	৩	৫	১৮৭
অসমন (Asmon)	AB1A	২	৪	১৪৮
ফোরস্নেশ (Forenes)	B2b	১	১	৪৮
হলাকর্স (Halafors)	b	১	০	৬
বেতোসেন (Betasen)	Aa	২	২	৯৬

এই স্কুল-ডিভিশনের আয়তন মাত্র ৪১৪ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে ৪০২৮জন ছিল।

ফোরস্নেশ্ বিদ্যালয়ে ছয়টি ক্লাশ আছে; সেজন্য উর্ধ্বতন ক্লাশের শিক্ষার জন্য ছয় বৎসরের শেষে ছাত্রছাত্রীকে অশমন বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হয়। আবার হলাকর্স বিদ্যালয়ে মাত্র দুই ক্লাশ আছে, দুই বৎসর পরে ছাত্রছাত্রীকে নেসোকার বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হয়। বেতোসেন বিদ্যালয়ে চারি বৎসরের শিক্ষাব্যবস্থা আছে; সেজন্য পরে ছাত্রছাত্রীকে অশমন বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হয়। ছাত্রদের যাতায়াতের জন্য কি পরিমাণ ব্যয় হয় তাহাও জানিবার বিষয়। ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে লইয়া যাওয়া এবং বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার জন্য বাস, নৌকা (পার্বত্য হ্রদ বহুল অঞ্চল), ঘোড়ার গাড়ী, মোটর গাড়ী ব্যবহৃত হয়।

আমাদের বৃহৎ ভারতবর্ষে অদূর ভবিষ্যতে আবশ্যিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইবে; তখন সকল অঞ্চলেই শিক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হইবে; সেজন্য দুইতেজের বাধ্যতামূলক আবশ্যিক শিক্ষা-ব্যবস্থার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক মনে করি না। কারণ বাধ্যতামূলক সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব দেশবাসীকে বুঝিতে হইবে। উপরে যে ক্ষুদ্র স্কুল ডিভিশনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সেই অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের যাতায়াত খরচ অনুধাবনযোগ্য।

স্থানের নাম বাসস্থান—বিদ্যালয়	দূরত্ব (কিলোমিটার)	যানের প্রকার	আরোহীসংখ্যা	বাৎসরিক খরচ ক্রাউন—এক টাকার সমান
কোরলমেন—অশমদম	১৬	বাস	৪৫	১১,১৮২ : ২০
বেতোসেম—অশমদম	১৬	বাস	৪৯	১০,৯৯৫ ৬০
হলাকোর্স—মেসোকায়	১৭	বাস	৫৯	৯,৩৩৩ : ৪০
লিবগাই—মেসোকায়	১৭	বাস	২০	৭,৮০৩ : ৪০
অমসো—মেসোকায়	১৮	বাস	১৪	৭,০৬২ : ০০
বিগহুশোম—মেসোকায়	৩৭৫	ঘোড়ার গাড়ী	৩	৭,১৪০ : ০০
কয়সোশ—মেসোকায়	৪	মোটর	২	১,৩২৬ : ৮০
বোতামো—এথেন্স	১৫	বাস	৭	৩,১০০ : ০০
মাকলো—কিলামোস	২৪	নৌকা	৩	৭০০ : ০০
ক্যারমোস্ট—কিলামোস	২৫	নৌকা	২	৭০০ : ০০
সোদেয়কর্স—বেতোসেম	৪	বাস	১৩	৮,৪২০ : ০০
				যাতায়াতের মোট খরচ = ৬০,৯১৩ : ৪০

উপরোক্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলি চালাবার জন্য শিক্ষকদের মাহিনা ছাড়া অন্যান্য খরচ কি পরিমাণ হয় তাহাও জানিবার বিষয়। যথা :—

১।	বিদ্যালয়ে বাড় পরিবেশন বাবদ—	৮৩,০০০ ক্রাউন প্রতিবৎসর
২।	দুর্ঘটনার জন্য ইনসিওরেন্স বাবদ—	৩২৪ "
৩।	বিদ্যালয়ে স্নান ও সাঁতার-ব্যবস্থা বাবদ—	৩,১০০ "
৪।	বিশেষ চিকিৎসা বাবদ—	২,০০০ "
৫।	দাঁতের চিকিৎসা বাবদ—	১৭,০০০ "
৬।	অন্যান্য খরচ—	১,০০০ "
	মোট খরচ = ১০৩,৪২৪ ক্রাউন প্রতিবৎসর	

অল্প ও বিচ্ছিন্নবসতি অঞ্চলের আবশ্যিক শিক্ষা ব্যবস্থা :—

আমি সম্প্রতি সুইডেনের উত্তর-পূর্ব প্রদেশের আবশ্যিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছি। এই অঞ্চলটির নাম নরবটেন (Norrbotten)। ইহার আয়তন ১০৪,৫০০ বর্গ কিলোমিটার। তন্মধ্যে ১৮,৬৭৫ বর্গ কিলোমিটার স্থল আর বাকী হ্রদ ও নদী। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র দুইজনের বাস। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৫১ জন কৃষি ও বনের কাজ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে; গ্রীষ্মকালে কৃষির কাজ, আর শীতকালে বনে কাজ চলে। শতকরা ২৬ জন ইন্‌ডাষ্ট্রি ও শিল্পকার্যে নিয়োজিত; শতকরা ৮৭ জন কমুনিকেশান, শতকরা ৪ জন ব্যবসাতে এবং বাকী ১১ জন বিবিধ কাজে নিয়োজিত। এই বৃহৎ জনবিরল অঞ্চলে এই শীতকালে (মার্চ, ১৯৫৩) এ অঞ্চলের শিক্ষাবিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তা W. Snell-এর মোটরে করিয়া সাতদিন ঘুরিয়াছি এবং এখানকার আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থাগুলি দেখিয়াছি।

আবাসিক বিদ্যালয়

শহর ছাড়া পল্লী অঞ্চলে জনবসতিগুলি ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন; সেজন্য এ অঞ্চলে ষোলটি আবাসিক আবশ্যিক বিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়গুলির নাম বিভিন্ন। যেমন—"শিক্ষাগৃহ" "কার্যগৃহ" ইত্যাদি। এই পার্থক্যের কারণ ঐতিহাসিক, কিন্তু ফলতঃ এই আবাসিক প্রতিষ্ঠানগুলি আবশ্যিক বিদ্যালয়। পল্লীর নিকটে মামুলী বিদ্যালয় না থাকিলে সাত বৎসর বয়স হইলেই ছেলেমেয়েকে এই সকল আবাসিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। রাষ্ট্র, কাউন্টি ও কমিউন্‌স্ এই সকল শিক্ষাগৃহের সমুদয় খরচ বহন করেন। এই সকল বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে আদর্শ সামাজিক জীবন যাপন করে, আর দীর্ঘ ছুটির দিনে গ্রীষ্মকালে ও খ্রীষ্ট জন্মোৎসবে ছাত্রছাত্রীরা পিতৃগৃহে চলিয়া যায়।

আমি এই অঞ্চলের স্কুলগুলির সমুদয় বিবরণ সহ একটি চার্ট দিতেছি। পাঠক মানচিত্রের সাহায্যে স্থানগুলি দেখিয়া এই চার্ট বুঝিতে প্রয়াস করিলে আবশ্যিক শিক্ষার ব্যয় কিভাবে সে দেশে প্রতিপালিত হয় তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। আমি একাধিক আবাসিক বিদ্যালয়ে রাত্রি যাপন করিয়াছি; সেজন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও সমাজজীবন সম্পূর্ণ উপভোগ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সুমেঙ্গ বৃত্তের উত্তরে একটি আবাসিক আবশ্যিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সকলেই জাতিতে ল্যাপ ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে ১৯৩০ সালে ভ্রাম্যমাণ ল্যাপদের শিক্ষাব্যবস্থা অনুরূপ দেখিয়াছিলাম; ল্যাপ পিতামাতা গ্রীষ্মকালে ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে দিয়া যাইত কিন্তু এখন ল্যাপেরাও ছেলেমেয়েকে আবাসিক বিদ্যালয়ে পড়িতে দেয়, রাষ্ট্রের আবশ্যিক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ ল্যাপেরাও গ্রহণ করিতেছে। [ক্রমশঃ]

নরবত্তেন অঞ্চলের স্কুল ডিভিশনের বিবরণ (১৯৫২)

স্কুল ডিভিশনের নাম School Districts	আয়তন (হেকটার)	চাষভূমির আয়তন (হেকটার)	সমগ্র জনসংখ্যা	প্রতি কিলো-মিটারে জনসংখ্যার হার	আবশ্যিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	শিক্ষকের সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা	আনুষঙ্গিক ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা ৮ম বর্ষ (Continuation School-Class)
হাপারান্ডা নগর (Haparanda Town)	২৪২	৬৯	৩,০৩৬	১২·০৭৬	১	১২	২৭৯	২৫
নেদের-টরনেয়ো (Nedor-torea)	৪২,৭২৮	১৮০৮	৪,২৭৯	১০·০	১২	৩৯	৬৮৪	৩১
কার্ল-গোস্তাব (Karl gustav)	৪৪,৮১০	২৫১১	৩,৩৭৯	৭·৫	৭	২৯	৫৭২	৩২
হেইতানিয়েমি (Heitaniemi)	৭০,৩২৪	১২৮৪	২,৭০৭	৩·৮	৭	৩০	৪০৬	৪
ওভার-টরনেয়ো (Over-torneå)	১৬৭,৫৫৭	১৯৯৪	৭,৪০২	৪·৪	১৮	৭১	১৫৬২	১৬০
কর্পিলোম্পল (Karpilompolo)	১৪৯,৮৮০	৯৬০	৩,৮২৯	২·৬	১৩	৪৪	৭৪১	১২১
পায়ালা (Payala)	৩৫১,২৬০	১০৫০	৭,০৮৬	২·	২১	৭৩	১৩৩৬	১৫৮
টেরেন্দো (Terendo)	১৬৬,৫২০	৫০৬	২,২৯৫	১·৬	৬	২২	৩৭৯	৫১
জোনসুয়ানদো (Junsuando)	১২২,০০০	৪৪৬	১,৯২৬	১·৩	৪	২২	৩৭৮	৬৭
নেদের্কালিক্স (Nederkalix)	৮১,৯১৮	৪৮০২	১৭,৯৬৮	২০·২	২৬	১০৩	২১৭৬	১৮৪
মোট—	১,২০৪,৫৫৮ হেকটার	১৬,০২১ হেকটার	৫৪,০২৩ জনসংখ্যা	প্রতিবর্গ কিলো-মিটারে ৪·৫ জন	১১৫ বিদ্যালয়	৪৪৫ জন শিক্ষক	৮৪১৩ ছাত্রসংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা মোট—৮৭২

ফ্রয়বেলের শিক্ষানীতি

শ্রীমতী কণিকা বসু

ফ্রয়বেলের চিন্তাধারায় যে দুটি বিশেষ সুর মূর্ত হয়ে উঠেছে, তার প্রথমটি হচ্ছে প্রগাঢ় শৈশবপ্রীতি আর দ্বিতীয়টি উচ্চাঙ্গের আদর্শবাদ, এবং উভয়েরই গতি ক্রমশঃ এসে মিশেছে অস্পষ্ট একধরণের অদ্বৈতবাদে। এই শিক্ষাবিধির রচনায় সে তিনিসই প্রকাশ পেয়েছে। এ দুটি কারণে এবং বিশেষ করে ফ্রয়বেলের আদর্শবাদে যে অংশটি অস্পষ্ট ও অপ্রকাশ্য থেকে গেছে—তার বোধে,একদল উৎসাহী শিষ্য তাঁর মূলমন্ত্রকে আঁকড়ে ধরতে পেরেছে ; সে মূলমন্ত্র হ'ল সন্তানের শিশুপ্রীতি। মানুষের জীবনে শৈশবের মাধুর্য অনেকখানি, শৈশব স্মৃতির চেয়ে প্রিয়তর আর কিছু নেই। বিগতশৈশব বৃদ্ধ সে সময় পার হয়ে এসে কিশোরের উচ্ছলতা ও নতেজ ভাবের আকর্ষ অনুরাগী হয়ে পড়ে। যে মানুষ অন্যের শুদ্ধও শিশুদের উচ্ছলতায় ডুবে যেতে আনন্দ পায় না, তার মুখ্যত এমন একটি চরিত্রের অপূর্ণতা থেকে যায়, যে কোন রকম পাপ-কার্য তার দ্বারা অসম্ভব বলে মনে হবে না। তবে এই মেলামেশারও রকম আছে। শিশুদের সঙ্গে একটু নাচকোঁদন বা তাদের সঙ্গে দু'একঘণ্টা কাটানো এককথা ; আর এই শিশুপ্রীতিকে মূলমন্ত্র রূপে গ্রহণ ক'রে জীবনের অধিকাংশ সময় শিশুদের মিশে কাটানো, তাদের হাতে ধরে শেখানো, দোষ-ত্রুটির সংশোধন করা, বা একঘেঁয়েমি ও আবদার মানিয়ে চলার সুরে স্বভাব ও অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করা, ছোট-খাট ব্যাপারে একটু একটু করে কতগুলো নীতি-নিয়ম তাদের সামনে তুলে ধরা—এ সব হচ্ছে অন্য কথা। এই রকম কাঁচা মনকে গ'ড়ে তোলার যে দৃষ্টিভঙ্গী তা হয়তো ব্যক্তিবিশেষকে কিছুটা সীমার গণ্ডীর ভিতর বেঁধে রাখে। কিন্তু যে সমস্ত শিক্ষক এ বিপদ সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সঞ্জীবনীর সন্ধানও রাখেন। তাঁরা ফ্রয়বেলের জীবনে এবং তাঁর আদর্শবাদের ভিতরে শিশুপ্রেমের মাধকতার সন্ধান পেয়েছেন বলে প্রতিদিনের শিক্ষকতার একঘেয়েমী থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন।

যে প্রেরণা জ্ঞানদর্শীকে (prophet) অনুপ্রাণিত করে থাকে, সচরাচর তার উৎপত্তি বিচার করে দেখার চেষ্টায় লাভ আছে। কারণ তাঁর মন্ত্রের মধ্যে যে প্রবল শক্তি নিহিত রয়েছে, সে-ই তো হ'ল গোপন উৎস। ফ্রয়বেলের শৈশবপ্রীতির কারণ অত্যন্ত সহজ ও নির্ভুল। তাঁর ছোট-বেলাকার সময়টা অবহেলা ও ভুল বোঝার ভারে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। Autobiographie-তে তিনি লিখেছেন—"অতি শৈশবেই জীবনের বেদনা-দায়ক সাধনা করতে হয়েছিল। একটা অদ্ভুত জীবনপ্রণালী ও ভুল শিক্ষাধারার প্রভাব আমার ওপর ছিল।" যে সময় সহানুভূতি ও স্নেহের জন্য শিশুর মনপ্রাণ উন্মুখ হয়ে থাকে—সে সময়ে তিনি পেয়েছেন অবহেলা। মা মারা গেলেন ফ্রয়বেলের নয় মাস বয়সের সময়। বাবা যে ছিলেন না—তা নয় ; সন্তানের প্রতি স্নেহ অনুভূতির তাঁর ছিল একান্ত অভাব। বিমাতার কুমাতা-সুলভ দোষের অভাব ছিল না। এই রকম পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বহু শিশুরই হয়তো শৈশব চিরদিনের মত বিকৃত ও ম্লান হয়ে গেছে। ফ্রয়বেলের বেলায় তা একটু অন্যরকম দেখা গেল। একথা সত্য যে তাঁর স্বভাবতঃ অভিমানী মন আত্মবিশ্লেষণ ও অন্তর্দর্শনের ফলে খুবই বেশী পীড়িত হ'ত। সে

যাতনার দিনগুলো তিনি কখনই ভুলতে পারেন নি। কিন্তু আশ্চর্য এই যে তাঁর আত্মা দুঃখের অনলে দগ্ধ না হয়ে আরও নির্মল হ'ল। তিনি খিটখিটে বা রূঢ় স্বভাবের না হয়ে অনন্ত শক্তিকে এমন কাজে লাগিয়ে দিলেন যেন তাঁর মত অন্যান্য শিশুরা ঐরূপ ভিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বেঁচে যেতে পারে। শিশুর জীবন তাঁর কাছে অনেকাংশে ঋণী। নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত রেখে এবং নিবিড় ভালবাসা দিয়ে এই ছোট কচি মনগুলোর জন্য তিনি স্নেহ ও সহানুভূতি জাগিয়ে তুলেছেন—যার ফলে এমন অন্তর্দৃষ্টির লাভ হয়েছে যে শিশুকে নেহাৎ খেলার সামগ্রী বা হাসির খোরাক না ভেবে লোকে তাকে বুঝতে পারে ও বুঝতে চেষ্টা করে। এই দৃষ্টিভঙ্গীই বর্তমান যুগের বিশেষত্ব। ফ্রয়বেল যে কাজে জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন—তার প্রেরণার উৎস ছিল নিরানন্দ শৈশবের নির্জন দিনগুলি।

ফ্রয়বেলের জীবনে যে দ্বিতীয় উৎসের প্রভাব চলেছে তাকে বলা যেতে পারে আদর্শবাদ, যা থেকে সমসাময়িক প্রসিদ্ধ জার্মান মনীষিগণ আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক চিন্তাধারার খোরাক পেয়েছেন। খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্মানীর রাজনৈতিক সঙ্কট উপস্থিত। খণ্ডিত জার্মানীর একীভূত হওয়ার স্বপ্ন স্বপ্নই ছিল। সেই সময়েই মুক্তির বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠল সম্রাট কিংবা যোদ্ধার অন্তরালে নয়; হ'ল কবি ও দার্শনিকের চিন্তাক্ষেত্রে—Schiller এবং Schelling-এর মতবাদে। বাস্তবজগত থেকে নয়, দার্শনিক মতবাদ থেকে এক নতুন ধরণের হাওয়া বইতে লাগল যা নাকি মুমূর্ষু জার্মাণীর প্রাণ দিয়ে এল, প্রতিষ্ঠা করল মানব সভ্যতার ইতিহাসে জার্মাণীর মান, মর্যাদা ও নতুন ভাবধারা আভিজাত্য।

মানবশক্তির ওপর অখণ্ড বিশ্বাস যেমন ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লবের রূপ নিয়েছিল, জার্মানীতে সেই চিন্তা [illegible] স্পিরিচুয়েলস ফেলে নবজন্মের সঞ্চার করল। 'যা প্রয়োজন তা সম্ভব'—এ ছিল সে যুগের মহামন্ত্রের একটি। কাণ্ট (Kant) idea of freedom-এ সে কথাই প্রচার করে গেছেন—"তুমি করতে পারো, যেহেতু তোমার করা উচিত।" ঠিক এরই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই Schiller এবং Fichte-র বাণীতে—"জগতে মানুষের সত্যি কারের কাজ হচ্ছে নতুন নতুন ভাবধারা দিয়ে বাস্তবকে রূপ দেওয়া। যে ইচ্ছাশক্তির নিজের অস্তিত্বে ও ক্ষমতা বিশ্বাস আছে তার কাছে কিছুই অসম্ভব নয়।" সবচেয়ে মজার হ'ল যে, যে নেপোলিয়ন (Napoleon) 'ইচ্ছার' সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাসে এবং প্রভাবে ইউরোপকে কম্পিত করলেন, তিনি আদর্শ হয়ে দাঁড়ালেন সহরের সহলোকের। সুতরাং নৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষার চিন্তাধারা একসঙ্গে মিলে গেল।

এই কার্যকরী (practical) আদর্শবাদ Fichte-তে প্রকাশ পেল আর মূর্ত হয়ে উঠল Schiller-এর নাটকে। নতুন জার্মানীকে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ফেলতে সাহায্য করলেন এঁরাই। Schiller বলে গেলেন, "প্রকৃতিই চৈতন্য, আর চৈতন্যই প্রকৃতিতে প্রকাশ।" তাহলে প্রকৃতি হ'ল মানুষের আত্মচেতনের অভিব্যক্তি বা বহিঃপ্রকাশ। এই আদর্শবাদের পরিণতি হ'ল হেগেলের দর্শনে। দেখা যায়, Spinoz-র প্রভাব এঁদের জীবনে প্রগাঢ় ছাপ রেখে গেছে। Schelling একে ধর্মের রঙে রাঙিয়ে অদ্বৈতবাদে নিয়ে ফেললেন—যার ফলে সব কিছুতে ঈশ্বর প্রকট বলে মনে হ'ল।

রোমান্টিক কবিগণ—যাঁদের অন্যতম ছিলেন গ্যেটে—এই মতধারায় অবগাহন করেছিলেন। ঐক্যের সন্ধান পাওয়া গেল, সকল জিনিষে ঐশ্বরিক মহিমার বিকাশ অনুভব করার প্রয়াস বোঝা গেল, এবং সৌন্দর্য দ্বারা ইউরোপকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে মানবাত্মার মুক্ত ও জয় এই ভাবেই এক দিক থেকে ঘোষণা

করল। মুক্তির পিপাসা জাগিয়ে তুলল সারা জগতে। এ যুগের সন্তান হলেন Keats, Coleridge এবং Wordsworth.

ক্রয়বেল এ দুইয়ের প্রভাবে পড়ে গেলেন। কোনরূপ কঠোর দার্শনিক শিক্ষার সুযোগ তাঁর হয় নি। তাঁর শিক্ষা 'আত্মশিক্ষা' বলা যেতে পারে। Jena-তে এবং Gottingen ও Berlin-এ যে সময়টুকু তিনি পেয়েছেন অঙ্কশাস্ত্র ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পড়তেই তাঁর কেটে গেছে। তিনি বলতেন, "অঙ্কশাস্ত্র ছাড়া অন্য কোন বিষয়বস্তু আমার আকর্ষণ করেনি। দার্শনিক মতবাদ আমি ততটুকু জেনেছি—যতটা জীবনের গতি আমার সামনে তুলে ধরেছে। তবে এইতেই উদ্দীপক বহু চিন্তাধারা আমি পেয়েছি।" কিন্তু সে সময় Jena বিশ্ববিদ্যালয় সুখ্যাতির শীর্ষে উঠেছে—জার্মান চিন্তাধারার কেন্দ্র বলে তাকে ধরা হোত। Kant-কে সাদরে সবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং দর্শনের সুউচ্চ আসন ক্রমান্বয়ে Fichte, Schelling ও Hegel সম্মানিত করেছেন।

ক্রয়বেলের স্বপ্ন—যাকে বস্তুতঃ দার্শনিক দৃষ্টি-প্রসূত বলা চলে না—বিশেষভাবে প্রকৃতির সান্নিধ্যে পুষ্ট হয়েছে। তবে একথা ঠিক যে তাঁর স্বপ্ন তাঁর ব্যাপ পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ছোঁয়াচমুক্ত ছিল না। বোঝা যায় যে ক্রয়বেলের দর্শন কোন সুপরিকল্পিত চিন্তাধারা নয়—বরঞ্চ একটা স্বাভাবিক মনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ।

প্রকৃতির সঙ্গে ক্রয়বেলের সখ্য যেন অত্যন্ত নিবিড় ও জীবনব্যাপী। যখন তাঁর বয়স অল্প বাড়ীর চারপাশে Thuringian বনশ্রেণী তাঁর আত্মবিশ্লেষণশীল মনকে বিমুগ্ধ করে ফেলত। তিনি বলতেন—"ফলফুল ও বৃক্ষের যে শোভা আমি দেখেছি, শৈশব থেকেই, সে সবই আমার পরিবেক্ষণের ক্ষেত্র হয়ে দেখা দিল।" নির্জন বনবাথাড়ে কতদিন তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন; একপ্রকারের প্রীতি ও ভক্তি তাঁর মনকে আপ্লুত করে দিত; ক্রমশঃ তা যেন ধর্মের মূল ভিত্তিতে রূপ নিত। "My church religious life became a nature religious life." নির্ঝর ধর্ম ও প্রকৃতির ধর্ম এক হয়ে গেল—মুক্তলতা তাঁকে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ক্রয়বেলের অন্তরের প্রেরণা, এবং তাঁর চারদিকের অবস্থা তাঁর মনকে আদর্শবাদের জন্য তৈরী করে দিল—যার জন্য তাঁর চিন্তাপ্রবাহে যোগীসুলভ তন্ময়তার আভাস পাওয়া যায়। অসীমের সে ধ্যানে যোগী অস্পষ্টতার ছোঁয়াচ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। প্রকৃতিতে রয়েছে আত্মা; আত্মা প্রকট হচ্ছে প্রকৃতির রূপে। প্রকৃতি বহুজীবনে নিজেকে প্রকাশ করে, সৃষ্টির বিভিন্ন ধারা মূলতঃ একই সৃষ্টিকর্তার অংশ। আত্মার স্বতন্ত্রতাও এই ঐক্যের সন্ধানে ছোটে এবং তৃপ্তি পায় বিশ্বরূপে লুপ্ত হয়ে—এই হচ্ছে ক্রয়বেলের দার্শনিক মতবাদ।

কোনদিন কোন অবস্থায় ক্রয়বেল গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বের বা কঠিন যুক্তির আশ্রয় নিতে পারতেন, এ ধারণা করা ভুল হবে। তাঁর স্বচ্ছন্দ মন এক-ধরণের নির্দিষ্ট পথে চলা থেকে যেন বিমুখ ছিল। প্রকৃতকথা হচ্ছে এই যে, কোন মানসিক শৃঙ্খলায় ধরা না দেবার জন্য এবং বিশেষ করে নির্মল প্রকৃতির সঙ্গে স্বপ্নাবিষ্ট সখ্যতার ফলে মন তাঁর যুক্তিতর্কেও অক্ষম ছিল। তবে সাধারণ প্রথাসম্মতীয় অনভ্যস্ততা এবং গভীর অনুভূতি থাকায় ফলে এই মনীষির অন্তরে একটি প্রগাঢ় ও নির্মল ভগবদ্‌প্রেমের সাড়া পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ

LIBRARY

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

• ১৯শ বর্ষ | মাঘ, ১৩৬৭ | ৩য় সংখ্যা

আলোচনা

শোক প্রকাশ

সহযোগী 'ত্রিস্রোতার' সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মৌলিকের পরলোকগমনে গভীর দুঃখ ও শোক প্রকাশ করিতেছি। সত্যেন্দ্রনাথ কৃতবিদ্য ছিলেন, এবং জলপাইগুড়িতে 'ত্রিস্রোতা' সম্পাদনের ভার সুচারুভাবে বহুদিন চালাইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বঙ্গদেশের পল্লীতে যাঁহারা সংবাদ বিতরণের ভার লইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান শূন্য হইল।

শ্রীযুতী ভায়োলেট রায় দীর্ঘজীবন শিক্ষক ও পরিদর্শকরূপে কাটাইয়া সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহার কথা তাঁহার ছাত্রী ও সহকর্মীরা বহুদিন স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখিবে। তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

শিশুনিকেতন

জলপাইগুড়ি শিশুনিকেতন সম্প্রতি তাহার বিংশতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কলিকাতায় উৎসবের আয়োজন করিয়াছিল। উৎসবে বিখ্যাত শিল্পীদের নৃত্যগীতের ব্যবস্থা ছিল। এই দিন যে স্মারকপুস্তিকা প্রকাশিত হয় তাহার বৈশিষ্ট্য হইল শিশুদের নিজেদের লেখা ও ছবি। কুড়ি বৎসরে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৫ হইতে ২৭৮-এ দাঁড়াইয়াছে, আরও শিশুর নিশ্চয় স্থানাভাবের জন্য শিশুর সংখ্যা আরও বাড়িতেছে না। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পরলোকগত ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাত বৎসর পূর্বে শিশু নিকেতন দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন, কলিকাতার বাহিরে এরূপ শিশুবিদ্যালয় দেখেন নাই, কলিকাতার মধ্যেও ইহার সমকক্ষ শিশুবিদ্যালয় খুব কমই দেখিতে পাওয়া যাইবে। চিত্রে, বর্ণে, ভাষায় শিশুমনের যে প্রকাশ হইয়াছে, তাহা স্মারক পুস্তিকা শান্তিনিকেতন হইতে প্রকাশিত 'আমাদের লেখা'র কথা মনে করাইয়া দেয়।

আচার্যের সম্মান

গত সংখ্যায় আমরা বীরভূমের গ্রামে অনেক প্রবীণ শিক্ষকের সম্মান ও সমাদরের সংবাদ দিয়াছিলাম। এবার গুজরাটের অনেক শিক্ষাব্রতীর সম্মান লাভের কথা বলি। গান্ধীজীর আন্দোলনের সময়ে সৌরাষ্ট্রে

তিনজন শিক্ষাব্রতীর সাধনার কথা শোনা গিয়াছিল। এঁদের একজনের নাম ছিল গিজু ভাই, একজনের হরভাই, আর তৃতীয় জনের নানাভাই। মনোরমা নামক স্থানে ৬ জানুয়ারি তারিখে শান্তিবাচন ও মঙ্গল প্রার্থনা দিয়া নানাভাইয়ের সংবর্ধনা আরম্ভ হয়। নানাভাই একবার শিক্ষামন্ত্রীও হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এ কাজ পছন্দ হয় নাই। কিছুদিন কাজ করার পর মন ছুটিল সেই গ্রামের হিন্দালয়টির দিকে, যাহার সঙ্গে তাঁহার প্রাণের যোগ ছিল। কেন্দ্রমন্ত্রী মোরারজি দেশাই, বৈকুণ্ঠভাই মেহতা, দেবব্রতভাই প্রভৃতি সকলে তাঁহাকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধাভাজন রবিশঙ্কর মহারাজ সমাজের পক্ষ হইতে দুই লক্ষ আট হাজার টাকার একখানি থলি তাঁহাকে উপহার দিলেন।

সংবর্ধনার উত্তরে আচার্য নানাভাই বলেন—"ছাত্রদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই শিক্ষকের সব চেয়ে বড় সম্মান। সরকার বা সমাজ নিজেদের দিক হইতে শিক্ষককে যতই অর্থ বা সম্মান দিন না, তাহাতে শিক্ষকের মানের কমবেশী কিছু হয় না। এই সম্মান বা টাকার থলির কথাটা বাস্তবিক আমার ভাল লাগে নাই, কিন্তু আমি আপত্তি করিলে সকলে মনে মনে ভাবিত ইহা আমার গুণের অভিমান, সদ্‌গুণেরও যে একটা অভিমান আছে। তাই আমি সকলে মিলিয়া যাহা কিছু দিয়াছেন তাহা নিঃসংকোচে গ্রহণ করিয়া আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির কাজে লাগাইব।

"যে শিক্ষায় আত্মানুসন্ধানের আলো জ্বলে নাই সে শিক্ষা বা প্রতিষ্ঠান বাহির হইতে দেখিতে যতই সুন্দর হউক, তাহা ভ্রান্ত পথে চলিতেছে। বড় বড় বাড়ি কি মোটা মোটা টাকা থাকিলেও অধ্যাপক মিথ্যা শিক্ষাকে সত্য বলিয়া চালাইতে পারেন না। কিন্তু আজ যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহা তো বিস্তারই পণ্যের রূপে। এ একজাতীয় পেশাই চলিতেছে। ইহা বড় ভয়ানক কথা।...শিক্ষক, দেশবাসী ও শাসকবর্গ সকলের মনের পরিবর্তন হইলে তবে পুরানো তালিমের স্থানে নূতন তালিম আসিতে পারিবে, এবং তাহার বিকাশ হইবে। আজ সর্বত্র আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যাইতেছে, আমার আন্তরিক ইচ্ছা হইতেছে, যুগের অনুরূপ শিক্ষার পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

আমি চাই যে এই থলি পাওয়ার পর হইতে আমাদের প্রতিষ্ঠানের জীবনে সংযম ও স্বচ্ছতা বাড়ুক। আমাদের অপব্যয়ের পরিমাণ বাড়িলে নয়া তালিমেরই কলঙ্ক। এই টাকার থলির সদ্ব্যয় করিবার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠান লাভ করুক, ঈশ্বরের নিকট আমার ইহাই প্রার্থনা।

এখন আমার মনের সামনে না আছে লোক-ভারতী, না আছে দক্ষিণামূর্তি, অন্ততপক্ষে পক্ষিশাবক যেমন মায়ের পথের পানে তাকাইয়া থাকে, ক্ষুধার্ত গো-বৎস যেমন দুধের জন্য ব্যাকুল হয়, ঠিক তেমনই আমার মন এখন ঈশ্বর দর্শনের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। আপনাদের আশীর্বাদে আমি ভগবান দক্ষিণামূর্তিকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে যেন পারি, ইহাই আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইদিনব্যাপী সমাবর্তন উৎসবে আচার্যের ভাষণ ছাড়া ডক্টর নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত ও শ্রীগগনবিহারী লাল মেহতা উভয়েরই ভাষণ চিন্তাপূর্ণ ও মনোজ্ঞ হইয়াছিল। ডক্টর সিদ্ধান্ত সুনিপুণভাবে অথচ সহানুভূতির সহিত ছাত্রদের জীবনধারা পরিবর্তনের পথে যে সব বাধা আছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন। এ কাজ মামুলি নয়; বিশেষ পরিশ্রম করিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝাইয়া দিতে হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গগনবিহারীলাল মেহতা বিশেষ করিয়া শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের সম্মুখে এই প্রশ্নই আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাজে কর্মে, চিন্তায় ও ব্যবস্থাপনে ছাত্রের

অন্ন ও শিক্ষার জন্য বরাদ্দ কতটুকু ও কোথায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ছাত্রজীবনের সম্পর্ক অবশ্যই নূতন করিয়া দেখিতে হইবে। ছাত্রমঙ্গল চাই, না, নিজেদের মঙ্গল চাই, আর যদি বাস্তবিকই মঙ্গল চাই, তবে সে মঙ্গলের প্রকৃতি বা স্বরূপ কি, তাহাও অনুধাবন করিতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ঐতিহ্য এবং ক্রমবর্ধমান আয়তনের দিক ভাবিলে সমগ্র দেশের উপর ইহার প্রভাব ও জাতিগঠনে ইহার দান অস্বীকার করা যায় না, সুতরাং এই দুইটি বক্তৃতার পরিসর ও বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গী আমাদের সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকে আকৃষ্ট করিয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই। এগুলি বিশেষ করিয়া দেখিবার জন্য অনুরূপ সমাবর্তন ভাষণের সঙ্গে এই দুইটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়া উচিত।

আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষার স্থান

বর্তমান আইনসভার অধিবেশনের প্রারম্ভে রাজ্যপালের ভাষণে শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম এই :

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় সরকার শিক্ষার খাতের জন্য অধিকতর ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে এজন্য বরাদ্দ ছিল ২২·১৬ কোটি টাকা, এবার বরাদ্দ হইল ৪৮·৮৫ কোটি টাকা, এই ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হইল মুখ্যত এই যে—৬ হইতে ১১ বৎসর বয়সের রাজ্যের সকল শিশুকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দিতে হইবে, সেজন্য বেতন লওয়া চলিবে না। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের ব্যবস্থা বৃহৎ পরিমাণে করিতে হইতেছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ উচ্চ মানে উন্নীত করিয়া "হায়ার সেকেণ্ডারী" বিদ্যালয়ে পরিণত করা হইতেছে। গত বৎসর আরও তিনটি কলেজ খোলা হইয়াছে—পশ্চিমবঙ্গে কলেজের সংখ্যা এখন ১২৪। বর্ধমান ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় টেকনিক্যাল শিক্ষার উপর বেশি জোর দেওয়া হইতেছে। গত বৎসর দুর্গাপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও দুইটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও আটটি পলিটেকনিক স্থাপিত হইবে।

কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, এজন্য প্রস্তুতি কোথায়? উদ্যোগ বিনা সমস্ত পরিকল্পনাই বৃথা, টাকার পরিমাণ নিরর্থক, শুধু নিরর্থক নয়, দেশমধ্যে অপচয়ের প্রবৃত্তিই বাড়িয়া উঠিবে। অর্থব্যয় হউক, কিন্তু সদ্ব্যয় হউক, ইহাই কাম্য।

সেই যে আমার নানারঙের দিনগুলি

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য

৩

একটি ছেলেমানুষ মহাপুরুষের কাহিনী

কবিতার কথায় একটা স্মৃতি মনে পড়ে গেল,—যদিও এর সঙ্গে ছাত্র-জীবন বা পড়াশুনার কোনও সম্বন্ধ নেই, এজন্য আপনারা ক্ষমা করবেন। ৺দুর্গা-শঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয় (এঁর কথা আর একদিন বলবার ইচ্ছা আছে) ভূতত্ত্ব বিভাগে উচ্চ পদাধি-কারী ছিলেন। ইনি ছিলেন প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী, জলরঙের ছবিতে এঁর বেশজোড়া খ্যাতি ছিল। এঁর গুরু ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। গুরুকে ইনি যে রকম ভক্তি করতেন তা আজকার দিনে বর্ণনা করলে কেউ বিশ্বাস করবেন না। দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। একদিন তিনি অবনীন্দ্র সকাশে যাবেন। আমি তখন নিতান্ত বালক এবং বোঝবার মত বুদ্ধি শুদ্ধি পাকেনি। বাঙালীর ছেলে মায়ের পেট থেকে পড়েই কবি হয়, তারপর আমি ছিলাম একটু এঁচড়ে-পাকা ও রোম্যান্টিক প্রকৃতির। স্কুলপাঠ্য বইয়ে Tommy-son, Wordsworth-এর কবিতা এবং Legends of Greece and Rome প্রভৃতি বই পড়ে আমার কবিতা লেখবার সাধ গজিয়ে উঠল এবং কয়েকটি পদ্য লিখেও ফেললাম। (অন্নের সংস্থানের কৃপায় সেগুলোর পরলোকপ্রাপ্তি অনেক আগেই ঘটেছে।) যাহা করে নিজের হাতে একটা খাতা বেঁধে সেগুলো তাতে লিখে কেলে নাম দিয়েছিলাম "কনকাঞ্জলি"। দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয়ের কি খেয়াল হল, আমাকে বললেন, "আমি জোড়াসাঁকো যাচ্ছি, তুইও চল্না কেন?" আমি তো তৎক্ষণাৎ সেজেগুজে প্রস্তুত। পকেটে চুপিচুপি সেই "কনকাঞ্জলি" নিতেও ভুল হল না। সেখানে গিয়ে তো অবাক্। এই আমার জীবনে প্রথম জোড়াসাঁকো যাওয়া এবং প্রথম ও শেষ অবনীন্দ্রনাথকে এত কাছ থেকে পাওয়া। হল ঘরটার কত ছবি! আর কত লোক সেখানে—যাঁদের নাম করলে এখনও রোমাঞ্চ হয়! শ্রীনন্দলাল বসুকে সেই প্রথম দেখলাম। দুর্গাশঙ্কর বাবুর কৃপায় সেই বয়সেই ভাল ছবি অনেক দেখে ছিলাম, সুতরাং অত রঙ আর রূপের ঘটার ভাব উপেক্ষা করি কি করে? ছবি দেখে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ দুর্গাশঙ্কর বাবুর আহ্বানে ভিতরের দিকে, অর্থাৎ অতি প্রসিদ্ধ দক্ষিণের বারাণ্ডায় গেলাম। সারি সারি ইজি চেয়ার, যতদূর মনে পড়ছে প্রথমটাতে গগনেন্দ্র-নাথ, পরেরটায় অবনীন্দ্রনাথ। উত্তেজনায় মুখ চোখ রাঙা, কানের মধ্যে সোঁ-সোঁ আওয়াজ হচ্ছে। কোথায় কি আছে ভাল করে লক্ষ্যই করিনি। শুধু তাঁর পাশে ছবি আঁকবার সরঞ্জাম একটা বাক্স মত, ডালা খোলা, তাতে কি সব টুকি-টাকি। পায়ের কাছে একটা মোড়া বা ঐ জাতীয় কিছুতে বসে দুর্গাশঙ্কর বাবু কথা বলছেন। চাকর এসে প্রত্যেককে এক গ্লাস করে সরবৎ দিয়ে গেল, তার পর পান, তারপর তামাক। তিনি গড়গড়া টানতে সুরু করলেন। আমার পরিচয় পেয়ে স্নেহভরে বাঁ হাত দিয়ে একটু জড়িয়ে ধরলেন। তারপর দুজনের কথা চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে দুর্গাশঙ্কর বাবু আর কারুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হলঘরে চলে এলেন। সেখানে আর কেউ নেই, শুধু অবনীন্দ্র-নাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছাড়া, এই সুযোগ। বুক তখন দুরু-দুরু করছে। পকেট থেকে টুপ করে খাতাটা বের করেই "আমি কবিতা লিখি, আপনাকে দেখাতে

এসেছি" বলে ওঁর হাতে দিলাম। প্রসন্ন হাস্যে "ও, তুমিও পদ্য লেখো" বলে দু'এক পাতা পড়ে (তাগ্যিস্, পাতাগুলো ছোট, এবং আমার হাতের লেখা বড় সাইজের ছিল) "রোসো, রোসো, আমি কাল একটা পদ্য লিখেছি, শোনো, শোনো," বলে একটা কাগজ কোথেকে বের করে পড়তে সুরু করলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কবিতাটা আজ আর মনে পড়ছে না, কি বিষয়ে। শুধু মনে আছে, খুব বড় ছিল না সেটা, আর একটা বটগাছ ও মাঠের একটু বর্ণনা ছিল। আমার তথাকথিত কবিতা পড়ে আমাকে ওঁর লেখা কবিতা শোনানো, এ বোধ হয় করছে।

অবনীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব ছিল। মনে আছে, আমাকে অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র এর পরে খুব আদর করেছিলেন। কিন্তু পরে যখন দুর্গাশঙ্কর বাবুর কাছে এই ঘটনার কথা বলি, অবনীন্দ্রনাথকে বিরক্ত করবার মত দুঃসাহস দেখানোর জন্য ওঁর কাছ থেকে প্রচণ্ড তৎর্সনা লাভ করেছিলাম। তাতে কি? দুঃসাহসের পুরস্কার তো হাতে হাতেই পেয়ে গিয়েছিলাম, আর তাতেই শিশু-মন ভরে গিয়েছিল। প্রায় চল্লিশ বছরের কথা, কিন্তু স্মৃতির বলিরেখায় সে স্মৃতি আজও জল জল

ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকের ডায়েরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

হেইস্তানিয়োসি স্কুলডিভিশনে নয় বৎসরের আবশ্যিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে। অন্যান্য ডিভিশনে পূর্বের মত সাত বৎসর ও আনুষঙ্গিক এক বৎসর (Continuation School class) এখনও চলিতেছে। নেদেরকালিক্স্ ডিভিশনে নয় বৎসরের আবশ্যিক শিক্ষার জন্য স্কুলবাড়ী তৈরি হইতে দেখিয়াছি। আধুনিক বিদ্যালয়ের প্রাসাদসম অট্টালিকা ও ব্যবস্থাদি না দেখিলে বিশ্বাস করাই আমার পক্ষেও কঠিন হইত, কিন্তু জাতীয় সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। কারণ সুশিক্ষিত নাগরিকের উপর জাতীয় সমৃদ্ধি যে কি পরিমাণ নির্ভর করে, তাহা সুইডরা অন্তিমতা দ্বারা অনুভব করিয়াছে।

সুইডেনের আবশ্যিক শিক্ষার আর একটা দিক আছে। যে সকল ছেলেমেয়ে পড়াশোনায় পিছাইয়া থাকে, তাহাদের জন্য পৃথক ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। এই ক্লাসগুলিকে সুইডিশ ভাষায় Help class বলা হয়। হেইস্তানিয়োসি স্কুল-ডিভিশনে দুইটি Help class-এর ব্যবস্থা দেখিয়াছি। ওভারটরনেরো ডিভিশনে দুইটি, কয় পিলোয়পলো ডিভিশনে একটি, পায়ালা ডিভিশনে তিনটি, টেরেন্দো ডিভিশনে একটি, ঘোসসুয়াম্বো ডিভিশনে দুইটি এবং নেদেরকালিক্স ডিভিশনে দুইটি Help class-এর বিশেষ ব্যবস্থা আছে। আবশ্যিক বিদ্যালয়ে ন্যূনতম যতটুকু জ্ঞানলাভ করা উচিত, ততটুকু সকলকে দিবার জন্যই এইসকল ব্যবস্থা।

গৃহবিজ্ঞান :—

এসব দেশের আবশ্যিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় গৃহবিজ্ঞান শিখাইবার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। রান্নাবান্নার কাজ, কাপড় ধোয়া

ইত্যাদিকে পৃথক বিষয় বলিয়া বিবেচনা করা হয়, সূতের কাজ ও জামা তৈরীর কাজ আলাদা শিক্ষণীয়। সতরঞ্জ মজাইটি মেয়ে গৃহবিজ্ঞান শেখে; আজকাল অনেক ছেলেও গৃহবিজ্ঞান শিখিবার আগ্রহ দেখাইতেছে। প্রতি সপ্তাহে পাঁচ ঘণ্টা গৃহকর্ম শেখান হয়, আর এক ঘণ্টা গৃহ-বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক জ্ঞান দেওয়া হয়। হাতে কলমে গৃহকর্ম শিখাইবার উদ্দেশ্য এই যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে ঘর গুছাইয়া থাকার অভ্যাস ইহার ফলে জন্মে, অপচয় ও অপব্যয় সম্পর্কে চিত্ত সজাগ হয় এবং মনোরম গৃহপরিবেশ সৃষ্টির কাজে একটা বোধ জন্মে।

গৃহকর্ম সাধারণত ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম বর্ষে আনুষঙ্গিক ক্লাশে শেখান হয়। মেল সাহেবের (Mr. W. Snell) সঙ্গে নরওয়ে ঘুরিবার সময় মার্চ মাসের ১০ তারিখ কয়িবুক্লিয়া (Koivuklya) নামক স্কুলে গিয়াছিলাম। তখন ছেলেরা রান্নার কাজ করিতেছিল। রান্নার শিক্ষক আমাদিগকে আহারে আমন্ত্রণ করেন। ছেলেরা রান্না শেষ করিয়া টেবিল সাজাইল এবং নিজেরাই খাদ্য পরিবেশন করিল। খাওয়ার পর বাসন ধোয়া, ঘর পরিষ্কার করিল। সুইডেনে জীবিকার মান এত উন্নত যে আজকাল কেহ ঘরে চাকর রাখিবার চিন্তা করে না, সুইডেনে চাকর শব্দ কেহ ব্যবহার করে না, চাকরকে সাহায্যকারী বলা হয়। সাহায্য-কারীর মাসিক মাহিনা শিক্ষকের মাহিনার প্রায় সমান। সেজন্য গৃহ-বিজ্ঞান ছেলেমেয়ে উভয়ই যত্ন সহকারে শেখে। ভারতবর্ষের আবাসিক বিদ্যালয় জীবনের অভিজ্ঞতা আমার আছে; আমি জানি, প্রতিষ্ঠানিক জীবনে খাবার ব্যাপারে আমরা চিরকালই ঠাকুরচাকরের উপর নির্ভরশীল, ঘরে মা, বোন বা স্ত্রীর উপর নির্ভর করি। এই নির্ভরশীলতা আমাদের জীবনকে পঙ্গু করিয়া রাখে, গৃহস্থের পরিচালনা আমাদের দেশে বড় সমস্যা। বিশেষ, আধুনিক ভারতবর্ষে এখন আমাদের ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই গৃহস্থালীর কাজ ভাল করিয়া শেখান উচিত বলে করি, জাতীয় অপচয় বন্ধ করিবার জন্যও ইহা প্রয়োজন।

গৃহ-বিজ্ঞান কোর্সের শিক্ষণীয় বিষয় এইরূপ :—(১) খাদ্য ও পুষ্টি (Food and nutrition), (২) গৃহ-পরিচর্যা (care of the home), (৩) রুটি তৈরি (Baking), (৪) খাদ্য সংরক্ষণ (Food preservation), (৫) কাপড় ধোয়া ও ইস্ত্রি করা ও (৬) গৃহ-পরিচালনা (House-wifery)।

হাতে-কলমে উক্ত বিষয়গুলি শেখানোর সঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞান দেওয়া হয় :—(১) স্বাস্থ্যের পরিপোষক খাদ্য (balanced diet), (২) বাজার করা (economic buying), (৩) মনোরম ও কার্যকরী গৃহব্যবস্থা (a cosy, beautiful and practical home), (৪) গৃহ-সরঞ্জামের দাম সম্পর্কে উত্তম জ্ঞান (a good knowledge of the cost of home equipments), (৫) গৃহ-পরিচালনার জ্ঞান (knowledge of home management)। উৎকৃষ্ট গৃহীর কর্তব্য সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান দিবার জন্য এই শিক্ষাব্যবস্থা।

শিশুর যত্ন

উক্ত বিষয়ের আর একটি বিশেষ অঙ্গ শিশুর যত্ন-পরিচর্যা; আবশ্যিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের চিত্তকে এ বিষয়ে সজাগ করিয়া দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য।

সেলাইয়ের কাজ

ইহা বিদ্যালয়ের আবশ্যিক নয় কিন্তু সকল বিদ্যালয়েই সেলাইয়ের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা আছে এবং অনেকেই শেখে। প্রথম দুই শ্রেণীতে সপ্তাহে দুই পিরিয়ড শেখান হয়, অন্যান্য ক্লাশে সপ্তাহে চার পিরিয়ড শেখান হয়। শিশুপরিচর্যা, সেলাই, উলের জামা বোনা, এমব্রয়ডারি, এই শিক্ষার

অঙ্ক। শেষ বর্ষে এই ক্লাশে যন্ত্র ও উপাদানের দাম সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া হয়। এই সকল কাজ শিখা দেওয়ার উদ্দেশ্য—যেন সকলেই নিজের জামাকাপড়ের যন্ত্র লইতে পারে, প্রয়োজনমত ঘরে নিজের পোষাক তৈরী করিতে পারে; ইহার সঙ্গে দুরুটি জন্মে, আত্মনির্ভরশীলতা বাড়ে। গৃহবিজ্ঞান ও সেলাইয়ের কাজ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও শেখান হয়।

অপেক্ষাকৃত ঘনবসতি অঞ্চলের আবশ্যিক বিদ্যালয়

এখানে ভ্যারমল্যাণ্ড প্রদেশের আবশ্যিক বিদ্যালয়ের বর্ণনা দিতেছি। ভ্যারল্যাণ্ড মধ্য সুইডেনের একটি প্রসিদ্ধ অঞ্চল। এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য বনবন ও হ্রদ। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকা সেলমালাগেরলফ এবং অতীতের অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক, আর্টিষ্ট, বৈজ্ঞানিক, গায়ক এই অঞ্চলের শিক্ষক। এক সময়ে আমি এই অঞ্চলে দীর্ঘকাল কাটাইয়াছিলাম। কার্লস্টাড (Karlstad) সহর কেন্দ্র করিয়া আমি এ অঞ্চলের একটি ডিভিশনের স্কুল পরিদর্শন করিয়াছি। এই ডিভিশনে ১৪৭টি আবশ্যিক বিদ্যালয় আছে; শিক্ষক-সংখ্যা ৪৮১ আর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১১০৪৪ (৩০শে জুন, ১৯৫২ সনে)। ভ্যারল্যাণ্ডে সাকুল্যে সতেরটি স্কুল ডিভিশন। প্রত্যেক ডিভিশনে একজন করিয়া স্কুলের ডাক্তার আছেন। সতেরটি স্কুল ডিভিশনের অধীনস্থ ৭,৪৫৯ ছাত্রছাত্রীকে বিদ্যালয়ে খাবার পরিবেশন করা হয় এবং এই বাবদে প্রতিবৎসরে ১৮৭, ৩৯১ ক্রাউন (এক ক্রাউন এক টাকার সমান) ব্যয় হয়, অর্থাৎ মাথা পিছু ৩৯২ ক্রাউন (৩২ নয়া পয়সার সমান) খরচ পড়ে। ব্যয়সংক্ষেপের জন্য এই অঞ্চলে সেন্ট্রাল রান্নার ব্যবস্থা আছে। মুনকফোর্স (munkfors) নামক গ্রামে একটি সেন্ট্রাল রান্নার ব্যবস্থা দেখিয়াছি। সেখান হইতে রেলগাড়ী বা মোটরগাড়ী করিয়া পাকখাদ্য বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠানো হইয়া থাকে। এ অঞ্চলে বিদ্যালয় হইতে আড়াই কিলোমিটার দূরের প্রথম তিন শ্রেণীর অর্থাৎ আট, নয় ও দশ বৎসরের ছাত্র ছাত্রীকে বিদ্যালয় পৌঁছাইয়া এবং বাড়ীতে ফিরাইয়া দিবার জন্য স্কুলবাস আছে। গতবৎসর অর্থাৎ ১৯৫২ সালে ১৮২৩টি ছেলে মেয়েকে এভাবে গাড়ী করিয়া বিদ্যালয়ে আনিতে ও বাড়ী পৌঁছাইতে হইয়াছিল।

আবশ্যিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ

সুইডেনের একাধিক শিক্ষকশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের বা কলেজের পরিচালনা পদ্ধতি লক্ষ্য করিয়াছি। আবশ্যিক বিদ্যালয়ে দুই শ্রেণীর শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আছেন। যে সকল শিক্ষক প্রথম দুই তিনটি ক্লাশের শিক্ষকতা করেন, তাঁহারা জুনিয়ার ট্রেনিং কলেজে শিক্ষা লইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের প্রায় সকলেই মহিলা। শিশুশিক্ষায় পক্ষে শিক্ষয়িত্রীই বিশেষ কার্যকরী এরূপ অনেকে মনে করেন। এসম্পর্কে দেশের শিক্ষা-সম্পর্কীয় কাগজে অনেক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। কোন কোন শিক্ষাবিদ মনে করেন যে বিবাহিতা শিক্ষয়িত্রী শিশু-শিক্ষায় পক্ষে সর্বোত্তম, কিন্তু কার্যত এই নীতির অনুসরণ সম্ভব নয়।

উর্ধ্বতন ক্লাশের শিক্ষকগণের প্রস্তুতির জন্য সিনিয়র ট্রেনিং কলেজ আছে। জুনিয়র ট্রেনিং কলেজ দেশে দশটি আছে, এবং প্রতি বৎসর মোটামুটি শিক্ষকশিক্ষয়িত্রী ট্রেনিং কলেজের শিক্ষা লইয়া থাকেন।

রাষ্ট্রপরিচালিত সিনিয়র ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা দেশে উনিশটি। তন্মধ্যে ছয়টি কলেজ শুধু পুরুষদের জন্য, পাঁচটি শুধু মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট। বাকী ট্রেনিং কলেজে পুরুষ নারী উভয়েই শিক্ষা লইয়া থাকেন।

শিক্ষাদান অনুশীলনের জন্য পূর্বে ট্রেনিং

* ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে নির্দিষ্ট।

কলেজের সংলগ্ন বিদ্যালয় থাকিত, কিন্তু আজ কাল নিকটস্থ যে কোন বিদ্যালয়ে অনুশীলন-ক্লাশ চলিতেছে।

অভিভাবক ও শিক্ষকসঙ্ঘ

বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গৃহের শিক্ষা যাহাতে একযোগে বিদ্যার্থীর জীবনবিকাশের সহায়ক হয় সেজন্য এই সঙ্ঘের জন্ম। এই সঙ্ঘ দুই প্রকারের :— একটি জাতীয় সংস্থা অপরটি স্থানীয় সংস্থা। কোন বিদ্যালয়ে "অভিভাবক ও শিক্ষকসঙ্ঘ" স্থাপন করিতে হইলে "জাতীয় সংস্থা" পরামর্শ ও সাহায্য দান করেন। জাতীয় সংস্থাটির সুইডিশ নাম Malemsnnes Riksforbund জাতীয় সংস্থাটি বহু প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয়ে সাহিত্য রচনা করিয়া প্রচার করিয়া থাকেন।

স্থানীয় সংস্থার উদ্যোগে অভিভাবকগণ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন, ক্লাশের পড়া লক্ষ্য করেন। শিক্ষকগণও অভিভাবকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগ রক্ষা করেন এবং ছাত্রছাত্রীর বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। আবশ্যিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণতর রূপ দিবার জন্যই এদেশে এসকল ব্যবস্থা। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ডেনমার্কের প্রধান শহর কোপেনহেগেনের একটি বিদ্যালয়ে এই সম্পর্কে বিশেষ পরীক্ষামূলক কাজ হইয়াছে ; পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

যে সকল বিদ্যালয়ে এই সঙ্ঘ নাই, সেই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও অভিভাবকদিগকে ক্লাশের পড়া লক্ষ্য করিবার জন্য বৎসরে একাধিকবার আমন্ত্রণ করেন, এবং সামাজিক যোগ রক্ষা করেন। অভিভাবকগণ সাধারণতঃ প্রথম তিনটি ক্লাশের পড়াশোনা লক্ষ্য করিতে আসেন।

১৯৫০ সালের আবশ্যিক শিক্ষা সংস্কার

বর্তমানে সুইডেনের আবশ্যিক শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি এবং ১৯৫০ সালের শিক্ষাসংস্কার সম্পর্কেও অল্প স্বল্প ধারণা দিতে প্রচেষ্টা করিয়াছি। নয় বৎসরের আবশ্যিক ব্যাপক শিক্ষার স্কিমটি সুদীর্ঘকাল অনুসন্ধানের ফলে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। দেশের শিক্ষাবিদ, সমাজবিদ, সমাজসেবী, স্বাস্থ্য-বিশারদ, রাজনৈতিক দল সমূহের প্রতিনিধি, শ্রমিক দলের প্রধান প্রভৃতি সমাজের সকল স্তরের বিশেষজ্ঞগণের দশ বৎসরের সমবেত অনুসন্ধান ও শ্রমের ফলে এই স্কিমটি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। পূর্বেকার বিভিন্ন ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার বিষয় সমূহ এই নূতন স্কিমের অঙ্গ হইয়াছে। ব্যাপক জাতীয় আবশ্যিক শিক্ষার স্কিমটি তিন ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক বিভাগে তিনটি করিয়া শ্রেণী। প্রথম ভাগে স্নাতকের ট্রেনিং পাশ করা শিক্ষকগণ শিক্ষকতা করেন। দ্বিতীয় ভাগে সিনিয়র ট্রেনিং পাশ শিক্ষকগণ শিক্ষা দিয়া থাকেন। আর তৃতীয় ভাগে প্রত্যেক বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষক থাকেন।

আবশ্যিক বিদ্যালয়ে বিদেশী ভাষা শিক্ষা

রিফর্ম বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়। জার্মান ভাষা সপ্তম শ্রেণীতে এবং ফরাসী ভাষা নবম শ্রেণীতে শেখান হয়। ইংরাজী, জার্মান ও ফরাসী ভাষা ইউরোপের প্রধান তিনটি ভাষা। যুদ্ধের পূর্বে প্রথমে জার্মেন ভাষা শিখান হইত। আবশ্যিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া উচ্চতর যে কোন লাইনে শিক্ষা লইতে গেলে এই সকল ভাষা জানের প্রয়োজন আছে মনে করিয়াই আবশ্যিক বিদ্যালয়ে বিদেশী ভাষা শিক্ষার এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আবশ্যিক শিক্ষা ও পেশা নির্বাচন

রিফর্ম স্কুলে পরবর্তী জীবনের পেশা নির্বাচন ও পেশা-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পেশা-শিক্ষা নবম বর্ষে দেওয়া হয়। পূর্বে ট্রেড স্কুলে যে সকল বিষয় শেখান হইত এখন তাহা আবশ্যিক শিক্ষার অঙ্গ হইয়াছে এবং রুচিভেদে বিভিন্ন রকমের পেশা

শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। Sodertalji নামক নয় বৎসরের স্কুলে পেশা শিক্ষার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

আবশ্যিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে আবশ্যিক শিক্ষার পূর্ণ সঙ্গতি রাখা হইয়াছে। পূর্বে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, টেকনিক্যাল স্কুলে যে সকল বিষয় শেখান হইত, এখন তাহা নয় বৎসরের আবশ্যিক শিক্ষার অঙ্গ হইয়াছে, ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার যান বাড়াইবার পথ প্রশস্ততর হইয়াছে। এই মূল নিকর্ষে শিল্পবাণিজ্যিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে; জাতির স্বাস্থ্যোন্নতিই ইহার লক্ষ্য।

ব্যাপক আবশ্যিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

দেশের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে নিজ নিজ রুচি ও প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষা পাইয়া যাহাতে সমাজের উত্তম নাগরিক হইতে পারে এবং আবশ্যিক শিক্ষার পর যাহাতে সুপরিকল্পিত পথে নিজের নিজের জীবনের বিকাশের পথ পায় সেই উদ্দেশ্যেই ১৯৫০ সালের নিকর্ষ স্থির রচনা করা হইয়াছে। এই স্থিরে সমাজবিজ্ঞানকে বিশেষ স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং প্রত্যেক স্কুলেই অতিরিক্ত সমাজ কর্মি-শিক্ষক রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। মূল স্থিরটি পড়িলে মনে হয়, উন্নততর ডেমক্রেটিক সমাজ গঠন ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই স্থিরে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যয়ভার হইতে অভিভাবককে যথাসম্ভব মুক্ত করা হইয়াছে এবং সেইজন্য ট্রি-শিপ ও স্কলার-শিপের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে; আবশ্যিক শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যয় রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছেন। একজন সরকারী রাষ্ট্রদূত দীর্ঘকাল সুইডেনে ছিলেন। তিনি (Serge de chessin) সুইডেনের শিক্ষানীতি ও সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে "The key to Sweden" নামক একখানা মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, আর সেই দেশের আবশ্যিক শিক্ষা সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—"The elementary instruction is not a uniform and rigid mould where one imprisons life with decrees. On the contrary, it absorbs with an astonishing pliability all the diversity of local conditions ;—it moves at ease in the pedagogical palaces just as it accomodates itself to the tent of the lappo and adjusts itself to the wandering of the reindeer. Instead of levelling the pupils under a steam roller, the Swedish school takes into account the individuality of the children, their degree of ability and their material situation. Backward children are the object of special care in "auxiliary" classes, and needy children are the object of measures destined to remedy the effect of social inequality." —"One of the most interesting results of this plasticity of the primary education consists in admitting advanced stages where it loses its elementary character and assumes that of a highly popularized general instruction."—"The legislators prudently prevent children from obtaining work too young; and spare them on the threshold of life the trials and the deception of unemployment. Those who want to take up deeper studies have the right—instead of going to the school of improvement—to choose either the upper sections of primary schools or the higher primary schools with their three divisions—technical, commercial and rural."

গ্রন্থকারের এই বইখানা প্রকাশের পর সুইডেনে নয় বৎসরের আবশ্যিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষকে সত্যিকার ডেমোক্রেটিক দেশে পরিণত করিতে হইলে উপযুক্ত আবশ্যিক শিক্ষা পদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে হইবে, সমাজের সকল স্তরের ছেলেমেয়ের শিক্ষায় ও দীক্ষিকার সুযোগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ডেমোক্রেটিক স্বাধীন দেশে ডেমোক্রেসির ট্রেডিশন গড়িয়া উঠিয়াছে; সেজন্য সেই সকল দেশের পক্ষে শিক্ষার উন্নতির জন্য যাহা করা সম্ভব তাহা হয়ত আমাদের পক্ষে সম্ভব নাও হইতে পারে, আর পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণও বাঞ্ছনীয় নয়। আবশ্যিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে দ্বিধাহীন হইয়া আমাদের স্বকীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই নূতন শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

ছাত্রজীবনে স্বায়ত্ত শাসন

শ্রীনীহারিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যালয়ের পাঠ্যবস্তু শিক্ষার ফাঁকে ফাঁকে ছাত্রছাত্রীদের দলবদ্ধ ভাবে কাজ করিতে উদ্বুদ্ধ করা যায়, এবং তদ্দ্বারা সুশৃঙ্খলে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে স্ব স্ব শ্রেণীর কাজ, বিদ্যালয়ের কাজ আদর্শ-যোগ্য রূপে তাহারা সম্পাদন করিতে উদ্বুদ্ধ হয়। পরে ভবিষ্যৎ জীবনে তাহারাই দেশের, সমাজের ও জাতির মঙ্গলে সংগঠিত হইয়া নিয়োজিত হইতে পারে।

আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিকগণের মতে শিশুকে শিক্ষিত করিয়া গড়িয়া তোলার অর্থ, শিশুর স্বাধীন কর্মের মাধ্যমে তাহার অন্তর্নিহিত সুপ্তশক্তির বিকাশ সাধন করা। আবার দেখিতে হইবে, তাহার এই অবাধ স্বাধীনতা যেন উচ্ছৃঙ্খলতা বা স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত না হয়। তাহার ইচ্ছামত কাজের মাধ্যমেই সে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া যাহাতে সদভ্যাস গঠন করিতে পারে সেদিকে সযত্ন, সজাগ দৃষ্টি রাখিবার দায়িত্ব শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের।

ছোট ছোট শিশুদের ন্যায়-অন্যায় সত্যমিথ্যার জ্ঞান প্রায়ই থাকেনা। কাজেই তাহারা তাহাদের স্বাধীন কর্মে যাহাতে ন্যায় ও সত্য পথ অবলম্বন করিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শিশুকে এই নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিতই একমাত্র এবং একান্ত কার্যকরী। তাঁহারা এমন ইঙ্গিত বা আদেশ করিবেন যাহাতে কোনরূপ দ্বিধা বা সন্দেহ না থাকে, অর্থাৎ সেই ইঙ্গিত বা আদেশ হইবে সুস্পষ্ট। একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে শিশু-মনের উপর আদেশের পুনরাবৃত্তি বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। একবার একটি আদেশই যথেষ্ট, যদি তাহা হয় সুনির্দিষ্ট।

শিশুদের আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি অত্যন্ত সজাগ। তাহারা সর্বদা নিজেদের ইচ্ছায় নিজেদের চেষ্টায় নানারকম কাজ করিতে ভালবাসে। বার বার নিষেধাত্মক আদেশ দিলে তাহাদের নিজস্ব স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় এবং ক্রমশ নিজেদের উপর আস্থা বা বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। শিশুর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া তাহার শিক্ষাকার্যে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব, কিন্তু তাহার স্বাধীন মনোবৃত্তিকে দমন করিয়া দিলে সেক্ষেত্রে সফলতা লাভ প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমে ও সুযোগে তাহাদিগকে স্বায়ত্ত শাসন শিক্ষা দেওয়া খুবই সহজসাধ্য ও সুফলপ্রসূ। ইহা ভবিষ্যৎ জীবনে দেশের

পার্লামেন্টারী ব্যবস্থায় তাহাদের দায়িত্ব শিখাইবে, তাহাদের কর্মে অভিজ্ঞতা আনিয়া দিবে, ও চিন্তা-ধারার উন্মেষ করিয়া দেশ ও জাতির পক্ষে কল্যাণ দায়করূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে তাহাদিগকে সাহায্য করিবে। বিদ্যালয়ের আইন ও শৃঙ্খলা নিজে মানিয়া চলা এবং অন্যকেও মানিয়া চলিতে পরোক্ষভাবে সাহায্য করা, প্রত্যক্ষ সহযোগিতার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া তাহাই House System হইতে Parliamentary System-এ রূপান্তরিত করিয়া শিশুকে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে।

সুতরাং স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের গঠিত স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা এবং তদনুপাতিক Parliament থাকা খুবই উপযোগী হয়। যে সকল ছাত্রছাত্রীগণ এই সব স্বায়ত্তশাসন কর্মে অংশগ্রহণ করে এবং লিপ্ত থাকে তাহারা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজগুলি সম্পর্কে সুবিধা অসুবিধা বুঝিতে পারে এবং শিক্ষকশিক্ষিকা-দের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়। এই ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের শাসনশৃঙ্খলা বজায় রাখিতে এবং আসবাবপত্র রক্ষা করার বিষয়ে খুবই সহায়তা করে। বিদ্যালয়কে তাহারা নিজেদের বলিয়া ভাবিতে শেখে এবং বিদ্যালয়ের জিনিসপত্রের যাহাতে অপব্যবহার না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখে।

বিদ্যালয়ের এই স্বায়ত্তশাসন পরিচালন ব্যবস্থায় নির্বাচিত সদস্য, মন্ত্রী, প্রধান মন্ত্রী, স্পীকার, বিচারক এবং সর্বোপরি প্রেসিডেন্ট বা রাজা থাকিবেন। সদস্যবৃন্দ, মন্ত্রীগণ, এবং স্পীকার, ছাত্রগণের মধ্য হইতে ছাত্রগণই ভোটের দ্বারা নির্বাচিত করিবে। পদাধিকার বলে শ্রেণী শিক্ষকেরাই বিচারক হইবেন, এবং প্রধান বিচারক বা প্রেসিডেন্ট অথবা রাজা থাকিবেন প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষিকা।

শৃঙ্খলা-মন্ত্রীর উপর ছাত্রছাত্রীগণের শাসনভার থাকিবে, এবং তাঁহাদিগকে শৃঙ্খলা-মন্ত্রীর আদেশ মানিয়া চলিতে হইবে। একগুঁয়ে, উচ্ছৃঙ্খল, কুস্বভাবের, বোকা অবাধ্য শিশুকে শৃঙ্খলা-মন্ত্রী শাসন করিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাকে সাময়িক ভাবে একঘরে করিয়া রাখা হইবে। শৃঙ্খলা-মন্ত্রীর নির্দেশ সকল ছাত্রছাত্রীগণকেই মানিয়া চলিতে হইবে এবং সহায়তা করিতে হইবে। তাহাতে অন্তে যাহাতে জানে তাহাও দেখিতে ঐরূপ স্বভাবের শিশু অতি অল্পকাল মধ্যেই সংশোধিত হইয়া যাইবে। আরও বহুপ্রকারের শাসন পরিকল্পনা উদ্ভাবন করিয়া অপরাধবিশেষে উপযুক্ত ও যোগ্য শাসন মৃদু বা কঠিন আকারে প্রয়োগ দ্বারা অবাধ্য শিশুকে সংশোধন করা চলে। একজন শিশু হয়তো শ্রেণীর কাজ করিবে না বলিয়া বসিয়া রহিল। তখন তাহাকে দূরে পৃথক করিয়া দিয়া তাহার প্রতি শ্রেণীর অন্যান্য ছাত্রগণ উদাসীন ভাব দেখাইবে। তখন তাহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিবে এবং সকলের সহিত সহজভাবে মিশিবার আকাঙ্ক্ষায় নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কাজ করিতে আগ্রহান্বিত হইবে।

কাগজ ছিঁড়িয়া, থুথু ছিটাইয়া, সুন্দর বোকা করার স্বভাব অনেকেরই থাকে। এই সব পরিদর্শনের ভার থাকিবে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উপর। ছোঁয়াচে রোগ লইয়া কেহ স্কুলে আসিতে পারিবে না, সেদিকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিদ্যালয়প্রাঙ্গণ, শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা বিষয়ে ছাত্রগণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা ইত্যাদি বহু প্রকারের কাজ তাহাকেই করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্র হইতে প্রতিটি শ্রেণীকক্ষ, সমুদয় বিদ্যালয়টির পরিবেশ রক্ষায় তাহাকে যত্ন লইতে হইবে।

আইন-মন্ত্রী, খেলাধূলার মন্ত্রী, আরও যে সকল বিষয়ে প্রয়োজন সেই সকল বিষয়ে মন্ত্রী নির্বাচন করিয়া উক্ত বিষয়ের ভার তাহাদের উপর অর্পণ করিতে হইবে।

মন্ত্রীদের কর্তব্য ও কাজ সম্বন্ধে নির্দেশ দান

এবং তাহাদের কাজে সমালোচনা করিবার জন্য থাকিবেন একজন Speaker বা সভাপতি। এই সভাপতি ছাত্রগণের মধ্য হইতে অথবা শিক্ষকগণের মধ্য হইতেও, অধিকসংখ্যক ছাত্রছাত্রীগণের আস্থাভাজন কাহাকেও নিযুক্ত করা সমীচীন। কিন্তু এই Speaker বা বক্তার উপস্থিতি যেন ছাত্রছাত্রীগণের স্বাধীন মতপ্রকাশে কোনরূপ বাধার কারণ না হয় সেদিকে স্পীকারকে সহানুভূতিমাখা দরদের পরিচয় দিতে হইবে।

ছাত্রছাত্রীগণ সরাসরি ভাবে কখনও তাহাদের অভিভাবকের নিকট অথবা প্রধান শিক্ষকশিক্ষিকার নিকট কোন নালিশ করিতে পারিবে না। নিয়মতান্ত্রিক ভাবে অগ্রসর হইবার শিক্ষা তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। স্কুল পার্লামেন্ট ব্যক্তিত্ব প্রকাশের স্থান। মন্ত্রী ও তাহাদের সহকর্মীদের উপর ইহার সফলতা নির্ভর করে। যদি মন্ত্রীগণ তাহাদের কর্তব্যে অবহেলা করে তাহাদিগকে পদচ্যুত করা এবং নূতন মন্ত্রী নির্বাচন করা চলিবে। যে সকল ছাত্রছাত্রী এইরূপভাবে সংঘত বিদ্যালয় হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় বাস্তবিক পক্ষে তাহারা সুনাগরিকতার শিক্ষাই লাভ করিয়া থাকে। ভবিষ্যতের রাজনীতিজ্ঞ, শাসনকর্তা এবং ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক দায়িত্বসম্পন্ন নাগরিক এদের ক্ষেত্র হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে।

স্কুল পার্লামেন্ট গঠনের মাধ্যমেই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় পার্লামেন্ট গঠনের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে ও শিক্ষালাভ করিতে সক্ষম হয়। নাগরিক হিসাবে তাহাদের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধেও সম্যক ধারণা লাভ করিতে পারে।

স্কুল পার্লামেন্টে শুধু একটি হাউসই থাকিবে। সমস্ত বিদ্যালয়ের সমগ্র ছাত্রগণের মধ্যে শতকরা ৫ বা ৬ জন সদস্য লইয়া পার্লামেন্ট গঠিত হইবে। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক বিভাগ বা শাখা শ্রেণী হইতেই সদস্য নির্বাচন করিতে হইবে। নিম্ন নিম্ন শ্রেণীর সদস্যগণ আবার শ্রেণী পঞ্চায়েৎ গঠন করিতে পারে। যে সব বিদ্যালয়ে সহশিক্ষা প্রচলিত আছে তথায় মেয়ে ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা থাকিবে কিন্তু কোনরূপ জাতিগত, শ্রেণীগত কিংবা প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় থাকিবে না।

ভারতের আইন সভার পাঁচ বৎসর অন্তর নির্বাচন হওয়া ভাল। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীরেই পূর্ণ স্বাধীনভাবে ভোট দিবার ক্ষমতা থাকিবে। এইরূপ ভোটদানের মধ্য দিয়া ছাত্রছাত্রীগণ ভবিষ্যৎ আইনসভা, মিউনিসিপ্যালিটির ভোটদান সম্পর্কে ধারণা সঞ্চয় করিতে পারিবে। ভোটদানের ব্যবস্থা ব্যালট রীতিতে হইলে জ্ঞানের প্রসারতা আরও বৃদ্ধি পাইতে পারিবে।

শাসন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে একজন ছাত্র বিচারক নিযুক্ত থাকিবে। বিশেষ বিশেষ অপরাধের বিচারে 'জুরি' পদ্ধতিও অবলম্বন করা চলিতে পারিবে। যদি কোন ছাত্র বিচারক লঘু অপরাধে গুরুতর শাস্তি বিধান করে তবে তাহা Supreme Court এ পেশ করা চলিবে। তাহাই হইবে জুরির বিচার। হেড্-মাষ্টার বা হেড মিষ্ট্রেস সকল ক্ষেত্রেই প্রেসিডেন্ট বা রাজার ক্ষমতার অধিকারী থাকিবেন। যখন তখন তাঁহার নিকট যে কোন বিচারের জন্য যাওয়া চলিবে না। তাঁহার ক্ষমতাও প্রেসিডেন্ট বা রাজার মতই সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। তিনিও প্রত্যেক বিষয়ে ছাত্রদের স্বাধীন শুভ প্রচেষ্টার মধ্যে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগে বিরত থাকিবেন। শুধু বিশেষ অবস্থাতেই তিনি 'ভেটো' প্রয়োগ করিতে পারিবেন। কোন বিচারের ব্যাপারে তিনি যাহাতে বিচারের ফল শুভ হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিজে সর্বশেষ বিচার করিতে পারিবেন এবং কোন ছাত্র ছাত্রীর শাস্তি সম্পূর্ণ মকুব অথবা মুলতুবি করিয়া দিতে পূর্ণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

• • •

এই ভাবেই বিদ্যালয়ের স্বায়ত্ত শাসন ছাত্রছাত্রী-

গণকে ছাত্রজীবন হইতে পূর্ণ মানবাধিকারের জীবনে হিতৈষী নেতা রূপে গড়িয়া তুলিয়া দেশের পরম পরিচালিত করিয়া দেশের ও জাতির একজন কল্যাণ সাধনে সক্ষম হয়। দেশমাতৃকার মুখ দায়িত্বশীল নাগরিক এমন কি দেশের একজন পরম বিশ্বমাঝে সম্মানের সিংহাসন উদ্ভাসিত হয়।

ফ্রয়বেলের শিক্ষানীতি

শ্রীমতী কণিকা বসু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফ্রয়বেল অদ্বৈতবাদকে এড়িয়ে চলতে পারলেই যেন বাঁচতেন ; কখনও বুঝতে পারেন নি যে মূলতঃ তাঁর মতবাদ এবং উক্তি অদ্বৈতবাদকেই প্রচার করেছে তবে তিনি অদ্বৈতপন্থী হয়েও প্রকৃতিকে ভগবানের কেবলমাত্র অংশবিশেষ মনে করেন নি। তাঁর ধারণা যে, বাস্তবে যা প্রকাশ তার সঙ্গে ঐশ্বরিক (divine nature) মহিমার কোন প্রভেদ নাই ; বরঞ্চ যে জিনিসের অস্তিত্ব আছে—সে খারাপই হোক আর ভালই হোক—তার যোগাযোগ রয়েছে সেই বিরাট শক্তিমানের ঐশ্বরিক গুণের সঙ্গে। ফ্রয়বেলের শিক্ষার মূলকথার ভাব এখানেই বোঝা যায়। প্রতিটি জিনিসের অস্তিত্ব সম্ভব এইজন্য যে অলৌকিক আত্মার বীজ ওতে রয়েছে। ব্রহ্ম ও প্রকৃতির এই অভিন্নতা সামঞ্জস্যে ফ্রয়বেলের বাণীতে ব্যক্ত হয়েছে। অস্তিত্বকরণের এই প্রথা ফ্রয়বেলের মনে স্পষ্টভাবে কোনদিন ধরা যায়নি। কারণ তাঁর লেখার অনেকাংশে মনে হয়, তিনি ব্রহ্মকে প্রকৃতিতে নিহিত দেখছেন, আবার কখনও ব্রহ্মতে প্রকৃতিকে বিলয় দেখছেন। Krause যে দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদের মীমাংসা করেছেন তাতে বলেছেন—"ব্রহ্ম ভুবন নয় —যা ব্রহ্ম ভুবন থেকে বাইরে। অথচ ব্রহ্মে লীন, ব্রহ্মের বিস্তৃতি অথচ থেকেও বিরাট ও মহৎ।" ফ্রয়বেল Krause কে যে বিধি দিয়েছিলেন—তা এই অর্থেই নিহিত—"শিক্ষা মানুষকে এভাবে তৈরী করবে, যাতে স্বভাবের যেমন আত্মবিকাশ হবে সেরকম জগতেরও অনুরূপ উন্নতি হবে। প্রতি-মুহূর্তেই জীবন-বৃত্তির যন্ত্রের জন্য মানুষের তৈরী হতে হবে, আর হতে হবে পরমাত্মার সুপ্ত হয়ে যাবার অবিরাম চেষ্টার জন্য প্রস্তুত।

মানুষ এবং প্রকৃতির ভগবানের সঙ্গে যে সম্পর্কই তিনি দেখিয়ে থাকুন—একথা ঠিক যে, গোঁড়া খ্রীষ্টানের মত অনুসরণ তিনি করেন নি উঁর মনে ভগবান সকল জাতি বা জাতের অনেক উর্ধ্বে নয়, তিনি এদের মধ্যেই—একথাই তিনি প্রচার করে-ছেন। অন্যথায় মনে হবে যেন, জগৎ ভগবান হতে উদ্ভূত নয়, ভগবানের প্রতিচ্ছবিও এখানে নেই ; জগতের উৎপত্তির কারণ যেন পরমাত্মার খাম-খেয়ালীর এক ফলক ; অর্থাৎ পৃথিবীর জন্ম কেবল-মাত্র খোদার খুসীমনের খেয়ালে, আর তার অস্তিত্ব মানুষের জ্ঞানোপলব্ধি হওয়ার নয়। প্রচলিত খ্রীষ্টীয় ধর্মমতের সঙ্গে ফ্রয়বেলের নীতির তুলনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, কেন লুথারিয় ধর্মযাজক ফ্রয়বেলকে মতভেদে ধারী করেছিলেন, কেন প্রাশিয়ার গভর্ণমেণ্ট ফ্রয়বেলের শিক্ষানীতিকে সাধারণের উন্নতির অন্তরায় বলে ধরে নিলেন।

ফ্রয়বেলের মধ্যে একপ্রকারের রহস্যবাদ বাসা

বেঁধেছিল। এ থেকেই বোঝা যায়, ফ্রয়বেল বস্তু ও প্রকৃতির একীকরণে আগ্রহী ও বিশ্বাসী ছিলেন। মধ্যযুগের জ্ঞানযোগীরা প্রায়ই সীমা ও অসীমের সম্পর্ক খুঁজে বেরিয়েছেন। কিন্তু ধর্মমন্দিরের শ্রেষ্ঠত্ব তবুও সবার উপরে স্থান পেয়েছে এবং তাঁদের সকল মতবিরোধ থেকেও বাঁচিয়েছে। ফ্রয়বেলের সেরকম রক্ষাশিবির ছিল না; কাজেই তাঁর তেজ প্রকাশ পেয়েছিল। তবে প্রেরণাও এ থেকেই তিনি পেয়েছেন, এবং এরই উপর তিনি শিক্ষানীতির ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

তৎকালীন সাধারণের মতামতের প্রভাব মুক্ত হলেও ফ্রয়বেলকে অনুপ্রাণিত করেছেন অপর এক মনীষী। তিনি হচ্ছেন Pestalozzi। Pestalozziর মতধারা ফ্রয়বেলে তখন পাই, বিশেষ করে যখন উভয়েই বলেন—শিক্ষা হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের পারিপার্শ্বিকের অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার প্রয়াস।" ফ্রয়বেল পেস্টালৎসিকে গুরু বলে মেনে নিয়েছেন। ফ্রয়বেল বলেছেন, "পেস্টালৎসি ছিলেন আমাকে শিক্ষার ও শেখানোর যাদুমন্ত্র। সে মন্ত্র যেন আমার নিজেরই বলে মনে হ'ল। এই বিশেষ নাম আমাকে মুহূর্তের মধ্যে উৎসাহিত করতো, কারণ আমার শিক্ষা উন্নতির মূলে ছিল এই মন্ত্র, যদিও অজ্ঞাতসারে। প্রতিজ্ঞা করে নিলাম তৎক্ষণাৎ, যা এ মনীষীর জীবনের লক্ষ্য—তা আমারও জীবন ও কর্মের ধ্রুবতারা হবে।"

১৮০৫ এর আগষ্ট মাসে তিনিঅল্প সময় হাতে নিয়ে Yverdonএ চলে গেলেন পেস্টালৎসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। এত অভিভূত তিনি হয়েছিলেন যে লিখেছেন—"আমি ঐ অবস্থায় আর বেশীক্ষণ থাকলে, আবেগের আধিক্যে আমার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া আশ্চর্য ছিল না। ঠিক সেই সময়ে আমার জীবন প্রবল উত্তেজনা ও কর্মপ্রেরণায় বশীভূত হয়ে পড়ল।"

সে সময়ের ভ্রমণের প্রভাব তাঁর ওপর যেরকম হয়েছিল তার কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন—"শিক্ষার নীতি ও প্রথা সম্বন্ধে আমি তখনও অনভিজ্ঞ। একমাত্র ছোট বয়সের স্কুলের দিনগুলির আবছায়া ঘটনাগুলি আমার মনে আনাগোনা করত এবং সেজন্য শিক্ষার প্রণালী বা কাঠামো নিয়ে সূক্ষ্ম বিচার করার সাধ্য ছিল না।" তাই তিনি অনুভব করলেন যে প্রকৃত শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক সম্পর্কের অভাব সব জায়গাতেই রয়েছে—তা অন্তরের অন্তস্থলেই হোক বা বাইরের কার্যক্ষেত্রেই হোক। "সুতরাং যা-ই আমি দেখেছি, তাইতেই যেমন একদিকে অবাক হয়েছি অনুপ্রাণিত হয়েছি আবার পীড়িতও হয়েছি।"

সংক্ষেপে তিনি বলেছেন—"পেষ্টালৎসির সঙ্গে যে অল্প সময়টুকু ছিলাম—তাতে লাভ হল এই যে একটি ভাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সুষ্ঠু পরিকল্পনায় কিভাবে চালানো হচ্ছে—দেখা হ'ল। পরিকল্পনা আমার আগে থেকেই ছিল। আমার মনে হ'ল যে এর সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে। যে ব্যবস্থার সাহায্যে একই বিষয়বস্তু একই সময়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে পড়ানো হ'ত তা দেখে আনন্দ হ'ল। পাঠ্যবস্তু প্রতি শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত ছিল; কিন্তু শিক্ষার্থীদের নানা বিষয়ে শেখবার সাধ্যানুযায়ী ক্ষমতা হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ করে দেওয়া হত। সেইজন্য প্রতি শ্রেণীতে পাঠ্যবিষয় অনুসারে ছাত্রসংখ্যা একই রূপ থাকার পরিবর্তে বিভিন্ন হয়ে যেত। এর সুবিধা আমার এমনভাবে মুগ্ধ করল যে সে সময় থেকে আমিও এ জিনিস চালু ক'রে এসেছি—আর ছাড়তে পারিনি।

"পরিকল্পনার যে জিনিসটি খারাপ ছিল—তা হচ্ছে স্থানবিশেষে এর অসম্পূর্ণতা। মনুষ্যত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের (harmonious development) জন্য যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তু শিক্ষার প্রয়োজন তার কিছু কিছু যেন দেখে রাখা হয়েছিল।"

ফ্রয়বেল কয়েকটি বিশেষ পাঠ্য বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ-

রূপে বিচারে লেগে গেলেন; শিক্ষাপদ্ধতিতেও যথেষ্ট ত্রুটি বের করলেন; তাঁর মতে সে সব ছিল অত্যন্ত প্রাণহীন ও শুষ্ক।

সে সাক্ষাতের পরে এবং তিনি যখন তিনটি ছাত্রকে পড়াতেন, তখন অহরহ তাঁর মনে কয়েকটি প্রশ্ন উঁকি দিত—'প্রাথমিক শিক্ষা কাকে বলে,' 'পেস্টলাৎসি যে শিক্ষাপ্রথার উদ্ভাবন করেছেন তার সার্থকতা কি', 'প্রকৃতপক্ষে কি শেখানো হয়?' সর্বশেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "মানুষ এমন একটি পরিস্থিতিতে বসবাস করে যে সেখানকার প্রতিটি জিনিস তাকে কম বেশী প্রভাবিত করে। সুতরাং তাকে সে বিষয়ের অবস্থলে চুকতে হবে—তার বিশেষত্ব জানতে হবে, আরও জানতে হবে সে বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধ, এবং মানুষের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক। প্রতিটি জিনিসেরই যে প্রধানতঃ 'আকার' (doctrine of form) আয়তন বা বিস্তৃতি, এবং প্রকার ভেদ আছে—তা স্বীকার করতেই হবে।

"'বহির্জগত' বলতে আমি প্রকৃতিকেই বুঝি। প্রকৃতি নিয়েই আমি এমন জড়িয়ে ছিলাম যে মানুষের সৃষ্ট কোন শিল্পকলা বা অন্যান্য জিনিস আমাকে সেভাবে আকৃষ্ট করতো না, বা সে ধরণের প্রয়োজনীয়তায় আমার বিশ্বাসও ছিল না। কাজেই সে সমস্ত জিনিস প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্গত করতে আমায় বেশ কিছু বেগ পেতে হয়েছিল। বাইরে এবং ভিতরে আমার দৃষ্টিভঙ্গী এতটা ছড়িয়ে দিতে হ'ল যে তার জন্য মানুষের সৃষ্টির সমস্তটাই বহির্জগত কথাটার অন্তর্ভুক্ত করে নিলাম।

"যে পরম সত্য আমার সামনে উদ্ঘাটিত হ'ল তা হচ্ছে এই যে, বিশ্বলোকে এক একত্ব ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। সকলেরই উদ্ভব, স্থিতি ও লয় এই ঐক্যে। মানুষের জীবনের বিভিন্ন ধারার যে প্রকাশ তা ঐ 'বহুর' 'একের' মধ্যে লুপ্ত হবারই প্রয়াস। কিন্তু সত্যিকারের অবদৃষ্টি থাকা আর 'জানা' 'বোঝা' বা 'করার' ভিতর বিরাট ব্যবধান রয়েছে। কাজেই মনে হ'ল, যে শিক্ষার বা শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে যে সমস্ত জিনিস আমাদের নেওয়া উচিত তা প্রথমতঃ গড়ে ওঠার বয়সেই ওদের সামনে রাখা উচিত। পরস্পরের যে সম্বন্ধ সেটাও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেখানো উচিত। জগতে যে এই গূঢ় তত্ত্ব জেনেছে, বুঝেছে, বিচার করতে শিখেছে এবং সময়-মত তার পরিবর্তনে নিজের শিক্ষা প্রয়োগ করেছে—তাকেই প্রকৃত শিক্ষিত বলব।

"এ সময় অক্লান্ত ভাবে প্রচুর কাজ করে যেতাম। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি অসংখ্যরূপে টুকরো টুকরো ভাবে আমার সবকিছু এলোমেলো ও বিচ্ছিন্ন করে দিত। তার ফলে পরের কয়েক বছর অত্যধিক পরিশ্রমের ফলেও কোন সুশৃঙ্খল নিয়মে চিন্তা-ধারাকে রূপ দিতে পারলাম না;—সে অন্তরের যোগসূত্রকেও জীবন্ত করে সকলের সামনে তুলে ধরতে পারিনি।

"পেস্টলাৎসির মতধারা আমার মনে হ'ল প্রয়োজন, তবুও একথাও না ভেবে পারলাম না যে প্রচুর জীবনীশক্তি সঞ্চয় করবার শক্তি ওতেও নেই, বিশেষ করে পাঠ্য বিষয়গুলির পরস্পরের যে সম্বন্ধ তার অভাব পীড়িত করল। ছেলেদের পড়াবার সময় আরও ভালকরে তা অনুভব করলাম। একান্তভাবে বুঝতে পারলাম যে প্রকৃত শিক্ষা সমষ্টিগত ভাবে এমন হওয়া উচিত যে শিক্ষার্থী আনন্দের সঙ্গে স্বাধীন ক্রিয়ায় ডুবে গিয়ে যেন মূল ঐক্যের সন্ধান পায়।"

ফ্রয়বেলের এই উক্তিতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে প্রথম প্রথম শিক্ষাবিদের কর্তব্যের ধারণা কত সঙ্কীর্ণ ছিল। "প্রথমে প্রকৃতির সাহচর্যে, মুক্ত আবহাওয়ার ভ্রমণেই আমার শিক্ষার কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাণপণ চেষ্টা করেছি যেন আমার শিক্ষার্থী-দের পূর্ণশিক্ষা দিয়ে সর্বাঙ্গীন উন্নতির পথে চালিয়ে দিতে পারি; কিন্তু যে অবস্থায় সে সময়ে আমার কাজ করতে হোত সে অবস্থায় এ উদ্দেশ্য সফল

করা সম্ভব ছিল না ; না আমার ভেতরে সে পরিপূর্ণতা আমি পেয়েছিলাম। ভাল করে এ জিনিস বুঝতে যখন পারলাম, মনে হ'ল যে সিদ্ধ হবার একমাত্র উপায় পেস্টলাৎসির সঙ্গে মিলে Yverdon-এ গিয়ে কাজ করা। স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আমার দেরী হ'ল না ; ইচ্ছাপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক হ'ল যে আমার তিনজন শিক্ষার্থী নিয়ে আমি গ্রীষ্মের সময় চলে যাবো। তখন খ্রীঃ ১৮০৮।"

অনেক উচ্চ আশা ফ্রয়বেল করে রেখেছিলেন। লিখেছেন—"প্রবল তেজোদীপ্ত শিক্ষার্থীর জীবনের আশা নিয়ে সেখানে গিয়েছিলাম—যেখানে মানুষের সমস্ত শক্তি সৃজনাত্মক ক্রিয়ায় এমন ভাবে লেগে থাকবে যেন অন্তরের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থ করবার সকলপ্রকার সুযোগ মেলে, দৈহিক, আত্মিক প্রয়াসের তৃপ্তি মেলে।"

পেয়েছিলেন ও তিনি সেখানে "সর্বাঙ্গীন, উৎসাহোদ্দীপক জীবনের সন্ধান।" কিন্তু কত রকমের ত্রুটি ও অপূর্ণতা যে তাতে ছিল তা বলা যায় না। তবে সাধারণ ভাবে যে উদ্দীপনা, শিক্ষার ক্ষেত্রে সংযোগ ও ঐক্য স্থাপনের ব্যাকুল প্রচেষ্টা করে চলেছিল—তা সহজেই অনুভব করছিলাম। সময়ে যদিও এই পরিশ্রম উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হয়ে নানা পথগামীও হয়েছিল।"

"এই উদ্দেশ্য ও শিক্ষাপদ্ধতির অন্তর্নিহিত বৈষম্য আমি সহজেই অনুভব করলাম। বুঝতে পারলাম যে শিক্ষাপ্রণালীতে কত ত্রুটি, অব্যবস্থা ও অসঙ্গতিও রয়ে গেছে। আরও উচ্চতর আদর্শের জন্য মন ব্যাকুল হ'ল ; এর চাইতেও ফলদায়ী পথ যেন রয়েছে বলে বিশ্বাস হ'ল—ভিতরের ঐক্যের সন্ধান যেন বাকী রয়ে গেছে। পেস্তালৎসির চাইতেও যেন আমি ভাল করে বুঝেছি বলে মনে হ'ল।"

বছর দুয়েক কাটানোর পর তিনি লিখলেন—"Yverdon-এ আমার গৌরবময় সময়ই কাটল—যখন সিদ্ধান্তে নেবার চরম উপায় পেলাম। ক্রমে শেষের দিকে ঐক্যের অভাব ও বৈষম্যের পীড়া কঠোর ভাবে বাজতে লাগল।"

ঐক্যের সন্ধানে যে আকুলতা ফ্রয়বেলের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সন্দেহ নেই। দু বছর ধরে Gottingen-এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করলেন। ফলে তাঁর এমন অনুভূতি হ'ল যে তিনি লিখলেন—"বহুর মধ্যে একের ব্যাপ্তি আমার চেতনায় এমনভাবে ধরা দিল যে, প্রকৃতির মধ্যে বা মানুষের জীবনে এমন কিছু রইল না যাতে তারই প্রকাশ আমি না দেখলাম। সময়ের এবং বিশেষত্বের তারতম্য যে তাতে ছিল না এমন নয়।" ফ্রয়বেলের পরবর্তী কালের রচনায় এ প্রয়াস এতই প্রবল ছিল যে সময়ে সময়ে অতিসরোক্তির দোষে তাকে দোষী করা যায়। একথা ঠিক যে ফ্রয়বেলের মধ্যে যে সকল গুণের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় তার মূলে রয়েছে পেস্তালৎসির কৃতিত্ব ; এবং দোষের জন্য তাঁর অদ্বৈতবাদকে দায়ী করা চলে।

Froebel's Chief Writings on Education, edited by S. S. Fetcher and J. Weston (Edward Arnold, Aublished Ltd.) হইতে অনূদিত।

ছাত্রজীবনের এক অধ্যায় : বাগেরহাট কলেজ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

(১)

আমাদের ছাত্রজীবনের একটি ছবি এখনকার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্মুখে ধরিতে চাই। প্রথমে বাগেরহাট কলেজের কথা কিছু বলি। আমি এখানে আই-এ দুই বৎসর (১৯২২—২৪) পড়িয়াছিলাম। তখন ইহার এই নামই ছিল, একথা অনেকেই জানেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলেজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতেই উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়া এইরূপ একটি ক্ষুদ্র শহরে স্থানীয় ব্যক্তিগণ কলেজ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। আচার্যের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ পরে তাঁহারা কলেজের নামকরণ করেন "আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ।" পাকিস্থানী আমলেও মনে হয় কলেজটি এই নামেই চলিয়া আসিতেছে।

প্রবেশিকা পরীক্ষা সমাপনান্তে বরিশাল ত্যাগের পূর্বদিন সন্ধ্যায় পূজ্যপাদ অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করিয়া আসি। পূর্বে এবং তখন তাঁহার সঙ্গে কিরূপ কথাবার্তা হয় অন্যত্র ইহা সবিস্তারে বলিয়াছি। 'অতঃপর' কি করিব জিজ্ঞাসা করায় অশ্বিনীকুমার পরিহাসচ্ছলে দুই একটি কথা বলিয়া শেষে বলিলেন, টেক্‌নিক্যাল কোন কিছু শিক্ষা করাই ভাল। তদবধি আমি কোথায়ও এইরূপ কিছু শেখা যায় কিনা সেই চেষ্টায় রহিলাম। কলিকাতায় আসিয়া কলিকাতা মেডিকেল স্কুলে (এখন কলেজ) ভর্তি হইবার উদ্যোগ করি। নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকায়ও আমি স্থান পাইলাম। কিন্তু তখন অসুস্থ হইয়া পড়ায় দেশের বাড়ীতে ফিরিয়া যাই, কলিকাতায় আর আসা হইল না। এ দিকে পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে, তাড়াতাড়ি কোথায়ও গিয়া ভর্তি হইতে হইবে। পিতৃদেব আমাকে নিকটেই কোথাও রাখিতে চান। তাই বাগেরহাট কলেজে ভর্তি হওয়াই স্থির হইল।

কিন্তু থাকিব কোথায়? ভর্তি হইবার পূর্বে তো বাসস্থান ঠিক করিয়া লওয়া দরকার। তখন কলেজের হোষ্টেল বা মেস নামেমাত্রই ছিল। আবার আমাদের অনেকেরই আর্থিক অবস্থা এমন ছিল না যাহাতে আহার ও বাসস্থানের ব্যয় নির্বাহ করিয়া কলেজে পড়িতে পারিতাম। মফঃস্বলের কলেজ, দুঃস্থ দরিদ্র ছাত্রেরাই আসিয়া ভীড় করিত। কলেজটি বাস্তবিকই স্বল্পবিত্ত বা স্বল্প-আয়ী পিতা বা অভিভাবকের সন্তান ও আশ্রিতদের একটি শিক্ষাকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। স্থানীয় ছাত্র বাদে পার্শ্ববর্তী দশ পনর বা বিশ মাইলের ভিতরকার বহু ছেলে আসিয়া এখানে ভর্তি হইত। দূরাগত ছাত্রদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হইত শহর ও আশপাশের গ্রাম সমূহের ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে। দুই মাইল কি তিন মাইল দূরের গ্রামেও ছেলের দল আহার ও বাসস্থান সংগ্রহ করিয়া লইত। বাগেরহাটে গিয়া যতদূর মনে পড়ে সপ্তাহখানেক তত্ত্বতল্লাস লইয়া অবশেষে শহর হইতে আড়াই মাইল পূর্ব দিকে একটি গ্রামে এইরূপ আবাসস্থল যোগাড় করিয়া লইলাম। ইহার পর কলেজে যথানিয়মে প্রবেশ করিলাম।

(২)

বাগের হাট একটি ছোট মহকুমা মাত্র, মিউনিসি-

প্যালিটি পর্যন্ত ছিল না। এখানে কেমন করিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইল, সেযুগে সে সম্বন্ধে অনেকেরই মনে বেশ একটা জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল। ক্ষুদ্র মহকুমা শহর হইলেও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রাম সমূহে সম্পত্তিপন্ন লোকের বাস ছিল, প্রায় তিন মাইল দূরবর্তী কাড়াপাড়ায় পুরন্দো জমিদার পরিবারের বসতি। অনতিদূরে বাসাবাটীতেও কায়স্থ ব্রাহ্মণ তালুকদার জমিদারদের বাস। অর্থের জোগাড় হয় কিন্তু আর একটি সম্প্রদায়ের নিকট হইতে। ঐ অঞ্চলের বৈদ্য ব্যবহারজীবি সম্প্রদায় ব্যবসায়কর্মে রত, এবং বেশ বিত্তশালী। তাহাদের নেতৃস্থানীয়েরা কলেজ প্রতিষ্ঠায় বড়ই উৎসাহী হইয়া পড়েন। জমিদার বিশ্বাস পরিবারও এই বৈদ্য ব্যবহারজীবি সম্প্রদায়ভুক্ত। এই পরিবারের গোপালচন্দ্র বিশ্বাস বরিশালের প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। যতদূর মনে হয় তিনিই কলেজের প্রথম সেক্রেটারি বা কর্মসচিব হন। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের আন্তরিক সহযোগিতায় কলেজের ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ বর্ধিত হওয়া সম্ভব হইয়া উঠে।

প্রথম তিন চারি বৎসরের মধ্যেই কলেজের সুনাম ছড়াইয়া পড়ে। প্রথম বৎসরের আই-এ পরীক্ষায় মতিলাল দাস (অধুনা ডক্টর) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বিভাগে প্রথমদিকে স্থান লাভ করিয়া উত্তীর্ণ হন। আরও বহু ছাত্র ক্রমে পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে থাকেন। প্রথম হইতেই কলেজ হইতে ছাত্রেরা যখন এরূপ কৃতিত্বের অধিকারী হন, তখন এখানে ছাত্রের অভাব হইবে কেন? আর একটি কারণেও কলেজের খ্যাতি নিকটে ও দূরে ছড়াইয়া পড়িল। ইহার অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণ নাগকে তখন এ অঞ্চলে কে না জানিত? দৌলতপুর কলেজে কয়েক বৎসর নৈপুণ্যের সহিত অধ্যক্ষতা করিয়া, শুনিয়াছি মতান্তর হেতু, ইহা ছাড়িয়া দেন এবং বাগেরহাট কলেজের পত্তন হইতেই তিনি ইহার অধ্যক্ষ হইয়া আসেন। কলেজটি শিশু অবস্থায়ই এইরূপ একজন সুনিপুণ পরিণতবুদ্ধি শিক্ষাবিদের নেতৃত্বে একটি উৎকৃষ্ট শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হইবার সুযোগ লাভ করে। মফঃস্বলের কলেজ, এখানকার আকর্ষণই বা কি? মনে হয়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় এবং অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণের সহৃদয়তায় প্রথমশ্রেণীর বহু অধ্যাপক এখানে আসিয়া শিক্ষাদানে তৎপর হন। আমি যখন গিয়া কলেজে ভর্তি হইলাম, তখন বহু ভাল অধ্যাপকের সাক্ষাৎ পাই।

(৩)

তখন বর্ষাকাল। বাসস্থান নির্দিষ্ট করার নিমিত্ত আমাকে প্রায় সাত দিন ধরিয়া বাগেরহাট শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহে যাতায়াত করিতে হইয়াছিল। মুসলমানেরা 'জায়গীর' বলিতে যাহা বুঝে, এই 'বাসস্থান' দ্বারাও তাহাই বুঝিতে হইবে। কোন নির্দিষ্ট পরিবারে আহার ও থাকিবার ব্যবস্থা, অবশ্য ছাত্রের পক্ষে হইলে তাহাকে 'জায়গীর' বলা হয়। বাগেরহাটের অন্যূন তিন মাইল দক্ষিণে কাড়াপাড়ায় গিয়া সেখানকার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি কলেজ প্রতিষ্ঠার পর হইতে কিছুকাল ইহার সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। প্রসন্নবাবু প্রবীণ শিক্ষাব্রতী, পরবর্তীকালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনী লিখিয়া বেশ নাম করেন। তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং অতদূর হইতে যাতায়াত সুসাধ্য বলিয়া নিকটবর্তী কোন স্থানে 'জায়গীর' সংগ্রহ করিতে উপদেশ দিলেন। কলেজ হইতে দশমি গ্রাম মাইল খানেকের মধ্যে, মনে পড়ে চন্দ্রনাথ দাসের বাড়ীতে একবেলা আতিথ্য গ্রহণ করি। চন্দ্রবাবু খুব উচ্চমনা মানুষ ছিলেন। কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁহার অপূর্ব কৃতিত্বের কথা ঐ সময় সকলের মুখে মুখে শুনিয়াছি। তখন তিনি পরলোকগত।

চন্দ্রবাবু খাঁতিদার এবং প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। দশানির জমিদার বিশ্বাস বাবুরা খুব খ্যাতিমান। এই বংশের গোপাল বাবুর কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সেখানেও 'আয়গীরের' অন্বেষণে যাই। নিকটবর্তী সোমাতলা, কৃষ্ণনগর এবং আরও কোন কোন গ্রামে গিয়াছিলাম। কিন্তু বিধি বাম, কোথায়ও 'স্থায়ী' বাসস্থানের সন্ধান মিলিল না। কি সূত্রে মনে নাই, শহরের আড়াই মাইল দূরবর্তী গোটাপাড়ার বসুবাটীর সন্ধান পাই, এবং সেখানে যাওয়া মাত্রই 'আয়গীর' মিলিয়া গেল।

বাগেরহাটের পূর্বদিকে দক্ষিণবাহিনী দড়াটানা নদী। দড়াটানা নাম হইতে বুঝা যায়, আধুনিক এই রকম আরও অনেক নদীর যে নূতন সৃষ্টি হইয়াছে নাম দেখিয়াও তাহা আঁচ করা যায়, যেমন বিলখালি নদী, কচানদী ইত্যাদি। দড়াটানা কেন বলা হইত? দড়ি বা দড়া দিয়া এপার ওপার করা যাইত বলিয়া কি? কচা নদীর কথা শুনিয়াছি প্রথমে ইহা সোঁতা খাল মাত্র ছিল, কচার উপর দিয়া ইহা পার হওয়া যাইত। সে কথা যাক। দড়াটানার পূর্ব দিক হইতে আমাদের যাতায়াত। শহরের উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ দিকে তিনটি খেয়া ঘাট। আমরা উত্তরদিকস্থ মুনিগঞ্জের খেয়াঘাটে খেয়া পার হইতাম। তখন এই খেয়ার মাসিক 'কেরায়া' বা ভাড়া ছিল চারি আনা মাত্র। এই মুনিগঞ্জেই একটি বিখ্যাত কালীবাড়ী ছিল। আবার ইহার নিকটেই ছিল একটি দ্বিতল গৃহে অধ্যক্ষ কাষাখ্যাচরণ নাগের বাসস্থল।

কলেজে ভর্তি হইবার সময় বর্ষাকাল বলিয়াছি। বাসস্থানের অনুসন্ধানীতে বৃষ্টির মধ্যে কত জলকাদাই না ভাঙিয়াছি। কিন্তু তাহাতে তেমন কষ্ট হয় নাই। নদীর ওপারে বেলেমাটী নাই, খাঁশ এঁটেল মাটি। বেলেমাটির রাস্তায় বৃষ্টিপাতের অল্প পরেই জলকাদা চানিয়া যায়। এঁটেল মাটির সঙ্গে জলের কেমন যেন অত্যধিক সম্প্রীতি। ডিস্ট্রিকবোর্ডের কাঁচা রাস্তা। খেয়াঘাট হইতে ২২।২৩ মাইল দূরবর্তী চিতলমারি নামক একটি গঞ্জের সঙ্গে এই রাস্তার দ্বারা সংযোগ সাধিত হইয়াছে। পূর্ব দিকে যতই অগ্রসর হইবেন ততই এঁটেল মাটি। মানুষ, গরু এবং মহিষের যাতায়াতে রাস্তা একেবারে কর্দমাক্ত হইয়া যায়।

গোটাপাড়া গ্রামের পূর্বদিকে এক প্রকাণ্ড বিল। আমি যখন যাই তাহার কিছু পরেই দেখিতে দেখিতে ঐ অঞ্চল যতদূর দৃষ্টি যায় জলমগ্ন হইয়া গিয়াছিল। এখান হইতে প্রতিদিবস কলেজে যথাসময়ে যাইতাম এবং বৈকালে ফিরিয়া আসিতাম। পথ চলার কষ্ট মোটেই তখন কষ্ট বলিয়া বোধ হইত না। কাদা হইলেও তবু এ রাস্তা। কৈশোরে আড়াই মাইল, তিন মাইল দূরে স্কুলে হাঁটিয়া যাইতাম। কিন্তু যাতায়াতের পথে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড বা লোকাল বোর্ডের কোন রকম রাস্তাই ছিল না। তখনও ও অঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ডের পত্তন হয় নাই।

গোটাপাড়া খুব যে বড় গ্রাম তা নয়। তবে এখানে কায়স্থ ও বৈদ্য ব্যবসায়ীসম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকটি সম্পন্ন পরিবারের বাস। এ গ্রামে তখন একটি মাইনর স্কুল ছিল। কলেজের ছাত্র আমার সঙ্গী আর কেহ ছিলেন কিনা মনে পড়িতেছে না। কিন্তু বাগেরহাট উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক এই গ্রামেই বাস করিতেন এবং এখান হইতেই তিনি সহরে কর্মব্যপদেশে যাতায়াত করিতেন। পরে শুনিয়াছি, তিনি বিপ্লবী দলভুক্ত ছিলেন। এই শিক্ষক মহাশয়ের চাষবাসের প্রতি খুব ঝোঁক। তিনি একটি বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে বিভিন্ন ঋতুতে নানারকম শাকসব্জির ও ফলমূলের চাষ-আবাদ করিতেন। যে বাড়ীতে আমার 'আয়গীর' ঠিক হইয়াছিল তাহা বসুবংশীয় এক পরিবারের। এখানে সকালে সন্ধ্যায় তিনটি ছাত্রকে পড়াইতে হইত। বাড়ীর কর্তা ছিলেন খুবই ধোকদমাপ্রিয়। ছেলেদের প্রতি নজর দেওয়ার অবসর কোথায়? আমি অল্পকালের মধ্যেই পরিবারভুক্ত হইয়া গেলাম,

এবং পরিবারের নারীপুরুষ সকলেরই আদর আপ্যায়ন পাইতে লাগিলাম। কর্তার ছেলেদের আমি পড়াই। ছেলেদের মা আমাকে কত যত্ন করিয়াই না খাওয়াইতেন। পরিবারের সঙ্গে ক্রমে এতই মিশিয়া গেলাম যে, শীতকালে যখন জল টানে ধরিল তখন ইহাদের কাহারও কাহারও সঙ্গে মাছ ধরিতেও যাইতাম। আবার কোথাও নিমন্ত্রণ হইলে ছাত্রবাবুরও ডাক পড়িত। এইরূপে খুব আদরযত্নের মধ্যেই কলেজের প্রথম বর্ষ সেখানে কাটাই আর সেখান হইতেই প্রত্যহ কলেজে যাতায়াত করি।

তখন আমাদের মধ্যে বেশ একটা স্বাবলম্বনের প্রবৃত্তি ছিল। ইহা কোন বিশেষ শিক্ষা বা পরিবেশ ঘটিত নয়। তবে পল্লীর মানুষ আমরা, বাল্যাবধি আমাদিগকে নানা ঝড়ঝাপটা অসুবিধা এবং অনটনের মধ্য দিয়া চলিতে হইত। এই হেতু সকল বিষয়েই এই স্বাবলম্বন প্রবৃত্তি স্বাভাবিক-ভাবেই মানুষের মধ্যে দেখা যাইত। যে চাল-আবাদ করে অল্প সময়ে সে ঘর মেরামতি বা অন্যান্য গৃহস্থালী কর্মেও মন দেয়। বড় বড় শ্রমসাধ্য বা কঠিন কাজ পুরুষেরাই করিত, কিন্তু ঘরোয়া বিস্তর কাজ, অবশ্য রান্নাবান্না তো আছেই,—নারীগণ নিজ হাতে করিতে ভালবাসিতেন। বাড়ীর ছেলেমেয়েরাও নানা কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করিত। আমরা দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া বিভিন্ন বস্তুতে কত কষ্টের মধ্যে স্কুলে যাইতাম। কিন্তু সকালে বিকালে পড়াশুনা বাদে যতটুকু অবসর মিলিত অনেকেই পিতামাতা বা অভিভাবকের গৃহস্থালী কর্মে যথাসাধ্য যোগ দিতাম। এই যে স্বাবলম্বন বৃত্তি বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে গেলেও তাহা আমাদের সঙ্গেই থাকিয়া যাইত। নিজের হাতে কাপড় কাচা পরিষ্কার করা এ যেন কর্তব্য মধ্যেই ছিল। এ বিষয়ে অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকার কথা একটি বারের তরেও মনে উদয় হয় নাই। গোটাপাড়ার যখন ছিলাম, তখন সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় অত কঠিন পরিশ্রমের মধ্যেও নিজের কাজ নিজে করিতে ব্যাপৃত থাকিতাম। আজকাল এই প্রবৃত্তির অভাব দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারি না।

(৩)

সুপণ্ডিত কামাখ্যাচরণ নাগের অধ্যক্ষতায় এবং স্থানীয় লোকের আন্তরিক সহযোগিতায় কলেজটি ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইল। কলেজের বিস্তর জায়গা। একটি পুষ্করিণী সবেমাত্র খনন করা হইয়াছে। ইহার মাটির দ্বারা কলেজ চত্বর অনেকটা উঁচু হইয়াছে। সম্মুখেই একটি দোতলা বাড়ী নির্মাণ প্রায় শেষ। আমাদের ক্লাশ বসিত পূর্ব ও উত্তর দিকে কয়েকটি চালা ঘরে, একটি ছিল টালির ঘর। আর একটি ছিল গোলপাতার। এই দুই ঘরেই আমাদের ক্লাশ বসিত। অফিস, অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকগণের বসিবার ঘর ছিল একটি পাকা বাড়ীতে। এই বাড়ীর একাংশে কয়েকজন অধ্যাপকও বাস করিতেন।

এতদিন কলেজ একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল এবং মাত্র আই-এ এখানে পড়ান হইত। এই বৎসর অর্থাৎ ১৯২২ সনের জুলাই হইতে আই-এস-সি বিভাগও খোলা হইল। যতদূর মনে পড়ে, ইহার পরবৎসর ইহা প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে ছাত্রেরা আসিয়া ভর্তি হইতে থাকে। কলেজের প্রধানতম আকর্ষণ অধ্যক্ষ কামাখ্যা বাবু। তাঁহার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলাদা করিয়া বলিয়াছি। এখানে বিস্তারিত কিছু বলার প্রয়োজন নাই। কি অধ্যাপক, কি ছাত্র, কি কর্মী সকলেই যেন কামাখ্যা বাবুর নিতান্ত আপন জন। আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করিতাম তিনি আমাদের কত ভালবাসেন। কলেজের যে পরিচালকমণ্ডলী আছেন বা কোন সেক্রেটারী অথবা অন্য কোন কর্মকর্তা রহিয়াছেন

একথা আমাদের কখনও মনে উদয় হয় নাই। একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি। ভর্তি হইবার পর দেখিলাম কলেজে সর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং শিখাইবার ব্যবস্থাও রহিয়াছে। আমি ইহাতেও ভর্তি হইয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুই বৎসরকাল প্রতি মাসে এক টাকা করিয়া বেশী বেতন দিলেও ইহা তখন শিখিতে পারি নাই। আমাদের সময় হইতেই ছাত্র-অধ্যাপকে কলেজটি অমজমা করিতে লাগিল।

ছাত্র এবং অধ্যাপকগণের মধ্যে বেশ একটি সম্প্রীতির ভাব বিদ্যমান ছিল। এই সম্প্রীতিহেতুই বোধ হয় উভয়ের মধ্যে বেশ একটা যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার অবশ্য একটি প্রধান কারণ মফঃস্বল কলেজে ছাত্র সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প, কাজেই ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন কতকটা সহজ হইয়া উঠিয়াছিল। পরে যখন কলিকাতায় উচ্চতর শিক্ষালাভার্থ আসিলাম তখন বড় বড় কলেজে ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে যোগাযোগের অভাব বিশেষভাবেই চোখে পড়ে। যোগাযোগের অভাবহেতু পরস্পর ভিতরে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াও সম্ভব হয় না। আজকাল যেমন তুমি ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে মোটেই যোগাযোগ নাই, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ, পরস্পরকে ভাঙ্গাদার বস্তু করিয়া তোলা, অধ্যাপকের বক্তৃতা যতই মনোজ্ঞ বা প্রয়োজনীয় হউক, মন দিয়া না শুনা, যেন নিত্যকার রীতি হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত শিক্ষা দানের এবং শিক্ষা লাভের পক্ষে ইহা প্রধান অন্তরায়।

আমাদের ছোট কলেজ, ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে সংযোগ সহজেই স্থাপিত হইল। উপরে শ্যামাধ্যাবাবু ত আছেনই, তাঁহার প্রীতি যেন ছাত্র অধ্যাপক সকলকেই প্লাবিত করিয়া তুলিত। আমি আই-এ পড়িতাম। বিশেষ বিষয় ছিল লজিক, ইতিহাস ও সংস্কৃত। ইংরেজী ও বাংলা ত সকলকেই পড়িতে হইত। ইংরেজীর অধ্যাপক হইয়া আসিলেন নগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কিতীশচন্দ্র বর্মন। নগেন্দ্র বাবু আমাদের কবিতা পড়াইতেন; কিতীশবাবু পড়াইতেন গদ্য। আমরা উভয়ের অধ্যাপনায়ই বেশ উপকৃত হইয়াছিলাম। নগেন্দ্র বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র, সবে এম্. এ পাশ করিয়া অধ্যাপক হইয়া আসিয়াছেন। বয়সে তরুণ; তাঁহার ও আমাদের মধ্যে বয়সের পার্থক্য খুবই কম। এ কারণেও হয়ত তাঁহাকে আমরা সহজেই আপন করিয়া লইতে পারিয়াছিলাম। নগেন্দ্রবাবু চিরকাল শিক্ষাব্রতী রহিয়া গিয়াছেন। অধ্যাপনাকে জীবনব্রত করিয়া লওয়ায় তাঁহাকে ত্যাগ স্বীকার করিতেও হইয়াছে প্রচুর। কিতীশ বাবু আমাদের ইংরেজী গদ্য বড় ভাল পড়াইতেন। কি মনোযোগ দিয়াই না তাঁহার পড়ান শুনিতাম! কিন্তু তিনি আর বেশিদিন অধ্যাপনা কার্যে লিপ্ত থাকেন নাই। বি, সি, এস্ পরীক্ষায় সফলকাম হইয়া সরকারী শাসনবিভাগে কর্ম লইয়া চলিয়া গেলেন। ক্রমশঃ উন্নতি করিয়া রাজস্ব বিভাগের কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে কার্য করেন এবং শুনিয়াছি তিনি এখান হইতে অবসর লইয়াছেন। নগেন্দ্র বাবুর সঙ্গে কয় বৎসর পূর্বেও সাক্ষাৎ হইয়াছে, কিতীশ বাবুকে পরে কখনও দেখি নাই। দেখি আর না দেখি, উভয়ের প্রতিই আমরা যে শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি পোষণ করিতাম আজিও তাহা স্মরণ করিয়া ধন্য হই।

আমাদের ইতিহাস পড়াইতেন জনার্দন বাবু এবং সন্তোষ বাবু। জনার্দন বাবুর পুরা নাম সঠিক মনে হইতেছে না। বন্দ্যোপাধ্যায় কি মুখোপাধ্যায় হইবে। খুপসুরত নাতিদীর্ঘ মানুষটি,—ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি। চলনে বলনে বেশ একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতাম। তিনি আমাদের ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়াইতেন। ইতিহাস বইখানি যাহা ক্লাসে

অনুসরণ করা হইত—ছিল মার্টিন ও গার্ডিনার কৃত। বইখানির রচনাশৈলী অতি চমৎকার, ইতিহাস পড়িতেছি কি সাহিত্য পড়িতেছি বুঝা যাইত না। অমনস্ত বাচনভঙ্গিতে ইতিহাস যে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে এই বইখানির মধ্যে সে বিষয়ে আমার প্রথম অনুভূতি। যেমন ভাল বই তেমনি সুন্দর পড়ানো। জনার্দন বাবু কি প্রাঞ্জল ভাষায়-ই না তাঁহার বক্তব্য আমাদের নিকটে বলিয়া যাইতেন! তিনি কলিকাতায় অধ্যাপক মহলেও সুপরিচিত ছিলেন, ইহা প্রথম টের পাই সিটি কলেজে বি-এ পড়িতে আসিয়া। কিন্তু এমন ভাল অধ্যাপককেও আমাদের শীঘ্র হারাইতে হইয়াছিল। মনে হয়, দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর শেষাশেষি তিনি কলেজ ছাড়িয়া গেলেন। শুনিলাম জনার্দনবাবু মুন্সেফী পদ পাইয়াছেন। ইতিহাসে দ্বিতীয় অধ্যাপক ছিলেন সন্তোষবাবু—সন্তোষ কুমার (চন্দ্র?) দে। তিনি আমাদের গ্রীস ও রোমের ইতিহাস পড়াইতেন। এই দুইখানি ইতিহাসের বই সাহিত্যরসসমৃদ্ধ। কিন্তু এতে এত বেশি কথা থাকিত যে, আমাদের সবটা পড়া প্রয়োজন হইত না। সন্তোষবাবু পড়াইবার সময় আমাদের বইতে ক্রমাগত দাগ দিয়া যাইতে বলিতেন। এক পৃষ্ঠার মধ্যে একটি বা দুইটি কালো দাগ পড়িত। কখনও একটি বা দুইটি পৃষ্ঠা "skip over" করিয়া যাইতে বলিতেন। এরূপ অনবরত বই চিহ্নিত করিতে থাকায় বক্তৃতায় খানিকটা ছেদ পড়িত বটে, কিন্তু তিনি এত সহজ ও সাবলীল ভাষায় বলিয়া যাইতেন যে, উহা অনুসরণ করিতে আমাদের মোটেই বেগ পাইতে হইত না। সন্তোষ বাবু পরে অধ্যাপকের পদ লইয়া সেখানে চলিয়া যান, তিনি শেষ পর্যন্ত শিক্ষাব্রতী ছিলেন কিনা আমি না তবে তাঁহার শিক্ষাগুণে ইতিহাসের জটিল বিষয়গুলিও আমাদের নিকট যে কত সরল হইয়া যাইত তাহা আজিও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

এই সময় লজিক বা তর্কশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন রাধারমণ বাবু, পুরানাম রাধারমণ বন্দ্যোপাধ্যায়। খানিকটা খুলকায়, গম্ভীর প্রকৃতি, ছাত্রদের শ্রদ্ধা আকর্ষণের যোগ্য। লজিকের বই যখন আমরা পড়িতাম তখন বড় খটমট লাগিত—একটার পর একটা নূতন নূতন ধারা, শেষ পর্যন্ত মনে রাখা দায় হইত। কিন্তু যে বিষয়টি আমাদের পড়ার সময় এমন কঠিন ও নীরস ঠেকিত, রাধারমণ বাবুর বক্তৃতায় তাহা কতই না সহজ ও রসাল হইয়া উঠিত। তিনি সমাধে এক সিরিয়স বক্তৃতা করিয়া যাইতেন। একটির পর একটি ধারা বা নিয়ম আমাদের পরিষ্কার করিয়া সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দিতেন। পড়িবার সময় আমাদের মনে যতগুলি খট পাকাইয়া যাইত তিনি যেন কথার ছলে সেগুলি একটির পর একটি খুলিয়া দিতেন। তাঁহার ইংরেজী খুবই Idiomatic ছিল। তবে বিভিন্ন বিষয় বুঝাইতে গিয়া অনেক সময় কোন কোন বাক্য বা বাক্যাংশ তাঁহাকে পুনরাবৃত্তি করিতে হইত। ইহার কয়েকটি এখনও মনে গাঁথিয়া আছে—যেমন, 'Few and far between', 'The reason is not far to seek, 'Talpukur without a Tal tree' ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি দীর্ঘকাল এই কলেজে অধ্যাপনা কার্যে লিপ্ত ছিলেন। পরে কিছু সময় কলেজের অধ্যক্ষতাও করেন।

এইবার সংস্কৃত অধ্যাপকের কথা। দুঃখের বিষয় অধ্যাপক মহাশয়ের নাম আমার স্মরণ হইতেছে না। তবে তাঁহার চেহারা আমার চোখের সামনে এখনও ভাসিতেছে। ছিপছিপে লম্বা মানুষটি, রং কয়লা, দীর্ঘকায়, দেখিলেই মনে হইবে পেটরোগা। তাঁহার চলন বলনেও কিরূপ একটা বিশেষ ধরন ছিল। তিনি সংস্কৃত বেশ ভালই পড়াইতেন, কিন্তু তাঁহার বিশিষ্ট ভাবভঙ্গি এবং নাকিসুর আমাদের তরুণ চিত্তে কেমন একটা চটুলতার উদ্রেক করিত। তিনি

অত মন দিয়া বই লইয়া পড়াইতেন, আমরা সম্মুখের বেঞ্চিতে বসিয়াও তাহা মনোযোগ সহকারে শুনিতাম না। আজ এই কথা লিখিতে বসিতেও অনুতাপবোধ করি। সেই যে অধ্যাপকের প্রতি তরুণ-সুলভ চটুলতাপূর্ণ তাচ্ছিল্য প্রদর্শন, তাহার ফল আমরা আজীবন ভোগ করিতেছি। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে মাত্র তাঁহার নিকট পড়িয়াছি। ইহার পর তিনি অন্যত্র যান। বহু বৎসর পরে কলিকাতায় তাঁহাকে দুই একবার দেখিয়াছি। দেখা হইবার মাত্রই তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, এবং মৃদুহাস্যে সমবয়স্যের সঙ্গে কত কথাই না বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে এক নূতন অধ্যাপক পাইলাম। তাঁহার বয়স বেশি নয়। বি-এ কাব্যতীর্থ। যখনই শুনিলাম তিনি এম্-এ নন, তখন হইতেই তাঁহার প্রতি আমাদের কেমন একটা বিরূপ মনোভাব জন্মিয়া গেল। তিনি সযত্নে আমাদের পড়াইতেন। কিন্তু শুনিবে কে? তিনি পরে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, বর্তমানে মেদিনীপুরের কন্টাই কলেজে অধ্যাপনা কার্যে রত রহিয়াছেন। তাঁহার নাম বনবিহারী ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের অগ্রজ। সংস্কৃতের প্রতি এইরূপ অবহেলা তাচ্ছিল্য পরবর্তী কালে আমাদিগকে বড়ই পীড়া দিয়াছে। সংস্কৃত না শিখিলে ভারত-আত্মার সঙ্গে পরিচয়লাভ কখনও সম্ভব হইবে না। সংস্কৃত আমাদের সত্যকার জাতীয়ভাষা ও সাহিত্য। ভারতের মহাজাতিকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিতে হইলে আপামর সাধারণের সংস্কৃত কমবেশি অবশ্যই শিখা করিতে হইবে। বর্তমানে সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি কর্তৃপক্ষের যে অবজ্ঞার ভাব পরিদৃষ্ট হয় তাহা স্থায়ী হইলে জাতীয় ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। মনে মনে বলি, কখনও বন্ধু-বান্ধবকেও বলিয়া থাকি—যদি পরজন্ম বলিয়া কিছু থাকে তাহা হইলে ফিরিয়া আসিয়া যেন কায়মনে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চায় জীবন কাটাই।

অধ্যক্ষ কামাখ্যা বাবু আমাদের ইংরেজী বাইবেল পড়াইতেন, কিন্তু দেখিয়াছি তিনি ছিলেন সর্ববিদ্যাপারঙ্গম। যখনই যে অধ্যাপকের অভাব হইত তখনই তিনি তাঁহার "বিষয়" সম্বন্ধে ক্লাসে অনর্গল বক্তৃতা করিয়া যাইতেন। অঙ্কশাস্ত্রে অধ্যাপক ছিলেন নেপালচন্দ্র রায়। তিনি কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপাল বা উপাধ্যক্ষপদেও বৃত ছিলেন। অধ্যাপনায় তাঁহার বেশ সুনাম ছিল। তাঁহার নিকট আমরা পড়ি নাই—কেননা অঙ্কশাস্ত্র আমাদের ছিল না। কিন্তু তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ না হইয়া পারি নাই। নেপালবাবু পরে মেদিনীপুরের কন্টাই কলেজে অধ্যক্ষ হইয়া যান। পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপকগণও তখন নিযুক্ত হইয়া আসেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার মত জ্ঞান আমার নাই। তবে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক কালীকুমার রায়কে আমার খুবই মনে পড়ে। শুনিয়াছি তিনি পরে কলেজের উপাধ্যক্ষ পদেও কার্য করেন। তখন রাধারমণবাবু কলেজের অধ্যক্ষ।

৪নং ফরম

(৮নং নিয়ম দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশের স্থান—কলিকাতা

২। বৎসরে কতবার প্রকাশিত হয়—
মাসে একবার

৩। মুদ্রাকরের নাম—
শ্রীঅজিতকুমার বসু, ভারতীয় নাগরিক
২৭।৩বি, হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

৪। প্রকাশকের নাম—
শ্রীঅজিতকুমার বসু, ভারতীয় নাগরিক
২৭।৩বি, হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

৫। সম্পাদকের নাম—
শ্রীস্বর্ণপ্রভা সেন, ভারতীয় নাগরিক
১নং ডোভার লেন, কলিকাতা-২৯

৬। সংবাদপত্রের মালিক—
শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, ভারতীয় নাগরিক
১নং ডোভার লেন, কলিকাতা-২৯

আমি শ্রীঅজিতকুমার বসু এতদ্বারা জানাইতেছি যে উপরিলিখিত বিবরণগুলি আমার বিশ্বাস অনুযায়ী ও জ্ঞাতসারে সম্পূর্ণ সত্য।

শ্রীঅজিতকুমার বসু

শিক্ষা

ম হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৯শ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৬৭ | ৪র্থ সংখ্যা

আলোচনা

স্মরণে

প্রভাত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আর ইহজগতে নাই। সংকটের সময় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী বাঙালী গিয়া তাঁহার নিকটে পরামর্শ ও উপদেশ চাহিত ও পাইত। সত্যদর্শী বিদগ্ধ গুণগ্রাহী নির্ভীক সমালোচক রূপে তিনি নানা ক্ষেত্রে সমাজের সেবা করিয়াছেন, তাঁহার দরদের পরিচয় বাঙালী সমাজ ভাল করিয়াই জানে। কিন্তু বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ও সাহিত্যিক হইয়াও তিনি ছিলেন "মাষ্টার"—একদিন তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাই বলিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে রঙ্গপুরের প্রথম জাতীয় বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতাও করিয়াছিলেন, তিনি কলিকাতাবাসী হইলে স্যর আশুতোষ তাঁহাকে ডাকিয়া কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধ সাধারণকে শিক্ষা ও সাহিত্যের নিকট-সম্বন্ধকে স্পষ্ট করিয়া ধরিয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেদিন স্বাধীন হইলে বয়স্ক-শিক্ষার জন্য যে কমিটি নিয়োগ করেন, তিনি তাঁহার সভাপতি ছিলেন। সংস্কৃত কলেজ পরিচালন সমিতিরও তিনি ছিলেন অধ্যক্ষ। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তনছাত্র সমিতির তিনি ছিলেন প্রাণস্বরূপ। গান্ধীজীর প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল; তাই বুনিয়াদি বা 'বৈদিক' শিক্ষা পদ্ধতিতে তাঁহার অনাস্থা ছিল না। বরং তিনি অনেকবার বলিয়াছিলেন, আমাকে একটা ভালো বুনিয়াদি স্কুল দেখাইয়া আনুন। শিক্ষা সম্বন্ধীয় চিন্তা ও কর্মের সহিত তাঁহার প্রাণের যোগ ছিল, তাঁহার অভাব তাই আমরা সত্য সত্য খুবই বোধ করিতেছি। তাঁহার স্থান পূরণ হইবার নহে।

অধ্যাপক সুরেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের নাম শুধু যাদবপুর কলেজের অধ্যাপক হিসাবে নয়, দেশের শিল্প পুনরুদ্ধার এবং নূতন শিল্পের প্রবর্তনে সংগঠন সাধনে উৎসাহী দেশপ্রেমিক বলিয়াও তিনি সুপরিচিত ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক গমনে তাঁহার ছাত্র ও অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের মনে যে স্বাভাবিক শোক, তাহার সহিত আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি।

শ্রীমতী জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তার অকাল মৃত্যুতেও

আমরা বিশেষ দুঃখ অনুভব করিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্ এ পরীক্ষা পাশ করিয়া তিনি বিদেশে যান, এবং সেখানে অধ্যয়ন শেষ করিয়া এদেশে ফিরিলে বিহারীলাল ইনস্টিটিউটের ভার গ্রহণ করেন। বাংলা দেশে মেয়েদের গার্হস্থ-বিজ্ঞান শেখার পথ তিনিই সুগম করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতা গঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত মহাশয় সারাজীবন শিক্ষাকর্মে অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাই।

ছাত্রসমাজের অব্যবস্থা

কলিকাতার কলেজের ছাত্রসমাজের এক পরীক্ষা নিরীক্ষা বা স্যাম্পল সার্ভে কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি পুণা শহরের কলেজের ছাত্রদের মধ্যে অনুরূপ কাজ হইয়াছে। এই সার্ভের কাজ করিয়াছেন স্নাতকোত্তর বিভাগের অঙ্ক ও সংখ্যাবিজ্ঞানের ছাত্ররা নিজেই, অবশ্য তাঁহাদের পরিচালনার জন্য তিনটি প্রসিদ্ধ অধ্যাপকও উপস্থিত ছিলেন। সার্ভের জন্য প্রস্তুত প্রশ্নমালা খুবই সুরচিত হইয়াছিল। ছাত্রদের বাসের বন্দোবস্ত, তাহাদের কি কি বিষয়ে খরচ হয়, নিত্যকার দিনচর্যা, পড়ার ধরন, পাঠ্যবহির্ভূত কাজকর্ম, পাঠক্রম নির্বাচন ইত্যাদি সকল বিষয়ে বিশেষ যত্ন সহকারে তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে।

অনুসন্ধানে তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া যাহা জানা গিয়াছে তাহা হইল, অধিকাংশ ছাত্র ভবিষ্যতে ভাল হইবে ভাল করিতে পারিবে এরূপ আশা রাখে। ছেলেরা যে বিশেষ চিন্তা না করিয়াই পাঠক্রম নির্বাচন করে, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই, তবে অনেক ছাত্রই কলেজের লাইব্রেরী হইতে বই নেয় না, দৈহিক ব্যায়াম করে না, খেলাধুলাতেও যোগ দেয় না। তাহাদের থাকিবারও কোনও সুব্যবস্থা নাই। এই সব দিকে কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি দিলে ছাত্রসমাজের কল্যাণ হয়।

একটি উদ্ধৃতি

উদ্ধৃত অংশে "সাময়িকী" হইতে শিশুকাল হইতে শিক্ষা মানিয়া চলার প্রবৃত্তি কি করিয়া বিকাশ করিতে হয় সে সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"একথা প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে বুঝাইতে হইবে যে, তোমার সর্ববিধ কাজের জন্য তুমি তোমার কাছে দায়ী, আবেষ্টনের কাছে দায়ী। ছোট বয়সেই ছেলেমেয়েকে জানাইতে হইবে যে, তাহার প্রত্যেক কাজ এমন ভাবে করিতে হইবে যাহাতে তাহার ব্যক্তিগত কল্যাণের সঙ্গে তাহার পরিবারের, তাহার সমাজের, তাহার রাষ্ট্রের কল্যাণ হয়, কেননা তাহার অস্তিত্বই এই প্রত্যেকের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এইভাবে ভাবিতে অভ্যস্ত হইলে উচ্ছৃঙ্খলতা স্বাভাবিকভাবে কমিয়া আসিবে—জোর করিয়া কিংবা আইনের চাপ দিয়া যে ফল ফলে তাহার মূল্য কম কিংবা মূল্য নাই—নীতি যখন জীবনের মধ্যে স্বভাবের রূপ ধরে তাহাই সত্যিকারের সার্থক নীতি। প্রশ্ন যখন আজ যে, স্বাধীনতাও দিতে হইবে আবার সংযমও শিখাইতে হইবে, তখন প্রতি ব্যক্তি যে সর্বের সঙ্গে—তাহার অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের সকল প্রকার আবেষ্টনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত—একথা বুঝান ছাড়া অন্য মনস্তাত্ত্বিক পথ নাই।"

যাঁহারা শিশুশিক্ষার ব্রতী তাঁহারা এই সুন্দর কথাটা নিশ্চয় মনে রাখিবেন, তবে 'বুঝাইবার' পথ সহজ নহে, উহা সহজ শিক্ষানীতির পথ।

প্রাথমিক শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ সংগ্রাম

প্রাথমিক শিক্ষকের কাজের গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করিবেন, এবং এখনকার দুর্মূল্যতার দিনে তাঁহাদের অভাব মোচনের কথাও রাষ্ট্র ও সমাজ ভুলিতে পারেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সব ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন তাহা কার্যত করিবার পক্ষে বাধা কোন ও বিলম্ব কোন, এই কথাটার সদুত্তর আমরা কিছুতেই পাইতেছি না। তাঁহাদের

পর বৃদ্ধি প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে না পাওয়ার অভিযোগই বা কেন বৎসরের পর বৎসর হইতে থাকিবে? অন্ত রাষ্ট্রের ব্যবস্থা সম্বন্ধে তো কর্তৃপক্ষ সংবাদ লইয়াছেন। যদি দপ্তরে কর্মীর অভাবের জন্ত এই সব বিষয়ে সুব্যবস্থার পরিকল্পনা বাধা পাইতে থাকে, তবে এতদিনেও আরও কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা কেন হয় না? অভিযোগ যেখানে বাস্তব, অভাব যেখানে প্রত্যক্ষ, সেখানে এতদিনেও প্রতিকার কেন হইবে না?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আপাততঃ একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন তিন টাকা ও দুর্মূল্য ভাতা পাঁচ টাকা বাড়িবে—সুতরাং বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল না, কিন্তু উহা ধূমায়িত হইতে দেওয়াও সঙ্গত নহে, আশা করি 'পে কমিশনের' অনুমোদন প্রকাশিত হইলে সেইমত ব্যবস্থা করিতে বিলম্ব হইবে না।

———

ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকের ডায়েরী (৩)

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

পেশা নির্বাচনে সহায়তা ঃ

ছাত্র জীবনে সকলেই যাহাতে ভবিষ্যতের কর্ম-ক্ষেত্র বা পেশা নির্বাচন করিতে পারে, পেশার জন্য নিজকে উপযুক্ত ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে, সেজন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট পন্থা এদেশে অনুসরণ করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়া কেহ যেন বেকার হইয়া বসিয়া না থাকে। পেশা নির্বাচনের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ বিদ্যালয়ের জীবনেই আরম্ভ হয়; পরে আবশ্যিক সামরিক বিদ্যা গ্রহণের সময় দ্বিতীয় পর্যায়ে যাহাদের ভবিষ্যতে পেশা স্থির না হয় তাহাদিগকে (Employment office)এ যাইয়া 'ইন্টারভিউ' দিতে ও পেশা স্থির করিতে হয়। তদুপরি অভিভাবক সঙ্ঘও এ বিষয়ে সহায়তা করেন।

আবশ্যিক ও আনুসঙ্গিক বিদ্যালয়ের (Continuation schools)শিক্ষকগণ ছাত্রছাত্রীকে ভবিষ্যত জীবনের কর্মক্ষেত্র নির্বাচনে অবশ্যই সাহায্য করেন। বস্তুত আবশ্যিক শিক্ষা-ব্যবস্থার ইহা অঙ্গ। আবশ্যিক বিদ্যালয়ের উপরের ক্লাশে ছাত্রদিগকে "আমার ভবিষ্যত" বা অনুরূপ বিষয়ে রচনা লিখিতে দেওয়া হয়। পরে ক্লাশের সময় লিখিত রচনাকে কেন্দ্র করিয়া আলোচনা চলে। ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে ছাত্রদিগকে সজাগ করিয়া তোলা শিক্ষা ও শিক্ষকের অবশ্য করণীয় কাজ বলিয়া বিবেচিত হয়। পেশা নির্বাচনে যে সকল সমস্যা দেখা দেয়, আলোচনার দ্বারা সে সকলের সমাধান করা হয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ও কলেজের ছেলেমেয়েরা আপনাপন কর্মক্ষেত্র নির্বাচনে স্বভাবতই অধিকতর সজাগ থাকে। তাহারাও যাহাতে যুক্তিযুক্তভাবে কর্ম-ক্ষেত্র নির্বাচনে কোন ত্রুটি না করে, সেজন্য একাধিক পন্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে।

Vocational Guidance Bureau দেশে কর্ম সংস্থান ও বাবতীয় পেশা সম্পর্কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। দেশের যুবকদের প্রয়োজন ও রুচিকে কেন্দ্র করিয়াই এ জাতীয় সাহিত্য প্রচার করা হয়। ছাত্র ও অভিভাবক সকলেই সেগুলি পড়িয়া থাকেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপরের ক্লাশে পেশা নির্বাচন সম্পর্কে বিস্তারিত প্রশ্নমালা (questionnaire) দেওয়া হয়। ছাত্রেরা উত্তর লিখিয়া দিলে সেগুলি বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতার নিকট পাঠানো হয়। দেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা কোথায় কি আছে, কোন কাজের ভবিষ্যত কিরূপ প্রভৃতি বিষয়ে উর্ধ্বতন ক্লাশসমূহে আলোচনা হয়। অধিকাংশ ছেলেমেয়ে নিজেরাই নিজেদের কর্মজীবনের পথ বাছিয়া লয় এবং তাহাদের স্বনির্বাচন নিজেদের সামর্থ্যের অনুকূল হইলে তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়াই হইয়া থাকে। কিন্তু নির্বাচন ভুল হইলে পরপর একাধিকবার আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাহা সংশোধন করা হয়।

বিদ্যালয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিশেষ লক্ষ্য করা হয় :—

এক :—বিদ্যালয়ের জীবনেই ভাবী কর্মক্ষেত্র স্থিরীকরণ এবং তদনুরূপ শিক্ষা গ্রহণে ছাত্রছাত্রীকে সচেতন করিয়া তোলা।

দুই :—কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা দেশে যাহা আছে, সেগুলির যে কোন একটি গ্রহণ করিতে হইলে কিরূপ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, কোথায় তাহা সম্ভব,

খরচই বা কত, এবং বিভিন্ন পেশাতে ভবিষ্যৎ উন্নতি কতটুকু সম্ভব ইত্যাদি তথ্য পরিবেশন করা।

তিন :—ছাত্রছাত্রীকে নিজ নিজ রুচি ও প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলা।

চার :—কাহারো নির্বাচন যথাযথ না হইলে তাহাকে যথোচিত উপদেশ দেওয়া এবং উপযুক্ত পেশা নির্বাচনে সহায়তা করা।

পাঁচ :—একবার পেশা নির্বাচন হইলে, তাহা গ্রহণের কার্যকরী পন্থার নির্দেশ দেওয়া এবং পেশার উপযোগী শিক্ষা গ্রহণের প্রতিষ্ঠান বা কার্য ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা। শিক্ষকগণ এ সকল বিষয়ে সকলেই যথার্থ সহায়তা করেন।

ছয় :—প্রয়োজন হইলে ট্রেণিং-এর ব্যবস্থাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা এবং ট্রেণিং কলেজ বা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া দেওয়া। ট্রেণিং লইতে যাইবার সময় আর্থিক সাহায্য পাইতে হইলে সেই পথ দেখাইয়া দেওয়া।

সাত :—একবার কোন পেশা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলে পর ফলাফল অনুসরণ করা ; ট্রেণিং লইয়া জীবিকার ক্ষেত্রে যোগ দিবার পরও ফলাফল অনুসরণ করা হয় ; এবং প্রয়োজন হইলেই উপযুক্ত নির্দেশ দানে সাহায্য করা হয়।

এই প্রাচীন ডেমোক্রেটিক দেশে জীবিকার ক্ষেত্র নির্বাচন, তদনুরূপ শিক্ষাগ্রহণ এবং জীবিকার্জন প্রভৃতি বিষয়ে আন্তিবর্ণ উচ্চনীচ নির্বিশেষে সকলের সম্বন্ধে সমান যোগের সঙ্গে কর্তব্য পালন করা হয়। সুযোগের অভাবে কেহ জীবনে উন্নতি করিতে পারিল না—এরূপ ক্ষোভের কোন ক্ষেত্রই এদেশে নাই। জীবিকা নির্বাচনে উক্ত সহায়তা দান করার প্রধান লক্ষ্য এই যে দেশের কোন অধিবাসী যেন বেকার না থাকে বা আসন্তে জীবনযাপন না করে। কেহ সহসা কার্যক্ষেত্রে বেকার হইলেও সেই সময়ের ভাতা পাইয়া থাকে। ইহা রাষ্ট্রের দায়। কিন্তু বেকারকে সাহায্য করা আর বেকার হইতে না দেওয়ার পথ প্রশস্ত করা, এই দুইয়ের মধ্যে নীতিগত প্রভেদ আছে। সকলেই যাহাতে জীবিকার উপযোগী শিক্ষা পায়, সেই দিকেই সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। আবশ্যিক শিক্ষার সর্বশেষ যে রিপোর্ট হইয়াছে, তাহাও এসকল বিবেচনা করিয়াই করা হইয়াছে। আজ পৃথিবীর উন্নত অনুন্নত সকল দেশেই বেকার সমস্যার সমাধান ও জীবিকার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলিয়াছে, সুইডেন এ সকল সমস্যার সমাধান যে পথে করিয়াছে তাহাই এখানে আমার আলোচ্য।

ভারতবর্ষ সবে মাত্র স্বাধীন হইয়াছে। Employment Bureau আমাদের দেশেও আছে। পাঁচসালা পরিকল্পনায় দেশবাসীর কালের ও জীবিকার সংস্থানের কথাও ভাবা হইয়াছে এবং হইতেছে, কিন্তু প্রতি পেশার ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর কত লোকের কাজ হইতে পারে এবং সেই অনুযায়ী পেশার উপযোগী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে সজাগ হইতে হইবে। কৃষিপ্রধান দেশে সকল বেকার লোক গণনায় ধরা যায় না। শিক্ষার বিস্তার ও শিক্ষার মান উন্নয়ন অবশ্য প্রয়োজন, কিন্তু শিক্ষা লাভের পর কে কি ভাবে জীবিকার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, তাহাও আজ বিবেচনার বিষয়।

সম্প্রতি আর্থিক অনটন হেতু পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইবে। আসল কথা, এ সকল বিষয়ে জনগণের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার মাধ্যমেই এ সকল মৌলিক সমস্যার সমাধান আমাদিগকে করিতে হইবে। এ বিষয়ে দেশের শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষা বিভাগের দায় আছে।

স্তোকেশভাল শিক্ষা ব্যবস্থা

সুইডেনের সর্বত্র বিভিন্ন পেশার উপযোগী শিক্ষা দিবার প্রতিষ্ঠান ছড়াইয়া আছে। আমি এবার দেশের উত্তরাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ প্রদেশ মধ্যে নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানের কাজ দেখিয়াছি। উত্তরে নরবত্তেন প্রদেশের হাপারাণ্ডা

(Haparanda) শহরে বিবিধ কর্মশিক্ষার পেশা শিখাইবার প্রতিষ্ঠান আছে ; এই প্রতিষ্ঠানে নারীদের অবসরকালীন বয়ন শিখাইবার পৃথক ব্যবস্থা আছে। ইহাতে শহরের মেয়েরা অবসর সময়ে বয়ন শেখে। ইহার বৈশিষ্ট আছে। ছাত্রীরা বার বার ঘরের দরজা জানালা মেজে ও আসবাবপত্রের মাপ লইয়া আসে এবং নিজ নিজ আবাসের প্রয়োজনীয় জিনিস বয়ন করিতে শেখে, রঞ্জনও শেখে এবং তৈরি বস্ত্র সকল উপাদানের মূল্যে কিনিয়া লইয়া যায়। এরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের সর্বত্রই আছে। অবসর সময়ে সৌন্দর্যচর্চা ও নিজের প্রয়োজন পূরণ—এই দুইয়ের অদ্ভুত সমন্বয় এদেশবাসী সম্ভব করিয়াছে। সুইডিশ গৃহিণীরা বিশেষ করিয়া পল্লী অঞ্চলে অবসর সময়ে বয়নে তৈরি শিল্পবস্ত্রের দ্বারা আপনাপন ঘর সাজায়। যান্ত্রিকযুগে ব্যক্তিবিশেষের রুচি বিকাশের এই পথটি সুইডিশরা খোলা রাখিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানে একটি কিণ্ডারগার্টেনও আছে। মায়েরা শিশুদিগকে কিণ্ডারগার্টেনে দিয়া অবসর-কালে শিল্পচর্চা করেন।

ভোরবেলা হাপারান্ডা হইতে মোটর গাড়ী করিয়া পথে পথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া আমরা সন্ধ্যাকালে মাতারাঙ্গী (Mataroingo) নামক শহরে পৌঁছি। পথের শেষদিকটায় আমরা বোথানিয়াস উপসাগরের তীর দেশ বাহিয়া চলিয়া ছিলাম। উপসাগর এখানে ক্রমশঃ সুরু হইয়া নদীর আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। অপর তীরে ফিনল্যাণ্ডের ঘরবাড়ী স্পষ্ট দেখা যায়।

মাতারাঙ্গী শহরে Central Vocational High School আছে। প্রতিষ্ঠানে যাবতীয় শিল্প শেখান হয়। ইহা আবাসিক প্রতিষ্ঠান। সারা প্রদেশের ছাত্রছাত্রী এখানে বিবিধ শিল্প শেখে। কোন কোন কোর্স চারিবর্ষের, কোনটা দুই বর্ষের, আবার এক বৎসরের কোর্সও অনেকগুলি আছে। আবশ্যিক শিক্ষা সমাপন করিয়া জীবিকার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে এখানে পেশা আয়ত্ত করা হয়। এই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের পর আমাকে ও আমার সঙ্গীকে প্রধান পরিচালকের গৃহে আহারে আমন্ত্রণ করা হয়। ভদ্রলোকের গৃহিণী আমাদিগকে স্বাগত করিয়া ড্রইংরুমে লইয়া যান। গৃহিণী একাধিক বার আমার নাম, ভারতবর্ষে আমার কর্মস্থান প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। কারণটা আমি তখন যুক্তিতে পারি নাই। ভূরিভোজনের পর ড্রইংরুমে বসিয়া কফি পান কালে গৃহিণী একরাশ এলবাম আমার সম্মুখে টেবিলে স্থাপন করেন। পরে একটি পুরাতন এলবাম খুলিয়া তিনি ১৯২৮ সালে তোলা আমার ফটো দেখান, ফটোতে তিনিও ছিলেন। মহিলা এক সময়ে শিক্ষয়িত্রী ছিলেন এবং ঐ সালে মৈত্র-শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আমার সহপাঠিনী ছিলেন। পঁচিশ বৎসর পর আপন গৃহে আমাকে পাইয়া কী খুশি!

উত্তর অঞ্চলে পাজালা (Pajala) নামক শহরের Vocational Institute-এর কাজও দেখিয়াছি। ইহা আকারে পূর্ব প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা ছোট হইলেও বহুবিধ শিল্প শিখাইবার ব্যবস্থা এখানে আছে। এখানেও অবসরকালীন শিল্পচর্চার ব্যবস্থা আছে।

মধ্য সুইডেনে মালমবের্গেট (Malmberget) শহরে 'কোকেনস্তাস' প্রতিষ্ঠান দেখিয়াছি। দোমমার-ভেট (Dammarvet) নামক লৌহশিল্পপ্রধান অঞ্চলে Industrial Vocational School ও দেখিয়াছি। এই প্রতিষ্ঠানে বাস্তিক শিল্পকলার যাবতীয় জ্ঞান দেওয়া হয়—যাহাতে ছাত্রেরা পরে লৌহকারখানায় উপযুক্ত কাজ করিতে পারে। সকল প্রতিষ্ঠানেরই শিখাইবার ব্যবস্থাদি অতি আধুনিক।

দেশের অন্যান্য স্থানে যথা :—আলফ্রেডসহেম্ (Alfredshem) সেফ্‌লে (Saffle) কার্লস্টাড (Karlstad) প্রভৃতি স্থানের বহু ধরনের শিল্প-

বিভালয় আমার ঘুরিয়া দেখার সুযোগ হইয়াছিল ১৯৫২ সাল পর্যন্ত এদেশে পেশাদারী শিক্ষায়তনগুলির হিসাব দিতেছি :—

বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
১। কেন্দ্রীয় উচ্চ শিল্প প্রতিষ্ঠান (Central Vocational High School)	১৯	২,৬১৭
২। কর্পোরেশন্ পরিচালিত শিল্প বিভালয়	৩৯১	৮৫,৭০৭
৩। উচ্চ টেক্‌নিক্যাল শিক্ষায়তন (Higher Technical High School)	১৫	৩,৭২০
৪। কম্যার্শিয়্যাল উচ্চ বিভালয়	১৭	২,৪৮২
মোট সংখ্যা—	৪৪২	১৪,৫২৬

উপরে ৪৪২টি বিবিধ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহা ছাড়াও বিশেষ বিশেষ বিষয়—পেশার উদ্দেশ্যে শিখাইবার পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠান আছে। ১৯৫২ সালের হিসাব অনুযায়ী সাকুল্যে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৫০৬টি এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল মোট ১০৫,৭৫৭।

কৃষি, গোপালন, বাগানের কাজ ইত্যাদি শিক্ষা দিবার জন্ত যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদের হিসাব ও ছাত্র সংখ্যাও এখানে দিতেছি :—

বিভালয়ের ধরন	ছাত্র সংখ্যা
১। কৃষিবিভালয়	৩২৭
২। কার্ষ পরিচালনার প্রতিষ্ঠান (Farm School)	২০১৫
৩। পল্লী গৃহবিজ্ঞান বিভালয় (Rural Domestic School)	১০০০
৪। পেশাদারী কৃষি বিভালয় (Agricultural Vocational School)	১৪১
৫। গো-পালন বিভালয় (Dairy School)	৭০
৬। বাগ-বাগিচার স্কুল (Horticultural School)	৮৮
মোট	৩৭২১

দেশে বনবিদ্যা শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও আছে।

বিভালয়ে শরীর চর্চা ও স্বাস্থ্যরক্ষা

এদেশের রাষ্ট্রপরিচালিত বিভালয় মাত্রেই শরীর চর্চার (Health culture) ব্যবস্থা আছে। আবশ্যিক ও মাধ্যমিক বিভালয় মাত্রেই ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতির বিবিধ পন্থা অনুসরণ করা হয়। এজন্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের অর্থ চাহিলেই পাইয়া থাকেন, নতুবা নিজেরাই এ কাজ করেন। বস্তুতঃ শতকরা নিরানব্বইটি আবশ্যিক ও মাধ্যমিক বিভালয় রাষ্ট্রের অর্থে শরীরচর্চা বিভাগের কাজ সম্পন্ন করেন, কিন্তু চিকিৎসাদির ব্যবস্থা সমাজমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হয়।

বোরদেজে (Borlange) নামক শহরে তথাকার বিভালয় সমূহের প্রধান চিকিৎসক ডক্টর হাগেনষ্টেড্ (Dr. Hageusted) মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করিয়া এ বিষয় আমি যতখানি বুঝিয়াছি, তাহাই বলিতেছি। তিনি আমাকে ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্যের বিষয় কি ভাবে রেকর্ড করা হয় তাহা বুঝাইয়া দেন। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের নামে Health card আছে। সমগ্র দেশের সকল বিভালয়ে ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্যতথ্য সম্বন্ধে রেকর্ড করা হয়। শিক্ষাবিভাগ হইতেই এ ব্যবস্থা বহাল করা হইয়াছে। অবশ্য বিশেষ অঞ্চলের বিভালয়ের চিকিৎসক অতিরিক্ত Health card রাখিতে চাহিলে তাহা করিবার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু শিক্ষাবিভাগের নির্দেশ পালন না করিলে রাষ্ট্রের সাহায্য পাওয়া যায় না। আবশ্যিক বিভালয়ে সাত বৎসর বয়সে ছেলেমেয়ে প্রবেশ করিলেই তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া Health card লিখিয়া রাখা হয়। কোন ছাত্র বা ছাত্রী বিভালয় পরিবর্তন করিলে বা এক বিভালয়ে শিক্ষা

সমাপ্ত করিয়া অন্য বিদ্যালয়ে যোগ দিলে তাহার Health cardও সঙ্গে যায়। প্রতি বৎসর কখনও একাধিকবার ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষানৈতিক জীবনে উনিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রতিজনের স্বাস্থ্যতথ্য কার্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়। পরে এই কার্ডগুলি জাতীয় বাওলজিক্যাল ইনস্টিট্যুটে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখানে শরীরতত্ত্ববিশারদেরা এগুলি গবেষণার কাজে লাগান।

Health card-এ একটি স্থান থাকে, সেখানে জন্ম হইতে বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের স্বাস্থ্যতথ্য পিতামাতার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া পূর্ণ করা হয়। এসকল কাজ যথাযথ সম্পন্ন করিবার জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করা হয়। যথা :—

এক :—ছাত্রছাত্রীর পিতামাতা বা অভিভাবকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করা হয়।

দুই :—বিদ্যালয়ে চিকিৎসক ছাড়া পৃথক নার্স থাকেন। নার্স চিকিৎসকের কাজ সুসম্পন্ন করিতে সাহায্য করেন।

তিন :—নার্সেরা ঘন ঘন ছাত্রছাত্রীর বাড়ী যাইয়া প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন।

চার :—বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ একাজে সহায়তা করেন।

পাঁচ :—কোন ছাত্র বা ছাত্রী হঠাৎ অসুস্থ হইলে বা দুর্ঘটনায় আহত হইলে বিদ্যালয়ের চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার কাজ করেন।

ছয় :—ছাত্রছাত্রীর মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসার ব্যাপারে বিদ্যালয়ের চিকিৎসক, নার্সেরা, ছাত্রের অভিভাবক, শিক্ষক ও মনস্তত্ত্ববিদেরা একযোগে কাজ করেন।

ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থাগুলি শিক্ষার মৌলিক অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই কাজের মাধ্যমে গৃহ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। দেশবাসীও এই স্বাস্থ্যসেবাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করেন। স্বাস্থ্যসেবার কাজও এদেশে অতি নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করা হয়। আর এই সেবাকার্যের ফলও প্রত্যক্ষ করা যায়। দেশের শিশুমৃত্যুর হার ও রোগশোকের স্বল্পতা ইহার প্রমাণ। এদেশের স্কুল-ডক্টরেরা মনে করেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিদ্যালয়ের চিকিৎসকগণ পরস্পরের সহযোগিতা করিলে সমগ্র মানবসমাজের শিশু স্বাস্থ্যের ব্যাপক উন্নতিসাধন সম্ভবপর। অবশ্য World Health Organization একাজে ব্রতী আছেন।

এদেশে কাহারও নিরক্ষর থাকা সম্ভব নয়। অসুস্থ শিশুকে শিক্ষা দিবার জন্য 'সেনাটেরিয়ম' বিদ্যালয় আছে। আমি ঘানার তালাকার্লিয়া নামক প্রদেশের হগবো (Hogbo) নামক স্থানে একটি কেন্দ্রীয় সেনাটেরিয়ম বিদ্যালয়ও পরিদর্শন করিয়াছিলাম। সেখানে শিশুদের চিকিৎসা হয় এবং যাহারা সমর্থ তাহাদের বিদ্যালয়ও পরিচালনা করা হয়।

সুইডেন বা অন্যান্য উন্নত দেশের মত ভারতবর্ষের সমগ্র শিশুদের স্বাস্থ্য বিধানের ব্যবস্থা হয়তো শীঘ্র গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়, কিন্তু একদিন তাহা সম্ভব হইবে এ ভরসায় এবিষয়ের আলোচনা করিলাম।

ক্ষেতখামার পরিচালনার শিক্ষা

কৃষি, গোপালন প্রভৃতি বিষয় শিক্ষার জন্য এদেশে যত প্রকার প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের হিসাব পূর্বে দিয়াছি। সম্প্রতি আমি লিন্‌চপিন (Linkoping) নামক শহরে আসিয়াছি। শহরের বাহিরে পল্লী অঞ্চলে ক্ষেতখামার পরিচালনা শিক্ষা দিবার দুইটি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম পরিদর্শন করিয়াছি। কৃষি-গোপালন প্রতিষ্ঠানের আকর্ষণ আমার আছে, তাহার কারণ আমার জন্ম পল্লীর গৃহস্থ পরিবারে; সেজন্য পৈত্রিক অধিকার সূত্রে

এবিষয়ে আমার আগ্রহ প্রবল। তাছাড়া আমাদের "সুজলা সুফলা" ভারতভূমি খাদ্যবস্তুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ক্রমবর্ধমান দেশবাসীর খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা ব্যাপক ও উন্নত না হইলে আমাদিগকে সর্বদাই পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে, দেশের দারিদ্র্যবোঝা কঠিন হইবে, দেশ ও সমাজগঠনের কাজও বিলম্বিত হইবে।

প্রতিষ্ঠান দুইটিই শহরতলীর রিমফর্ন (Rimforna) নামক স্থানে অবস্থিত। একটি farm-home-management কলেজ, অন্যটি farm-home-management স্কুল বিশেষ। কলেজে যাহারা শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহারা পরে কৃষি-সমিতি পরিচালনা করে। আর স্কুলে কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েরা হাতে কলমে উন্নত কৃষির কাজ শেখে যাহাতে দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের ক্ষেতখামার চালাইতে পারে। কলেজে তিনটি পৃথক পৃথক কার্য আছে। খামার ও গৃহস্থালীর কাজ, (Farming, cookery and animal care); রান্নাবান্না ও গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজ (cookery and domestic duties) এবং ফলবাগ রচনা ও পরিচর্যা, বাড়ীর বাগান ও মেয়েদের শিল্প।

প্রতিবৎসর ১লা অক্টোবর কোর্স আরম্ভ হয়। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শেখান হয় :—(১) খাদ্যবস্তুর বিজ্ঞান ও পুষ্টির জ্ঞান (২) রান্নার কৌশল (৩) ব্যাকটেরিয়োলজি (৪) পদার্থবিজ্ঞান (৫) রসায়নশাস্ত্র (৬) শরীর বিজ্ঞান (৭) স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান (৮) রোগী ও শিশুর পরিচর্যা (৯) গৃহ-সংরক্ষণ (১০) গৃহস্থালীর ব্যয় নির্ধারণ ও হিসাব সংরক্ষণ (Household Economy and Book-keeping) (১১) সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি (১২) দুগ্ধ সংরক্ষণ (১৩) গৃহপালিত পশুর যত্ন (১৪) কৃষি ও ফলবাগ বিজ্ঞান (১৫) কার্যের প্ল্যান করা ও অঙ্কনবিদ্যা (১৬) বয়নের তাত্ত্বিকজ্ঞান (১৭) ডিজাইন ও উপাদানজ্ঞান (১৮) শিশুশিক্ষা বিজ্ঞান ও শিক্ষাদান পদ্ধতি। তাত্ত্বিক বিষয়ের জন্য মোট ৮০০ ঘণ্টা।

হাতে কলমে শিখিতে হয় (১) গৃহস্থের যাবতীয় দৈনন্দিন (২) কাচা গৃহের যত্ন (৩) গো-শালার যত্ন (৪) অন্যান্য গৃহপালিত পশুর যত্ন (৫) কৃষি-ক্ষেত্র প্রস্তুত করণ ও বাগানের কাজ, (৬) বয়ন ও সূচীকর্ম। হাতে কলমে দুইবৎসরে ৪০০০ ঘণ্টা কাজ শিখিতে হয়।

প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইতে গেলে নিম্নলিখিত গুণ ও বিদ্যা থাকা প্রয়োজন :—

বয়স—বিশ, স্বাস্থ্য—উত্তম, আবশ্যিক শিক্ষা-সমাপ্তির সার্টিফিকেট অথবা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের নিদর্শন পত্র, অথবা জনতা কলেজে শিক্ষাসমাপ্তির নিদর্শন পত্র, Farm-home-management স্কুলের শিক্ষাসমাপ্তির নিদর্শন পত্র, তাছাড়া কমপক্ষে খামার পরিচালনার এক বৎসরের অভিজ্ঞতা।

যাহারা দ্বিতীয় কোর্সে রান্নাবান্নার কার্যে যোগ দেয় তাহাদের পূর্বে কোন প্রতিষ্ঠানের রান্না ও ভোজনশালা পরিচালনার অথবা নিজবাড়ীতে রান্নাবান্নার কাজের ন্যূনতম এক বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন।

তৃতীয় কোর্সে ভর্তি হইতে হইলে নিজ খামার বাড়ী পরিচালনার ন্যূনতম এক বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকা চাই; যাহারা ফলবাগ ও হাতের কাজ শিখিবে, তাহাদেরও এক বৎসরের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

এই কোর্সের শিক্ষার যাবতীয় খরচ যথা বেতন, খাওয়া, থাকা বাবত সর্বসমেত মাত্র ১৫০০ ক্রাউন অর্থাৎ ১৫০০ টাকা লাগে অর্থাৎ প্রতি মাসে ১৩০৲ টাকার মত খরচ। রাষ্ট্র কোষ হইতে শিক্ষকদের মাহিনা ও প্রতিষ্ঠান চালাইবার জন্য প্রতি বৎসর ১৪,০০০ ক্রাউন দেওয়া হয়।

শিক্ষার কাজ পরিচালনা করেন অধ্যক্ষ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী। মাঝারি আকারের তেয়ারি অর্থাৎ দুগ্ধাধিক গাই ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু ও একটি বৃহৎ বাগান আছে; ছাত্রছাত্রী হাতে কলমে বাগানে কাজ শেখে।

এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান সুইডেনে চল্লিশটি আছে। গবর্নমেণ্ট প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য পাঁচজন সদস্য দ্বারা একটি পরিচালক বোর্ড গঠন করিয়া দিয়াছেন। এই বোর্ড প্রতিষ্ঠানের নীতিগত প্রশ্ন ও দেশের সামগ্রিক কৃষকজীবন উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তব্য স্থির করেন।

আমি বিশেষ কারণে এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সহানুভূতির সহিত পর্যবেক্ষণ করিয়াছি। কারণ আমাদের দেশে কৃষির উন্নতির জন্য সার ও বীজের উপরই জোর দেওয়া হইতেছে, প্রগতিসম্পন্ন কৃষক-জীবন গঠনের কোন প্রচেষ্টা আমাদের দেশে নাই। কৃষকদেরও যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন, এ বোধ আমাদের নাই। ফলে আমাদের দেশে যে হারে কৃষিকলেজে পাশ করা কৃষিপণ্ডিতের সংখ্যা বাড়িতেছে সেই হারে কৃষকজীবন সংস্কারের প্রচেষ্টা নাই। আমাদের কৃষির উন্নতি করিতে হইলে কৃষকজীবনকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, ইহা আমার বদ্ধমূল ধারণা।

১৯৩০ সাল পর্যন্ত কৃষিই সুইডেনের বৃহত্তম শিল্প ছিল, কিন্তু পরে ইমুস্ট্রাস্ট্রি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। কৃষি এখন শতকরা ত্রিশজন অধিবাসীর পেশা। কিন্তু অপর পক্ষে কলল দেশে পূর্বাপেক্ষাও বাড়িয়াছে। বস্তুতঃ কৃষি সুইডেনের সমগ্র অধিবাসীর খাদ্য উৎপন্ন করে। সাধারণতঃ প্রতি বৎসর শতকরা দশ ভাগ শস্য বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়, কিন্তু অন্য পক্ষে দুগ্ধজ দ্রব্য, ডিম, শূকরের মাংস প্রচুর পরিমাণে বিদেশে চালান দেওয়া হয়।

সুইডেনের সমগ্র ভূভাগের মাত্র দশ ভাগ কৃষির উপযোগী অর্থাৎ নয়ভাগে চাষ আবাদ চলে, আর এক ভাগের সামান্য অধিক অংশ গোচারণ ভূমি। চাষ-আবাদ ও পো-পালন সুইডিশ কার্মের দুইটি দিক। প্রধান ফসল ওট (oat), গম (wheat), রাই (rye) বার্লি (barley) আলু ও বিট। এ সকল ফসল দেশের প্রায় অধিকাংশ চাষীই উৎপন্ন করে, সেজন্য এ দেশের কৃষকগণকে mixed farmer বলা হয়। সাধারণতঃ কৃষকেরা কয়েক একর জমিতে চাষ আবাদ করে এবং কয়েকটি গাই ও শূকরও পালন করে। সুইডেনের কৃষির বৈশিষ্ট্য এই যে, অনেক কৃষক কৃষির সঙ্গে বনের কাজও করিয়া থাকে। সুইডেনের দক্ষিণ প্রদেশ 'স্কোনে' বা 'স্কানিয়া' (scania) কৃষির জন্য বিখ্যাত এবং কৃষকদের খামারের আকারও সে অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বড়; সে অঞ্চলে বনের কাজ বড় হয়ই না। কিন্তু দেশের উত্তরাঞ্চলের কৃষকেরা সাধারণতঃ পাঁচ একর হইতে দশ একর জমির চাষ করে, আর কৃষিক্ষেত্রের সন্নিকটে বন রাখিয়া বনের পরিচর্যা করে। বনের আয় সামান্য নয়।

বড় বড় কার্মে মেসিনের দ্বারা চাষ আবাদ হয় কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কার্মে কতক কাজ মেসিনের সাহায্যে ও বাকী হাতে হয়। কৃষকদের কো-অপারেটিভ সংস্থা আছে, এই সংস্থা দেশের স্থানে স্থানে কৃষিযন্ত্রাদির ষ্টেশন রাখিয়াছেন। ষ্টেশনে আধুনিক কৃষিযন্ত্রাদি মজুত থাকে। চাষীরা প্রয়োজনমত ষ্টেশনকে জানাইলেই লাঙ্গল মই দেওয়ার, ফসল কাটার কাজ মেসিনে করাইয়া দিয়া যায়। প্রতিটি কাজের হার ঠিক করা আছে। শীতকালে চাষ চলে না, তখন ষ্টেশনের কাজ গাছ কাটা, ও কাটা গাছ স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া। এই উভয়বিধ কাজ মেসিন-ষ্টেশন করে বলিয়া খরচের পড়তাও কম পড়ে।

সেদেশে নিয়ম আছে যে, যাহারা হাতে কলমে কৃষির কাজ করিবে, কৃষিই যাহাদের পেশা, মাত্র তাহারাই কৃষিক্ষেত্র কিনিবার অধিকারী। এ

সম্পর্কে আইন আছে। এই আইনের উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা কৃষক হইতে চায় না, শুধু লাভের জন্য অপর লোক দ্বারা চাষ আবাদ করে তাহাদের হাতে যেন কৃষিভূমি না যায়।

এবার আমি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু কৃষি-বিদ্যালয় দেখিয়াছি। উত্তর সুইডেনে Vojakkala, মধ্য সুইডেনের Trillingeta, Vaasbo প্রভৃতি বিখ্যাত কৃষিপ্রতিষ্ঠানের কাজ ভাল করিয়া দেখিয়াছি। এ দেশের কৃষক-পরিবারের ছেলেমেয়েরাই কৃষিপ্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান ও অর্থনীতি-সম্মত কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করিতে আসে—যাহাতে তাহারা নিজ নিজ কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি করিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে আমাদের অবস্থা বিপরীত। আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা কৃষিবিদ্যা শিখিতে যায়;—আদর্শ কৃষক-জীবন তাহাদের উদ্দেশ্য নয়, সরকারী চাকরী তাহাদের লক্ষ্য।

সুইডেনে কৃষিসংক্রান্ত বিবরণ দিবার জন্য একটি একটি বোর্ড আছে (The agricultural Information Board), কৃষিসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তাঁহারা কৃষকদিগকে দিয়া থাকেন।

কৃষি-মূলক সংবাদপত্র দেশে একাধিক আছে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃষকসমিতির মুখপত্র—The Agricultural Association Magazine। ইহা সাপ্তাহিক কাগজ। ইহার গ্রাহক সংখ্যা—৩৭৫২০০। সেই দেশের কৃষকসমাজ কতখানি প্রগতিসম্পন্ন, তাহা এই গ্রাহক সংখ্যা হইতে অনুমান করা যায়।

প্রতি সপ্তাহে তিন দিন কৃষির সমস্যা সম্পর্কে রেডিওতে বিশেষজ্ঞগণ আলোচনা করেন। রেডিওর মাধ্যমে একটি কোর্সও চালনা করা হয়। জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির উপায় প্রভৃতি বিষয়ে চিঠিপত্রের মাধ্যমেও কোর্স চালনা করা হয়। বহু কৃষক এই কোর্সে যোগদান করে।

SOL নামক একটি ফিল্ম কোম্পানী আছে; এই কোম্পানীর উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি ও কৃষকজীবনের চিত্র ফিল্মে করিয়া যাবতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কৃষিসমিতিতে দেখান হয়। দেশের যাবতীয় কৃষি ও কৃষি শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করেন—Education Bureau। কিন্তু কৃষিমন্ত্রণালয় কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করেন।

আমাদের দেশের জমি ও জলবায়ু কৃষির পক্ষে যত অনুকূল, উত্তর ইউরোপের দেশ তত নহে, কিন্তু শিক্ষা ও প্রগতির গুণে সেই সকল দেশের কৃষি-জীবন উন্নত।

এ দেশে সামগ্রিক পল্লী সংগঠনের আদর্শ পরাধীনতার আমলেই রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতন স্থাপনের মধ্য দিয়া দেশবাসীর নিকট রাখিয়া গিয়াছেন। এখন ত দেশ স্বাধীন। দেশের চাষী-জীবনের প্রগতির উপরই দেশের উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করিতেছে।

অবকাশ বিনোদন ও শিল্প চর্চা

খাওয়া পরা ও জীবিকা-অর্জনের ক্ষেত্রের বাহিরেও আত্মবিকাশের পথ সাধারণ মানুষেরও সৃজনধর্মী স্বভাব খোঁজে। পৃথিবীর যে সকল দেশে এক-নায়কত্ব আছে সেই সকল রাষ্ট্রে নায়কের নির্দেশে গণজীবন পরিচালিত হয়, কিন্তু ডেমোক্রেটিক দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকে; সেজন্য সকলেই যার যার রুচি অনুযায়ী সৃজনমূলক কাজে—চিন্তায় ও শিল্প-চর্চায়—আত্মবিকাশের পথ খুঁজিতে পারে, সমাজের জন্য সেই পথকে সুগম করিয়া রাখে; না করিলে সেই সমস্ত আলস্যে বা সমাজমঙ্গলপরিপন্থী কাজে নিয়োজিত হয়। সুইডেনের সমাজবিদ শিক্ষাবিদ ও প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারকেরা ইনডাস্ট্রিয়েল রিভলিউশন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। গৃহশিল্প চর্চার পথ জাতীয় জীবনে সুগম করিবার জন্য ১৮৬০ সালেই আন্দোলন সুরু হয়। প্রাচীন ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ কালমার (Kalmar)

নাবক শহরে ১৮৬৩ সনে শিল্পগৃহ স্থাপিত হয়। গৃহশিল্পের জাতীয় সংস্থার (Home Craft Association) উদ্যোগে দেশের সর্বত্র শিল্পচর্চার পথ সুগম হয়। এখন দেশের প্রতিটি প্রদেশে একাধিক শিল্পসংস্থা কাজ করিতেছে। প্রত্যেক কাউন্টিতে এক একটি শিল্পসঙ্ঘ আছে, আর সর্বোপরি জাতীয় শিল্পসংস্থা (The National League of Swedish Home Craft Association)। এ সম্পর্কে সুইডেন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন :—

"One feature that distinguishes the Home Craft movement in Sweden is the extremely important contribution made by the women of the country both in the matter of initiative and organisation and with regard to the work of production."

এই আন্দোলনের গোড়ার দিকে কৃষকপরিবারই শিল্পচর্চাকে অবশ্য করণীয় কাজ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু পরে শ্রমিকেরাও শিল্পচর্চার অনুরাগী হইয়া উঠে।

শতাব্দীব্যাপী জাতিগতভাবে শিল্পচর্চার ফলে সুইডিশ নাগরিকদের জীবনযাত্রায় যে সুষমা দেখা দিয়াছে, তাহা বস্তুতই অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে দেখা যায় না। বহু ইউরোপীয় দেশ দেখার পর এই সত্যটি আমার নিকট প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, যার ফলে একসময়ে (১৯৩৩-৩৪ সালে) আমি সুইডেনের জাতীয় শিল্পসঙ্ঘের পরামর্শ কামনা করিয়াছিলাম। তখন একাধিক সঙ্ঘ পরিচালকের সঙ্গে আমার যোগ ঘটিয়াছিল, ফলে সুইডেনের সুইজন শিল্প পারদর্শিকাকে নাগিনিকেতনে পাঠানো সম্ভব হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে তথা পূর্বদেশমাত্রেই কারুশিল্পের অপূর্ব ঐতিহ্য আছে। স্বাদেশিকতা ও জাতীয় জাগরণের ফলে স্বদেশী শিল্পের পুনর্জীবন লাভ সম্ভব হইয়াছে। এখন নূতন নূতন ভাবধারায় আমাদের শিল্পজীবনকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে—দেশময় লোকজীবনে ছড়াইয়া দিতে হবে। কারু-শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা ও লোক-কল্যাণের সঙ্ঘ পরিচালনার কৌশল আমাদিগকে আয়ত্ত করিতে হইবে। সমাজ গঠন করিতে হইলে নাগরিকদের অমলন করিয়া তোলা একটা বড় কাজ, আর এই কাজ শিল্পচর্চার মাধ্যমে সহজ হয়; কারণ সৃজনমূলক শিল্পচর্চায় মানুষের মন যেরূপ সজীব হইয়া উঠে, তেমনি অন্যভাবে সম্ভব হয় না। সেজন্যই সুইডেনের গৃহশিল্প ইতিহাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইয়াছে।

সুবেড ঐতিহাসিক Nilo Lithberg ১৯৩০ সালে লিখিয়াছিলেন :—No other country in Europe, and indeed no other country outside Europe, has been able to show a textile home craft in such rich variety as Sweden. None of the old methods of art weaving would seem to be entirely lacking in Sweden. It is a noble heritage that Swedish home craft has made it its task to preserve. Nearly every region throughout the wide domain of Sweden has created for itself its own traditions; and it is there that we have called the local characteristics of home craft. The swedish home craft movement has attained an ever fuller consciousness of what the local character of the craft consist in, and has come to feel more and more serious responsibility that these regional units should be able to preserve, as far as possible, their identity in the practice of art. Above all, this endeavour which is national in the deepest sense of the term, has been promoted in the local Home Craft

Associations. Many of the fighting cocks of arts and crafts ask how long home craft will be able to hold its own under the increasing pressure of industrialization in our times, or ever whether home craft has any justification whatever for its continued existence. One point, however, it would seem impossible to dispute ; and that is that, if home craft is to be continued in being as a living force, it will also continue to possess an altogether special strength so long as it maintains its safe anchorage in the tradition that has been created within each several regions by past generation.

ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস পদ্ধতিতে স্বাধীনতা আসিয়াছে, গঠনমূলক কার্যের আদর্শ রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা রাখিয়া গিয়াছেন। সুখের বিষয় মহাত্মার উদ্যোগে দেশে সর্বভারতীয় কাটুনিসঙ্ঘ (All-India Spinners Association) ও সর্বভারতীয় পল্লী শিল্পসঙ্ঘ (All-India Village Industries Association) দেশে শিকড় গাড়িয়াছে। জাতীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে এই উভয়বিধ সঙ্ঘের আরব্ধ কাজ দেশে বিস্তার লাভ করিবে, এরূপ আশা করা অন্যায় নয়।

এবার (১৯৫৩ সালে) সুইডেন পরিক্রমাকালে আমি দুই গৃহশিল্প প্রতিষ্ঠান দেখিয়াছি, প্রথমটি Stjarnond নামক স্থানে অবস্থিত। এ প্রতিষ্ঠানে art-weaving শেখান হয়। গৃহশিল্পদক্ষ সম্প্রতি যাবতীয় প্রাচীন বয়ন কৌশলের (old designs) বিশাল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এই মূল্যবান গ্রন্থের এক কপি আমিও কিনিয়াছি। প্রাচীন কালের যাবতীয় বয়নের ডিজাইন গ্রাফ করিয়া গ্রন্থে চিত্রিত। দ্বিতীয়টি একটি পশমের সুতা তৈরির কেন্দ্র - Stora Skedvi নামক স্থানে অবস্থিত। ইহা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৬ সালে। ১৯৪৭ সালে এই প্রতিষ্ঠান গৃহশিল্পসঙ্ঘের অধিকারে আসে। এই প্রতিষ্ঠানের দুইটি কাজ, গৃহস্থেরা বিশেষতঃ মেষপালকেরা তাহাদের ভেড়ার লোম এখানে পাঠাইয়া দেয় ; এই লোমে পশমের সুতা করিয়া গৃহস্থদিগকে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে উৎকৃষ্টতর লোম পাওয়ার ব্যবস্থাদি সম্পর্কেও পরামর্শ দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, এখানে পশমের কাপড় বুনিয়া ব্যবসাও করা হয়। ১০০২ তকলি (Spindle) এই ফেক্টরীতে চালু আছে এবং কর্মীর সংখ্যা ৬০ জন।

সুইডেনের অধিকাংশ শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই অবসর বিনোদনের জন্য শিল্পচর্চার পৃথক বিভাগ আছে। প্রতিষ্ঠান সমূহের তাঁতের সংখ্যা বাদ দিলেও সংখ্যায় বহু সহস্র তাঁত গৃহস্থ বাড়ীতে আছে।

জনতা কলেজ

এই শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্কান্ডেনাভীয় দেশসমূহ প্রসিদ্ধ।

এবার সুইডেনের উত্তরাঞ্চলে ভেস্টেরনরল্যাণ্ড (Vesternorrland) নামক প্রদেশে ঘুরিবার কালে হাম্পসেন (Hampnese) নামক স্থানে একটি জনতা কলেজও পরিদর্শন করিয়াছি। এই কলেজের বার্ষিক বাজেট ১১৫০০০ ক্রাউন (এক ক্রাউন এক টাকার সমান)।

সুইডেনে সাধারণতঃ আবশ্যিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কর্মজীবনে প্রবেশের পূর্বে দলে দলে তরুণ-তরুণী এইরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়—পাশ করার উদ্দেশ্যে নয়—নিজের জীবনকে জ্ঞানে ও কর্মে সমৃদ্ধ করিবার জন্য। ১৯৩০ সালে ল্যাপল্যাণ্ড গমনের পথে Sunderbyn নামক স্থানের জনতা কলেজে বক্তৃতা করিয়াছিলাম। জনতা কলেজের জীবনের অভিজ্ঞতা সেই আমার

প্রথম। পরে আমি সুইডেনের, ডেনমার্কের ও নরওয়ের বহু জনতা কলেজে গিয়াছি। জনতা কলেজে গেলেই আত্মীয়তার পরিবেশটি মনকে আকর্ষণ করে।

জনতা কলেজের জন্ম ডেনমার্কে। ইহার ইতিহাস এইরূপ : "In connection with the national revival that swept over Denmark in the 1860's, Grundtvig, the father of the Danish folk high school, urged the need for a form of school, that would give the people a national education, in contrast to the onesided classical education provided at the grammar schools and universities."

Grundtvig এর আহ্বানে সমগ্র স্কানডিনেভীয় দেশগুলিই সাড়া দিয়াছিল কিন্তু সুইডেনের "ফলক্ হইগ স্কোলা"গুলি (Folkhogskola) স্বতন্ত্র নীতিতে আবর্তিত হইয়াছে।—

It is, however, as well to point out at the outset that the folk high school in Sweden has followed independent lines and has not been modelled on the Danish pattern.

১৮৬৮ সালে প্রথম Ostergotland নামক প্রদেশের Herrestad শহরে এক Onnestad, Hirlan, Akarp নামক স্থানে সুইডেনের প্রথম জনতা কলেজগুলি স্থিতিলাভ করে। সেই কলেজের আদর্শ ছিল এইরূপ :

"A school in which a youth may be given instruction for the improvement of his mind as well as for the practical affairs of life, a school in which he may acquire general knowledge, decide what occupation he is best suited for, learn to respect work, and to take pleasure in working himself, and gain the realization that it is not only as an official or an employee that one becomes a good and useful citizen."

জন-উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৮৬৮ সাল স্মরণীয় বৎসর। প্রায় শত বর্ষ পরে আজ সুইডেনে ৬৬টি জনতা কলেজ চলিতেছে, আর প্রতি বৎসর এগার হাজার ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করিতেছে। সুইডেনের জনতা কলেজে আজকাল ভাষা, সাহিত্য, বিদেশী ভাষা, পৌরতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, শরীর বিজ্ঞান, খেলা, জিমনাস্টিক ইত্যাদি বিষয় শেখান হয়। বৎসরে দুইটি কোর্স হয়—গ্রীষ্মকালে ও শীতে। জনতা কলেজের স্থানীয় বিশেষত্ব আছে। নিজ নিজ খেলার সামাজিক ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও ছাত্রছাত্রীকে ওয়াকিবহাল করা হয়। গ্রীষ্মকালীন কোর্সে মেয়েদিগকে গৃহস্থালীর কাজ, রন্ধন, সেলাই শেখান হয়, এমন কি বাগানের কাজও অনেকে শেখে। এই হেল্পাসেশ কলেজে পরীক্ষা-মূলকভাবে দুইশত আপেলের গাছ ও বেরিগাছ এবং অন্যান্য অনেক রকম সবজির গাছ লাগানো হইয়াছে—যে সকল গাছ সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত দক্ষিণাঞ্চলেই হয়। স্বাধীন ও সজীব সমাজের এইটি বড় লক্ষণ; পরীক্ষা করিয়া দেখার মনোবৃত্তি সর্বত্রই দৃষ্ট হয়।

সুইডেনের জনতা কলেজে ছাত্রছাত্রীর ভীড় লাগিয়াই আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, যুবক যুবতী জনতা কলেজে যোগ দেয়—পাশ করার কৃতিত্ব অর্জনের জন্য নয়, নিজের জীবনকে সমৃদ্ধ করার তাগিদেই যোগ দেয়। জনতা কলেজগুলির আর একটি বিশেষত্ব এই যে ছাত্র ও অধ্যাপকদের সম্পর্ক নিবিড় ও মধুর, যার ফলে অধ্যাপকগণ ছাত্র-ছাত্রীকে অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হন। জনতা কলেজের শিক্ষা সম্পর্কে একজন বিদেশী শিক্ষাবিদ লিখিয়াছেন :—

"Sweden has discovered a formula of social humanities which instead of producing embittered intellectual

misfile, furnishes the nation with men attached to their work and class in spite of the level of their learning or to be more exact, just because of an assimilated sagacity."

ভারতবর্ষের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা এরূপ যে পরীক্ষায় পাশ করাই যেন জীবনের লক্ষ্য, যেন প্রকৃত চরিত্রবান মানুষ হওয়ার প্রয়োজন নাই, জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞানের দ্বারা জীবন সমৃদ্ধি অপেক্ষা পাশের ছাপের মূল্যই বেশী। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের জীবনকে সমাজকেন্দ্রিক করিতেছে না; আর আত্মকেন্দ্রিক অধিবাসীর পক্ষে সমবায় পদ্ধতিতে সংগঠনমূলক কাজের দ্বারা সমাজের ও দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধনের আকাঙ্ক্ষা বিড়ম্বনা বলিয়াই মনে হয়। এবিষয়ে আজ দেশের শিক্ষানীতিবিদদের দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে। স্কানডিনাভীয় জনতা কলেজের অনুকরণে আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থা হোক্ এরূপ বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু জনতা কলেজের আদর্শকে যাচাই করিয়া তরুণ-তরুণীর জীবনকে সমৃদ্ধ করার পথ নির্ণয় করার প্রয়োজন অবশ্যই আছে।

"সেই যে আমার নানারঙের দিনগুলি"

(৪)

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য

কয়েকটি পুরাতন পত্রিকা

আজকাল "শিশু সাহিত্য", "শিশু মাসিক" প্রভৃতির যখন ছড়াছড়ি দেখি, আমাদের ছেলেবেলার জন্য দুঃখ হয়। আমাদের সময় এত শিশুদের—শিশু বলতে বালক ও কিশোরও ধরা হচ্ছে—জন্য কেতাবও ছিল না, মাসিক পত্রও ছিল না,—যা ছিল তা বোধহয় আঙুলে গোনা যেত। কিন্তু সেই ধরনের বই আর আজকাল দেখতে পাই না। যা দেখতে পাই তার বেশীর ভাগই চটকদার মলাট-ওয়ালা অতি বাজে জিনিসের সমারোহ, যা শিশুদের কেন, আমাদের পক্ষেও দুষ্পাচ্য। খাদ্য তেজাল দেওয়া যদি অপরাধ হয় তো ছেলেদের গল্প উপন্যাস বলে বাজারে যা চলে, সাহিত্যে তেজাল দেওয়ার অপরাধে তার অন্তও সাজা থাকা উচিত।

যখনই ছেলেদের এইসব অদ্ভুত মাসিকপত্র দেখি, তখনই আমাদের ছেলেবেলার কতকগুলো মাসিকপত্রের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। আমাদের খুব ছেলেবেলায় মুকুলের নাম গুরুজনদের কাছ থেকে খুব শুনতাম। মনে আছে, কোনও বাল্যবন্ধুর বাসায় "মুকুল" প্রথম দেখি। বাঁধানো এক বছরের মুকুল,—তখনই বেশ মুরু মুরু হয়ে গেছে পাতাগুলো, অর্থাৎ বেশ পুরানো বইটি। যতদূর মনে আছে, রঙীন ছবি একটিও ছিল না, কিন্তু সাদা কালোর ছবির ছিল বাহার। আর, ভালো ভালো লোকের সুন্দর সুন্দর লেখা ছিল। সত্যদের বর্ণলা ও ঘোড়ার টানা অশ্বনিবাসের ছবি মুকুলেই প্রথম দেখি। একটা ছবি ছিল,—কার ছবি এখন মনে পড়ছে না, কিন্তু ছবির চার দিকে ফুল লতা পাতা বর্ডারটা এখনও মনে আছে। এ ধরনের বর্ডার আজকাল আর দেখিনা। যতদূর মনে আছে, ভুল হলে ক্ষমা করবেন, কারণ অতি ছেলে-

বেলায় এই বই পড়েছিলাম, আচার্য জগদীশচন্দ্রের কিছু লেখা তাতে ছিল। তাল তাল অনেক লোকেরই লেখা তাতে ছিল মনে পড়ছে। আর লেখা ছিল অত্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জল,—মনে আছে, সেই বয়সে বোঝবার কোনও অসুবিধা আমার হয় নি।

প্রথম মাসিকপত্র যা একেবারে আমার বলতে পেরেছিলাম, তা হোল "সন্দেশ"। আমাদের সঙ্গে কি একটা কারবারের সম্পর্কে আমাদের বাড়ীতে "সন্দেশ" আসত, বলা বাহুল্য, সেটা আমারই তাগে পড়ত। সন্দেশের মত মাসিক পত্রিকা আজ পর্যন্ত আর কই চোখে পড়ল না! যেমন ছাপা, তেমনি ছবি, তেমনি গল্প, তেমনি কবিতা!—৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও ৺সুকুমার রায়ের মত শিশুদের মন বুঝে লিখতে আর তো কাউকে দেখলাম না। আর কত কি শেখবার বিষয় যে তাতে থাকত, কি বলব। সহজ ভাষায় গল্পের মত করে পুরাণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল—কত কি! শুধু কি শেখবার? মন ভরাবার মত মজাদার গল্প ও কবিতার ছড়াছড়ি এবং রঙীন ছবির কি বাহার। রোম ও গ্রীক পুরাণের প্রাথমিক জ্ঞান "সন্দেশ" থেকেই আমরা প্রথম পেয়েছিলাম। "হযবরল" তখন সন্দেশে বেরুচ্ছিল, তখনকার একটা ঘটনা বলবার লোভ সামলাতে পাচ্ছি না। স্কুলে যাবার সময়ে তাকে সন্দেশ এসেছে দেখে গেলাম; আর কি সেখানে পড়ায় মন বসে? কোন একটা অজুহাতে ছুটি নিয়ে বাড়ী পালিয়ে এলাম। বাড়ীতেও বিপদ—এত সকাল সকাল বাড়ী এসেছ কেন, শরীর-টরীর সব ভালতো? বই পত্র সরিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়বার হুকুম জারী হল। বহু কষ্টে বিছানায় smuggle করে সেই সংখ্যাটা পড়া গেল। পুরানো সন্দেশের অনেকগুলো কপি হারিয়ে গেছে। কেউ বা "না বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে", কিন্তু দু'বছরের সন্দেশ কি করে এখনও রয়ে গিয়েছে। সেই জরাজীর্ণ বই দুখানি সযত্নে তুলে রেখেছি।—যখনই দেখি, তখনই পুরানো সেই দিনগুলির কথা মনে পড়ে, আমি আবার শিশু হয়ে যাই।

সন্দেশে মাঝে মাঝে চমৎকার চমৎকার বিদেশী গল্পের অনুবাদ থাকত। সেইসব গল্প পড়ে আসল বই পড়বার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক।—এভাবে নানা ধরনের পড়বার ইচ্ছাও সন্দেশ আমাদের বাড়িয়ে দিত। সব দিক দিয়ে ছেলেশিশুদের উপযোগী মাসিক পত্র আর দুটো বেরুল না কেন, কে জানে? সন্দেশের যখন অকালমৃত্যু হয়, তখন আমরা বেশ বড় হয়ে গেছি; তখন অনুভব করেছিলাম, একজন অতি প্রিয় ও বিশ্বস্ত বন্ধু হারালাম। আজও সন্দেশের কথা মনে পড়লে সেই কথা মনে পড়ে। আমাদের ছেলেবেলায় আর একটি কাগজ ছিল, "মৌচাক।" "মৌচাক সৌভাগ্যবশত এখনও চালু আছে। কিন্তু মৌচাকের কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে প্রফের সুধীর সরকার মহাশয়, কিছু যদি মনে না করেন তো বলি, সে যুগের মৌচাক এবং এখনকার মৌচাকে আসমান-জমীন ফারাক। স্কুলের এক সমপাঠী (সম্প্রতি পরলোকগত) মৌচাকের গ্রাহক ছিল। তাকে নানারকম মিষ্টি বাক্যে তুষ্ট করে মৌচাক পড়তে পেতাম, তাও সব সময় নয়, তার মর্জি মাফিক।

মৌচাকে প্রকাশিত তিনটে জিনিস কখনও ভুলতে পারব না; একটা হল, অবনীন্দ্রনাথের বুড়ো আংলার গল্প। পুস্তকাকারে অনেকদিন হল প্রকাশিত হয়েছে। এখনও যখন এই বইটা পড়ি, আবার সেই তের চোদ্দ বছর বয়সে ফিরে যাই, বুড়ো আংলার সঙ্গে বাংলার বনে বনে সাহেবে সাহেবে দার্জিলিঙের পাহাড়ের চূড়োয়, শিলিগুড়ির ষ্টেশনের টিনের চালে, আসামের অতি প্রাচীন রাজবাড়ীতে ঘুরে বেড়াই। কি অদ্ভুত যাদু-করা বই! শিক্ষক মহাশয়দের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে ক্লাস রুমে পড়ার সময় বুড়ো আংলা পড়তে গিয়ে ধরা

পড়ে কত সময় মিত্রর সঙ্গ করতে হয়েছে, কিন্তু ঘুড়ো আংলা পড়বার লোভ সম্বরণ করতে পারি নি,—যেমন পারি না এই বয়সেও।

আর একটা হল কবি নরেন দেবের অহল্যাদের স্বদেশযাত্রার কবিতা। চিরকাল সহরে আমি, সহরের বাইরে জগতের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি যৎসামান্য হওয়ার কথা। কিন্তু ঘুড়ো আংলার মত বই এবং নরেনদার এই কবিতার মত কবিতা আমাকে শৈশবেই বাংলা দেশ চিনিয়ে দিয়েছে একান্ত আপন করে। তার বনবাদাড় মাঠ জঙ্গল, বাগান পুকুর, কুঁড়ে ঘর, ঠাকুর দালান, নদী নালা, ঝোপ-ঝাড়, নারিকেল তাল সুপারির বাগান, লেংটা ছেলের দলের হুটোপাটি, ছইওয়ালা গোরুর গাড়ী, পাল-তোলা নৌকা, পল্লী প্রকৃতির খুঁটি-নাটি সব কিছু, তার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ মিলে জীবন্ত হয়ে দেখা দেয় এই ধরনের লেখাগুলির ভিতর দিয়ে। নরেন দেবের কবিতার দু'চারটে ভাঙা লাইন এখনও মনে আছে—যেমন "নৌকার ভিতর বউয়ের মুখ যেন ডালিম ভাঙা।" কি আশ্চর্যভাবে এক আঁচড়ে আঁকা একটি লাজুক গ্রাম্যবধূর অপূর্ব ও সম্পূর্ণ ছবি! এই কবিতাটি আধুনিক কোন কাব্য সংগ্রহেই স্থান পেয়েছে কি না জানতে ইচ্ছা করে। বিদেশে সব সময়েতো পড়তে ইচ্ছে করলেই বাংলা বই পাওয়া যায় না।

তৃতীয়টি হল, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "যকের ধন।" যকের ধন সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন, কারণ যকের ধন পড়েনি এমন ছেলে অন্ততঃ আমাদের সময়ে ছিল না। ওই একখানা বই হেমেন্দ্রবাবুকে শিশু-সাহিত্যে পাকা আসন দিয়ে গেছে। এর পরে তিনি অনেক কিছু লিখেছেন বিমল ও কুমারকে নিয়ে, কিন্তু যকের ধনের মত কেউ না।

আর একটা কাগজ মনে পড়ছে, "শিশু"। এর একটি কপি বাবা একবার পূজোর সময় কিনে দিয়েছিলেন। তাতে সুন্দর সেকেলে ধরনের গল্প ছিল; একটা গল্প যতদূর মনে পড়ছে,—কোনও গরীব ব্রাহ্মণের দুর্গোৎসব ও শ্বশুরবাড়ী থেকে মেয়ের আসার গল্প। একটা শরতের পল্লীর সম্বন্ধে কবিতাও যেন ছিল, লেখকের নাম মনে নেই, উপাধিটা মনে আছে "বরাট"। যতদূর মনে হচ্ছে, সত্যচরণ চক্রবর্তী এর সম্পাদক ছিলেন।

আমাদের ছেলেবেলায় আর দুটো কাগজের কথা না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মশায়রা দুটো কাগজ বের করেছিলেন, "বালক" ও "কিশোর"। "বালক"ই বোধহয় পরে "কিশোর" হয়েছিল। বালকের কথা খুব ভাল মনে নেই—কেবল একটা সূর্যাস্তের গঙ্গার ছবি বেশ মনে পড়ছে। কিন্তু কিশোরের কথা ভুলব না। সম্পাদকের নাম ঠিক মনে পড়ছে না,—বোধ হয় হেমেন্দ্রবাবুও দলিত (?) বিদ্যাস। কিন্তু তাঁর যে নামই হোক, কিশোরের মনস্তত্ত্বের আশ্চর্য জ্ঞান ছিল। কিশোরদের কি কি গল্প ভাল লাগে, কেমন ভাবে বললে ভাল লাগে—এমন ভাবে তাঁর জানা ছিল যে মনে হত তিনিও বুঝি আমাদের মত কিশোর ছিলেন, নইলে ও বয়সে আমরা যে সব "slang" ভাষা ব্যবহার করতাম তাও জানলেন কি করে? কাগজখানাতে অবশ্য ইংরেজদের প্রতি রাজভক্তির প্রকাশ খানিকটা ছিল, সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সেটুকু ক্ষমার্হ। কিন্তু খোলা ও রীতি বাদ দিলেও ভাল লাগত তাতে। একটা উদাহরণ, "খোকার" জীবন কাহিনী। এটা এক অসম্ভব রচনা, কখনও ভোলার মত নয়। ছিল আরও একটা জিনিস। যাঁরা লিখতেন, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁদের বিশেষ দখল ছিল। এই প্রসঙ্গে Stevenson-এর Treasure Island-এর সচিত্র বাংলা অনুবাদের কথা মনে পড়ছে। কি অপূর্ব অনুবাদ, বাঙালী নায়ক ও কুশীলব সাজিয়ে বাঙালীর অনুকূল আবহাওয়ায় গল্পটাকে সাজানো, পড়লে মনে হবে অনুবাদ নয়, যেন মৌলিক গল্প।

কয়েকটি ইংরেজী পত্রিকার কথা আমার ছেলে-বেলাকার স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কাজেই পুরানো বাংলা কাগজগুলির সঙ্গে সেই কয়েকটি ইংরেজী কাগজের কথাও এখানে বলা উচিত। মধুসূদন মল্লিক মহাশয় আমাদের এক অবস্থাপন্ন ও নিঃসন্তান প্রতিবেশী ছিলেন। আমাদের ছেলেবেলায় রক্তের সম্পর্কের চেয়ে পাড়ার সম্পর্ক কিছু কম ছিল না, সময় সময় রক্তের সম্পর্কের চেয়েও বেশী হয়ে দাঁড়াত পাড়ার সম্পর্ক। সেই সম্পর্কে তিনি আমাদের জ্যাঠামহাশয় হতেন। তাঁর অমায়িক স্নেহ মনে পড়লে আজও আমাদের চোখে জল আসে। এঁর অনেক সখ ছিল, ব্যায়াম, সন্ধ্যাবেলায় আমাদের রকে বসে আমাদের নিয়ে গল্প বলা বা খেলা করা (আমরা তাঁর বিশাল পিঠের পিছনে লুকিয়ে 'চোর চোর' খেলেছি কতবার), আর নানারকম বিলিতী কাগজ কেনা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার এবং তার অব্যবহিত পরের অনেক ইংরেজী মাসিক পত্র তাঁর কাছে ছিল। একটু জ্ঞানবৃদ্ধি হলে আমি সেই সব পাঁজা করে বাড়ীতে এনে পড়তাম। অবশ্য বুঝতে পারতাম না বেশীর ভাগই—কারণ তখন ওই সব বোঝবার বয়সও হয়নি। কিন্তু Wide World Magazine এবং Pearson's Magazine-এর অনেক গল্পই পড়ে বুঝতে পারতাম এবং ভাল লাগত। তাঁর সংগৃহীত My Magaro (বিলাতী) এর রঙিন ছবি এবং Wide World-এ প্রকাশিত আজগুবী সত্য ঘটনা বালকচিত্তকে যে প্রলুব্ধ করবে এ তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু Pearson's Magazine-এ প্রকাশিত Rider Haggard-এর King Solomon's Mine জাতীয় উপন্যাস এবং Sir Arthur Conan Doyle এর Prof. Challenger-এর গল্পগুলি আমার হাতে এক আশ্চর্য লোকের চাবী তুলে দিয়েছিল, সেই চাবী দিয়ে দরজা খুলে আজও যার সৌন্দর্য অবাক বিস্ময়ে দেখি, আর, যার শেষ কোথাও আজও খুঁজে পাইনি।

বুনিয়াদী শিক্ষা

শ্রীঅনিলনাথ ঘোষ

আমাদের সরকার ঠিক করিয়াছেন যে প্রাথমিক শিক্ষা বুনিয়াদী প্রণালীতে দেওয়া হইবে। কিন্তু আশঙ্কা হয় যে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে সরকার ও জনসাধারণ কাহারও সম্যকরূপে অভিজ্ঞতা হয় নাই। শিক্ষামন্ত্রী লোকসভায় প্রশ্নোত্তরে বহুবার জানাইয়াছেন যে বুনিয়াদী শিক্ষায় প্রচলিত শিক্ষা হইতে খরচ অধিক হয়। গান্ধীজী বুনিয়াদি শিক্ষা পদ্ধতির উদ্ভাবক। এই পদ্ধতির মূলসূত্র দুইটি। (১) হাতের কাজ, পারিপার্শ্বিক, প্রকৃতি এবং সামাজিক আচার বিচারের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হইবে; যাহাতে শিক্ষান্তে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবন যাপনের উপায় নির্ধারিত হইয়া যায় এবং কেবল চাকুরীর উপর নির্ভর ত্যাগ করিতে পারা যায়। (২) শিক্ষণ ব্যয় শিক্ষা-প্রণালী হইতেই উদ্ভূত হইবে। হাতের কাজের মাধ্যমে যখন এই শিক্ষা, তখন শিক্ষা প্রণালীতে যে সমুদয় শিল্পপদার্থ প্রস্তুত হইবে তাহা হইতেই শিক্ষণব্যয় বহুলাংশে পোষাণ হইবে। শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা বুনিয়াদী শিক্ষার এই মূলসূত্রের বিরোধী। আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু ইহার বিপরীত। জামসেদপুরে আমাদের

প্রয়োগ অভিজ্ঞতার কথা এখানে কিছু বলিতে চাই।

১৯৩৭ সনে বিহারের প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে বুনিয়াদী প্রথার সংযোগ চেষ্টায় প্রাথমিক ও মধ্য বিদ্যালয় সমূহে হস্তশিল্প এক অবশ্য করণীয় বিষয় বলিয়া ধার্য হয়। সেই অনুসারে বিদ্যালয়ে শিক্ষণ সময়ের ¼ অংশ শিল্প শিক্ষার জন্য পৃথক করিয়া রাখা হয়। কিন্তু খুব কম সংখ্যক শিক্ষকই শিল্পশিক্ষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। এই অভাব পূরণ করিবার জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষক আনিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তাহা ছাড়া কিছু শিক্ষককে অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠাইয়া শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। ইহার পর তিন বৎসর চেষ্টায় ফলেও শিল্প-শিক্ষায় সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় না। তখন কাহারও কাহারও ব্যক্তিগত চেষ্টায় এই শিক্ষণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তন করা হয়। এই সকল স্কুলে অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে ছাত্র ও শিক্ষকদের (বিশেষ করিয়া শিক্ষকদের) বিষয় উপলব্ধি এবং আন্তরিক আগ্রহের অভাবেই এই শিল্পশিক্ষা পরিণতি লাভ করিতেছে না। শিল্পশিক্ষার সামাজিক মূল্যের অভাবও ইহার জন্য বিশেষভাবে দায়ী।

যাহা হউক তিনটি স্কুলকে পরীক্ষাকেন্দ্ররূপে গ্রহণ করা হয়। ঠিক করা হয় যে এই সব স্কুলে শিল্প কতকটা কো-অপারেটিভ্ ধরনের পন্থা অবলম্বন করিবে। স্কুল তিনটির উপরই ভার দেওয়া হয় কোন কোন শিল্প তাহারা শিক্ষণ বিষয় বলিয়া অবলম্বন করিবে, এবং ইহার জন্য কত মূলধন প্রয়োজন তাহাও তাহারাই নির্ধারণ করিবে। সেই মূলধন তাহাদের সরবরাহ করা হয়। শিল্পশিক্ষার মাধ্যমে প্রস্তুত উপাদান সমূহের বিক্রয়ব্যবস্থাও করা হয়। ক্রমে এই আমদানী হইতে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তিন বৎসর পরে এই মূলধন ফেরত দিতে হইবে বলিয়া শিক্ষকদের সম্মতিক্রমে স্থির করা হয়। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কার্য-লিপি গৃহীত হয়।

(১) শিক্ষণ হিসাবে নিম্নলিখিত শিল্প অবলম্বন করা হইবে—(ক) সব্জীর বাগান (খ) চাষবাস ও (গ) কাগজের কাজ (ঘ) ছুতোরের কাজ (ঙ) সুতা কাটা ও বুনাইয়ের কাজ। মেয়েদের স্কুলে ছুতোরের কাজের পরিবর্তে সিলাইয়ের কাজ।

(২) ছাত্র ও শিক্ষক মিলিয়া খরচ ইত্যাদির হিসাব রাখা, এবং সেই উদ্দেশ্যে জব্-কার্ড (job-card) প্রবর্তন করা হইবে। (৩) বিক্রির জন্য যে ব্যবস্থা করা হয় তাহাও এখানে উল্লেখ করা যেন—(ক) শিক্ষক ও ছাত্রের নিকট বিক্রয় (খ) স্কুলের বিদ্যার্থী ও শিক্ষকদের নিকটও এই সব জিনিস বিক্রয় ব্যবস্থা (গ) সময় সময় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের আমন্ত্রণ করা: নিজেদের ছেলেমেয়েদের প্রস্তুত জিনিস ক্রয় করিবার আগ্রহ স্বাভাবিক। (ঘ) নিজেদের স্কুলে, অন্য স্কুলে অথবা অন্তঃ-স্কুল প্রতিযোগিতায় প্রাইজ-এর উদ্দেশ্যে এই সব উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেওয়া, (ঙ) খাদি গ্রামোদ্যোগ বোর্ডের নিকট এই সব উৎপাদন বিক্রয় করা।

এই পরীক্ষার ফলাফল উল্লেখের পূর্বে জানান দরকার যে প্রতি সপ্তাহে স্কুলে ৪০ মিনিটের কেবল ৬ পিরিয়ড্ ছিল শিল্পশিক্ষার জন্য। স্কুল সময়ের শতকরা ৩০ ভাগ সময় শিল্পশিক্ষায় নিয়োজিত হইলে এই প্রয়োগ আরও অধিক কার্যকরী হইত। তিনটি স্কুলের কার্য বিবরণ পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

এই সব স্কুলের কার্যদক্ষতা দেখিয়া অন্যান্য স্কুল নিজেদের চেষ্টায় উক্ত পন্থায় কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়। অনেক স্কুলও তাহাদের শিল্পশিক্ষার বাৎসরিক বরাদ্দ লইয়াই কাজ সুরু করে এবং ভাল সাফল্য লাভ করে। অনেক স্কুলে এক প্রকার স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে মূলধনের অত্যন্ত ক্ষুদ্র এক ভাগ সময়ের মধ্যে যদি এইরূপ সার্থকতা লাভ করা যায় তবে পূর্ণ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে, যেখানে

স্কুল	প্রদত্ত মূলধন	৩ বৎসর বাদে ৪৪৩৫৳.	মন্তব্য
(১) সাকরী বালিকা বিদ্যালয়	১১৮০·০৪ টাকা	১৭৭৪·০৯ টাকা	৪৫০ টাকা মূলধন প্রত্যর্পণ সমেত।
(২) জামসেদপুর মধ্য বিদ্যালয় (ছেলেদের)	৭১০·০০ "	১১৪৩·৬০ "	বাগান উন্নতিতে ১৫০ টাকা খরচ সমেত।
(৩) কদমা মধ্য বিদ্যালয় (ছেলেদের)	৭৯০·০০	৭০০·০০	এই স্কুলে দুই সিফট্-এ কাজ চালাইতে হইত বলিয়া ফল তেমন ভাল হয় নাই। কিন্তু ভবিষ্যৎ কাজের জন্য আর মূলধন দেওয়া হয় না।

অধিকাংশ সময়ই শিল্পশিক্ষায় নিয়োজিত হইবে সেখানে ছেলেমেয়েদের শিক্ষণ খরচ এবং শিক্ষকের বেতন এই শিল্প মাধ্যমে উপার্জন করা কঠিন হইবে না।

এই গেল বুনিয়াদী শিক্ষার দ্বিতীয় সূত্র সম্বন্ধে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে শিল্পশিক্ষাই বুনিয়াদী শিক্ষা নয়। শিল্প শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষণীয় সকল বিষয়ই শিখাইতে হইবে—সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান সবই। সেই সম্বন্ধেও আমরা যে কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করিব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম তাহাও এখানে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি।

আমাদের এই পরীক্ষার সহযোগী শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেরই শিল্প এবং সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি abstract বিষয়ের জ্ঞান আছে, কিন্তু এই দুই-এর যোগাযোগ করিবার অভিজ্ঞতা নাই। বুনিয়াদী শিক্ষার দিকে অগ্রসর হইতে হইলে এই শিক্ষা জ্ঞান প্রাপ্তি প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে সেবাগ্রামে শ্রীআর্যনায়কম্‌কে অনুরোধ করা হয়, তিনি যেন আমাদের কিছু শিক্ষককে এই শিক্ষণ প্রণালী শিখাইয়া দেন। তিনিও রাজি হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, এই শিক্ষা প্রণালীর অভিজ্ঞতা লাভের পরে উক্ত স্কুলে নিয়োজিত সময়ের মধ্যেই শিল্প-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ে ছাত্রছাত্রীর সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি করা। কারণ গভর্ণমেণ্টের শিক্ষার পাঠক্রম পরিবর্তন করা তত সহজ হইবে না।

আশা করা যায় এই তৃতীয় পর্যায়ে অন্য সাধারণ স্কুলের ছাত্রছাত্রী হইতে ইহাদের জ্ঞান ও মান অনেক উচ্চ হইবে। তখন চতুর্থ পর্যায়ে শিক্ষাবিদ ও গভর্ণমেণ্ট্ শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন ব্যক্তি ও মন্ত্রীদের আমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের পরিদর্শন করান। তুলনায় ইহাদের অধিকতর জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহারা যদি তুষ্ট হন তবে এই স্কুলগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বুনিয়াদীতে পরিণত করিয়া শিক্ষাব্যবস্থা এবং তাহাদের পরীক্ষাও বুনিয়াদী প্রথায় গ্রহণ করিতে রাজি করান। কিন্তু উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীকে অন্য স্কুলের মত একই ম্যাট্রিক বা অনুরূপ সার্টিফিকেট্ দিতে হইবে, যাহাতে এই সব ছাত্রছাত্রীর যে কোন লাইনে যাইতে কোনরূপ বাধা না থাকে বা কোন অসুবিধায় না পড়িতে হয়। তাহাতে অভিভাবকদেরও আপত্তির কোন কারণ থাকিবে না। স্কুলে এই কয় পর্যায় অবলম্বন করিয়া বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে গোড়া হইতে বুনিয়াদীতে পরিবর্তন করা সম্ভব হইবে।

আমাদের প্রয়োগ প্রথম পর্যায়ে সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। দুই বৎসর হইতে প্রাথমিক স্কুল

সমূহ গভর্নমেণ্ট হইতে দেবার কথা হইতেছিল। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে শিক্ষকদের উৎসাহ কমিয়া যায় বলিয়া দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য শ্রীঅরবিন্দ সাহায্য করিতে স্বীকার করা সত্ত্বেও কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই।

মনে হয়, মুদ্রিত শিক্ষায় উৎসাহী শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষকদের এই ভারে কয়েকটি স্কুল লইয়া বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। বিশ্বাস করি, জনসাধারণ ও গভর্নমেণ্ট পর্যায়ের বহু লোকের অনেক বিষয়ে ভুল ভাঙিবে, এবং মুদ্রিত শিক্ষাও প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

———

ছাত্রজীবনের এক অধ্যায় : বাগেরহাট কলেজ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

৫

কলেজে অধ্যয়ন অধ্যাপনার কথা কিছু বলিলাম। যে সকল অধ্যাপকের কথা এখানে উল্লিখিত হইল, দুই একজন বাদে প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে তাঁহাদের সকলের নিকটই পাঠ লইয়াছি। কলেজের পড়া ছাড়া প্রথম বৎসরে অন্যান্য কি কি বই বা পত্রিকাদি পড়িতাম সে সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। প্রত্যহ পাঁচ মাইল যাতায়াতে বিস্তর সময় নষ্ট হইত। কিন্তু কখনও ক্লান্তিবোধ করিয়াছি বলিয়া তো মনে হয় না। আবার তিনটি ছেলেকেও সকাল সন্ধ্যায় পড়াইতে হইত। পাঠ্যপুস্তক পড়ার সময় কোথায়? তথাপি যতটুকু সময় পাইতাম পাঠ্যপুস্তক পড়িয়া অন্যান্য বইপত্র পড়িতে চেষ্টা করিতাম।

কলেজের একটি ছোট গ্রন্থাগার ছিল। ছোট হইলেও ভাল ভাল বইয়ে ঠাসা। একদিন গ্রন্থাগার হইতে টলস্টয়ের Resurrection (পুনরুত্থান) নামে একখানি বই ইস্যু করিয়া লইলাম। বড় বই, পড়িতে বেশ সময় লাগিল। কিন্তু একবার পড়িতে আরম্ভ করিয়া যতই অগ্রসর হইতে থাকি যেমন একটা মাদকতা আমাকে পাইয়া বসিল। বইখানি পড়া যতশীঘ্র সম্ভব শেষ করিয়া ফেলিলাম। অনেক রাশিয়ান নাম, যেমন লম্বা তেমনি বিদ্‌ঘুটে, কিন্তু এইসব নামের চড়াই উৎরাই পার হইয়া স্বাভাবিক গতিতে কখন যে পড়া শেষ হইয়া গেল যেন বুঝিতেই পারিলাম না। দীর্ঘকাল চলিয়া গিয়াছে তবু Resurrection পড়ার আনন্দের রেশ এখনও যেন হৃদয়ে লাগিয়া আছে। তরুণ চিত্তের চাঞ্চল্যকর অনেক ঘটনা ইহাতে ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেন একটা উচ্চ আদর্শ রূপায়নের সার্থকতা মনের সমস্ত চাঞ্চল্যকে যেন মুছিয়া মুছিয়া ফেলিল। বর্তমানে সোভিয়েট সরকার টলস্টয়ের প্রতি কার্যত খুবই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন। সেদিন ট্রেনে Resurrection এর একটি সুলভ সচিত্র সংস্করণ দেখিয়া বড়ই উৎসুক হই।

পত্রিকাদি পড়ার ঝোঁক আমার বরাবর। স্কুলীয় পাঠকালে আমরা 'প্রবাসী'র পোড়া হইয়া উঠিয়াছিলাম। কলেজে আসিয়া রীতিমত পাঠের সুযোগ না ঘটিলেও যখনই 'প্রবাসী' পাইতাম এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিতাম।

এখানে আর একখানি মাসিক পত্রিকা পাইলাম —'বঙ্গবাণী' নাম্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সুপরিচালনায় এখানি কয়েকবৎসর চলিয়াছিল। পাঁচকড়ি

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ সাহিত্যিক মনীষীদের রচনায় ইহা ভরপুর থাকিত। পাঁচকড়ি বাবুর লেখা যেমন প্রাঞ্জল তেমনি সরল। আমরা সচরাচর যেসব কথা ব্যবহার করি তাহার মূলগত ব্যাখ্যা দিয়া তিনি ধারাবাহিক ভাবে কতকগুলি প্রবন্ধ লেখেন, 'ধর্মঘট' 'হাটে হাঁড়ি ভাঙা' প্রভৃতি বহু শব্দ ও চলিত কথার মূল তাৎপর্য তাঁহার রচনায় প্রথম জানি। বিপিনচন্দ্রের 'সবযুগের বাংলা' বা বাংলার নবযুগ প্রবন্ধ নিচয়ে গত শতাব্দীর বাঙালী কৃতিত্বের কতই না পরিচয়! তাহা ঐশ্বর্যময়ী কিন্তু গতি কি সাবলীল! তবে আমাদের নিকট 'বঙ্গবাণী'র আর একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল ঔপন্যাসিক ও কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "পথের দাবী"। একজন বিপ্লবীকে কেন্দ্র করিয়া নরনারীর বিচিত্র সমাবেশে এই উপন্যাসখানি আমাদের নিকটে বড়ই লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিমাসে ধারাবাহিক ভাবে 'পথের দাবী' প্রকাশিত হইত এবং আমরা কত আগ্রহ সহকারেই না ইহা পাঠ করিতাম। 'পথের দাবী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে সরকার ইহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেন।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় যতদূর মনে পড়িতেছে আরও কিছু কিছু বই পড়িয়াছিলাম।

মিসেস হেনরি উডের লেখা Strike বইখানি আমার যে কত ভাল লাগিয়াছিল তাহা এখন হয়ত বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। স্ট্রাইক মানে ধর্মঘট। ইহাকে ভিত্তি করিয়া গত শতাব্দীর মধ্যভাগে বিলাতের শ্রমিক-চাষীদের অবস্থা কিরূপ মর্মন্তুদ দুঃখ দুর্দশাপূর্ণ হইয়াছিল, তাহাই অতি সরল ভাষায় এই উপন্যাস-খানিতে বিবৃত রহিয়াছে। ঐযুগে স্ট্রাইক বেআইনী ছিল। যদি কোন শ্রমিক বা শ্রমিকদল ধর্মঘট করিত বা ইহার বাসনা প্রকাশ করিত তাহা হইলে তাহাদের উপর নির্যাতনের অন্ত থাকিত না, বিলাতের শ্রমিক উন্নয়নের চিন্তা ও কর্মপ্রণালীর মূলে এই বইখানি কম রসদ জোগায় নাই। সাহিত্য কিরূপে ইতিহাসের উপাদান হইতে পারে স্ট্রাইক বইখানির দ্বারা তাহা সহজেই প্রমাণিত হয়। সেই কবে বইখানি পড়িয়াছি এখনও যেন উহার মধ্যেকার ভাবনা আমার মন জুড়িয়া আছে। ইংরেজ প্রগতিশীল জাত, কিন্তু তাঁহারা আদতে যে কত প্রগতিবিমুখ সেযুগের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলে প্রতীতি জন্মিবে। কিন্তু এখন আর সে স্থান পাইয়া লাভ নাই।

এই সময় আর একখানি বই পড়িয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে—নাম, Bacon's Essays। বেকনের প্রবন্ধপুস্তকখানি ইংরেজী সাহিত্যে ক্লাসিকস্-এর মর্যাদা লাভ করিয়াছে। প্রবন্ধ বা রচনাগুলি বড় নয়। সেই কবেকার লেখা, অথচ কত ছোট ছোট শব্দ আর কাটা কাটা কথা। সেনফিল্ডের গ্রামার এখন আর বোধ হয় পড়ান হয় না। ইহার একটি স্থলে 'Gerund' ও Verbal Noun-এর ভিতরকার সূক্ষ্ম তাৎপর্য বুঝাইতে গিয়া শিক্ষাবিদ্ সেনফিল্ড বেকনের এই বাক্যটি তুলিয়াছেন—'Writing makes man perfect'। কত সোজা কথা অথচ কত অর্থপূর্ণ! এই প্রবন্ধপুস্তক-খানিও তখন পাঠ করিয়া বেশ উপকৃত হইয়াছিলাম।

পূজার ছুটি বা গ্রীষ্মের ছুটি ঠিক মনে নেই, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। পূর্বে একখানি বইয়ের সামান্য কিছু মাত্র পড়িয়াছিলাম, এবারে 'কপালকুণ্ডলা' সমগ্র উপন্যাসখানি পড়িয়া কতই না মুগ্ধ হইলাম। নব-কুমার, কাপালিক, কপালকুণ্ডলা, বঙ্গোপসাগর হইতে বাঙলা দেশের দৃশ্য, একে একে আমাকে যেন কোন অজানা দেশে লইয়া গেল। ইহার পর কপাল কুণ্ডলা কতবার পড়িয়াছি কিন্তু প্রথম পাঠের আবেশ আমার হৃদয়মন এখনও জুড়িয়া আছে। নবকুমার প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি—"তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন? পরের অন্ত কাঠাহরণ করা যাহার স্বভাব সে তাহা করিবেই।"

কিরূপ ভাবপূর্ণ তাহা কি আর বলিতে ? "দূরাদয়শ্চক্র নিভস্যতন্বী···"ইত্যাদি শ্লোকটি কেমন সুন্দরভাবেই না তিনি প্রযুক্ত করিয়াছেন। একে একে আরও কতকগুলি উপন্যাস পড়িলাম— 'চন্দ্রশেখর' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'বিষবৃক্ষ' 'আনন্দমঠ' 'দেবী চৌধুরাণী' প্রভৃতি। 'বিষবৃক্ষ' কি 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মর্মে তখন প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলাম কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী' তখন বড়ই ভাল লাগে। তদবধি এই দুইখানি বইও বারবার পড়িয়াছি। 'আনন্দমঠ' রচনার নিগূঢ় তাৎপর্য পরবর্তীকালে কতকটা বুঝা গিয়াছে। 'দেবীচৌধুরাণী'তে দেবীর বীরত্ব গাথা আমাদের তরুণ চিত্তে তখন বড়ই রোমাঞ্চের উদ্রেক করে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' যখন সাহিত্যমূলক রচনায়, ভরপুর থাকিত। 'কমলাকান্ত' 'মুচিরামগুড়ের আত্মচরিত' পরে আমার মত অনেকেই পড়িয়াছেন। কিন্তু কি উপন্যাস কি মননসাহিত্য তাঁহার লেখনীমুখে যে বরাবর রসপ্লুত হইয়া উঠিয়াছে ইহার সাক্ষ্য যে পাঠকমাত্রেই দিবেন আশা করি।

৬

তখন বাগেরহাট খুলনা লাইট রেলওয়ে সবেমাত্র হইয়াছে। স্থানীয় লোকেরা রেলগাড়ীতে যাতায়াত করায় তখনও তেমন অভ্যস্ত হয় নাই। হাঁটাপথে নৌকাপথে, খুববেশী দূর হইলে গরুর গাড়ীতে যাতায়াতের রেওয়াজ ছিল। আমি যে জেলার মানুষ সেখানে তো রেলগাড়ী আজাপি প্রচলিত হয় নাই। সৈশবাবধি হাঁটাপথে এবং নৌকাযোগেই আমরা স্থানান্তরে যাতায়াত করায় আমাদের অভ্যাসসারেই যেন মেজাজ জন্মে প্রচুর। বাগেরহাট আসার ও অকল হইতে বেশি দূরে নয়। দূরত্ব সোজসুজি ধরিয়া হিসাব করিলে বার তের মাইল মাত্র হইবে। কিন্তু কি নৌকা পথে, কি হাঁটা পথে (অবশ্য শীতের সময় ছাড়া উভয়ের দূরত্ব কুড়ি কি বাইশ মাইলে দাঁড়াইত। নৌকায় এ খাল, সে খাল, এ নদী সে নদী করিয়া যাইতে 'গোন বন্ত' প্রায় দশ বার ঘন্টা লাগিত। 'গহনার' নৌকায় গেলে অবশ্য খানিকটা তাড়াতাড়ি যাওয়া হইত। আবার হাঁটা পথে প্রায় কুড়ি মাইল রাস্তা ধরিয়া গেলেও কত গ্রাম পল্লী, নদী ও খাল অতিক্রম করিয়া যাইতে হইত। আজিকার ছেলেরা তাহা হয়ত কল্পনাও করিতে পারিবে না। এখন দেশের অভ্যন্তরে রেলগাড়ীর বাহুল্য, বাসের প্রাচুর্য, হাঁটার অভ্যাস আমরা যেন ক্রমশ ভুলিয়াই যাইতেছি। সে সময় এমনটি হইবার অবকাশ মাত্র ছিল না। জলপথে ও হাঁটাপথে যাতায়াতে অভিজ্ঞতাও হইত অনেক। কত ছোটবড় খাল ও নদীর মধ্য দিয়া চলিতে হইত। দুই ধারে বিচিত্র রকমের বৃক্ষরাজি পশুপক্ষী। আবার কত নরনারী শিশু আমাদের দৃষ্টিগোচর হইত। হাঁটা পথেও এই অভিজ্ঞতা। তবে জলপথে যাতায়াতে আর একটি অভিজ্ঞতা যাহা হইত তাহাতে আমাদের সাহস বাড়িয়া যাইত যথেষ্ট। সাধারণত বর্ষাকালে নদী প্রমত্ত হইয়া উঠিত। উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্যেও মাঝির চালনাগুণে নৌকা তালে তালে চলিয়া পাড়ে গিয়া পৌঁছিত। কতবার নৌকার উপর জল উঠিত। মনে হইত এইবার বুঝি ডুবিয়া যাইবে। কিন্তু তদ্মুহূর্তেই ইহা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিত। 'গহনা'র নৌকাতো খুবই বড়, তবুও ইহাও একবার মাঝ দরিয়ায় পড়িয়া প্রায় ডুবুডুবু হইয়াছিল।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে শহরের আশেপাশে এবং কিছু দূরেও কতকগুলি স্থলে যাইবার সুযোগ ঘটে। তবে মনে রাখিবেন সবই হাঁটা পথ। বাগেরহাট অঞ্চলে মুসলমান আমলের কীর্তিকলাপ কিছু কিছু রহিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল বসু মহাশয় 'প্রবাসী' ও অন্যান্য পত্রিকায় এই অঞ্চলের কতকগুলি মুসলমান কীর্তিসম্পন্ন গ্রাম ও গ্রন্থের কথা আলোচনা

করিয়াছিলেন। শহরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রায় চারি মাইল দূরে প্রসিদ্ধ "খানালির দীঘি।" সংক্ষিপ্ত নাম, পুরা নাম খান্ জাহান আলি'র দীঘি। এরা খাই কি আরও কোন নদী ছিল বলে নাই। এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানটি দেখিয়া লইতে কাল-বিলম্ব করিলাম না। খুব মস্ত বড় দীঘি, এক ঘোড়া ছুটিয়া যতদূরে যাইতে পারে ততখানি লম্বা। এ কারণ ইহাকে 'ঘোড়া দীঘি'ও বলে। বাগেরহাটের অন্তর্গত চন্দ্রকীশের 'দুর্গাসাগর দীঘি' দু'তিন বৎসর পূর্বে দেখিয়াছিলাম। উহার চেয়ে এই দীঘিটি অধিকতর পরিচ্ছন্ন এবং আধুনিকতর বলিয়া মনে হইয়াছিল। দীঘির এক কোনে দরগা। এখানে খান জাহান আলির সমাধি—প্রত্যহ আলো দেখান হয়। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর ও খুলনার ইতিহাসে' এই দীঘিটির কথা অনিসন্ধিৎসু পাঠক অবশ্যই পাইবেন।

এবারে আরও কতকগুলি গ্রামে কোনকোন সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে যাই। প্রথমেই মণিলাল মুখোপাধ্যায়ের বাকইপাড়ার কথা মনে পড়ে। বাগেরহাট হইতে বাকইপাড়া দশ মাইলের মাথায়। আমরা দুই বন্ধুতে বৈকালে রওনা হইলাম। সবই হাঁটাপথ, কত গ্রাম পার হইয়া গেলাম, চিরুলিয়া, বিষ্ণুপুর, রাজাপুর, কোদলা তারপরে বাকইপাড়া। সন্ধ্যার পূর্বেই বাকইপাড়ায় পৌঁছি। একটি জিনিস দেখিয়া কতকটা বিস্মিত হইলাম—সিঙি গাছ ঘাসের মত সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে। সরকারের আবগারি বিভাগ এখানকার প্রকৃতির নিকট একেবারেই অকেজো। বাকইপাড়া বর্ধিষ্ণু গ্রাম। জমিদার, তালুকদার বাদে সম্পন্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বিস্তর। এখানে একটি উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ও ছিল। আমি তখন বেশ সাবুক ছিলাম, দুইদিন মণিলালের বাড়ীতে থাকি। তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতা তখনও জীবিত। জ্যেষ্ঠাগ্রজ স্কুলের শিক্ষাব্রতী। খুবই আদর-আপ্যায়ন পাইলাম তাঁহাদের নিকট হইতে। দেখিলাম আমার পূর্বেকার অন্যতম শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাড়ীতে থাকিয়া স্থানীয় হাইস্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন। তাঁহার কথা পূর্বে স্বতন্ত্রভাবে লিখিয়াছি। মণিলালের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়। সে পরে শিক্ষকতা কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, শুনিয়াছি।

এই সময় আর একটি বন্ধুর সঙ্গে যাই ঘাটভোগ। ঘাটভোগ বাকইপাড়ার চেয়েও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। কত যে পাকা বাড়ী, বলিয়া ইয়ত্তা করা যায় না। এখানকার চাটুজ্যেরা পূর্বে বড় জমিদার ছিলেন। আমার সহপাঠী বন্ধু ক্ষেত্রনাথ ও এই চাটুজ্যে বংশ সম্ভূত। কিন্তু সে জমিদার ছিল না। নিতান্তই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের। ক্ষেত্রনাথের অঙ্কে খুব মাথা। সে ছিল এক চক্ষু, অগোছাল এবং খানিকটা অপরিচ্ছন্ন। একারণ কেহ কেহ তাহাকে মোটেই পছন্দ করিত না। তাহার সঙ্গে আমার কিন্তু খুব ভাব হইয়া যায়। একদিন ঝুঁকি করিলাম, তাহার বাড়ী যাইব। সে সানন্দে আমাকে লইয়া গেল। যদিও বাকইপাড়ার মত ঘাটভোগ ও রেল ষ্টেশন হইতে বেশী দূরে নয় তথাপি আমরা সে সময় হাঁটাপথে যাতায়াত করাই বেশি পছন্দ করিতাম: নিঃখরচায় নূতন নূতন স্থান দেখার সুযোগ ছাড়া কাজের কথা নয়। আমরা একদিন ভোরে দুই বন্ধুতে মিলিয়া বাগেরহাট হইতে ঘাটভোগ রওনা হইলাম। পনর মাইল দূর কিন্তু তখন ইহা আমাদের পক্ষে বেশ বর্তব্যের মধ্যেই ছিল না। কত গ্রাম যে পার হইয়া চলিলাম, অনেকগুলির নামও হয়ত এখন বলিতে পারিব না। পথে কত গাছপালা, কত লোকজন! ক্ষেত্রনাথের অভিভাবকদের নিকট হইতেও বেশ আদর যত্ন পাই। ক্ষেত্রনাথ পরবর্তী জীবনে শিক্ষকতা ব্রত গ্রহণ করে। মেদিনীপুর জেলার একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে কার্য করিয়াছিল। শুনিয়াছি সে আর ইহজগতে নাই।

(ক্রমশঃ)

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৯শ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৬৭ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আলোচনা

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষার চিত্র

প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া ভারত সরকার প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর পর শিক্ষার অগ্রগতিতে, অর্থাৎ সকল স্তরে শিক্ষার সুযোগ সুবিধার প্রসার হইয়াছে বলিয়া, তাঁহারা সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আরও যথেষ্ট উন্নতির জন্য তাঁহারা ৬ হইতে ১১ বৎসর পর্যন্ত বয়সের সকল বালকবালিকার জন্য বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং প্রতি প্রদেশে বা স্টেটে "সার্ভে" করাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় স্কুল বসিবে, তাহার গতি কতদূর হইবে, তাহাও নাকি নির্ধারিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে টাকার বরাদ্দ ছিল ২৭০ কোটি, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৫০০ কোটি টাকায়—৩৭০ কোটি সাধারণ শিক্ষার জন্য, ১৩০ কোটি টেকনিক্যাল শিক্ষার জন্য। বিভিন্ন স্টেটে বিভিন্ন ভাবে নিজ নিজ প্রয়োজনমত এই টাকার মধ্য হইতে শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হইবে। তবে মোটামুটি ভাগ করা হইয়াছে এইরূপ—প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ১৮০ কোটি, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ৯০ কোটি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য ৭৫ কোটি, অন্যান্য শিক্ষার জন্য ২৫ কোটি ব্যয় করা হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৯২ কোটি, মাধ্যমিকের জন্য ৪৫ কোটি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য ৪৪ কোটি ও অন্যান্য শিক্ষার জন্য ৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল।

টাকার কনুষনানি কাগজের মারফৎ শুনিতে পাইলাম, কিন্তু যে কথা আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, প্রস্তুতি কোথায়? যে বৃহৎ কর্মশালায় তার খসড়াতে ফুটিয়া উঠিতেছে, বাস্তব জগতে তাহার রূপ কোথায়—বিপুল শিক্ষকবাহিনী কোথায়, বুনিয়াদি শিক্ষার উপর যে জোর দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে, তাহার পূর্বাভাস কোথায়?

কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়

খুবই আনন্দের বিষয় যে সম্প্রতি (অর্থাৎ ৩১শে মার্চ তারিখে) কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। ১১ই এপ্রিল

১৮৬০ সালে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবের সাধনার ফলে। তখন হইতে একশত বৎসর ধরিয়া বহু বাধা বিপত্তির মধ্যেও বিদ্যালয়টি জীবিত রহিয়াছে। শুধু জীবিত নয়, সর্বপ্রকারে জাগ্রত থাকিয়া আধুনিক যুগের উপযোগী হইয়া ছাত্রীদিগকে শিক্ষাদান করিতেছে। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত এই বিদ্যালয় আজ উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, কর্মী, কর্তৃপক্ষ এবং কোন্নগর পল্লীবাসী সকলের সমবেত চেষ্টায় এই দীপশিখা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছে। বাংলাদেশের পক্ষে ইহা অতিশয় সৌভাগ্যের ও আশার কথা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৯৬১ সালে এই বিদ্যালয় ১০১ বৎসরে পদার্পণ করিল। আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতি এখনও আশানুরূপ হয় নাই। আমরা অবশ্য প্রসার বা ব্যাপ্তির কথাই বলিতেছি। কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের বিজয় কামনা করি। বিশেষ করিয়া এই কারণে।

দেশের শিশুরা কি লিখিতে পড়িতে শিখিবে না?

শিক্ষা বাধ্যতামূলক বা আবশ্যিক, এবং সার্বজনীন হইবে, এ কথা আমরা শুনিয়া আসিতেছি। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইহার জন্য ব্যবস্থা থাকিবে। কিন্তু স্পষ্ট নির্দেশ বা প্রস্তুতির স্পষ্ট চিহ্ন কোথাও দেখি নাই।

সম্প্রতি কিন্তু মাদ্রাজের হিন্দু পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীমালী যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আশার কিছু আভাস পাওয়া যায়। ১৯ই এপ্রিল তারিখের রবিবাসরীয় হিন্দুতে দেখিতেছি, শতকরা আশীজনকে লেখা পড়া শিখাইতে হইবে, বাদ বাকী কুড়ি জনের ব্যবস্থা চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় হইতে পারিবে।

টাকা জোগাইবে কে? তৃতীয় পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার জন্য যত কোটি টাকা মঞ্জুর হইলেও প্ল্যানিং কমিশন ভরসা দিয়াছেন যে বেশি কোটির ভিত্তিতে পরিকল্পনা বাড়ানো যাইতে পারে, সমস্তটা টাকার ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। শিক্ষা লইয়া গবেষণা যাহাতে চলিতে থাকে এবং ফলপ্রসূ হয়, তাহার চেষ্টা চলিবে, আঞ্চলিক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় খোলা হইবে।

শ্রীযুক্ত শ্রীমালী ভরসা দিয়াছেন, তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে আদর্শে পৌঁছিবার জন্য গভর্নমেন্ট সম্ভাব্য সকলপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে ত্রুটি করিবেন না।

শিশুশিক্ষা আবশ্যিক ও সার্বজনীন করিতে গেলে যাহা যাহা দরকার তাহা করিবেন কি না, সে প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমালী বলিয়াছেন যে মধ্যাহ্নের খাবার, এবং শিক্ষকদের ত্রিবিধ সাহায্যের পরিকল্পনা—যাহাতে যেমন চলিত আছে—তাহাও সরকার অনুমোদন করিয়াছেন।

আমাদের দেশের শিক্ষকদের ক্রিয়মাণ প্রাণশক্তি অর্থাদির দুর্মূল্যতার দিনে আর কাজ চালাইতে পারে না। শিক্ষা-মন্ত্রীর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে মনে হয়। শীঘ্র প্রতিকার চাই—জীবনধারণের জন্য অতিরিক্ত সুচিন্তিত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা আজ প্রয়োজন।

"সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি"

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য

বিশনারী কলেজের বাঠ

১

আমাদের বাড়ীর ঠিক নিচে, ঠিক দক্ষিণেই মিশনারী কলেজের মাঠটি। দক্ষিণদিকের জানালা-গুলি দিয়ে হু হু করে মাঠের বাতাস এসে ঘরটাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় বললে বোধহয় অত্যুক্তি করা হয় না। কলকাতায়, যেখানে খোলা জায়গার খুব অভাব, সচরাচর যা দেখি, সে তুলনায় মাঠটাকে খুবই বড় বলতে হবে। মাঠটার চারধারে পাঁচিল, আমাদের ছেলেবেলায় পাঁচিলটা অত উঁচু ছিলনা, এখন যতটা উঁচু করা হয়েছে। পাঁচিলের উপর লোহার রড দাঁড় করিয়ে জাল ঘেরা, জালের গায়ে লতাপাতার সমারোহ। বছরের বারো মাসই ফিকে বেগুনীরঙের বড় বড় ফুল ফুটে থাকে। মাঠের চারধার ঘিরে লাল সুর্কির সরু রাস্তা এবং পাঁচিলের মধ্যে পাব গাছের সারি,—একটু হাওয়া বইলে ঝির ঝির করে আওয়াজ করে, পরে পাতাগুলি ঝরতে থাকে। আমাদের বাড়ীর নিচেই আমগাছের প্রায় গায়েই একটা কলকে ফুলের গাছ। ও দিকের রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা হোস্টেল। আমাদের জানলা দিয়ে তার সামনেটার একটু অংশ দেখা যায়—ছাদ থেকে সবটা। হোস্টেলটার এই অংশে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক জ্যাকেরিয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত অধ্যাপক অডিকাউন্ট সান্যাল কিছুদিন বাস করেছিলেন। ওপাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে আরো। ওপাশের এবং এ পাশের রাস্তা চক্কর মেরে যেখানে মিশেছে, সেখানে একটা টেনিস কোর্ট, কলেজভবন, লাইব্রেরী ভবন, ওদিকে আর একটা হোস্টেল, হোস্টেলের কোলে গুলিবল কোর্ট। এদিক দিয়ে বড় রাস্তায় যাবার সড়ক, সেখানে পুরানো ছবিতে যেমন দেখতে পাওয়া যায় সেই ধরনের পুরানো বাড়ী কয়েকটা ছিল, প্রিন্সিপ্যাল এবং অধ্যাপকদের কোয়ার্টার্স। বর্তমানে এই বাড়ীগুলো ভেঙে ফেলে আধুনিক ধরনের কয়েকটা ফ্ল্যাট বাড়ী করা হয়েছে অধ্যাপক মহাশয়দের ও প্রিন্সিপ্যালের থাকার জন্য। কলেজ বাড়ীর পিছনে আরও অনেক কিছু আছে, কিন্তু সামনে থেকে দেখতে পাওয়া যায় না। কলেজ ও হোস্টেলের পর আর চোখ চলে না—বাড়ীগুলো আর সব আড়াল করে রেখেছে। পাঁচিলটা বর্তমান ফ্ল্যাট বাড়ীর কাছে যেখানে শেষ হয়েছে, ওখানে আগে একটা ফটক ছিল, পরে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। মাঠের ঘাস পরিপাটীরূপে ছাঁটা, সবুজ মখমলের মত ঘাসের আস্তরণ। কলেজ ভবনটি ছোট, কিন্তু সুন্দর ও পরিপাটী—পড়াশুনা করবার মত আবহাওয়া সেখানে আছে—অন্ততঃ আমাদের সময়ে ছিল। এখনকার আইন কানুন জানি না, তখনকার দিনে অত্যন্ত কমসংখ্যক ছাত্র নেওয়া হত, মেয়েদের পড়বার সুযোগ সেখানে ছিল না, এবং বলা বাহুল্য, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হত। কলেজ কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ছিল কলেজ থেকে যতগুলো ছাত্র যায়, সবকটা যেন উত্তীর্ণ হয়;—এগুলো প্রথম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করবে, বা এতগুলো বৃত্তি পাবে, এসব নিয়ে তত্তটা মাথা ঘামাতেন না। তার একটা কারণ বোধ হয় ছিল, সাধারণ দেশীয় খ্রীষ্টানমহলে তখনকার দিনে খুব উচ্চ শিক্ষার রেওয়াজ ছিল না, কেননা, তাঁদের বেশীর ভাগই

সমাজের অনুগ্রহ তার থেকে আসতেন। তাই তাঁদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রচার মিশনারী কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ছিল। যাই হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় খুব উচ্চ স্থান অধিকার না করলেও (যতদূর মনে পড়ে, এক আধবার ফার্স্ট সেকেণ্ডও হয়েছে) পাশের হার এই কলেজের সর্বোচ্চ ছিল, শতকরা ৭০ এর মত ছিল। কলেজটি ছোট, প্রথম শ্রেণীতে ছাত্র-সংখ্যা সীমিত, কাজেই অধ্যাপকদের পক্ষে প্রত্যেকটি ছাত্রের প্রতি নজর রাখা অসম্ভব ছিল না। এজন্য, পাঠে অনগ্রসর ছাত্রও ভালভাবে পাস করতে পারত।

এ পাড়াতে বাবা যখন বাড়ী করেন, এই মাঠের জায়গায় তখন একটা বিরাট পুকুর ছিল এবং তার পাশে কয়েক ঘর বাঙালী মুসলমান বাস করতেন। তখনকার দিনে সাম্প্রদায়িকতা এত উগ্র ছিল না; হিঁ এবং ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে (পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা বলছি মনে রাখবেন) হিন্দু-মুসলমানের সামাজিকতায় কোন বাধা ছিল না। আমার যখন ন'দশ বছর বয়স, অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ বছর হল, একটা ঘটনা এখনও মনে আছে। সেদিন বিজয়া দশমী ; বাড়ীর প্রতিমা বিসর্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রতিমাকে একটু এগিয়ে দেবার জন্য আমার হাত ধরে বাবা বড় রাস্তা পর্যন্ত গিয়েছেন,—তিনি আর গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত যাবেন না, ঐখান থেকে ফিরে আসবেন। হঠাৎ একজন প্রৌঢ়, প্রায় বৃদ্ধ বললেই চলে, মুসলমান এসে বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন,—কেমন আছেন কাকাবাবু? আমিতো অবাক। বাবা তাঁকে দেখে খুব খুশী, অনেক গল্প করলেন। ভদ্রলোক আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এইটি বুঝি আমার ভাই? বলে আমাকে আদর করে চলে গেলেন। বাবার কাছে শুনলাম, এঁরা আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন। বাবার চেয়ে বড় হলেও পাড়া সম্পর্কে বাবাকে কাকাবাবু বলতেন। সুখে দুঃখে পরস্পর পরস্পরের সহায় ছিলেন। হিন্দু প্রথা অনুযায়ী ব্রাহ্মণ কাকাবাবুর পদধূলি নিতে তো চোখেই দেখলাম। একবার জলে নাকি চারদিক ডুবে যায়। তখন এঁদের আশ্রয় নিতে হয় আমাদের এবং অন্যান্য হিন্দু-ভদ্রলোকের বাড়ীতে। ৺বলাই মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণকারী এক মুসলমান গৃহস্থবধূর প্রসব বেদনা উপস্থিত হওয়ায় মল্লিক মহাশয়ের বৃদ্ধ পিতাকে সেই বড় জলে দৌড়াদৌড়ি করে সব ব্যবস্থা করতে হয়। তখনকার দিনে বোপঝাড়, মশামাছি, পুকুর ডোবা, কুঁড়ে ঘর, যাদুঘরপ্রধান খোলা নালী নর্দমা, খাটা পায়খানা, কাঁচা রাস্তা, কেরোসিনের টিমটিমে বাতি, এসব ছিল। গ্রাম পাড়াগাঁয়ের অবস্থা আর কি! কাঁচা রাস্তা আমিও দেখেছি মনে আছে। এ সব অবস্থা সত্ত্বেও, অবস্থাপন্ন বৃদ্ধ প্রতিবেশী দরিদ্র বিপন্ন বিধর্মী গৃহস্থ-বধূর সেবা নিজের মেয়ের মতই করেছিলেন।

কালক্রমে এই পুকুর আর তার আশে পাশের জমি মিশনারীরা কিনে নিয়ে মিশনারী কলেজ ভবন নির্মিত হয়। অবশ্য লাইব্রেরী ভবন তৈরীর ব্যাপারটা বেশ মনে আছে। সেটা অনেক পরের ব্যাপার। আর অধ্যাপক ভবন তৈরীতো সেদিনের কথা।

মিশনারী কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকেরা —বিশেষ করে সাহেব যাঁরা ছিলেন—পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব মিশতেন এবং তাদের সুখ-দুঃখের কিছু ভাগও নিতেন। এই কলেজের অধ্যক্ষদের মধ্যে খুব বেশী মনে পড়ে ডাঃ B এবং Mr. Mকে। ডাঃ B এবং শ্রীমতী B বড় মিতুক প্রকৃতির ছিলেন। ছাত্রদের এঁরা খুব ভাল বাসতেন। ক্লাসে কোন ছাত্র কি রকম পড়াশুনা করছে, কেমন ব্যবহার কেমন চরিত্র, এসব খবর ডাঃ B-এর নখদর্পণে ছিল। শুনেছি কোন ক্লাসে উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখলেন, হয়তো দু'জন ছাত্র

অনুপস্থিত। ওঁর ঠিক জানা ছিল, হস্টেলের কোন ঘরে ছেলে দুটি তার বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলছে। 'একটু বস তোমরা' বলে B সাহেব উঠাও। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, সাহেব মাঠের উপর দিয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ পদ বিক্ষেপে যাচ্ছেন কলেজের দিকে। দুই বগলে দুটির বগলে রাবণের মত দুই ছাত্র, শূন্যে তাদের হাত পা আক্ষেপিত হচ্ছে। আবার, খুব বৃষ্টি, মাঠের ভিতরই এক কোমর জল জমেছে (মাঠটা সাধারণ রাস্তা থেকে অনেক উঁচু level এ অবস্থিত), B সাহেব গেঞ্জি ও হাফপ্যান্ট পরে কোথা থেকে এক বাঁশ টব জোগাড় করে নৌকা বানাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেই নৌকাতে চড়তেই ওঁর দেহের ভারে নৌকা গেল কাত হয়ে এবং বিপুল উদর নিয়ে B সাহেব জলে উল্টে পড়ে হাত পা ছুঁড়তে লাগলেন।—ছাত্ররা তামাসা দেখছিল, এবার দৌড়ে অধ্যক্ষকে তুলতে এল—কিন্তু অধ্যক্ষ তাদেরই ধরে জলে চুবিয়ে দিয়ে হো হো করে হাসতে লাগলেন। মানুষটি রসিকও খুব ছিলেন। বি-এ পরীক্ষার পর দার্জিলিঙে বেড়াতে গেছি। অবজারভেটরি হিলের কাছে ডাঃ ও মিসেস্ B-এর সঙ্গে দেখা। একলা দার্জিলিঙে আসা উচিত নয়—এবং আমার দোকলা হওয়ার কোন সম্ভাবনা তখন কেন, অদূর ভবিষ্যতেও নেই বলায়, তখন দার্জিলিঙ আমার পক্ষে নিষিদ্ধ বলে সে কি হাসি! আবার শুনেছি, পড়াবার সময় এবং শাসন করবার সময় তিনি খুব কড়া ধাতের লোক হয়ে যেতেন—তখন তিনি অন্য মানুষ। M সাহেব এতটা হাসি-খুশী না হলেও বড় ভালমানুষ ছিলেন। ওঁকে ঢুলি চাদর পরা অবস্থায় প্রায়ই দেখা যেত। শ্রীবতী পাড়ার গৃহিণীদের বান্ধবী ছিলেন। শাড়ী পরে খুব ঘুরে বেড়াতেন। ছিপ্‌ছিপে সুন্দরী এই মহিলাটির প্রকৃতি বড় মধুর ছিল, হৃদয়ও দয়া এবং স্নেহে পূর্ণ ছিল।

আবার, পাড়ার নানা সমস্যায় এঁদের সাহায্য পাওয়া যেত। একবার এক ধনী ব্যবসায়ী ওঁর মাল-বাহী লরী চলাচলের সুবিধার জন্য পাড়ার গলিটাকে গাড়ীর রাস্তা করতে চেয়েছিলেন। বাবা ও অন্যান্য কয়েকটি ভদ্রলোক এই বিশ্বভারতী কলেজের কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে দেখা করে জানালেন, গলিটিকে গাড়ীর রাস্তা করলে পাড়ার অনেক অসুবিধা হবে এবং সব চেয়ে ক্ষতি হবে ছেলেপুলেদের খাসের কাছে এই গলিটাই একমাত্র খেলার জায়গা, অথচ লাভ কিছুই হবে না মোটর দুর্ঘটনা বাড়া ছাড়া। বিশ্ব-ভারতীর তৎক্ষণাৎ পাড়ার লোকেদের দিকে হয়ে গলি ভেঙে রাস্তা করার বিপক্ষে দাঁড়ালেন এবং সেই ব্যবসায়ীকে এই প্রচেষ্টা বন্ধ করতে হল। একবার বাজে ধর্মঘটের সময় অধ্যাপকদের ও অধ্যক্ষ সাহেবকে ছাত্রদের নিয়ে রাস্তাঘাট সাফ করতে দেখা গেছে। ১৯২৬ সালে বন্যার সময় সাহেব ও ওঁর ছাত্ররা অনেক সাহায্য করেছে।

অন্যায় প্রশ্ন

শ্রীকুমারলাল দাসগুপ্ত

সারা জীবনটা প্রায় ছোটনাগপুরে কাটলো, তাই পশুপক্ষীর মত অরণ্যকে ভালবেসে ফেলেছি। আগে বছরের বেশী সময়টা পাহাড়ে আর বনে ঘুরে বেড়াতাম, এখন বয়সের সঙ্গে মনের কিছুটা ও শরীরের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে, তাই ঘরে বসে খোলা জানালার ভিতর দিয়ে দূরের পাহাড় আর তার শাল অরণ্যের দিকে তাকিয়ে থাকি, বাওয়া আর ঘটে ওঠে না।

ফাল্গুন মাস, তারিখটা মনে নাই, দুপুর বেলা জানালার ভিতর দিয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে দেখছি, শীত শেষের পাণ্ডুর শাল অরণ্যে হালকা সবুজের একটা ছোঁয়া লেগেছে, তার মধ্যে এখানে ওখানে লাল রং-এর ছিটে। বুঝলাম, পলাশ ফুটতে সুরু করেছে! মন কেমন করে উঠলো, ইচ্ছে হোলো ছুটে গিয়ে অরণ্যের বসন্তোৎসবে যোগ দিই, কিন্তু 'ঘোর ভানা নাই', দূরত্ব যে অনেক, যাব কেমন করে? বুকের মধ্যে গভীর একটা বেদনা নিয়ে বিরহীর মতই বসে আছি, এমন সময় বাইরের দুয়োর আওয়াজ পেয়ে প্রশ্ন করলাম "কে?" "আমি বাবু অরোধা" বলে সামনে এগিয়ে এল ময়লা কাপড় হাঁটুর উপর তুলে পরা, মাথায় পাগড়ী, অনাবৃত দেহ, পায়ে গ্রাম্য চামারের তৈরি দোহা-ঠোকা নাগড়া, হাতে বাঁশের লাঠি, আধাবয়েসী একটা লোক। অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম "আরে, তুমি হঠাৎ এখানে? কি খবর, অরোধা?" সেলাম করে অরোধা বল্ল, "মাল কিনতে বাজারে এসেছি তাই, তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে এলাম।" খুশী হয়ে বল্লাম "তা খুব ভাল করেছ, বোসো!" অরোধা, বাংলায় অরোধা, তাতে খুশী, দূরের পাহাড়টার কোলঘেঁষে যে দুতিয়াবো গ্রাম—সেইখানে তার ঘর। অবস্থা মন্দ নয়, ছোট একখানা দোকান আছে, চালডাল নুনতেল, ছাতু, তামাকপাতা ইত্যাদি বিক্রি হয়। অরোধা লাঠিটা পাশে রেখে বসে পড়লো। বল্লাম "মাল কেমা হয়েছে?" মাথা নেড়ে সে বল্ল "না, আজ আর মাল কেমা হ'ল না, রামপ্রসাদবাবু কলকাত্তা গেছে, দোকান বন্ধ। বুধবারে হাটিয়া, সে দিন এসে হাটও কোরবো মালও কিনবো।" উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলাম, "তাহলে খালি গাড়ী ফেরৎ নিয়ে যাবে?" "হাঁ বাবু", বল্ল অরোধা। মাথায় একটা মতলব এলো, বল্লাম "অরোধা যদি আজ না গিয়ে কাল সকালে ফিরে যাও তাহলে কোন ক্ষতি হবে তোমার?" মাথা নেড়ে অরোধা বল্ল "না, ক্ষতি হবে না, তবে থেকেই বা কি হবে।" "যদি তোমার গাড়ীতে আমি যাই!" "তুমি যাবে বাবু?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করে অরোধা। মতলবটা খুলে বল্লাম অরোধাকে। "তোমার বয়েল গাড়ী পেলে পাহাড়ে বেড়াতে যেতাম"। "তুমি যদি সত্যিই যাও বাবু তাহলে একদিন কেন, দুদিনও থাকতে পারি" অরোধা হেসে বল্ল। বল্লাম "সত্যিই যাব।" "পাক্কা বাত, দেখ যেন খিলাপ না হয়, তোমরবেলা আমি গাড়ী নিয়ে আসবো" বল্ল অরোধা।

অরোধা চলে গেলে আমার সুরু হোলো উদ্যোগপর্ব। বাড়ী থেকে নিকটতম পাহাড় আসেয়ারা হচ্ছে আট মাইল, যেতে-আসতে দীর্ঘ সময় লাগবে, তাই একটি পুরোদিনের প্রোগ্রাম করতে হোলো। চা তৈরির সরঞ্জাম, রান্নার হাঁড়িকুড়ি, চালডাল নুনতেল ইত্যাদি গুছিয়ে নিতে লাগলাম, এ বয়সে এত উৎসাহ অনেকদিন পাইনি।

ভোর হবার আগেই অরোধা তার বয়েলগাড়ী নিয়ে উপস্থিত হোলো। আমি প্রস্তুত ছিলাম, মালপত্তর চাপিয়ে উঠে বসলাম গাড়ীতে। আধা-শহর আধা-গাঁ সরিয়ার পথ ধরে পড়লাম গিয়ে হাজারীবাগ রোডে। ভাল রাস্তা, গাড়ী চলে তাড়াতাড়ি, কিন্তু সে চলার আনন্দ বেশীক্ষণ টিকলো না, মাইলখানেক গিয়ে মাঠে নামলো গাড়ী। পথ আমার খুবই চেনা, অনেক দিন পরে আবার এ পথে চলেছি তাই সবই যেন নতুন লাগছে। আলো হয়েছে কিন্তু রোদ ওঠে নি, গাছপালার নীচে তখনও অন্ধকার। একটা ঘুঘুর ডাক ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। মাঠ পার হয়ে হড়মুড় করে একটা নদীতে নামলো গাড়ী, বালির উপর দিয়ে চলেছে চাকা, যেন পুরু গালিচার উপর দিয়ে চলেছে, শব্দ নাই, ঝাঁকুনি নাই। নদী পার হয়ে ক্যাঁ কোঁ করে উঁচু পাড়ে উঠলো গাড়ী। নদীর এপাড় থেকে সুরু হয়েছে বন, যতবার এদিকে এসেছি এই বনপথ আমার খুব ভাল লেগেছে, কিন্তু এ কি, সে বন কোথায়? চারিদিকে তাকিয়ে দেখি বন নেই, সারি সারি দীর্ঘ শাল, শিমুল আর পিয়াল গাছ অন্তর্হিত হয়েছে। এখানে ওখানে অতীত বনানীর সাক্ষ্য দিচ্ছে দু'একটা মহুয়া আর পলাশ গাছ। প্রশ্ন করলাম "অরোধা, বন গেল কোথায়?" "কাটা গেছে" বল্ল অরোধা। মনটা খারাপ হয়ে গেল। চলতে চলতে দেখলাম মাঝে মাঝে লাল জমিতে ক্ষেত তৈরি হয়েছে, ঘরও উঠেছে দু'চারখানা।

পাহাড়ের কোলে পৌঁছে গেলাম বেলা দশটা নাগাদ। বন অরণ্য দেখে মন আবার খুশী হয়ে উঠলো। এখানে কতবার এসেছি, কতবার ডেরা ফেলে দীর্ঘকাল কাটিয়েছি, যেমন ছিল ঠিক তেমনি সব সাজান আছে। জোড়া-মহুয়া তলায় পুরোনো দিনের স্মৃতি জাগানো পাথর দিয়ে তৈরি উনুন এখনও আছে, সেইখানে আজ আবার করলাম ডেরা। অরোধার থান ভেঙ্গে দিয়ে আমার লোকজন হাঁকডাক সুরু করে দিল, ঝরনা থেকে জল এলো, পাহাড় থেকে কাঠ এলো, পুরোনো উনুনে আবার জ্বললো আগুন, রান্না হোলো সুরু। ঘণ্টাখানেক এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করতেই খাবার ডাক এলো। গিয়ে দেখলাম শালপাতার আসন পাতা, সামনে শালপাতায় গাঁথা পাত্রে ভাত দেওয়া হয়েছে। মাথার উপর ঘুঘু ডাকছে, মহুয়া গাছের ছায়ায় বসে খেলাম ভাল।

একটু বিশ্রাম করে বেরিয়ে পড়লাম বেড়াতে। পাহাড়ের কোল দিয়ে এঁকেবেঁকে পায়ে চলার একটা পথ পূব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে, সেই পথ ধরে আমি এগিয়ে চল্লাম। শালগাছের ঝরে-পড়া শুকনো পাতায় বনতল ঢেকে গেছে। আমার সাড়া পেয়ে ত্রস্ত কাঠবেড়াল ছুটে গিয়ে গাছে উঠলো। যেখানে বন ঘন সেখানে গাছের ডালে ঠেলে ঠেলে পথ চলছি, শালের নবোদ্গত কচি পাতা নরম আঙুলের মত চোখে মুখে লাগছে। পথ ছেড়ে একটা গভীর নালা পাহাড়ের গা থেকে পাহাড়তলির দিকে নেমে গেছে, চেয়ে দেখলাম নালার ঝকঝকে সাদা বালির উপর রাত থেকে সুরু করে প্রায় সব জানোয়ারের পায়ের চিহ্ন পড়ে আছে, আমিও তার পাশে বাঘা কোম্পানীর একজোড়া পাঁচ-নম্বর জুতোর ছাপ রেখে গেলাম

একটু ঘুরে পথ দু'ভাগ হয়ে গেছে, একটা পাহাড়ের কোল ছেড়ে বনের মধ্য দিয়ে উত্তরে ঘুরে গেছে, আর একটা উঠে গেছে পাহাড়ে। সেই পথ ধরে আমি পাহাড়ে চড়তে লাগলাম। তেমন খাড়া পাহাড় নয়, চড়তে বিশেষ কষ্ট নাই। আশে পাশে বড় বড় পাথরের চাঙড় আর তাদের ফাঁকে গাছ আর পাহাড়ী বাঁশের ঝাড় উঠছে। ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছি। একেবারে উদ্দেশ্য-বিহীনভাবে নয়, আমি জানি আর খানিকটা উপরে উঠলে পাহাড়ের কোলে ছোট একটা

সাঁওতাল পল্লী দেখতে পাব। অনেক কাল আগে সাঁওতাল পল্লীতে আমার খুবই আসা-যাওয়া ছিল। আমার কাছে অরণ্যের সবচেয়ে বড় রহস্য হচ্ছে সাঁওতাল। শাল, শিশম, পিয়াল, পলাশ গাছের মত সাঁওতালও হচ্ছে অরণ্যের একটা অংশ। এদের জন্ম হয় অরণ্যের অন্তরালে, এরা বেড়ে ওঠে অরণ্যের আশ্রয়ে, প্রেম করে অরণ্যের আলোছায়ায়। এরা বাঘের সঙ্গে লড়ে, হরিণের সঙ্গে ছোটে, ময়ূরের সঙ্গে নাচে, আবার এদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে অরণ্যের সম্পদ লুট করে খায়। এদের জীবনযাত্রা যেমন সহজ তেমনি সুন্দর। জ্যোৎস্না রাত্রে বনের আঙিনায় সাঁওতালী মেয়েদের নাচ আমি বহুবার দেখেছি। নৈর্ঋে প্রস্থে খাটো পরনের মোটা শাড়ী এরা এত সুন্দর ঝাঁট করে পরে যে সৌন্দর্য ও শালীনতা দুইই বজায় থাকে। সাঁওতালী নাচ অত্যন্ত সংযত, লাফালাফি হাত-পা নাড়া নাই. আছে তালে তালে পা ফেলে এগোনো, আর পেছনো, মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ে ডাইনে বাঁয়ে দোল খাওয়া। এরা গান গায় চাপা গলায়—ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলার মত, তা কালোঘোড়ের পেছনে সারেঙ্গীর মিহি আওয়াজের মত শোনায়।

পাহাড়ের কোল বেয়ে আরো একটু উপরে উঠতেই চোখে পড়লো পুরোনো সাঁওতালপল্লী। একটা পাথরের উপর বসে দেখতে লাগলাম, পাহাড়ের পায়ের কাছে জঙ্গলঘেরা পল্লীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে, যেমন দেখেছি তেমনটি আর নাই। খোড়ো ঘরের মাঝে মাঝে খোলার ঘর চোখে পড়লো, একখানা ঘরের মাটির দেয়াল আবার চুণকাম করা। এই শহরে সাদা রং অরণ্যের মসৃণ পরিবেশের মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও সুন্দর লাগলো না। আশ্চর্য হয়ে ভাবছি হোলো কি, সাঁওতাল পল্লী উঠে গিয়ে খাঁ খাঁ করছে বাকি, এমন সময় পিছনে আওয়াজ পেয়ে ফিরে দেখি হাতে ছোট কুড়ুল, কাঁধে কাঠের বোঝা নিয়ে এক বুড়ো সাঁওতাল এসে দাঁড়িয়েছে। মুখখানা যেন চেনা চেনা মনে হোলো, আন্দাজে বল্লাম "বড়কু মাঝি নাকি?" হেসে মাঝি বল্ল "চিনতে পেরেছিস বাবু।" কাঠের বোঝা নামিয়ে রেখে সে পাশে বসলো। বল্লাম "খবর সব ভাল তো?" মাঝি বল্ল "খবর সব ভাল। তোর খবর বল, অনেক দিন এদিকে আসিস নি।" বল্লাম "আসিনি অনেক কাল। এবার তোদের পাড়ায় নতুন নতুন জিনিস দেখছি, জঙ্গলে বুঝি অনেক হরিণ হয়েছে তাই তোদের অবস্থা ফিরে গেছে।" বড়কু মাঝি কপালে হাত ঠুকে বল্ল "জঙ্গল, জঙ্গল কোথায় বাবু, জঙ্গল তো সাফ হয়ে গেছে। যা জঙ্গল রয়েছে তাতে খরগোস পা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে না, তা হরিণ থাকবে কোথায়?" কথাটার সত্যতা আমি অনেক আগেই উপলব্ধি করেছি, তাই প্রশ্ন করলাম, "জঙ্গল গেলে তোমরাই বা আর কতদিন টিকে থাকবে? অরণ্যই তো তোমাদের সহায় সম্পদ।" মাঝি আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বল্ল "চল, আমার ঘরে গিয়ে বসবি।" একদিনের সফরে এসেছি, সময় খুবই কম, তাই মাঝির অনুরোধ রাখতে পারলাম না, বল্লাম "এখানেই একটু বসে বাড়ী ফিরে যাব।" মাঝি উঠে পড়লো, কাঠের বোঝা কাঁধে তুলে পল্লীর দিকে চলে গেল।

খানিকক্ষণ বসে থেকে উঠবো ভাবছি এমন সময়ে দেখলাম, পাজামা পাঞ্জাবি পরা একটি লোক ছুতো মস্‌মস্ করে পল্লী থেকে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। বনের মধ্যে বনরক্ষা বিভাগের কর্মচারী দেখে আশ্চর্য হলাম, কেননা ওঁরা সর্বদা লোকালয়ে বসে বনরক্ষা করেন। আমার সামনে এসে ভদ্রলোক হাত জোড় করে বল্লেন "নমস্তে বাবুজী"। বল্লাম "নমস্তে", মনে মনে অসন্তুষ্ট হলাম, এখানে বসে এ লোকটির সঙ্গে আলাপ করে সময় নষ্ট করবার ইচ্ছে আমার নাই। ভদ্রলোক আবার বল্লেন, "বাবুজী এদিকে অনেকদিন পরে এলেন।" ভদ্রতার

পাল্টিয়ে জবাব দিলাম "হাঁ হাঁ।" ভদ্রলোক যাতে নিজের কাজে চলে যান সেজন্তে তাঁর দিকে না তাকিয়ে অন্তদিকে তাকিয়ে থাকলাম। একি আপদ, তিনি তবু ছাড়বেন না, প্রশ্ন করলেন "বাবুজী" আমাকে চিনতে পারলেন না?" কাটা কাটা জবাব দিলাম "মোটেই না, কখনো দেখিনি।" ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন, তারপরে বল্লেন "ভাল করে আমার দিকে তাকিয়ে দেখুন তো"। ভাল করে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতে হোলো, কিন্তু তাঁকে চিনতে পারলাম না, ঘাড় নেড়ে তা জানিয়ে দিলাম। ভদ্রলোক বল্লেন, "আমি দেবেশ্বর"। বল্লাম "না, ওনাম কখনো শুনিনি।" দেবেশ্বর বাবু একটু ইতস্তত করে বল্লেন "আমি বড়কু মাঝির ছেলে।" কাছে বোমা ফাটলে মানুষ যেমন চমকে ওঠে, আমি তেমনি চমকে উঠলাম, অবাক হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার অবস্থা দেখে সে হাসলো, বল্ল "আপনি যখন আমাকে দেখেছেন তখন আমি ছোট ছিলাম, এখন আমি অনেক বড় হয়েছি, হঠাৎ দেখে আমাকে চেনা তো মুস্কিলই।" ধীরে ধীরে মনে পড়লো সাত আট বছরের একটি কালো ছেলেকে, পরনে নেংটি. গলায় পুঁতির মালা, হাতে ছোট কুড়ুল। তখন তার নাম ছিল 'দারে' অর্থাৎ গাছ, গাছের মত চেলা। এই কি সেই? বিশ্বাস যেন হতে চায় না, কি পরিবর্তন, নাম পর্যন্ত বদলে গেছে, দারে হয়েছে দেবেশ্বর। সম্বিত ফিরে এলে বল্লাম "এইবার চিনেছি তোমাকে, তারি খুশী হলাম তোমাকে দেখে"। পাশের একটা পাথরের উপর সে বসলো। এতখানি পরিবর্তনের মধ্যে কি জানবার জন্তে কৌতূহল হোলো, ভাবতে লাগলাম কেমন করে কথাটা পাড়লে বেমানান হবে না, শেষে প্রশ্ন করলাম "কি কর আজকাল?" সে যেন বল্ল "মাষ্টারি"। আর একটা বোমা ফাটলো, তবে এবার বেসামাল হলাম না, কিন্তু টাল খেলাম বেশ, বল্লাম "বাঃ, খুব ভাল"। শুনে সে হাসতে লাগলো। আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস হোলো না, চুপ করে রইলাম। একটু পরে সে নিজেই বলতে লাগলো, "আপনি বোধ হয় জানেন না বাবুজী, আজকাল আমরাও লেখাপড়া শিখছি। বাপদাদা অসভ্য জংলী ছিল বলে আমরাও জংলী থাকবো এমনতো কোন কথা নাই।" বল্লাম "নিশ্চয়ই না"। শুনে সে খুশী হয়ে বলে যেতে লাগলো "আমরা বেশ এগিয়ে যাচ্ছি আজকাল, শিকার ছেড়ে দিয়ে চাষবাস করছি, সরকার আমাদের জন্তে ক্ষেতখামারের ব্যবস্থা করেছেন। শিক্ষার বিস্তারও হচ্ছে। বেহারে আমরা আছি প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ আদিবাসী, সরকার আমাদের উন্নতির জন্তে মোটা টাকা খরচ করছেন, আমাদের জন্তে বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে, ভালছেলেদের জন্তে stipend দেওয়া হচ্ছে. এই দেখুন, এবছরে প্রায় দুলক্ষ টাকার stipend খরচ হচ্ছে। কলেজের ছাত্র পিছে ৫০ টাকা, স্কুলের ছাত্র পিছে ৭ থেকে ১৫ টাকা দেওয়া হচ্ছে। আমাদের সাঁওতাল ছাত্রছাত্রীরা স্কুল ও কলেজ মিলিয়ে এবছর পঞ্চাশের উপর স্কলারসিপ পেয়েছে।" দেবেশ্বর অনেক কথা বলে যেতে লাগলো, কোন্ জেলায় কত স্কুল হয়েছে, কত ছেলেমেয়ে পড়ছে, কোথায় কে সরকারী কাজ করছে—এই সব। আমি শুনেও শুনছি না, আমার মন বারে বারে আলাপের যোগসূত্র হারিয়ে ফেলছে। অনেক দূরে পাহাড়ের মাথায় একটা ময়ূর ডেকে উঠতেই আমরা দুজনেই চমকে উঠলাম, বেলা যে পড়ে এসেছে। দেবেশ্বর উঠে দাঁড়াল, বল্ল "আমাদের পরিবারে এবার আপনি গেলেন না সেজন্তে আমরা খুবই দুঃখিত, কিন্তু সন্ধ্যা হতে বেশী দেরী নাই—আপনাকে যেতে হবে অনেক দূর, তাই আপনার সময় আর নষ্ট করতে পারি না।" আমি বল্লাম "আর একবার আসবো।" দুহাত যোড় করে সে বল্ল

"নমস্তে" তারপর পল্লীর দিকে চলে গেল। আমিও উঠলাম,—সেধবার পল্লীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম—পড়ন্ত রোদে চুণকাম করা ঘরখানা যেন দাঁত বার করে হাসছে।

আস্তানায় ফিরে এসে এক পেয়ালা চা খেয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে বসলাম। পাহাড়ের আড়ালে সূর্য তখন অস্ত গেছে, অরণ্য ঝুঁকে পড়েছে দীর্ঘ ছায়া, দু একটা আনোয়ার পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নেমে আসছে, শুকনো পাতা খড়মড়িয়ে উঠছে, বনমুরগি ডাকছে "জলকে চল"। যে পথ ধরে গাড়ী এসেছিল সেই পথ ধরে গাড়ী ফিরে চলল। ঝাঁকানিতে চোখে যেন তন্দ্রা নেমে এল, স্বপ্নই দেখলাম বুঝি, দেখলাম—একটা পাকা সড়ক দিয়ে হেঁটে চলেছি, সামনে পাহাড়, গাছ নাই, কেবল পাথরের স্তূপ। জঙ্গলের চিহ্নমাত্র নাই, পথের দুধারে মাঠ, সেই মাঠের মধ্যে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিদ্যুতের তারবাহী লোহার থাম। চলতে চলতে পাহাড়ের কোলে এসে পড়লাম, হঠাৎ দেখি জোড়াসহরা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, প্রায় চেনা যায় না, পথের ধুলোয় গাঢ় সবুজপাতা মলিন হয়ে গেছে। একপাশে একখানা বাড়ী, পাশ দিয়ে যেতেই ভিতরে হাসিগল্পের আওয়াজ পেলাম। চললাম এগিয়ে পুরোনো সাঁওতাল পল্লীর দিকে। সামনে একটা স্কুলবাড়ী, ঢংটকে ঘণ্টা বাজলো, কিটকাট একদল ছেলেমেয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে পথে এসে নামলো। পথের একটা মোড় ফিরতেই চোখে পড়লো পল্লী, কিন্তু সে পরিচ্ছন্ন সাঁওতাল পল্লী কোথায়, এযে সহরতলির নোংরা বস্তি! বাড়ী ঘরের বাহিরে আঁকজমক কিছু আছে, সামনে বাগান, জানালায় রঙীন পর্দা, কিন্তু ঘরের পাশেই খোলা মর্দিরা, আবর্জনার স্তূপ। পথ দিয়ে যারা আসছে যাচ্ছে, তাদের পোশাক চটকদার হলেও দেহে স্বাস্থ্য নাই। তারছি আগেকার সেই সুন্দর স্বাস্থ্যবান সাঁওতাল সাঁওতালী গেল কোথায়, এমন সময় শুনলাম পেছন থেকে কে যেন ডাকলো "বাবুজী।" ফিরে দাঁড়াতেই দেখলাম, পাশের একটা বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছে দেবেন্দর। কাছে এসে সে দুহাত জোড় করে বলে "নমস্তে বাবুজী।" প্রতি-নমস্কার করে বললাম "একি চেহারা হয়েছে তোমার, এরই মধ্যে চুল পেকে গেছে, রোগা হয়েছ ভীষণ, কি ব্যাপার?" দেবেন্দর ম্লানভাবে একটু হেসে বলে "অনেকদিন থেকে অম্বলের রোগে ভুগছি, তাতেই শরীরটা ভেঙে গেছে। তাছাড়া, ভাবনা চিন্তাও তো কম নয়।" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম "তোমার আবার ভাবনা চিন্তা কি?" ভুরু কুঁচকে সে বলে "সংসারে অভাবের অন্ত নাই।" আশ্চর্য হলাম, বললাম "সে কি—এখনও অভাব?" সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে দেবেন্দর বলে, "আসুন বাবুজী, চা খাবেন।" গেলাম তার সঙ্গে, তার বাড়ীর বারান্দায় বসলাম, ট্রেতে করে চা এল, আয়োজনের ত্রুটি নাই। গল্প করতে করতে সন্ধ্যা নেমে এল, ঘরে বাইরে বিদ্যুতের আলো জ্বলে উঠলো। আমি বললাম "এখন তাহলে উঠি।" দেবেন্দর বলে "আপনি তো নাচগান ভালবাসেন, আজ সন্ধ্যায় আমাদের ক্লাবে নাচগান হচ্ছে, যাবেন বাবুজী?" আমন্ত্রণটা খুশী হয়েই গ্রহণ করলাম।

জোড়াসহরার পাশে যে বাড়ীটা আসে দেখেছি সেটা যে ক্লাববাড়ী এখন তা বুঝতে পারলাম। ভিতরে বাইরে আলো ঝলমল করছে, নরনারীর ভিড় জমেছে, হাইহিলের খুট খুট আওয়াজ তো শুনলামই, কোনকোন বধূনারীর ঠোঁটে রক্তের পোঁচও দেখতে পেলাম। ভিতরে গিয়ে বসলাম সুজনে। গানবাজনা কিছু হোলো, এবার নাচ হবে, সামনের পর্দা সরে যেতেই দেখলাম, মঞ্চের পিছনে অরণ্যের সিন টাঙানো হয়েছে। হঠাৎ নীল আলো জ্বলে উঠলো, বোধ হয় সেটা জ্যোৎস্নার প্রতীক, তারপরে বাজতে সুরু করলো একটা rock and roll-এর সুর। সেই সুরের তালে

নাচতে নাচতে অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এল চারটি মেয়ে। দেবেন্দরকে প্রশ্ন করলাম, "এটা কি নাচ?" সে বল্ল "সাঁওতালী নৃত্য।" আমি বল্লাম "এটা কি রকম সাঁওতালী নৃত্য, বেসামাল লাফালাফি কেন?" দেবেন্দর গম্ভীর হয়ে বল্ল "একটু আধুনিক করা হয়েছে।" অবাক হয়ে সাঁওতালী নৃত্য দেখলাম। নাচ শেষ হলে খুব হাততালি পড়লো, আমার আড়ষ্ট হাতে তালি বাজলো না।

আসর ভাঙলে দেবেন্দরের সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। রাত হয়েছে অনেক। হঠাৎ প্রশ্ন করলাম "আচ্ছা দেবেন্দর, তোমাদের সেই পুরোনো পল্লীর কথা মনে পড়ে, পাহাড়ের কোলে অরণ্যের ছায়ায় ছোট পল্লীটি?" দেবেন্দর অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, "তা মাঝে মাঝে মনে পড়ে।" খুশী হলাম শুনে, বল্লাম "সেই দিন ভাল।" আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল দেবেন্দর, বল্ল "আপনি কাকে ভাল বলছেন, কয়েকখানা কুঁড়ে ঘরকে? দশটা জানোয়ারের সঙ্গে জানোয়ারের মত বাস করাকে?" আপত্তি জানালাম, বল্লাম "জঙ্গলে থাকলেই জানোয়ার হতে হবে এমন কথা কিছুই বলা চলে না, বরং—" কথাটা শেষ করতে না দিয়ে দেবেন্দর যথেষ্ট ঝাঁজের সঙ্গে বল্ল, "সেই পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গি বাবুজী, সেই পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গি। আপনারা আমাদের প্রগতি পছন্দ করেন না।" প্রশ্ন করলাম "এই কি প্রগতি?" দেবেন্দর কঠিন ভাবে জবাব দিল "এ আপনার অন্তায় প্রশ্ন, যে পথে আপনি চলেছেন সেই পথে আমরাও চলেছি।" জবাবটা মাথার হাতুড়ির মত পড়লো, মুহূর্তে তন্দ্রা ছুটে গেল, অনুভব করলাম গাড়ী তখন হুড়মুড় করে উঁচু পাড় থেকে নদীতে নামছে, জল পরম করবার বড় কেতলিটা ছিটকে এসে পড়েছে মাথায়। মাথায় হাত দিয়ে উঠে বসলাম।

———

বৈদিক ভারতে বুনিয়াদী শিক্ষা

শ্রীমীরদেব্ সান্যাল

বৈদিক ভারতে শিশু নির্দিষ্ট বয়সে আচার্যের আশ্রমে—গুরুগৃহে উপস্থিত হইলে আচার্য তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষা দিতেন। এই অনুষ্ঠানই রূপান্তরিত হইয়া এখনকার উপনয়ন-সংস্কারে পরিণত হইয়াছে। দীক্ষান্তে শিষ্যের নাম হইত ব্রহ্মচারী অর্থাৎ বেদবিহিত আচরণকারী। আচার্য ও ব্রহ্মচারী এই দুইটি শব্দেই আচরণার্থক চর্ ধাতু আছে। অর্থাৎ আচার্য আচরণ করিয়া শিখাইতেন এবং ব্রহ্মচারী আচরণ করিয়া শিখিত। শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ—দুইটি হইত আচরণ অর্থাৎ কার্যের মাধ্যমে। এই আচরণই ছিল আশ্রম অর্থাৎ শিক্ষায়তনের প্রধান কার্য। পুঁথি ঘরিয়া পাঠ দেওয়ার তেমন প্রয়োজন বা প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয় না। আশ্রমের চিন্তাধারা, পারিপার্শ্বিকতা এবং অধিবাসীগণের আচরণ এমনিই ছিল যে আশ্রমের দৈনন্দিন কর্মসূচীর অনুসরণ করার ফলে ব্রহ্মচারীর আপনা আপনিই সকল জ্ঞাতব্য বিষয় জানা হইয়া যাইত। আশ্রমের আবহাওয়ার তারতম্য অনুসারে ব্রহ্মচারীর অর্জিত জ্ঞানেরও তারতম্য হইত। যেমন শ্বেতকেতুর ক্ষেত্রে হইয়াছিল। আচার্যগণ সম্পূর্ণ সদাচারপরায়ণ হইলেও শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেন, "বাঙ্মাবাক্ং

মুচবিতামি, তানি ঘরোপাস্তামি। মো ইত্তরাপি।"—এই ভাবে শিষ্যের বিচারশক্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা হইত।

ব্রহ্মচারীর উপর ভার থাকিত আচার্যের অগ্নিরক্ষা, যজ্ঞশালার ব্যবস্থাপনা ও গোচারণ প্রভৃতি সেবার। এই সেবার সহিত থাকিত প্রবিপাত ও পরিপ্রশ্ন। এই তিনটির মাধ্যমেই ব্রহ্মচারীর জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ হইত। যেদিন আচার্য ব্রহ্মচারীর আচরণ হইতে বুঝিতে পারিতেন যে বেদবিধি তাহার কর্মের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকট হইতেছে সেইদিন তাহাকে স্নাতক আখ্যা দিয়া গৃহে ফিরিবার অনুমতি দিতেন। ইহাকেই বলা হয় আচার্যের ঘরে বিদ্যালাভ। বরদানের ফলে বিদ্যালাভ হইত বলিয়া মনে না করিয়া এই বরদানকে বিদ্যা-বত্তার স্বীকৃতি বলিয়া মনে করাই বোধ হয় ভাল।

কবিরাজ বাড়ীর মেয়েছেলেরা, এমন কি ভৃত্যেরাও, আয়ুর্বেদ না পড়িয়াও অনেক রোগের ঔষধের নাম জানে। নিরক্ষর ভারতীয় ভৃত্যও সাহেব বাড়ীতে চাকুরি করার ফলে কিছু কিছু ইংরাজি বলিতে ও বুঝিতে শিখিয়াছে—সাহেবী আদব-কায়দা ও শিখিয়াছেই। সবই কর্মের মাধ্যমে।

বৈদিক ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাও কর্ম-কেন্দ্রিক ছিল—লিপি উদ্ভাবিত হওয়ার পূর্বে ও বটেই, পরেও বহুকাল পর্যন্ত।

শিক্ষা-বিশেষজ্ঞগণ যদি এখানকার যুক্তিবাদী শিক্ষার সহিত সুপ্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির তুলনা করেন, তাহা হইলে শিক্ষাসংস্কার উপর নূতন আলোকপাত হইতে পারে।

———

ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকের ডায়েরী

পূর্ব প্রকাশিতের পর

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

সামাজিক রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার

সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সমগ্র দেশবাসীর শিক্ষার উন্নতি, বিজ্ঞানের সাধনা, সমাজমঙ্গল ব্যবস্থাদির ক্রম-পুষ্টিসাধন ও জনসাধারণের মনে আর্থিক ও রাষ্ট্রিক নিরাপত্তাবোধ সুদৃঢ় হওয়ার ফলে সুইডেন-বাসীদের জীবনে যে পরিণত মানবতা বোধের বিকাশ সম্ভব হইয়াছে, তাহা যুদ্ধপীড়িত অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে বড় দেখা যায় না। যে আতিথ্য ও প্রীতি আমি এদেশে উপভোগ করিয়াছি, তাহা দেশে অনেকেরই কল্পনার অতীত। দেশে তাহা শীঘ্র সম্ভব এরূপ মনে করিতে ভরসা হয় না। দেশে আমরা অহিংস নীতির যশোগাথা যতই করি না কেন সুদীর্ঘকালের পরাধীনতা ও লোকজীবনে আর্থিক অবস্থার বিপুল তারতম্য বর্তমানে, শুভপ্রীতির বিকাশ ভারতীয় জীবনে এখনও সম্ভব হইতেছে না। অহিংসা বা অপরকে নিজের প্রতিদানের সামর্থ্য সবল জীবনের ধর্ম, দুর্বলের নয়—এ সত্য এ দেশের সমাজ জীবনে সুস্পষ্ট দেখা যায়।

১৯২৮ সালে প্রথমবার যখন এ দেশে আসি, তখন ইংরাজী ভাষার প্রসার সুইডেনে ছিল না। সুইডিশ বিদ্যালয়ে তখন জার্মান ভাষাই বিশেষভাবে শেখান হইত। সেজন্য বাধ্য হইয়াই আমাকে

সুইডিশ ভাষা শিখিতে হইয়াছিল। পরে এস-পেরান্তো ভাষা শিক্ষার ফলে এদেশের আন্তর্জাতিক ডাকযোগে জনসাধারণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। ফলে এই দেশের লোকজীবনের ধারাকে ভিতর হইতে দেখিবার ও জানিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। বহুলত সুইডের ব্যক্তিগত জীবনের আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ মনকেও স্পর্শ করিয়াছে—যেমনটি আত্মীয় আত্মীয়ের জন্ত অনুভব করে। বস্তুতঃ আমার যৌবনকালটাই ওদেশে কাটিয়াছে। আমার এদেশে আসার পূর্বে এদেশে কোন ভারতীয় আমার মত এত দীর্ঘকাল কাটাইয়াছেন বলিয়া আমি শুনি নাই। পাঞ্জাবের বিপ্লবী ভক্টর হর-দয়াল রাজনৈতিক কারণে এ দেশবাসীর আশ্রয়ে কিছুকাল ছিলেন। বন্দনীয় মানবেন্দ্র রায়ও এ দেশে কিছুকাল আত্মগোপন করিয়াছিলেন। স্টকহলমের স্থানীয় লর্ড মেয়র লিণ্ডহাগেন (Lindhagen) মানবেন্দ্র রায়কে নিজের আশ্রয়ে রাখিয়াছিলেন। একজন সুইডিশ সাহিত্যিকের (নাম Idestrom ইডেস্ট্রম) সঙ্গে ভক্টর হরদয়াল ও মানবেন্দ্র রায়ের পরিচয় ঘটিয়াছিল। তিনি উভয়েরই প্রখর বুদ্ধিমত্তার বর্ণনা আমাকে শুনাইয়া দিয়াছিলেন। আর একজন ভারতীয়—নাম সাধু সুন্দর সিং—এদেশ ঘুরিয়া যীশুখ্রীষ্টের প্রেমধর্মের কথা শুনাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এঁদের কেহই এ দেশবাসীর আচার ব্যবহার ও সমাজের বিবরণ রাখিয়া যান নাই। বিদেশী সমাজের আদব কায়দা ও রীতিনীতি জানিবার বিষয়। আজকাল তো social studies বলিয়া বিষয়ও শিক্ষায়তনে পড়ান হয়; সেজন্ত সে দেশের সমাজ সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সুইডেনে তথা ইউরোপীয় অন্যান্য দেশে জাতিভেদ নাই; সেইজন্ত সামাজিক বিভেদ বিবেচনা করিতে গেলে দেশবাসীর আর্থিক অবস্থার তারতম্যের উপর নির্ভর করিয়াই আলোচনা করিতে হয়। গরীব বলিতে আমাদের দেশে যাহা বুঝি তাহাও সেদেশে নাই। বৈবাহিক সম্পর্ক সকল স্তরের লোকের মধ্যেই হইয়া থাকে। সমাজকল্যাণ রাষ্ট্রসমূহে এরূপই হয়।

সুইডদের চেহারা সাধারণত দীর্ঘ, চক্ষুতারকা নীলাভ, চুল পীতাভ বা পিঙ্গল বর্ণের—যেমনটি আমরা সাধারণতঃ এ দেশের সাহিত্যে পড়িতে পাই। আর শীতপ্রধান অঞ্চলের প্রকৃতির সঙ্গে সে দেশ-বাসীর চেহারার যেন কোথাও একটা গভীর সামঞ্জস্য আছে। কাল চুল, কাল চোখের লোক যে না দেখা যায় এমন নয়, ব্যতিক্রম কখনও কোথাও চোখে পড়ে।

উত্তর দক্ষিণে লম্বা দেশটির উত্তরাঞ্চল সুমেরু রেখাকে অতিক্রম করিয়া বিস্তৃত। বিশেষতঃ উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীরা বিচ্ছিন্ন হইয়াই বাস করে। প্রথম যখন ল্যাপল্যাণ্ড ভ্রমণে যাই তখন স্টকহলমের বন্ধুরা বলিয়াছিলেন—"হ্যাঁ, উত্তরে যাইতেছ, সেখানে ত মানুষ ও লোকবসতি চোখে পড়িবে না, গাড়ী হইতে শুধু মাইলের খুটিগুলিই গণিবে।" কথাটা যে কত সত্য তাহা শুধু অভিজ্ঞতা হইতেই জানা যায়। তবে আজকাল টেলিফোন রেডিও প্রায় ঘরে ঘরে আছে, আর যানবাহনের প্রাচুর্যে লোকবসতির মধ্যে দূরত্বের অবসান অনেকখানিই হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশে প্রাচীনকালের আচার ব্যবহার আবার স্বকীয় সাংস্কৃতিকরূপে লইয়া নূতনভাবে সমাজে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—যেমনটি রেনেসাঁসের বেলায় ঘটিয়াছে।

সুইডদের পোষাক পরিচ্ছদ অন্যান্য শীতপ্রধান সভ্য দেশেরই মত; প্যারিস লণ্ডনের হালফ্যাশান সুদূর বিচ্ছিন্ন পল্লীবাসীর মধ্যেও দেখা যায়। পুরাকালে হাতে তৈরি বিবিধ ডিজাইনের সুরম্য কাজ করা পোষাক সম্পন্ন নরনারীরা ব্যবহার করিত; আবার সেই পোষাকের ধারা সমাজজীবনে নূতন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। উৎসবাদি উপলক্ষে

আবার প্রাচীনকালের মনোরম পোষাক নরনারী সকলেই ব্যবহার করিতেছে।

নেস (Naas) শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সন্ধ্যাকালে লোকনৃত্য ও লোকগীতির আসর হইত, অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী স্ব স্ব আঞ্চলিক "জাতীয় পোষাকে" এ আসরে যোগ দিতেন। এই "জাতীয় পোষাক" দেখিতে সত্যই মনোরম; ডিজাইন ও রঙের সমাবেশ অপূর্ব, আর প্রত্যেক অঞ্চলের পোষাকেরই ডিজাইন ও রঙ পৃথক। পোষাক দেখিলেই জানা যায়—পরিচ্ছদধারী কোন অঞ্চলের লোক। সুইডেনের জলাশয় প্রদেশের সিলজ্যান (Siljan) নামক সুবৃহৎ হ্রদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মহিলারা দৈনন্দিন জীবনেও জাতীয় পোষাক ব্যবহার করিতেন লক্ষ্য করিয়াছি। তাছাড়া গ্রীষ্মকালীন "মধ্য রাত্রি"র (midsummer night) উৎসবে দেশের সর্বত্র ছেলে বুড়ো কিশোর কিশোরী যুবতী বৃদ্ধা সকলেই আঞ্চলিক "জাতীয় পোষাকে" সজ্জিত হইয়া যোগ দেয়। বার্ষ গ্রীষ্মে অর্থাৎ ২৩শে ও ২৪শে জুন সূর্যদেব যখন মধ্য গগনের সর্বোচ্চশিখরে অবস্থান করেন তখন এই উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবে সকলেই যোগ দেয়, আর সম্ভবতঃ ইহা প্রাচীনতম উৎসব প্রথা। আমরা বাংলাদেশে যেমন বিশেষ উৎসব পর্ব উপলক্ষে সবুজ পাতা দিয়া আসর সাজাই, তেমনি গ্রীষ্মকালীন মধ্যরাত্রি উৎসবেও স্থানীয় গাছের কচি পাতা দ্বারা বাড়ীঘর সজ্জিত করা হয়; সেদিন এমন কি জাহাজগুলি পর্যন্ত সবুজ পত্রের অলঙ্কারে ভূষিত হয়। পল্লী অঞ্চলে খোলা মাঠের মধ্যস্থানে একটি বিশাল খুঁটি বসান হয়। সপত্র কচিডাল ও ফুলের মালা দিয়া এই খুঁটিকে মণ্ডিত করা হয়। ছোট বড় নির্বিশেষে নরনারী সকলেই জাতীয় পোষাক পরিয়া হাতে হাত মিলাইয়া খুঁটির চতুর্দিকে চক্রাকারে লোকনৃত্য করে। সে দেখিবার মত দৃশ্য। এইদিনে দক্ষিণ সুইডেনেও রাত্রির অন্ধকার থাকে না; সূর্যের উৎসব তোর ২টা এমন কি ৩টা পর্যন্ত চলে। আমি পর পর তিন বৎসর (১৯২৮ হইতে ১৯৩০) এই উৎসব প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

'এপ্রিল ফুল' দিবসে প্রথম শহরে স্টকহলম ও প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় শহর উপশালায় বিরাট এক অগ্নি কুণ্ড করা হয়, দলে দলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এই উৎসবে যোগ দেয়। সাধারণতঃ টিলা বা উচ্চভূমির উপর অগ্নিকুণ্ড করা হয়। এই অগ্নিকুণ্ডের প্রথাও সম্ভবতঃ প্রাক্-খ্রীঃ যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে।

এদেশে গ্রীষ্মকালে সকলেই ছুটির আনন্দ উপভোগ করে। শহরবাসীরা তখন বাহিরে—সমুদ্রকূলে অথবা পাহাড় পর্বতে চলিয়া যায় এবং প্রকৃতির সান্নিধ্যে শরীর মনের স্বাস্থ্য আহরণ করে। স্কুল কলেজগুলি গ্রীষ্মকালে তিন মাস বন্ধ থাকে।

গ্রীষ্মাবসানে হেমন্তের হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিলে গাছের পাতা ঝরিতে থাকে। তখন শহরবাসীরা ছুটির অবসানে ঘরে ফিরে এবং দৈনন্দিন কর্মশালায় যোগ দেয়, কর্মজীবন তখন যথারীতি আরম্ভ হয়। অন্ধকারও তখন নামিয়া আসে, তখন দিনের বেলায়ও ঘরে ঘরে বিজলী বাতি জ্বলিতে থাকে। তখন সামাজিক সংযোগ নিয়ন্ত্রণ, পার্টী নিমন্ত্রণের পালা আরম্ভ হয়, তখন বন্ধু বন্ধুকে আত্মীয় আত্মীয়কে মধ্যাহ্ন আহারে বা সান্ধ্য আহারে নিমন্ত্রণ করেন। সমাজ প্রথা এই, নিমন্ত্রণকারী ভোজের পরও অতিথিকে সঙ্গে করিয়া নাট্য দর্শনে অথবা সঙ্গীত শ্রবণে অথবা ছায়াচিত্র দর্শনে লইয়া যান।

আমাদের দেশে আমরা যেমন কোন সংবাদ না দিয়াও আত্মীয় বা বন্ধুগৃহে উপস্থিত হইতে পারি, তেমন রেওয়াজ এদেশে নাই। শুধু আমন্ত্রিত হইলেই অন্য বাড়ীতে যাওয়া হয়। আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে পুনরায় আমন্ত্রণকারীকেও পার্টী নিমন্ত্রণ করিতে হয়, ইহাই এদেশের সমাজের রেওয়াজ।

এইভাবে দীর্ঘ শীতঋতু ধরিয়া নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের মধ্য দিয়াই সামাজিক যোগাযোগ চলে। আমার সে দেশে ত নিজের বাড়ী ছিল না; কিন্তু শীত ঋতুতে শত শত আমন্ত্রণ পাইয়াছি, রক্ষাও করিয়াছি! পাল্টা নিমন্ত্রণ করিবার দায় আমার ছিল না, তবু কালে-ভদ্রে বন্ধুবিশেষকে রেষ্টুরেন্টে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছি। কোন কোন ভোজনশালায় পরিচারিকা "জাতীয় পোষাক" পরিয়া পরিবেশন করে।

নিমন্ত্রিতকে যেভাবে আপ্যায়িত করা হয়, তাহাও উল্লেখযোগ্য। সময়মত আমন্ত্রণকারীর গৃহে উপস্থিত হইতে হয়, বলাই বাহুল্য। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বা পরে উপস্থিত হওয়া অনুচিত বিবেচিত হয়। আমন্ত্রণকারীর গৃহে পৌঁছিলে প্রথমেই গৃহস্থ অতিথির করমর্দন করিয়া স্বাগতম্ জানাইয়া থাকেন এবং বসিবার ঘরে বসিতে দেন।

খাবার ঘরে টেবিলে সাজানো থাকে। ঘরের এককোণে আকারে-ছোট টেবিলের উপর বহুবিধ মুখরোচক খাদ্য থাকে,—সুইডিশ ভাষায় এ ব্যবস্থাকে স্মোরগোচবোর্ড (Smorgosboard) বলা হয়। ক্ষুধাকে জাগ্রত করাই এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। বহু প্রকারের রুটি—নরম, শক্ত—সাদা, ব্রাউন প্রভৃতির সঙ্গে মাখন মাছ ভাজা. (সাধারণতঃ বাল্টিক হেরিং হার্ডিং) মাংস, পনির, সালাদ ইত্যাদি থাকে। এসকল খাদ্য সবিশেষ মুখরোচক। বিদেশীরা যখন প্রথম সুইডিশ গৃহস্থ ঘরে নিমন্ত্রিত হয়, তখন বড় অসুবিধা ভোগ করে—এই খাবার ব্যাপারে। ক্ষুধার উদ্রেককর এই সকল খাদ্য এত বেশী পরিমাণ খাইয়া ফেলে যে পরে প্রধান খাদ্য উপভোগ করিতে পারে না। আমি প্রথমবার ইংলণ্ডের লিভারপুল হইতে সুইডিশ জাহাজে করিয়া সুইডেনের গোথেনবার্গ নামক বন্দরে পৌঁছি। জাহাজে প্রাথমিক খাদ্য একমাত্র খাওয়ার বস্তু মনে করিয়া খাওয়ার ফলে পেট ভরিয়া যায়। পরে যখন প্রধান খাদ্য পরিবেশন করা হয় তখন আমার পক্ষে তাহা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। বিদেশাগত যাত্রী সকলেরও আমার দশা ঘটিয়াছিল। প্রাথমিক খাদ্য পরিবেশনের অর্থ জঠরাগ্নিকে উসকাইয়া দেওয়া। যাঁহারা মদ ব্যবহার করেন তাঁহারা আহার কালে ছোট ছোট কাচের পাত্রে পরস্পরের "স্বাস্থ্য পান" করেন। স্বাস্থ্য পানের পদ্ধতি আছে। ভোজনকালে প্রথমে গৃহকর্তা ও কর্ত্রী কাচপাত্র হাতে তুলেন, অন্য সকলে অনুসরণ করেন। গৃহকর্তা মাথা নত করিয়া অতিথিকে "স্বাগতম্" সম্বোধন করেন—ইহা এদেশের সমাজের ভদ্রতার রীতি। 'স্বাস্থ্যপান' শব্দের সুইডিশ প্রতিশব্দ (Skol) 'স্কোল।' এই বহুল প্রচলিত শব্দটি বহির্জগত বিদেশীরাও সহজেই আয়ত্ত করেন। স্বাস্থ্য পানের পর সকলেই পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি বিনিময় করেন এবং সম্মান প্রদর্শনের জন্য মাথা নত করিয়া গ্লাস যথাস্থানে রাখিয়া আহারে মনোযোগ দেন।

গৃহকর্ত্রী যখন বুঝিতে পারেন যে সকলেরই আহারের বেশ রুচি হইতেছে তখন 'রুটি মাখনের টেবিল' ছাড়িয়া প্রধান খাবার টেবিলের চারিদিকে অতিথিকে আহ্বান করেন, অতিথিদের কে কোথায় বসিবে সেই নির্দেশ গৃহকর্ত্রীকেই দিতে হয়। সাধারণতঃ তিন অথবা চার পদ খাদ্য থাকে। খাওয়ার সময় গল্প চলে। ভোজনের শেষে গৃহকর্তা বা কর্তার অবর্তমানে গৃহকর্ত্রী ছোটখাট বক্তৃতা করেন আর বক্তৃতার প্রধান মর্ম এইরূপ হয়:—অতিথিগণকে খাওয়ার টেবিলে পাইয়া নিজের আনন্দের আর সীমা নাই। পরে অতিথির পক্ষ হইতে উত্তর দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, এসব সামাজিক বক্তৃতা বেশ রসপূর্ণ হয় এবং অতিথি এরূপ আশা প্রকাশ করেন যে সেদিনকার সুখান্তের মত সুখান্তের আমন্ত্রণ এই শেষ নয়। ভোজনপর্ব শেষ হওয়ার পর সকলেই আসন ছাড়িয়া গৃহকর্ত্রীর দিকে অগ্রসর হন

এবং পর পর সকলেই গৃহকর্ত্রীর করমর্দন করিয়া সুখাদ্যের জন্য আনন্দ ও অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সুইডিশ ভাষায় এই অজস্র ধন্যবাদ সকলের প্রতিশব্দ Tack så mycket। ধন্যবাদ লাভ করিয়া গৃহকর্ত্রীও ধন্যবাদ দেন এবং শেষ পর্যন্ত Tack শব্দটি ব্যবহার করেন। সুইডেনবাসীর সমাজ জীবনে পরস্পরের প্রতি ধন্যবাদ প্রকাশ দেশবাসীর স্বাধীনতা বোধেরই অঙ্গ। ঘরে দোকানে রাস্তা ঘাটে কাহারও সঙ্গে কোন বিষয়ে যোগাযোগ হইলেই পরস্পর পরস্পরকে ধন্যবাদ দিয়া থাকেন। আমার প্রথম যৌবনে সে দেশে তিন বৎসর কাটাইয়া দেশে ফিরিবার পথে লণ্ডনে আসি। লণ্ডনে আমার দাদা থাকিতেন। যখন আবার সাক্ষাৎ ঘটে তখন আমি বলিয়াছিলাম Thanks for Yesterday। আমার দাদা আমার আচরণে খুবই বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সুইডেনে সকলেই সকলকে সকল কিছুর জন্যই ধন্যবাদ প্রদান করে। বলা বাহুল্য, সে দেশের সমাজ জীবনের প্রভাব আমার উপর পড়িয়াছিল—যাহার ফলে সেই দেশকে আমি ভিতর হইতে দেখিবার ও জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। অবশ্য পৃথিবীর সকল দেশেই ধন্যবাদ দেওয়ার প্রথা আছে; হয়ত প্রকাশভঙ্গী একরূপ নয়। সুইডিশ গৃহে শিশুরা পর্যন্ত খাওয়া শেষ করিয়া মায়ের কাছে দৌড়াইয়া যায় আর বলে—"মা, সুখাদ্যের জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ"। এই বলিয়া মায়ের কপালে চুমো খায়। মাকে ধন্যবাদ দিয়া বাবাকেও ধন্যবাদ দেওয়া হয়। একথা মনে করা অনুচিত যে এই রীতি একটা সামাজিক সংস্কার মাত্র, বা ধন্যবাদ শব্দের অতিরিক্ত ব্যবহার মাত্র। আমরা দেশে গুরুজনকে প্রণাম করি, পায়ের ধূলা লই; হইতে পারে ইহা সংস্কার মাত্র, কিন্তু শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য গুরুজনকে প্রণাম করা যেমন আমাদের পক্ষে সত্য, সুইডেনের সমাজ সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধন্যবাদ দেওয়ার রেওয়াজও তেমনি সত্য ও আন্তরিকতার পরিচায়ক। বলা বাহুল্য, এ দেশবাসীর অভ্রতার কথা কখনও ভুলিবার নয়।

উপরে সুইডিস পরিবারে অতিথি আপ্যায়নের কথা লিখিয়াছি, কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ নয়। সাধারণতঃ করমর্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সকলেই বসিবার কোঠায় কফির টেবিলের চারদিকে সমবেত হন। তখন পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন সহজ হইয়া উঠে। এ দেশে পরস্পরের সম্বোধন করারও বিশেষ রীতি আছে। "আপনি" "আপনাকে" প্রভৃতি শব্দ অজ্ঞাত প্রায়। বলিতে হয় "শ্রীযুত ডিরেক্টর" "শ্রীযুত রেক্টর" ইত্যাদি। যাহার যে পদবী তাহাই উল্লেখ করিতে হয়। এই প্রথার জন্য ভোতসতায় প্রথম প্রথম আলাপ জমাইয়া তোলা কঠিন মনে হয়। কিন্তু একবার অপরকে আত্মীয়বৎ স্বীকার করিলে আর সম্মানজনক ভারী ভারী পদবীর প্রয়োগ প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ করমর্দনের বিনিময়ে এক সুখময় মধুর সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। তখন একজন অপরকে "তুমি" "তুই" শব্দে—আহ্বান করেন আর সকল পদবীর মাথায় কুঠারাঘাত করিয়া একবার বাক্তদত্ত প্রথম নামে সম্বোধন করেন, সকল পদবীর অলঙ্কার একেবারে অন্তর্হিত হয়।

———

ছাত্রজীবনের এক অধ্যায় : বাগেরহাট কলেজ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

আর একবার ঘাটভোগের সন্নিকট আলাইপুরের পথে ছোটমাদার নিকট একদিন কাটাই। ইহা যে একদা একটি প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র ছিল, তৎকালীন ভগ্নদশা হইতে তাহা সম্যক উপলব্ধি হয়। আলাইপুর একটি টীথার ষ্টেশনও বটে।

বাগেরহাট হইতে আমাদের ও অকলে হাঁটাপথে আসিতে, বিশেষত বর্ষাকালে যেমন সময় অনেক লাগে পথও তেমনি দীর্ঘ। মধ্যে তিনটি নদী পার হইতে হয়। প্রথমেই বাগেরহাটের দক্ষিণে দত্তাটোলার খেয়া। বাদালের গায়ে বিশখালি নদীর খেয়া, শুনিয়াছি এই নদীটি শুকাইয়া গিয়া এখন একটি সোঁতা খালে পরিণত হইয়াছে। তৃতীয় বলেশ্বর নদ। বর্ষাকালে বলেশ্বরের কি প্রচণ্ড মূর্তি! ইহার মধ্যেও আমরা খেয়া পার হইয়া ওপারে গিয়াছি। পিরোজপুর মহকুমা এই বলেশ্বর নদের তীরেই অবস্থিত। দীর্ঘপথ যেমন কর্দমাক্ত তেমনি পিচ্ছিল। চলিতে কষ্ট হইত, কিন্তু কখনও ক্লান্তিতে মুহ্যমান হই নাই। কত গ্রাম অতিক্রম করিয়া গিয়াছি। মধ্যে শিবপুর ও বাকইখালি দুইটি গ্রাম দুটি বিভিন্ন কারণে আমাদের স্মরণীয় হইয়া আছে। শিবপুরে শিবরাত্রির মেলা হইত। নিকটেই গোলার খোলা, শ্রীরামপুরস্থ মাদিবার বাড়ী হইতে এই মেলায় একবার গিয়াছিলাম। বাকইখালি বর্ষপ্রাণ আজীবন শিক্ষাব্রতী আচার্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্মভূমি। বিশখালির খেয়া পার হইয়া আমরা বনগ্রাম বা বনগাঁয়ে ঢুকিতাম। এখানে বিখ্যাত দক্ষিণ রাঢ়ীয় জমিদার রায়চৌধুরী পরিবারের আবাস। প্রবলপ্রতাপ রাণী কমল-কুমারীর নাম ও অকলে তখন কে না জানে।

১

এ বৎসরের আরও দুই একটি ঘটনার বিষয় এখানে বলি। অন্যত্রও কিছু কিছু বলিয়াছি। কিন্তু এখানে একটু বিশেষ করিয়া বলিব। ঠিক সময় মনে নাই, তবে এটা মনে হইতেছে বর্ষা বা শীতকাল নয়। অধ্যক্ষ কামাখ্যা বাবু আমাদের কয়েকজন ছাত্রকে লইয়া দৌলতপুরে গেলেন। যশোহর-খুলনা জাতীয়-শিক্ষা-সম্মেলনের অধিবেশন। সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা বিপ্লবীপ্রধান কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। স্থান তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সত্যাশ্রম। অধ্যক্ষ কামাখ্যা বাবু এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন। আমরা যথাসময়ে খুলনা বাগেরহাট রেলপথে রূপসায় গিয়া পৌঁছি। এখানে খেয়াঘাট আছে। এই খেয়া নৌকায় লোক-চলাচল খুব। আবার এখান হইতে ষ্টীমারেও খুলনাঘাট ষ্টেশনে যাওয়া যায়। আমরা মাননীয় অতিথির সঙ্গী, এবারে তাঁহার সঙ্গে ষ্টীমারেই যাই। দৌলত-পুরে পৌঁছিয়া 'কিরণবার' দ্বারা সাদরে গৃহীত হই। সম্মেলন একদিন কি দুইদিন হইয়াছিল মনে নাই। প্রথম দিনের সম্মেলনের অন্তে সত্যাশ্রম দেখিয়া দৌলতপুর কলেজে যাই। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। রাত্রির অন্ধকারে কলেজ-চত্বর সম্বন্ধে তেমন জ্ঞান হয় নাই। ভোরবেলা উঠিয়া দেখি কি সুবৃহৎ চত্বর। চারিদিকে কত ঘর বাড়ী। মাঝে মাঝে পুষ্করিণী ও খেলার মাঠ। কলেজ-হোষ্টেল যেন সমুদয়ই কলেজ ভবনটির কাছাকাছি। 'গবর্ণমেণ্ট হোষ্টেলে' আমরা আহারাদি সমাপন করি। ভোরবেলা উঠিয়া ভৈরবের তীর বরাবর দেখি বহু খড়ের ঘর, সেগুলিও মেস বাড়ী। অল্প

ভাড়ায় এবং দামোদর হইতে যে সব ছাত্র থাকিতে চায়, তাহাদের জন্য এই ব্যবস্থা। দক্ষিণ দিকে বিরাট চত্বর, দৃশ্য অতি মনোরম, পিছনে উত্তর দিকে ভৈরব নদ কল কল রবে চলিয়াছে। মাঠে যেমন খেলাধূলা ভৈরবে তেমনি 'বাচ খেলা'। ছেলেরা নানারকম খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়া পড়াশুনা করে এবং নব-জীবনে উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। যতদূর মনে পড়ে আমরা কলেজের Guest House-এ রাত্রি যাপন করি।

কলেজের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকবৃন্দের সঙ্গেও আমরা একে একে পরিচিত হইলাম। যশোহর খুলনার ইতিহাস প্রণেতা অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্রকে আমি সেই প্রথম ও শেষ দেখি। এই পুস্তকখানির মধ্যে তাঁহার শ্রমশক্তির বিস্ময়কর পরিচয় মিলিবে, কিন্তু দৌলতপুর কলেজ গড়ার কাজেও তাঁহার উদ্যম ছিল যথেষ্ট। ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয় ইহার প্রতিষ্ঠাতা। সতীশচন্দ্র ছিলেন প্রত্যেকটি কাজে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। কামাখ্যা বাবু পূর্বে বহু বৎসর এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। প্রথম মহাসমর আরম্ভে এখানকার বহু যুবক ছাত্র এবং কোন কোন অধ্যাপক বিপ্লবকর্মে লিপ্ত হইয়া পড়েন কিন্তু কামাখ্যা বাবুর ছত্র-ছায়ায় থাকিয়া অনেকে পুলিসের কড়া নজর এড়াইতে সক্ষম হন। সতীশচন্দ্র কামাখ্যা বাবুকে এবং তাঁহার সঙ্গে আমাদের (যদিও খুবই অল্প বয়স) কত যত্ন করিয়া তাঁহার সংগৃহীত এবং তৎকর্তৃক সজ্জিত পুরাতত্ত্বের নিদর্শনগুলি একে একে দেখাইয়াছিলেন। এই দিনই সকালে কি বৈকালে ঠিক মনে নাই দধি-বামন মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে দৌলতপুর কলেজের অধ্যক্ষ দ্বিজপদ বাবু, কামাখ্যা বাবু এবং আমরা কিছু সময় কর্তাবার্তায় কাটাই। দ্বিজপদ বাবু খালি গায়ে, আরও কোন কোন অধ্যাপক খালি গায়ে আসিয়া কথায় যোগ দেন। পরবর্তীকালের বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ভট্টাচার্যকে ঐ সময় প্রথম দেখি। সেই সদা দোহারা চেহারা, প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে প্রবীণ বয়সে দেখিয়াও তাঁহার পূর্বেকার চেহারার কথা স্বতঃই মনে উদয় হইয়াছিল। দধি-বামনের মন্দিরের সঙ্গে একটি টোল বা চতুষ্পাঠী রহিয়াছে। এটি এখানকার আদি। দ্বিজপদ বাবু বলিলেন, এখানে সংস্কৃতের বিভিন্ন উপাধি পরীক্ষার জন্য ছাত্রদের তৈরী করা হইয়া থাকে এবং কয়েকজন অধ্যাপকও নিযুক্ত রহিয়াছেন। দৌলতপুর কলেজে জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে সকল কার্য পরিচালনা করা হইত। ইহার নাম দেওয়া হয় "দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী।" মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখ বহু নিষ্ঠাবান দানবীরের দানে কলেজটি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। দৌলতপুর কলেজে চার পাঁচ বৎসর পরে আর একবার যাই। তখনও কলেজের দৃশ্য আমাকে বিশেষভাবে চমৎকৃত করে। অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণের সঙ্গে আমরা আবার বাগেরহাটে ফিরিয়া আসিলাম।

আর একটি ঘটনা। ইহা ঠিক কলেজী শিক্ষা সংক্রান্ত না হইলেও আমার মনের উপর একটি দৃঢ় ছাপ রাখিয়া যায়। যুবসমাজ তখন কোন্ দিকে চলিয়াছে তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস পাই এই সময়ে। অসহযোগের মরশুম চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু দেশবাসীর অন্তঃকরণে ব্রিটিশ বিরোধী মূঢ় মনোভাব যেন দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল। যশোহরে সেবার (১৯২৩) বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন। সমগ্র ভারতের যেমন কংগ্রেস, বাংলাদেশের তেমনি এই সম্মেলন। তখন ওভক্রাইডের ছুটিতে এক একবার এক এক স্থলে তিন চার দিন ধরিয়া সম্মেলনের অধিবেশন হইত। বাংলার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কেহ কেহ সভাপতি হইতেন। এবারে সভাপতি নির্বাচিত হন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়। আমাদের তখন কলেজ ছুটি হইয়াছে কি হইবার মুখে, স্থানীয় কংগ্রেস-কমিটি এক স্বেচ্ছাসেবক-

বাহিনী গঠন করিলেন। আমরা কলেজের বহু ছেলে স্বেচ্ছাসেবক হইলাম। সংখ্যা হইল প্রায় দুইশত।

অধিবেশন আরম্ভের পূর্বদিন আমরা ছোট বড় জাতীয় পতাকা হস্তে ট্রেনে চাপিলাম। তখন সরকারী কর্মী সাধারণও মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণায় জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। জাতীয় পতাকা দেখিয়া উহার প্রতি মতি জন্মাইতে ভরসা না পাইলেও উহাকে বেশ সম্ভ্রমের চোখে দেখিতেন। আমরা প্রায় দুইশত স্বেচ্ছাসেবক ট্রেনে চাপিলাম, কিন্তু এই বাহিনীর ক্যাপ্টেন বা নেতা টিকিট কাটার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলেন না! মনে কেমন খটকা লাগিল। রূপসায় পৌঁছিয়া খেয়া নৌকায় খুলনার ওপারে গেলাম। আমরা দলে দলে গিয়া অতিথি হইলাম খুলনা জেলার অবিসম্বাদী কংগ্রেস নেতা নগেন্দ্রনাথ সেনের বাটীতে। তিনি হয়ত পূর্বেই আমাদের আগমনবার্তা পাইয়াছিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজন তাঁহার গৃহেই সমাধা হইল কিন্তু তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিলাম, এতগুলি স্বেচ্ছাসেবক যশোহরে যাই ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নয়। তিনি পঞ্চাশজনের টিকিটের ব্যয় বহন করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু আমাদের দলপতি এ প্রস্তাবে নারাজ। আমরা অনুমান বেলা দুইটা নাগাদ ছোটবড় জাতীয় পতাকা হস্তে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করিতে করিতে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। রেলকর্মীদের সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ না হইয়া পারি নাই।

যশোহরের আসের স্টেশনে 'সিঙ্গে' বা সিঙ্গিয়ার দলপতির নির্দেশ অনুসারে আমরা সবাই নামিলাম। এখান হইতে যশোহর টাউন মাইল চারেক হইবে। দলপতি আদেশ দিলেন সারিবদ্ধভাবে এই দীর্ঘপথ ভবলমার্চ করিয়া যাইতে হইবে! চৈত্রের অপরাহ্ণ, রাস্তার ধুলোয় পা ডুবিয়া যায়, ইহার মধ্যে ভবল মার্চ! কিন্তু কি করি। দলপতির আদেশ—মানিয়া চলিতে হইবে, অধিকার ভবল মার্চ করিয়া বর্ধিষ্ণু কলেবরে যশোরেশ্বরী কালীবাড়িতে গিয়া আর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। রবি পশ্চিম আকাশে চলিয়া পড়িয়াছে। গোধূলি হয় হয়। শহর এখনও এক মাইল দূরে। আবার ভবল মার্চ সুরু হইল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়ের অমিদার কুমার বীরেন্দ্রনাথ রায়ের বাসভবনের চত্বরে ভবল মার্চ করিতে করিতে উপনীত হইলাম। তখন মুখে আর 'রা' সরে না। এমন ক্লান্তি পূর্বে বা পরে কখনও বোধ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক অভ্যর্থনাসমিতির যত্নে আমাদের সন্ধ্যার আহার্যের ব্যবস্থা হইল। আমরা ভলান্টিয়ার, আমাদের আবার থাকিবার স্থানের বিষয়বস্তু কি! কথায়ইতো আছে, 'ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে'।

যেমন বাগেরহাট হইতে আমরা আসিয়াছি, অন্যান্য স্থান হইতেও স্বেচ্ছাসেবক আসিয়াছে. সংখ্যা শুনিলাম সাত শত। সম্মেলনের প্রতিনিধি সংখ্যাও এইরূপ কি ইহার কিছু বেশি। তখনকার দিনে চার পাঁচ দিন ধরিয়া সম্মেলন হইত। অভ্যর্থনা সমিতি প্রতিনিধি সংখ্যার আঁচ পূর্বেই পাইয়াছেন। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক যে এত অধিক হইবে তাহা বুঝিয়া কল্পনাও করিতে পারেন নাই। যশোহরের মত শহরে বেড় হাজার লোকের চারপাঁচ-দিন ব্যাপী আহার্য সরবরাহের পূর্ব হইতে ব্যবস্থা না থাকিলে বিপদে পড়িবারই কথা। তাঁহারা খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন তবে আমার যতদূর স্মরণ হয় অভ্যর্থনা সমিতি বিপদ কাটাইয়া উঠিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু কিছু ত্রুটি যে না হইয়াছিল তাহা নয়। এই ধরনের সামান্য ত্রুটি লইয়া স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হইতে লাগিল এবং ইহার পরিণতি হইল 'বিদ্রোহে'। আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম, অন্ন বা অন্য কোন আহার্য গ্রহণ না করিয়াই সেবা

কার্য সম্পাদন করিতে থাকিব! সম্মেলনের কার্য তো আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করাইলে তো চলে না, সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, মহিলাকর্মী হেমপ্রভা মজুমদার, মনে হয় ইহাদের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষও ছিলেন। আমাদের সারিবদ্ধভাবে বসাইয়া অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে ঘোষ ক্রটি আর হইবে না এইরূপ আশ্বাস দিতে লাগিলেন। ওদিকে ফুথায় পেট চিঁ চিঁ করিতেছে! প্রতিজ্ঞার অটল, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী অবশেষে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত হইল। এই সময়কার এই যে বিদ্রোহ, তখন যেমন, এখনও তেমনি ইহা ছিল নিয়ম-সংযম-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ যাহা এইখানে একদা সুরু হইয়াছিল, আজ দেখিতেছি সমাজ-দেহের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া ইহাকে কতই না জর্জর করিয়া ফেলিতেছে।

সম্মেলনের পাঁচদিন যশোহরে ভালভাবেই কাটে। সভাপতি শ্যামসুন্দর বাবু 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের অনুসরণে স্বদেশীর 'বিভীষণ'দের উদ্দেশ্য করিয়া তীব্র বাক্যবাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা স্বেচ্ছাসেবক, আমাদের অবাধ গতি। এক রাত্রিতে আমাদের কাহারও কাহারও 'ডিউটি' পড়িল বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে। সুভাষচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের মধ্যে একটি বিষয় লইয়া কি বিতর্ক ও বাদানুবাদ! সভাপতি মহাশয় তো একবার রাগিয়া গিয়া কাগজপত্র ছুঁড়িয়া ফেলিলেন এবং 'সভাপতিত্ব করিব না' বলিয়া সভামঞ্চ ত্যাগে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে অনেকক্ষণ ধরাধরি করিয়া পুনরায় বসাইলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, এমনটি আর বেশিক্ষণ চলিতে দেওয়া হইবে না।

যশোহরে গিয়াছি, রায়বাহাদুর যদুনাথ মজুমদারের বাড়ী দেখিতে গেলাম। শুনিলাম তখন তিনি সেখানে নাই। শহরের ভিতরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। শহরের বুক চিরিয়া বিনাইদহ রেল লাইন চলিয়াছে। এখানেও একটি নদী আছে। কিন্তু কচুরীপানায় ভরা, জল চোখেই পড়িল না। শহরের আধ মাইলখানেক দক্ষিণে চাঁচড়া রাজবাটী। সেখানে গিয়া বহু পরিত্যক্ত অপরিচ্ছন্ন প্রাসাদ ও ঘরবাড়ী দেখিলাম। লোকজন বেশি চোখে পড়িল না। এইরকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা লইয়া এবার সরাসরি রেলযোগে আমরা সকলেই গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলাম। ইহার পরই গ্রীষ্মের ছুটি।

৮

তখন গ্রীষ্মের ছুটি ছিল পুরা আড়াইমাস—বসন্ত গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিন ঋতু ব্যাপিয়া। এই ছুটির মধ্যেও কিন্তু আর একটি রাজনৈতিক সম্মেলনে গিয়াছি। মূল অসহযোগ আন্দোলনে ভাটা পড়িলেও, ঐ সময়ে বিভিন্ন জেলা মহকুমা প্রভৃতিতে রাজনৈতিক সভাসমিতি সম্মেলন হইতে থাকে। সেবার বাখরগঞ্জ জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন হইল পিরোজপুর মহকুমা শহরে। আমার পল্লী হইতে পিরোজপুর মাইল পাঁচেক দূরে অবস্থিত। স্বেচ্ছাসেবক রূপে নয়, দর্শকমাত্র রূপে সম্মেলনে দুইদিন উপস্থিত ছিলাম। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'নাইট হুড' বর্জন না করিয়াও মহাত্মা গান্ধী তথা কংগ্রেসের গঠনাত্মক কর্মে মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়া সত্যিকার 'অসহযোগী' হইয়া উঠিয়াছেন। চরখা ও খদ্দর প্রচারে তাঁহার মত বৈজ্ঞানিকের অনন্যসাধারণ আগ্রহে দেশবাসী স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এই প্রথম দেখিলাম। পরদিন প্রাতে তাঁহার 'বোটে' গিয়া পদধূলি লইলাম। বাগেরহাট কলেজের ছাত্র বলিতেই তিনি আমাকে একেবারে আপন করিয়া লইলেন। তাঁহার দুই একটা কিল ঘুষিও বুক পাতিয়া লইতে হইল। কলিকাতা হইতে যাঁহারা সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে যতদূর

মনে পড়ে তিনজন ছিলেন মহিলা। সাদা থান পরিহিত বয়োবৃদ্ধা মোহিনী দেবী, সন্তোষ কুমারী গুপ্তা ও আরও একজন। সন্তোষকুমারীর অনর্গল ইংরেজী বক্তৃতায় আমাদের তাক লাগিয়া গিয়াছিল।

এই দীর্ঘ অবকাশে উল্লেখযোগ্য আর কিছু মনে হইতেছে না। এই সময় জর্জ এলিয়টের Silas Marner পড়ি। বইখানি ইংরেজী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ উপন্যাস। কিন্তু মাঝে মাঝে উত্তর ইংলণ্ডের নর্দাম্বারল্যাণ্ড প্রভৃতির আঞ্চলিক ভাষা (Dialect) কথাবার্তায় প্রযুক্ত হওয়ায় পড়িতে বড়ই কষ্টবোধ হইয়াছিল, রস গ্রহণ তো দূরের কথা। আধুনিক কালে কোন কোন বাংলা উপন্যাসে এই রকম আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। নোয়াখালির ভাষা, চাটগাঁয়ের ভাষা, কি মালদহের ভাষায় স্থানীয় অধিবাসীদের কথাবার্তা বইয়ে সন্নিবিষ্ট হইলে, তাহার ভাবোদ্ধার করা খুবই কঠিন হয়। কিছুদিন পূর্বে বেতারকেন্দ্র হইতে আঞ্চলিক ভাষার কথিকা প্রচারের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আর বেশীদিন চালু থাকে নাই। উপন্যাস গল্প কথিক যাহাই হউক না কেন আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগে তাহার ভিতরকার রস গ্রহণে পাঠক মাত্রেরই বেগ পাইবার কথা। Silas Marner অতি ভাল বই, কিন্তু তাহার মর্মে প্রবেশ করিতে অক্ষমতা হেতু আজিও দুঃখবোধ করি।

গ্রীষ্মাবকাশ অন্তে বাগেরহাটে ফিরিয়া গেলাম। এবারে কিন্তু গোটাপাড়ায় আর যাই নাই। গ্রীষ্মের ছুটির পূর্বেই একজন সহপাঠী বন্ধুর মধ্যস্থতায় 'বান্দাবাটীতে' আস্তানা ঠিক করিয়া গিয়াছিলাম। নাগেদের বাড়ী ছোট্ট গ্রামখানির অর্ধেকেরও বেশী জুড়িয়া। আমি পূর্বদিকের বাড়ীতে বাসস্থান ঠিক করিয়াছিলাম। এখানে চক্রবর্তী জমিদার-দেরও বাস। কিন্তু তখন তাঁহাদের পড়তি-অবস্থা। না শহর, না গ্রাম। গোটাপাড়ায় পল্লীর স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে একটি বৎসর কাটিয়াছে। বান্দা-বাটীতে জমিদার তালুকদারদের বাস।

অধিকাংশই পাকা বাড়ী। পুষ্করিণী, ফলের বাগান অনেক এবং বেশীর ভাগই পরিচ্ছন্ন। খেলার মাঠটিও সুন্দর। আমাদের সমবয়সী কলেজের ছেলেও বিস্তর। তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়তা বেশী দেখি নাই বটে, কিন্তু পল্লীর নৈতিক মান ও পরিবেশের অভাব এখানে বেশ লক্ষ্য করিতাম। বান্দাবাটী হইতে কলেজের পথ আর দীর্ঘ নয়, মাইলখানেক কি তার একটু বেশী। তাবিয়া-ছিলাম, পূর্ব বৎসর অপেক্ষা পড়াশুনার অধিকতর সুবিধা হইবে। এখানেও কিন্তু তিনটি ছেলেরই পড়াইবার ভার পড়িল আমার উপর। ইহাদের মধ্যে সেরা ছাত্র সুশীল, তাহার সঙ্গেই আমার ক্রমে ভাব জমিয়া গেল। তবে তিনটি ছাত্রই আমাকে খুবই প্রীতির চক্ষে দেখিত। বয়সের পার্থক্য কম বলিয়া সেরা ছাত্র পড়াশুনা বাদেও অন্যান্য কার্যে আমাকে সঙ্গী করিয়া লইত। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলে ইহার তাৎপর্য বুঝা যাইবে। ভাদ্র মাসে 'নষ্টচন্দ্র' তিথিতে 'চুরি' করিয়া কিছু খাইলে অপরাধ হয় না। সেরা ছাত্র সুশীল 'নষ্টচন্দ্রের' সময় পশা, বাতাবি লেবু, ডাব প্রভৃতি 'চুরি' করিবার সময় আমাকে সঙ্গী করিয়া লয়। নিশীথের অন্ধকারে নারিকেল গাছে চড়িতেও ইহারা বেশ অভ্যস্ত দেখিতাম। এই বিন বাসে অল্প দিনেও তিনটি ছাত্রই যখন তখন আমাকে ডাব পাড়িয়া খাওয়াইত। আমি পল্লীর ছেলে হইয়াও কখনও গাছে চড়া শিখি নাই। অত লম্বা লম্বা নারিকেল গাছে রাত্রির অন্ধকারেও ইহারা যখন উঠিতে থাকিত তখন আমার গা শির শির করিত। আবার যখন শীতের রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে খেজুরের রস গাছ হইতে নামাইয়া আমাকে না খাওয়াইয়া ছাড়িত না, এই সব কার্যে ইহারা আপন-পর ভেদ কটিৎ করিত।

অমন ভাল বাড়ী, অমন পরিপাটী খাওয়া-দাওয়া, অত সুন্দর পরিবেশ, ইহার মধ্যেও আমাকে ম্যালেরিয়ায় ধরিল। মাসে কিছু অন্তর অন্তর প্রায় তিন মাস, এমন কি পূজার ছুটির মধ্যেও অরে ভুগি। এই সময়কার কলেজের অনেক কিছু হইতে আমি বঞ্চিত থাকি। কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ খোলা অবধি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এখানে আসিয়া সপ্তাহকাল থাকিতেন। তিনি পরীক্ষণ সহযোগে রসায়ন শাস্ত্রের বক্তৃতা দিতেন ছাত্রদের নিকট। তিনি এবারে আগস্ট মাসে আসিলেন। তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল চন্দ্রকান্ত দালের ভবনে। এই বাড়ীতে কিছুকাল যাবৎ আমার গতিবিধি ছিল, মৃণালকান্তি দাস দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া অবধি। আমাদের একই combination এবং ছেলেটিও ভাল। তাহার মাতুল মহাশয় সুবিখ্যাত রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার। মৃণালকান্তির মুখে মাতুল যদুনাথের অধ্যয়ন-তৎপরতার কথা খুবই শুনিতাম। যদুনাথ দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার একটি নিজস্ব বড় রকমের গ্রন্থাগারও ছিল। মৃণালকান্তির মুখে শুনিতাম, ইংরেজী, সংস্কৃত, ও বাংলা সাহিত্যের বিস্তর ভাল বই এই গ্রন্থাগারে রহিয়াছে। এখন তাহার দশা কি হইয়াছে কে জানে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আমার আগা বাড়ীতেই উঠিয়াছেন। বাসাবাটী হইতে সোজা ঐ স্থানে যাই। আচার্যের সঙ্গে সহজেই পরিচিত হইলাম। সেই সমাজ্ঞ কিল, চড়, ঘুসি। মৃণালকান্তিও সম্ভবতঃ কাছে ছিল। আমরা তাঁহার তুলনায় অত্যন্ত অল্পবয়স্ক, তথাপি আমাদেরই মত হইয়া তিনি কত কথাই না বলিতে লাগিলেন। বৈকালে তাঁহার রসায়ন শাস্ত্রের বক্তৃতা শুনিতে গেলাম। কত লোক, দোতলার হলঘর ভরিয়া গিয়াছে। ছাত্র অধ্যাপক বাদে শহর হইতে আরও বহু ব্যক্তি তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আসিয়া ভিড় করেন। প্রথম দিনের পরই আমি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হই এবং তিন চার দিন অন্তে গ্রামের বাড়ীতে চলিয়া যাই। এই বৎসর আরও দুই একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিদের দেখার সৌভাগ্য হয় আমাদের। রীতি আছে, কোন কলেজ পরিদর্শন করিতে হইলে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ-ইনস্পেক্টরই যান না—তাঁহার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট বা সিণ্ডিকেটের একজন সদস্যও যান। কলেজ ইনস্পেক্টর তখন কে গিয়াছিলেন মনে নাই তবে তাঁহার সঙ্গে যিনি যান তাঁহাকে দেখিয়া তখন আমরা ধন্য হইয়াছিলাম। তিনি হইলেন বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র বসু।

কলেজে এবং আশ-পাশে খেলাধুলায় খুব পড়িয়াছিল খুব। বাসাবাটীতে টীম, বাগেরহাট শহরে টীম, কলেজে টীম, ফুটবল খেলা প্রত্যহই কোথাও না কোথাও লাগিয়াই থাকিত। তখন দিন খুব বড়, কলেজ হইতে বাস ভবনে ফিরিয়া জলযোগান্তে প্রত্যহই কোথাও না কোথাও খেলা দেখিতে যাইতাম। তখনকার দিনের সে কি উন্মাদনা।

(ক্রমশঃ)

ভূগোল শিক্ষায় পর্যটনের স্থান

শ্রীগৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

প্রচলিত শিক্ষাধারায় ভূগোলকে অনেক মতে বিমূর্ত বিষয় বলে শিশুরা মনে করে থাকে। ভূগোল পড়ে তারা কোন আনন্দ তো পায়ই না, বরং ধীরে ধীরে ঐ বিষয়টির উপর বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করে। এইজন্য শিক্ষকের শিক্ষাপদ্ধতি অনেকাংশে দায়ী। কারণ, আমরা সাধারণতঃ শ্রেণীতে ভূগোল রেখে শিশুকে পড়াই এবং মানচিত্র শ্রেণীর একধারে টাঙিয়ে রেখে দুচারটি রাজধানী বা জায়গার নাম দেখিয়ে কার্য সমাধা করি। ঐ সব জায়গা সম্বন্ধে শিশুমনে কতখানি সাড়া দিল বা সে বিষয়ের কি বুঝল, সেই সম্বন্ধে আমরা উদাসীন থেকে যাই।

ভূগোলকে সরস করার যতগুলি উপায় আছে, পর্যটন তার ভিতর বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। প্রাথমিক স্তরে এই পর্যটন হবে শ্রেণীর বাহিরের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে। অনেক সময় পর্যটন ছাড়াও মডেল করে পুষ্করিণী, নদী, দ্বীপ, পর্বত ইত্যাদি জ্ঞান আনন্দ পাওয়ার মত দেওয়া যায়। কিন্তু মডেলের প্রয়োজনীয়তা বেশী চিন্তা না করাই ভাল। এই দিয়ে শিশু সুস্পষ্টভাবে ঐ সকল জিনিসের জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারে না। যতখানি পারা যায়, বাস্তব ধারণা দিয়ে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া দরকার।

কোন স্থান পর্যটনের পূর্বে সেই স্থানটি শিশুকে মানচিত্রে দেখিয়ে দিতে হয়। যেমন ধরা যাক, শিশু হয়তো আজ অমুকদের গ্রামটি পর্যটনে বাহির হবে। তাদের পূর্বেই গ্রামের মন্দির, মসজিদ, বড় রাস্তা, চৌরাস্তা, বিদ্যালয়, ডাকঘর ইত্যাদি গ্রামের মানচিত্রে দেখিয়ে দিতে হবে। তারপর শিশু যদি পর্যটনে বাহির হয়ে ঐ সব জায়গা দেখে, তবে মানচিত্র সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা হবে।

তা ছাড়া গ্রামের বিভিন্ন পশু, উদ্ভিদ, যানবাহন এই সব দেখিয়ে দিয়ে গ্রামের বিভিন্ন অতিরিক্ত জিনিস বাহিরে রয়েছি, ও পাটুলি জিনিস আমদানীর কথা শিশুদের বলে দেওয়া কর্তব্য। হয়তো গ্রামের পাশে বড় হাট পাঁচুয়াতে শিশুদের নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে কোন কোন জিনিস আসে এ সম্বন্ধে শিশু বাস্তব ধারণা পেল। আবার বিভিন্ন পাইকার কিভাবে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছে তা তাদের দেখিয়ে দেওয়া হলো। এইভাবে পরিবেশ পরিচিতির মধ্য দিয়েই শিশু যাতে পুস্তকের সংস্পর্শে আসে সেদিকে শিক্ষক দৃষ্টি দিবেন।

অনেক সময় দেখা যায় শিশুরা হয়তো পর্যটনে যাচ্ছে কিন্তু কোন সূচনা নাই, বা পর্যটনের কোন উদ্দেশ্য নাই। শিক্ষকের পূর্ব পরিকল্পনার অভাবই এইজন্য দায়ী। শিক্ষক কেন পর্যটনে যাবেন এবং শিশুকে সেখানে কি জ্ঞান দেবেন, এ বিষয়ে যেমন পূর্ব পরিকল্পনা রচনা করা দরকার তেমনি আবার শিশুও জানবে, তারা সেখানে গিয়ে কি কি দেখবে। তবেই শিক্ষার্থী আগ্রহশীল হয়ে সেই সব জিনিস দেখতে ও জানতে চাইবে। শিশুর ঐ আগ্রহ সৃষ্টি নির্ভর করে শিক্ষকের উপস্থাপনার উপর। শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রতিটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেবেন। শিশুর কৌতূহলী মন যদি প্রশ্ন করতে উৎসাহ না পায়, তবে বুঝতে হবে শিক্ষক জানবার জন্যে কোন আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন নি। এদিক দিয়ে তাঁর সতর্ক থাকা উচিত। পর্যটনে গিয়ে অনেক নতুন জিনিস দেখা যায় যা হয়তো শিক্ষক পূর্বে শিশুদের বলেন নি। সেই সব জিনিস নোট করে এসে শ্রেণীতে গল্পচ্ছলে আনন্দপূর্ণ পরিবেশ রচনা করে শিক্ষার্থীকে তাদের দর্শনীয় স্থানটির সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে দেবেন। এটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিম্ন স্তরেই চলবে।

১০।১১ বছরের শিশুদের উপরের শ্রেণীতে একটু বিস্তৃতভাবে ভূগোল শিক্ষা দিতে হয়। প্রথম

নিম্নস্তরের জন্য বিদ্যালয়ের খুব কাছাকাছি শিশুর ভৌগোলিক জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই স্তরের শিক্ষার্থীকে দূরে নিয়ে যেতে হবে। মনে করা যাক, শিক্ষার্থীদের ঝুলঝুলচণ্ডী স্টেশন ও টাঙ্গন নদী দেখাতে নিয়ে যাওয়া হলো। একটি কথা মনে রাখা কর্তব্য যে, একই জায়গায় দুইবার পর্যটনে যেতে হবে। কারণ প্রথমবার শিশু পর্যটনের আনন্দে এমনভাবে ডুবে যেতে পারে যে জানবার আগ্রহটা সেখানে গৌণ হয়ে পড়ে। সেইজন্য দ্বিতীয় বার নিয়ে গেলে আনন্দটা গৌণ হয়ে যাবে, এবং জানবার আকাঙ্ক্ষা মুখ্য হয়ে উঠবে। দর্শনীয় জায়গায় মানচিত্র নিয়ে যেতে হবে এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পৃথক পৃথক মানচিত্র দিতে হবে। সেখানে গিয়ে মানচিত্রে দর্শনীয় স্থানটি দেখিয়ে দিয়ে ভৌগোলিক বিবরণগুলি বুঝিয়ে বলতে হবে। এই স্তরে পর্যটনে গিয়ে বিভিন্ন জিনিস দেখে ও তার বিবরণী নিয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ফিরে এলে সেই নোটের দাম জানা যায়। মিল বা ফ্যাক্টরীতে শিশুকে কম বয়সে নিয়ে যেতে নাই। কারণ তাদের মন ঐ সমস্ত জটিল বিষয় গ্রহণ করতে পারে না।

পর্যটনে গেলে শিশু বুঝতে শেখে, মানচিত্র ছবি নয়। মানচিত্রে নির্দিষ্ট স্থানগুলি সত্য। মানচিত্রের সহর, রাস্তা, পর্বত, নদী ইত্যাদি যে প্রকৃত নগর, দূর, পর্বত, নদীর চিহ্ন এই বিশ্বাস শিক্ষার্থীর মনে দৃঢ় হয়। সর্বদা লক্ষ্য রাখা কর্তব্য, শিশু পর্যটনে গেলে যেন নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে সব জিনিস পর্যবেক্ষণ করে। শিশুর মনে কোন বিষয়ে ভিক্ততার সৃষ্টি করছে কিনা সহজ মেলা-মেশার মাধ্যমে শিক্ষক তা জেনে নেবেন এবং সে বিষয়ে তার চিন্তা ও বিচার-শক্তিকে জাগ্রত রাখতে শিক্ষক চেষ্টিত হবেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোন এক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা পর্যটনে গিয়ে এক সাঁওতাল পল্লীতে দেখতে পেলো যে সেদিনকার মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য তরকারী হিসাবে এক সাঁওতাল পরিবার আগুনে ঝলসানো ইঁদুর খাচ্ছে। এইরূপ ঘটনায় দেখেছি, শিশুদের মন সমস্ত সাঁওতাল জাতি সম্বন্ধে এক বিজাতীয় ঘৃণায় ভরে উঠেছে। এই স্থানে তাদের বোঝান উচিত, পৃথিবী বৈচিত্র্যময়, এবং ভূমিকা ও ভূমিকা মানুষের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রসঙ্গে পৃথিবীর দু একটি সত্যজাতির খাদ্যের (যা আমরা গ্রহণ করি না) কথা বলা উচিত। এইভাবে শিশুর মনে মানুষকে ভালবাসার প্রেরণা দেওয়া যেতে পারে। এইভাবে পর্যটনে গিয়ে শিক্ষককে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই বলে এই সকল সমস্যাকে এড়িয়ে না গিয়ে ভূগোলশিক্ষার উদ্দেশ্যের কথা শিক্ষকের স্মৃতিপথে রাখা কর্তব্য। ভূগোল শিক্ষার সার্থকতা হচ্ছে অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও আনন্দলাভ করায়। কোন দেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও ভৌগোলিক অবস্থানে কিভাবে মানবজীবনকে পোষাকে, আহারে এবং শিল্পবাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণ করছে এই সকল বিষয় শিশু যেমন চিন্তা করতে শিখবে তেমনি আবার কোন স্থানের অধিকসংখ্যক অধিবাসী বিশেষ কোন পেশা গ্রহণ করে সেই বিষয়ে পারদর্শিতা কেন দেখিয়েছে তার কারণও নির্ণয় করবে। সমাজে বিভিন্ন পেশার লোকদের পরিচয় দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে শিশুমনে শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত করা যেতে পারে।

ভূগোলশিক্ষার জন্য সকল স্তরেরই শিক্ষার্থীর পক্ষে পর্যটনের ব্যবস্থা যত বেশি করা যায় ততই ভাল। আজ যে শিশু তার ভূগোলশিক্ষা গৃহ বা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করেছে, যদি তার ভিতর ঘুমন্ত আবিষ্কারককে জাগ্রত করা যায় তবে কে জানে একদিন সেই বা মঙ্গোপার্ক, এমাণ্ড সেন, স্টেফানসন হয়ে গড়ে উঠবে না! ছাত্রছাত্রীরা ভ্রমণ কাহিনী পাঠ করবে এবং শিক্ষক উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব সরবরাহ করবেন। প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরের পর্যটন অপেক্ষা এই স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যটন বিস্তৃততর করতে হবে। এই সময় ছাত্রগণ রাজধানী, প্রধান প্রধান শিল্প বাণিজ্য কেন্দ্র, কারখানা, মিল প্রভৃতি স্থানগুলি, এমন কি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক বিশিষ্ট স্থানগুলি পরিভ্রমণ করবে। একাধিক শিক্ষক এই সময় ছাত্রদের সঙ্গে ভ্রমণে যাবেন এবং প্রত্যেক ছাত্র তার নিজস্ব ভূগোলের খাতায় সেই সম্বন্ধে মন্তব্য লিখবে। শ্রেণীতে এসে প্রত্যেক ছাত্র তা পড়বে, এবং অপর সকলে ভুল হলে সংশোধন করবে। শেষে শিক্ষক তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করবেন।

CALCUTTA UNIVERSITY

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৯শ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৬৮ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আলোচনা

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী

রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকীতে আমাদের দেশে সংস্কৃতি-উৎসব মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তির যে পরিচয় দিয়াছে ও দিতেছে তাহা একদিকে যেমন বিস্ময়কর, অন্যদিকে শিক্ষকদের পক্ষে চিন্তা করিবারও বিষয়। কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন, ইহা শারদীয় উৎসব অপেক্ষাও দীর্ঘকালস্থায়ী, সরস্বতী পূজা অপেক্ষাও ব্যাপক। অত্যুক্তির উদাহরণ স্বরূপে বলিতেছি না। কিন্তু 'মনের মন্দিরে নিত্য পূজে সর্বজন'—সরকুলের বক্তব্যের ভাজন যদি এমন কেহ থাকেন, তবে রবীন্দ্রনাথ এই যুগে সে স্থান পূর্ণ করিয়া আছেন, ইহা যেন সকলের সম্মুখে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে মেলিয়া ধরা হইল। বিদ্যায়তনের তো কথাই নাই—ছোটখাট ক্লাব, বড় ক্লাব, সমিতি ও কমন ও মহাকরণের কর্মীবৃন্দ সকলেই এই সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতির ঐক্যবন্ধন রাখী-সূত্রের মতই এই শতবার্ষিকী। স্বীকার করি, উৎসাহের আতিশয্যে যত অর্থ ব্যয় হইতেছে, তাহা জনসাধারণের আনন্দ সৃষ্টি করিতেছে না, এবং বিদ্যা দর্শীতে কোনও উৎসবে যোগ দেওয়ার আয়োজন হয় একটা নাই। তথাপি সবই 'শুধু মিছে কথা, ছলনা' নহে, এবং আতিশয্য যথাসম্ভব বর্জনীয় হইলেও উৎসাহ যে চাই, সে বিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না।

শিক্ষাজগতে, বিশেষ করিয়া শিক্ষকদের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথকে ছাত্রছাত্রীর মনোজগতে আরও ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত করিয়া ধরিবার এই এক বড় সুযোগ। একটি বিদ্যালয়ে, রবীন্দ্রনাথকে লইয়া এক দাময়িক পত্রিকা বা স্মারক পত্রিকা রচনায় প্রতিযোগিতা হয়, ব্যক্তিগত নয়, শ্রেণীগত প্রতিযোগিতা। সপ্তম অষ্টম নবম শ্রেণী, দশম ও একাদশ শ্রেণীর মধ্যে প্রতিযোগিতা। এই যে পরিকল্পনা, তাহার জন্য সকলকে রীতিমত পরিশ্রম করিয়া নূতনভাবে সব সাজাইতে হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকিতে হইয়াছিল, কি সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল; কেহ জীবন কথা লিখিল, কেহ বা নিজেই কবিতা লিখিল—পত্রিকার জন্য প্রয়োজনীয়

প্রচ্ছদপটেও নূতনত্ব দিবার প্রয়াস দেখা গেল। সুন্দর পরিকল্পনা। এবার আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করিলাম। কবিতা পাঠের চেয়ে আবৃত্তির পরিমাণ অনেক বেশি, যেমন হওয়া উচিত। বিশ্বকবির লেখা যথাসম্ভব কণ্ঠস্থ করাই তো চাই। নূতন নূতন দিকে কিশোর শিক্ষার্থীদের মনকে লইয়া যাওয়া চাই। যাঁহারা আজ ছাত্র নহেন, তাঁহাদের মুখেও রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কবিতা কণ্ঠস্থ শুনিয়া বড়ই ভাল লাগিয়াছে।

শতবার্ষিকীতে আরও সংহতি আসিলে, নূতন নূতন কর্মে প্রবৃত্তি আসিলে রবীন্দ্রনাথের নামের সুযোগ গ্রহণ করা যাইবে—কিন্তু যাহা পাইতেছি, তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট।

আমাদের শিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত রচনাবলী হইতে শিক্ষার বিষয়ে কত গভীর কথা আছে। সে সম্বন্ধে আমরা পূর্ববর্তী এক বৈশাখ সংখ্যায় মন্তব্য করিয়াছিলাম, কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলাম, এরূপ সংকলন বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত করা উচিত। আমাদের বর্তমান সংখ্যায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ শ্রীঅনাথনাথ বসু মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, এবং তাঁহার কিছু সংকলন এ সংখ্যায় প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আশা করি তিনি এ কাজ চালাইয়া যাইবেন, এবং রবীন্দ্রমহাসাগর হইতে বহুরত্ন উদ্ধার করিয়া শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে রাখিবেন। আজ হউক, কাল হউক, রবীন্দ্রনাথের হাত যন্ত্র কাজ করিবেই, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। শুধু বাংলা ভাষা নয়, বাংলার জীবন, ভারতের জীবন, বিশ্বের জীবনও রবীন্দ্রনাথের বহু উপদেশ কার্যে পরিণত করিতে পারিলে সমৃদ্ধতর হইবে সন্দেহ নাই। গুরুদেব সকল প্রশ্নই গভীরভাবে চিন্তা করিয়া সমাধানের ইঙ্গিত দিয়াছেন। অনেক প্রশ্নেরই তো সমাধান কেহ করিয়া যাইতে পারেন না, কিন্তু চিন্তার পরিচালনাতেই তাহার দিগ্‌নির্দেশ করা যাইতে পারে।

শ্রদ্ধায় স্মরণ

আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় ব্রহ্মপুত্রতীরে বিলাসিপাড়া গ্রাম। সেখানে প্রায় চল্লিশবৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও একান্তনিষ্ঠায় বিদ্যাবিতরণকে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া নিজের ইচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিয়া প্রফুল্লরঞ্জন বাগচি মহাশয় বাংলাদেশে বাস করিতেছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার দেহান্ত ঘটিয়াছে। তিনি অতি সামান্য বেতনে সারাজীবন কর্ম করিয়া গিয়াছেন, উদ্যোগী পুরুষ—কর্মের দ্বারা তাঁহার জীবন পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন—প্রয়োজন হইলে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগও করিয়াছিলেন। সাধুসঙ্গের প্রসঙ্গে অবসর সময় কাটাইতেন। নানা দুর্বিপাকের মধ্যে ভগবানের দয়ার কথা স্মরণ করিতেন, গ্রামে থাকিয়াও বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে যোগ মনে প্রাণে অনুভব করিতেন। স্বল্পবিত্ত শিক্ষক চরিত্রগুণে সমাজের সকল স্তরের লোকের নিকট যে শ্রদ্ধা অর্জন করেন, বাগচি মহাশয় তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তিনি 'শিক্ষায়' গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন, একবার তাঁহার লেখাও আমরা 'শিক্ষায়' প্রকাশিত করিয়াছিলাম। তাঁহার কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি।

অভিযোগ

অনেক শিক্ষক জানাইতেছেন :

"বিগত এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বস্তরের প্রাথমিক শিক্ষকগণের ৪৲ + ৩৲ = ৮৲ টাকা বর্ধিত বেতন দানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জ্ঞাত আছি যে

প্রাইমারি স্কুল সমূহে I. A. এবং B. A. পাস special cadre-এর যে সকল প্রাথমিক শিক্ষক আছেন তাঁহারা এই বর্ধিত বেতনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার special cadre শিক্ষকগণের প্রতি নানাপ্রকার বৈষম্য-মূলক আচরণ করিয়া থাকেন, যেমন তাঁহাদের চাকুরির স্থায়িত্ব বিধান আজও করা হয় নাই, বেতন বৃদ্ধির সুযোগ হইতেও তাঁহারা বঞ্চিত। ...শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির শাস্তিরূপে নানাপ্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ অবিচারের সামান্তর। আপনাদের এসম্বন্ধে কিছু করিবার নাই কি ?"

Special cadre-এর শিক্ষকদের এই অভিযোগ আমাদের পত্রিকায় প্রকাশ করিতে অবশ্যই পারি, এবিষয়ে শিক্ষাবিভাগের দৃষ্টিও আকর্ষণ করিতেছি। সরকারী সিদ্ধান্তের কারণ অনেক সময় বোঝা কঠিন ; তাঁহাদের সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করিতে বিস্তর সময় লাগে, ইহা তো শুধু শিক্ষাবিভাগের সম্বন্ধে নয়, সকল বিভাগের প্রতিই প্রযোজ্য। এই বিলম্বের মূলে কি আছে, কি করিয়া প্রশাসনের কার্য সত্বর হইতে পারে, সে সব বিষয়ে বহু কমিটি হইয়াছে, কমিটির ব্যয়ও হইয়াছে বিস্তর, কিন্তু আসলে অগ্রগামের রথ বিশেষ নড়ে নাই। আমরা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি যেদিন রথ চলিতে আরম্ভ করিবে, কাহাকেও নিষ্পেষণ করিয়া নয়, সকলের অগ্রগতিতে সাহায্য করিয়া, সকলকে লইয়া।

রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষা

শ্রীঅনাথনাথ বসু

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে তিনি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহারই কথায় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি। অনেক স্থলে সাময়িক পটভূমিকায় কথাগুলি বলা হইলেও এগুলির আবেদন এখনও বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নাই।

• • •

শিক্ষাসম্বন্ধে একটা মহৎ সত্য আমরা নিবিয়াছিলাম। আমরা জানিয়াছিলাম যে মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে; যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মানুষকে ছাঁটিয়া ফেলিলেই সে তখন আর সে মানুষ থাকে না। সে তখন আপিস-আদালতের বা কলকারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠে; তখনই সে মানুষ না হইয়া মাস্টার-মশায় হইতে চায়; তখনই সে আর প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ দিয়া যায়। গুরু-শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিত-স্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে। কারণ শিক্ষণের পালন ও শিক্ষণের যথার্থ ভার পিতামাতার উপর। কিন্তু পিতামাতার সে যোগ্যতা অথবা সুবিধা না থাকাতেই অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা অত্যাবশ্যক হইয়া ওঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা না হইলে চলে না। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিসকে টাকা দিয়া কিনিয়া বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, তাহা স্নেহ-প্রেম-ভক্তির দ্বারাই আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি; তাহাই মনুষ্যত্বের পাকা-রসের আসল রস, তাহাই জৈব সামগ্রীকে জীবনের সঙ্গে সম্মিলিত করিতে পারে। বর্তমানকালে আমাদের দেশের শিক্ষায় সেই গুরুর জীবনই সকলের চেয়ে অত্যাবশ্যক হইয়াছে। শিশুবয়সে নির্জীব শিক্ষার মতো ভয়ঙ্কর ভার আর কিছুই নাই, তাহা মনকে যতটা দেয় তাহার চেয়ে শিবিয়া বাহির করে অনেক বেশী। আমাদের সমাজব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতি দান করিবেন; আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন। যেমন করিয়াই হউক সকল দিকেই আমরা মানুষকে চাই; তাহার পরিবর্তে প্রণালীর বটিকা গিলাইয়া কোনো কবিরাজ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

—শিক্ষাবিধি

• • • •

প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটার ঠিক বাস্তবরূপ কি তার ঐতিহাসিক ধারণা আজ সহজ নয়। তপোবনের যে প্রতিরূপ স্থায়ীভাবে আঁকা রয়েছে ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে সে হচ্ছে একটি কল্যাণময় কল্পমূর্তি, বিলাসমোহমুক্ত প্রাণবান আনন্দের মূর্তি।

দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে। তিনি যন্ত্র নন্, তিনি মানুষ—নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন্, সক্রিয়ভাবে; কেন না মনুষ্যত্বের লক্ষ্য সাধনায় তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিবেগ ধারায় শিষ্যের চিত্তকে গতিশীল করে

তোলা তাঁর আপনার সাধনারই অঙ্গ। শিশুর জীবন প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। শিশু আগন্তুক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটি আশ্রমের শিক্ষার সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান। তাঁর সেই মূল্য অধ্যাপনার বিষয়ে নয়, উপকরণে নয়, পদ্ধতিতে নয়। গুরুর মন প্রতি মুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ সপ্রমাণ করছে নিজের সত্যতা দেওয়ার আনন্দেই। • • গুরুশিষ্যের মধ্যে পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মধ্যস্থ বলে জেনেছি।

—আশ্রমের শিক্ষা

• • • •

যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শুধু সাধীপ্য নয়, সাযুজ্য ও সাযুজ্য থাকা চাই, নইলে খেলাপাওনায় সাড়ীর যোগ থাকে না। নদীর সঙ্গে যদি প্রকৃত শিক্ষকের তুলনা করি তবে বলব কেবল ডাইনে বাঁয়ে কতক-গুলো বুড়ো বুড়ো উপনদীর যোগেই নদী পূর্ণ নয়। তার আদি করণার ধারাটি মোটা মোটা পাথরগুলোর মধ্যে হারিয়ে যায় নি। যিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের ডাক শুনলেই তাঁর ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি বেরিয়ে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উদ্ভাসিত হয় প্রাণে ভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যদি কোনো দিক থেকেই তাঁকে স্বশ্রেণীয় জীব বলে চিহ্নিত না পারে, যদি মনে করে 'লোকটা যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী' তবে নির্ভয়ে তাঁর কাছে হাত বাড়াতেই পারে না।

—আশ্রমের শিক্ষা

• • • •

তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যাঁরা ধৈর্যবান। ছেলেদের প্রতি স্বভাবতই যাঁদের স্নেহ আছে এই ধৈর্য তাঁদেরই স্বাভাবিক। শিক্ষকদের নিজের চরিত্র সম্বন্ধে গুরুতর বিপদের কথা এই যে, যাদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার তারা ক্ষমতায় তাঁদের সমকক্ষ নয়। তাদের প্রতি সামান্য কারণে বা কাল্পনিক কারণে অসহিষ্ণু হওয়া, তাদের বিদ্রূপ করা, অপমান করা, শাস্তি দেওয়া অনায়াসেই সম্ভব। দুর্বল পরাজিতকে শাসন করাই যাদের কাজ তারা যেমন নিজের অসৌচরেও সহজেই অন্যায়প্রবণ হয়ে ওঠে এও তেমনি। ক্ষমতা ব্যবহারের স্বাভাবিক যোগ্যতা যাদের সেই অক্ষমের প্রতি অবিচার করতে কেবল যে তাদের বাধা থাকে না তা নয়, তাতে তাদের আনন্দ। ছেলেরা অবোধ হয়ে দুর্বল হয়েই মার কোলে আসে, এইজন্যে তাদের রক্ষার প্রধান উপায় মায়ের মনে অপর্যাপ্ত স্নেহ। তৎসত্ত্বেও অসহিষ্ণুতা ও শক্তির অভিমান স্নেহকে অতিক্রম করেও ছেলে-দের পরে অন্যায় অত্যাচারে প্রবৃত্ত করে, ঘরে ঘরে তার প্রমাণ পাই। ছেলেদের কঠিন দণ্ড ও চরম দণ্ড দেবার দৃষ্টান্ত যেখানে দেখা যায় প্রায়ই সেখানে মূলত শিক্ষকেরাই দায়ী। তাঁরা দুর্বলমনা বলেই কঠোরতা দ্বারা নিজের কর্তব্যকে সহজ করতে চান। রাষ্ট্রতন্ত্রেই হোক আর শিক্ষাতন্ত্রেই হোক কঠোর শাসননীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ। শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। ক্ষমা যেখানে ক্ষীণ সেখানে শক্তিরই ক্ষীণতা।

—আশ্রমের শিক্ষা

• • • •

বহুবিধ বিষয়-পাঠনার ব্যবস্থা করলেই যে শিক্ষার লাভের অঙ্ক অগ্রসর হয় তাহা নহে, যে মানুষ বাড়ে সে 'ন যেযয়া ন বহনা শ্রুতেন'। যেখানে নিভৃতে তপস্যা হয় সেইখানেই আমরা শিখিতে পারি। যেখানে গোপনে ত্যাগ যেখানে একান্তে সাধনা সেইখানেই আমরা শক্তি লাভ করি। যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর। যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চায় স্বয়ংপ্রবৃত্ত সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ

দেখিতে পায়। বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে বাধাহীন, অন্তরে সেইখানেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত। ব্রহ্মচর্যের সাধনার চরিত্র যেখানে মুক্ত ও আত্মবশ ধর্মশিক্ষা সেইখানেই সরল ও স্বাভাবিক। আর যেখানে কেবল পুঁথি ও মাস্টার, সেনেট ও সিণ্ডিকেট, ইটের কোঠা ও কাঠের আসবাব সেখানে আজও আমরা যত বড়ো হইয়া উঠিয়াছি কালও আমরা তত বড়োটা হইয়াই বাহির হইব।

—শিক্ষা-সমস্যা

* * * *

শিক্ষার অবস্থায় উপকরণের কিছু বিরলতা, আয়োজনের কিছু অভাব থাকাই ভাল; অন্তত হওয়া চাই স্বল্পতায়। অনায়াসে প্রয়োজন-যোগানোর দ্বারা ছেলেদের মনটাকে আদুরে করে তোলা, তাদের নষ্ট করা। সহজেই যে তারা এত কিছু চায় তা নয়। আমরাই বয়স্ক লোকের চাওয়াটা কেবলই তাদের উপর চাপিয়ে তাদেরকে বস্তুর মোহে দীক্ষিত করে তুলি। শরীর মনের শক্তির সম্যক চর্চা সেখানেই ভাল করে সম্ভব যেখানে বাহিরের সহায়তা অনতিশয়। সেখানে মানুষের আপনার সৃষ্টি-উদ্যম আপনি আগে। বাধের পর বাধে প্রকৃতি তাদেরকে আবর্জনার মত বেঁটিয়ে ফেলে দেয়। আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টি-কর্তৃত্ব। সেই মানুষই যথার্থ স্বরাট আপনার রাজ্য যে আপনি সৃষ্টি করে। আমাদের দেশের অতি-লালিত ছেলেরা সেই শ্রেষ্ঠতার চর্চা থেকে প্রথম হতেই বঞ্চিত। তাই আমরা অন্যদের শক্ত হাতের চাপে পরের নির্দিষ্ট সমুনানত রূপ নেবার জন্য কর্মযন্ত্রভাবে প্রস্তুত।

—আশ্রমের শিক্ষা

"সেই যে আমার নামারম্ভের দিনগুলি"

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য

মিশনারী কলেজের ষাঠ

২

আমার এক বন্ধু বলেছিলেন, মিশনারী কলেজের মাঠ, বোসেদের বাগান আর পদ্মপুকুরের অধ্যাপক মৈত্র মহাশয়ের ঘর দুটো তোর মাথা খেয়েছে, নইলে হয়তো তুই পড়াশুনায় ভাল হতিস। হয়তো বন্ধুবরের কথা সত্য। বলতে পারিনা, যদি এই তিনটে আয়গা না থাকতো, পড়াশুনায় মন আর একটু বেশী বসতে পারত কিনা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নামের গেজেটে আমার নাম টর্চের আলো ফেলে ম্যাগ্নিফাইং গ্ল্যাস লাগিয়ে খোঁজবার যে দুর্ভাগ্য হয়েছে তা হত কিনা। কিংবা, হয়তো তাও হতনা, পড়াশুনা এমনিতেই হয়নি, অমনিতেও হতনা, মাঝখান থেকে এই তিনটে আয়গা আমাকে জীবনের যে পাঠ দিয়েছে, তার থেকে বঞ্চিত হতাম। লেখাপড়া হোক না হোক, এই পাঠ থেকে বঞ্চিত হতে আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না এবং লেখাপড়া না হলেও এখান থেকে যে পাঠ নিয়েছি, তার জন্য নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। মাঠটাকে আমরা কতরূপে দেখেছি যে বলে শেষ করতে পারব না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর শান্তির উৎসব হল, আমাদের বেশ মনে আছে। ঐ মাঠে কতরকম আমোদপ্রমোদ খাওয়াদাওয়ার আয়োজন হয়েছিল! এখানে ম্যাজিক, ওখানে প্রদর্শনী—কত কি! ঐ মিশনারী কলেজ স্কুলের

মেয়েরা ছাড়া আমরা পাড়ার ছেলেপিলেরাও অনুমতি পেয়েছিলাম ঐসব দেখতে এবং এক দফা খাবার খেতে। তখনকার দিনে মিশনারী কলেজের বড়দিনের উৎসব বড় ঘটা করে হত। অতবড় মাঠটা এধার ওধার পাঁদা ফুলের মালা, স্ট্যাণ্ড, আলো ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে উৎসব হত। আবার নানারকম খেলাধূলার ম্যাচ, ক্লাউট সম্মেলন, পুরস্কার বিতরণী সভা ইত্যাদি এবং কখনও কখনও আনুষঙ্গিক ভাবার যাকে বলে "সাংস্কৃতিক" সম্মেলন তাও হত। বোধহয় এখনও হয়, কারণ কলকাতায় এতটা খোলা জায়গা দুর্লভ। সেসব এক দেখবার জিনিস হত। আমরা কখনও নিমন্ত্রিত হতাম, কখনও বা বিনা টিকিটের দর্শক হয়ে জানলা থেকে দেখতাম। আবার, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মাঠটা A.R.P. বা ঐ রকম একটা কিছুর দখলে ছিল এবং মাঠটা তছনছ হয়ে গিয়েছিল। এটা একটা কিছুর ডিপো ছিল, বড় বড় লরী জিপের আসা-যাওয়া, অনেকগুলো কাঁচা ব্যারাক এসব হয়েছিল। যুদ্ধের শেষে আবার মাঠটা নিজের রূপ ফিরে পেয়েছে।

মাঠটা কিরকম করে এবং কেন কল্পনার সঙ্গে খাপ খেয়ে গিয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারব না। মাঠটা আমার কল্পনার রাজত্ব। কতকগুলো ছবির সঙ্গে মাঠটা কল্পনায় কি অদ্ভুত মিলে যেত কি বলব! অথচ আপনার কাছে গল্প করলে আপনি হেসেই উড়িয়ে দেবেন, বলবেন, ছেলেবেলাকার পাগলামী। "ঐতো বললাম, আপনার তো খেলার সঙ্গী টঙ্গী ছিল না, গল্পের বই পড়তেন আর মাঠটার দিকে তাকিয়ে থাকতেন আর এই উদ্ভূটে কল্পনা করতেন।" হয়তো আপনার কথা সত্যি। কিন্তু তবুও—ছেলেবেলায় একটা বিলাতী ছবি দেখেছিলাম, শস্য কাটা হয়েছে, এখানে ওখানে খড় জড়ো করে রাখা হয়েছে। মাঠের ঘাস কাটার দিনে এখানে-ওখানে জড়ো করা কাটা ঘাস দেখলে সেই ছবিটার কথা মনে পড়ে যেত। কালবৈশাখীর মেঘে ভরা আকাশের নীচে ঐ মাঠটা দেখলে "A storm at Torne" ছবিটি খুব বেশী মনে পড়ত। ছেলেবেলার "সন্দেশে" সুকুমার রায়ের আঁকা "এক্কা গাড়ী খুব ছুটেছে" শীর্ষক একটা ছবি দেখেছিলাম, ছবিটাতে সবুজ background খুব বেশী ছিল। দুপুর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে চাঁদের আলোর চাদরে ঢাকা ঐ মাঠটা দেখে মনে হল, সেই ছবির সঙ্গে এই মাঠটার কোথায় যেন মিল আছে। আমার দেখা অনেক ভালভাল ছবির সঙ্গে এই মাঠটার সম্বন্ধ খুঁজে পেয়েছি কতবার, অথচ কোথায় সেই সম্বন্ধ তা বলে বোঝাতে পারব না। আবার, আমার গল্পে শোনা তেপান্তরের মাঠ ছিল ওইটা। হস্টেলবাড়ীগুলোর পরে আর চোখ চলত না, মনে হত, ওই হস্টেলবাড়ীগুলির পিছনেই যত রহস্য লুকিয়ে আছে। বড় হয়ে একদিন তা খুঁজে বার করতে হবে।

৩

যে কারণেই হোক, ছেলেবেলায় আমার বাইরে বেরোনোর স্বাধীনতা খুব বেশী ছিল না। উপরের দক্ষিণের ঘরটা ছিল আমার রাজত্ব, আর জানলার ধারে বসে মাঠটাকে দেখা ছিল আমার একমাত্র অবসর বিনোদন। তার ফলে মাঠটার সঙ্গে আমার অন্তরের নিবিড় পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। মাঠটা আমার কাছে ছিল,—ছিল কেন বলি, এখনও মনে হয়, জীবন্ত। মুহূর্তে এর রূপ যায় বদলে, মনে হয় এক অঙ্গে এর এতরূপ কি করে ধরেছে! ভোরের সূর্য তখনও ওঠেনি, একটু একটু রঙের খেলা সুরু হয়েছে পুব আকাশের কোণে। অন্ধকারের ছায়ায় দীর্ঘ আমগাছগুলো হাতছানি দিয়ে ডাকছে পাতায় পাতায় শির শির আওয়াজ করে—উঠেছ বন্ধু, উঠেছ? আস্তে আস্তে আলোর আশীর্বাদ পড়ল তাদের মাথায়, তারপর ছড়িয়ে গেল দারা মাঠে। ভোরের আলোয় এক ঝাঁক পাখী কিচ্‌কিচ্‌ করতে

করতে মাঠ ছেয়ে ফেলল—চড়াই, শালিখ, বুলবুলি, একটা টুনটুনি, একটা মুনিয়া। কোত্থেকে বাহারে নীল রঙের এক পাখী এসে কদ্দে গাছে বসে ল্যাজ দুলিয়ে নাচতে লাগল। আবার কিছুক্ষণ পরে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। ছটফটে খুকু। জলের কোন খোঁজ নেই, অথচ এক মাছরাঙা পাখীর সহসা আবির্ভাব। কয়েকটা কাক কর্কশ শব্দে কা কা শব্দে ডেকে উঠল। ওই যাচ্ছে বগ্‌বগে তোয়ালে ঢাকা ট্রে হাতে করে বেয়ারাটি অধ্যাপক সাহেবের ব্রেকফাস্ট নিয়ে এদিকের হষ্টেলে। পাখীগুলো একটু উড়ে সরে বসল ঘাসের উপর, তাদের আহার খুঁজবার জন্য। ঘণ্টা পড়ল—এখন আর হষ্টেল থেকে কোন ছাত্র বেরুবে না, পড়ার ঘণ্টা। নিস্তব্ধ মাঠে কোন জনমানব নেই। ঐ যে ঘাস কাটা কল দুটো মাটীতে টানতে টানতে যাচ্ছে। কাটা ঘাসগুলো জড় করে এক এক পাশে রাখছে। কাটা ঘাসের সুগন্ধে জায়গাটা ভরে উঠল। লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস টেনে সেই সুগন্ধ যতটা পারা যায় গ্রহণ করল—আঃ, অদ্ভুত এক তৃপ্তি। আবার ঘণ্টা পড়ল। একপাল ছেলে বল পিটোতে পিটোতে মাঠে নেমে পড়ল। একটু পরে নানা বেশের নানা জাতের ছাত্ররা আসতে সুরু করল কলেজে। বাঙালীর ধুতি পাঞ্জাবী, অবাঙালীর প্যান্ট কোট—বার্মিজদের রঙদার লুঙ্গী। দুপুরে এখানে ওখানে ছাত্রদের জটলা। বিকালে আবার মাঠ খালি, পড়ন্ত রোদে মাঠের একপাশ চকচক করছে আর একপাশ ছায়ায় চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। আবার ঘণ্টা পড়ল। ফুটবল, ভলিবলের শব্দ, দূরে ব্যাডমিন্টনের ম্যাচ চলছে। দর্শকদের কোলাহল, জয়ধ্বনি, হুল্লোড় দেওয়া। সন্ধ্যা গড়িয়ে এল,—মাঠ ফাঁকা ও নীরব। দু' একটি স্বাস্থ্যকামী অধ্যাপক লালসুরকীর রাস্তার ধারে রাখা বেঞ্চিতে বসে হাওয়া খাচ্ছেন, দু চারটি ছাত্র জোট পাকিয়ে অন্ধকারে বসে জটলা করছে। পড়ার ঘণ্টা পড়ল,—মাঠ একেবারে ফাঁকা। হষ্টেলের ঘরে ঘরে আলো জলে উঠল। হঠাৎ হো হো হাসির একটুকরো, একটু গান হাওয়ায় ভেসে আসে। —আঁধার, গভীর রাত্রি। হষ্টেলের আলো কখন নিবে গেছে। মৃদু দক্ষিণা সমীরণের সঙ্গে কলকে কলকে চাঁদের আলো জানলা দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। চাঁদের আলোয় আর আমগাছের ছায়ায় মাঠটাকে কি অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে—আর কি রহস্যময়! ওখানে যেন কারা বেড়াচ্ছে, ফিস্‌ফাস করে কথা বলছে,—তাদের দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু অনুভব করতে পাচ্ছি,—তারাও বোধহয় আমাকে অনুভব করতে পারছে, হয়তো বা আমার বিষয়েই কথা বলছে! তাদের কাছে গেলে যেন তারা খুসী হয়, কিন্তু জানালার শিক দেওয়া,—দোতলা থেকে একতলা, তারপর রাস্তা, তারপর ওই পাঁচীল ডিঙিয়ে যাব কি করে তাদের কাছে?

ছুটীর দিনে আর এক রূপ! ছেলেরা নেই, হষ্টেল খালি। তখন বাইরে স্বাস্থ্যকামী দু' একজন জানাশোনা লোক বেড়াতে আসতে পেতেম—কচিৎ দু' একজন ঐ রকম স্বাস্থ্যকামী ও দুটকো দু' একজন মালী বেয়ারা ছাড়া লোকই নেই,—পাখীদের, বিশেষ করে শালিকদেরই রাজত্ব। গরমের ছুটি শেষ হবার আগেই বর্ষা নামত, ফড়িঙের প্রাচুর্য, শালিখদের ভোজ! দুপুরে খাঁ খাঁ রোদে উত্তর বাতাস খড়কুটো, পাতা, ছেঁড়া কাগজ ঘুরিয়ে নিয়ে চলল মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। একটা পাতা উড়তে উড়তে মাটিতে পড়ে দু একবার উলট পালট খেয়ে আবার মাটির উপর খানিকটা ছুটে গিয়ে উড়তে সুরু করল। ধীরে ধীরে রোদ নামতে সুরু করল,—মাঠের ওই দাগটা, তারপর ওই দাগটা, তারপর এই দাগটা—এর পরে আর রোদ থাকবে না। অন্ধকার হয়ে এল,—আস্তে, আস্তে,—এবার চাঁদ উঠবে—আলো ছড়িয়ে পড়বে গাছের আড়াল এড়িয়ে, পাতার ফাঁকে ফাঁকে,

বাড়ীর ছায়ার পাশে। কালবৈশাখী, আকাশে পুঞ্জে পুঞ্জে মেঘ, ঈশানতরা, ইস্পাতের মত কালো। দমকা ঝড়—গাছগুলো যেন আকুতি করে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে, কোণের ছোট্ট কদম গাছটা শুধু তাদের অবস্থা দেখে মুচ্‌কি হাসছে, তার দুদিকে দেওয়ালের আড়াল, সে বাতাসের দামালপণা অতটা টের পাবে কি করে? কিন্তু হঠাৎ সেই সে দেখতে পেল বাতাস তার ফুলগুলি চুরি করে পালাচ্ছে, অমনি গেল মিলিয়ে তার হাসি, ব্যস্ত হয়ে সেও মাথা দুলিয়ে সব সর্দ্দ আওয়াজ করে দিল। ওদিকের রুক্ষচূড়া গাছ লালফুল আর কুঁড়িতে আমাদের বারান্দা ভরিয়ে দিয়েছে, সিঁড়ির জালদার ভাঙা কাঁচ দিয়ে ফুল আর কুঁড়ি সিঁড়িতেও ছড়িয়ে পড়েছে। কালো আকাশের নীচে মাঠটা কি রকম যেন বড় বড় দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে শেষ নেই। তার পর সুরু হল, চড়বড় করে বৃষ্টি, জানালা বন্ধ করে দেওয়া হল। কপাটের ফুটো দিয়ে দেখতে লাগলাম বৃষ্টির ধারা। কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি থামল। গলিতে আলো জ্বলে গেছে। ধরণী এখন শান্ত, গাছগুলো জল ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে। ভিজে মাঠ থেকে ভিজা মাটির মিষ্টি মিষ্টি সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছে।

বর্ষায় আষাঢ় আর এক রূপ—পরিষ্কার মাঠে জল জমেছে—গলির জল ময়লা, পাঁচীলের ওপাশে জলের রঙ দুধের মত শাদা। যেখানটা জল কম, কয়েকটা কাক পাখা ঝাপ্টা দিয়ে স্নান করছে। কলেজ খোলা থাকলে ছেলেদেরও অধ্যাপকদের হৈ-হল্লোড়, কলেজ বন্ধ থাকলে দুদের জলে মনপবনের নাও ভাসিয়ে অচিন বাজার কল্পনা।

শীতের মাঠের রকমারি বেশী। মাঠও যেমন সুন্দর করে সাজানো, তেমনি সুন্দর সাজে সাজা রঙের মানুষের মেলা। সারাদিন ক্রিকেটের মরসুম। বড়দিনের ফুল লতাপাতা পতাকার সজ্জা উৎসবের সমারোহ। বার্ষিক স্পোর্টসের আমোদ-প্রমোদ। মাঝে মাঝে স্কাউট, ব্যায় ও ব্রতচারী মেলা। উদ্যান সম্মেলন—কত কি! তখন মাঠটার পোষাকী সাজ; মাঠটা তখন সহরে কাজের মানুষ—আমাদের বলছে, একটু রোসো, বড্ড ব্যস্ত। আজকের দিনটা যাক, কাল তোমার সঙ্গে কথা হবে। আবার হয়তো কথা বলিনি বলে রাগ করে অনেক বেলা অবধি কুয়াসা ঢেকে বসে রইল, রোদ উঠলে কুয়াসা সরে গেল, তখন হেসে উঠল এই বলে, কেমন জব্দ, লুকিয়ে ছিলাম কেমন বল দেখি!

গ্রন্থাগার আন্দোলন

শ্রীরত্নমণি চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুগণ,

বিষ্ণুপুর নামে বাঙালীর হৃদয়ে দোলা লাগে। মদনমোহনের স্থান এই বিষ্ণুপুর। চৈতন্যচরিতামৃতের কত অদ্ভুত স্মৃতি এই বিষ্ণুপুরের সহিত জড়িত। মল্লভূমের বীরগণের কত কাহিনী—স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কি সে বিক্রম। বিষ্ণুপুর বাংলা সঙ্গীতের বহু পুরাতন কেন্দ্র—বাংলার সংস্কৃতি ও শিল্পের অন্যতম প্রধান আশ্রয়। বিষ্ণুপুরের দেবতাকে প্রণাম করে আমি কথা আরম্ভ করি।

আরম্ভ করি আমাদের চিন্তাকাশে উদয়ের কবি রবীন্দ্রনাথের একটি বাণী দ'রে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "জগৎটা বাণীময় রে, এর যে দিকটাতে শোনা বন্ধ করবি সেই দিক থেকেই মৃত্যুবাণ আসবে।" প্রকৃতপক্ষে কোনো দিক থেকে কান না ফিরিয়ে, সকল দিকে কান পেতে থাকার অন্যতম প্রচেষ্টা হ'ল এই গ্রন্থাগার আন্দোলন। যে দিকের যে সত্য বাণী কানের ভিতর দিয়ে মর্মে পৌঁছবে, সেই বাণী আমাদের অমৃতত্বের স্পর্শ দেবে —কান ফিরিয়ে নিয়ে অনৃত-বাণীকে বিদায় দিলে মৃত্যুর প্রবেশ-দ্বার মুক্ত হবে। বিশ্ব জুড়ে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে বাণী, যে বাণী মানুষের মর্মের গভীরে, তার অনুভূতি ও উপলব্ধিতে সংকৃত, যে বাণী মানুষের বুদ্ধি, চিন্তা ও আবিষ্কারে বিধৃত, যে বাণী তার সেবা, প্রেম ও আত্মদানে মহিমান্বিত, সে বাণী সুষ্ঠুভাবে, বলিষ্ঠভাবে গ্রহণের পথ নির্দেশ করবে এই সব গ্রন্থাগার, যার পরিধিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "বাঁধা শিক্ষালয়ের বাইরে সমস্ত সমাজ জুড়ে আবাধা শিক্ষার একটা দিগন্তবিকীর্ণ বৃহত্তর পরিধি।" মানব-মনীষার সীমাহীনতার মধ্যে, তার দিগন্তবিস্তৃত চিত্তরাজ্যের বিস্ময়, আনন্দ ও কৌতূহলের মধ্যে অবাধ বিচরণের আহ্বান সারা দেশে ঘোষণা করাই গ্রন্থাগার-আন্দোলনকে সার্থক ক'রে তোলবার প্রকৃষ্ট পন্থা। এই পথে জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে যাতে নিজ দেশ ও সমাজের সম্যক্ ও সত্য পরিচয় লাভ করা যায় এবং সেই পরিচয় দেশাত্মবোধ আনিবে তরুণ ও কিশোর পাঠকের মনে শুভ কর্মের প্রেরণা সৃষ্টি করে, গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে সেদিকে দৃষ্টি রাখার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমাদের এই অতি প্রাচীন দেশকে স্বাধীনতা লাভের পর আবার নবীন হয়ে গড়ে ওঠবার তপস্যা গ্রহণ করতে হবে। সেই তপস্যার শিক্ষা ও প্রেরণা পাবার অন্যতম কেন্দ্র হ'ল গ্রন্থাগার, একথা অবিসংবাদী।

গান্ধীজীও বাণীময় জগৎ সম্বন্ধে বলে গেছেন। তিনি বলেছেন, বিশ্বের হাওয়া যাতে প্রতিনিয়ত আমার ঘরে অবাধে প্রবেশ করে তার জন্যে আমি ঘরের সকল জোর-জানালা আগাগোড়া খুলে রেখে দেবো—কেবল একটি বিষয়ে সাবধান থাকবো—বাহিরের ঝড়ের বেগে যেন ঘরটি থেকে আমি বিচ্যুত না হই। প্রকৃতপক্ষে ঘরটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে পারলেই পৃথিবীর সকল মানুষ ও সকল চিন্তাকে বলিষ্ঠভাবে গ্রহণ করে লাভবান হওয়া সম্ভব হতে পারে। এই মহাসত্যের আজ্বল্যমান সাক্ষ্য বহন করছে বাঙলার উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ। এই অপূর্ব নবজাগরণ বাংলার মনীষার দিক থেকে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে বাণীময় জগৎকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করবার সর্বতোমুখী চেষ্টার ফলেই সম্ভব হ'য়েছিল। বাংলাদেশে

রামমোহন, ডুদেব, (মাইকেল) মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্র, অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহামনীষীগণ "এই সাধনার এ আরাধনার যজ্ঞশালায়" অধিক—স্বভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে এঁরা বিশ্বকে আপন ঘরে আহ্বান করে এনেছিলেন—এবং বিশ্বপরিচয়ের মধ্যে এঁরা নতুন করে ভারতবর্ষের পরিচয়ও পেয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথের "সেই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ" যার কৃষিপঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত অশোক অভয় হোমাগ্নি এখনও জ্বলছে।

দেশের সঙ্গে সেই নব পরিচয়ের অনুভূতি হ'ল স্বাদেশিকতা—বাংলার হৃদয়সমুদ্র মন্থন করে এর উদ্ভব হয়েছিল—নতুন যুগে ভারতবর্ষের নব পথযাত্রায় এই স্বাদেশিকতা আমাদের প্রধান সম্বল হ'য়ে আছে। এই স্বাদেশিকতা সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাবর্জিত, এই স্বাদেশিকতা প্রসারিত হয়ে সহজেই বিশ্বমানবকে স্পর্শ করে—এরই জোলা লেগে কবিচিত্ত ঝঙ্কৃত করে গান উঠেছিল—

হে মোর চিত্ত, পুণ্য-তীর্থে জাগরে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারে এই স্বাদেশিকতার মূল সুরটুকু অনুরণিত হতে থাকা চাই। তাহ'লে গ্রন্থাগারে অর্জিত জ্ঞান দেশের কর্মক্ষেত্রে নানাভাবে ফলপ্রসূ হতে পারবে। গ্রন্থাগারের এমন একটি সুরি থাকা চাই যা লক্ষ্যে অলক্ষ্যে পাঠকদের ইঙ্গিত করবে—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্

তোমরা একসঙ্গে চলো, একসঙ্গে বলো, তোমাদের মন একসঙ্গে জাগুক। বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে পাঠকগণের একচিত্ততার সৃষ্টি করতে পারলে গ্রন্থাগার ধন্য হবে।

রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার পরিচালনায় গ্রন্থাগারিকের স্থান কোথায় ও কর্তব্য কি নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন "লাইব্রেরিয়ানের গ্রন্থবোধ থাকা চাই, কেবল ভাণ্ডারী হলে চলবে না।" গ্রন্থাগারিক অতিথিপরায়ণ হবেন—পাঠক যেন তাঁর সৌজন্যে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হ'য়ে গ্রন্থাগারকে আনন্দধাম বলে গ্রহণ করতে পারে—গ্রন্থাগার যেন তার নিত্য আসাযোনার জায়গা হয়। আমাদের গ্রামপ্রধান দেশে বড়র চেয়ে ছোটো ছোটো গ্রন্থাগারের উপযোগিতা ও কার্যকারিতা অধিকতর বলেই অনুভূত হয়। সহরে বড় গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু বড় গ্রন্থাগারের একটা বিপদ আছে। বড় গ্রন্থাগারে বই আবিষ্কার ক'রে পাঠককে এবং জনসাধারণকে তাকে লাগিয়ে দেবার একটা প্রবৃত্তি জেগে ওঠে।

সর্বসাধারণের জন্য প্রয়োজন ছোট ছোট গ্রন্থাগারের। সেইসব গ্রন্থাগারে প্রত্যেক বিষয়ের বাছা বাছা বই থাকবে—প্রত্যেক বইএর নিজ বৈশিষ্ট্য থাকবে, বইগুলি গ্রন্থাগারিকের আয়ত্তের মধ্যে থেকে পাঠকগণের কাছে সুকৌশলে নিত্য পরিবেশিত হবে এবং তারই সূত্রে পাঠক ও গ্রন্থাগারিকের আদান-প্রদানের সম্পর্ক সুন্দর ও সুদৃঢ় হয়ে গড়ে উঠবে। ছোট ছোট লাইব্রেরির রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "ভোজনশালা, তা প্রত্যহ প্রাণের ব্যবহারে ভোগের ব্যবহারে লাগে।" প্রত্যেক গ্রন্থাগারে বিশেষ পাঠকমণ্ডলী গঠন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব কথাগুলি এইবার উদ্ধৃত করে দিই। কথাগুলি হয়ত আপনারা সকলেই জানেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"প্রত্যেক লাইব্রেরির অন্তরঙ্গ সত্যরূপে একটি বিশেষ পাঠকমণ্ডলী থাকা চাই। সেই মণ্ডলীই লাইব্রেরিকে প্রাণ দেয়। লাইব্রেরিয়ান যদি এই মণ্ডলীকে তৈরি করে তুলে একে আগ্রহ করে রাখতে পারেন তবেই বুঝব তাঁর কৃতিত্ব! এই মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর লাইব্রেরির মর্মগত সম্বন্ধ স্থাপনের তিনি মধ্যস্থ। অর্থাৎ তাঁর উপর ভার কেবল গ্রন্থগুলির নয়,—গ্রন্থপাঠকের।

এই ঔদাসীন্যকে রক্ষা করার দ্বারা তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেন—তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দেন।"

বাংলাদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টায় ছোট ছোট গ্রন্থাগার একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিপ্লবের কর্মকেন্দ্ররূপে যেখানে সেখানে সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। প্রত্যেক সমিতির সহিত ভাব-কেন্দ্র সৃষ্টির জন্য এক একটি ছোট লাইব্রেরী যুক্ত থাকতো। লাইব্রেরিতে অল্পসংখ্যক সুনির্বাচিত বই থাকতো, যেমন গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, আনন্দমঠ, ভবানী মন্দির, স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী, রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনী, নৈবেদ্য, সংকল্প ও স্বদেশ প্রভৃতি, ম্যাটসিনী ও গ্যারিবল্ডী, জর্জ ওয়াশিংটন প্রভৃতি বীরগণের জীবনকাহিনী, প্রতাপসিংহ, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি ভারতীয় বীরগণের জীবনবৃত্তান্ত, দেশের কথা, (সখারাম গণেশ দেউস্কর) ভ্রমণবৃত্তান্ত, চরিতকথা, শিখের বলিদান প্রভৃতি জাতীয় ভাবোদ্দীপক পুস্তকাবলি। পুস্তকের সংখ্যা কোথাও পঞ্চাশ, কোথাও একশত বা দুইশত। পাঁচশত পুস্তকের লাইব্রেরি বোধহয় খুব কমই ছিল। কিন্তু কি প্রচণ্ড শক্তি ছিল এই ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলির। গ্রন্থাগারের সবগুলি বই অল্প-সংখ্যক পাঠকের দ্বারা গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও যত্নের সহিত অধীত হয়ে পাঠককে বিপ্লবোপযোগী মানুষ ক'রে গড়ে তুলতে সহায়তা করতো। এই সব গ্রন্থাগারে পাঠকেন্দ্র, 'ব্যায়াম ক্লাব' প্রভৃতিতে দেশের স্বাধীনতা, চরিত্রগঠন, সমাজসেবা সম্বন্ধীয় নানা কথার আলোচনায় ছেলেদের মন সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠতো। গান্ধী আন্দোলনের সময়ও এই সব ছোট লাইব্রেরির প্রসার অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশে ছোট ছোট লাইব্রেরির এই গৌরবময় সার্থকতার কথা স্মরণ করতে ও স্মরণ করিয়ে দিতে অতিশয় আনন্দ বোধ করছি।

দেশকে ভাল ক'রে জেনে বুঝে চিনে নিয়ে ভালবাসতে না শিখলে, দেশের জন্য ত্যাগস্বীকারের প্রেরণা না পেলে, দেশগঠন ও দেশরক্ষার উপযুক্ত নাগরিক তৈরি হওয়া কখনই সম্ভব নয়।

দেশ কি ক'রে স্বাধীন হ'ল তার গৌরবময় বিচিত্র ইতিহাস ছাত্রেরা সাধারণতঃ জানে না—সে সব অপূর্ব কথা শিক্ষা দিবার যথার্থ আয়োজন বিদ্যালয়ে নেই, তার প্রয়োজনও অনুভূত হয় না। ভারতবর্ষের প্রতিভাশালী বীর সন্তান ও শহীদগণের জীবনবৃত্তান্ত রীতিমতভাবে পড়াবার কোন ব্যবস্থাও বিদ্যালয়ে নেই। জাতীয় চরিত্র ও স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে কোন কথা ছেলেরা বিদ্যালয়ে শেখে না বললেই চলে। প্রথম বয়সে বালকের মন যখন কোমল, গ্রহণীয় ও গ্রহণক্ষম থাকে তখন থেকে এই শিক্ষা তাদের মজ্জাগত হয়ে না গেলে দেশে অলক্ষ্যে কি বিপুল শক্তি উপচিত হ'য়ে উঠবে তার হিসাবই তখন পাওয়া যাবে না।

এই ক্ষেত্রে আমাদের গ্রন্থাগারগুলিকে অগ্রণী হ'য়ে এসে দেশের জাতীয়তা, স্বাদেশিকতা, স্বাধীনতার বিচিত্র ইতিহাস, দেশের সাধনা ও সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আপন হাতে গ্রহণ করতে হবে। গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই এক অতি গুরু-দায়িত্ব।

আমাদের স্বাধীন ভারতে সকল প্রদেশেই সর্বত্র গ্রন্থাগার সৃষ্টি ক'রে তোলার দিকে গবর্মেণ্ট দৃষ্টি দিয়েছেন—দেশে এ একটা শুভ লক্ষণ এবং আশার কথা। জেলার সদরে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সকল স্থাপিত হচ্ছে—গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপনের সাড়া ধীরে ধীরে জাগছে। সরকার গ্রন্থাগারের গৃহনির্মাণ ও পরিচালনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত হয়েছেন। সরকারী সাহায্য একে একে সকল গ্রন্থাগারে এসে পৌঁছবে এই আশা আমরা করবো। এদিকে সাহায্যগ্রহণকারী বিভিন্ন গ্রন্থাগারেরও এই বিষয়ে গুরুদায়িত্ব ও কঠিন কর্তব্য রয়েছে একথাও স্মরণ আজ করতে হবে।

সরকারী সাহায্য পাওয়া যখন আদৌ সম্ভব ছিল না সেই ইংরেজ আমলে, আন্দাজ ৮০।৯০ বৎসর বা ততোধিক পূর্বে দেশে জেলাকেন্দ্রে বা গণ্ডগ্রামে দুই একটি ক'রে গ্রন্থাগার স্থাপিত হ'তে থাকে। এই উদ্যোগ শিক্ষিত লোকের স্বল্প সম্বল ও ঐকান্তিকতা সহায়েই সম্ভব হয়। এই কার্যে লোকের যে চেষ্টা তখন জাগ্রত ছিল, আজ অর্থাগম ক্রমশ সহজ হ'য়ে আসায় সেই চেষ্টা শিথিল হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এইজন্য গ্রন্থাগারের উদ্যোগিগণকে গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় অন্য বহুকর্মে সেই চেষ্টাকে প্রযুক্ত করে জাগ্রত রাখতে হবে একথা বলা বাহুল্য।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। কিন্তু পাঠের প্রবৃত্তি তেমন জাগছে না। একটা অতিশয় এলোমেলো ভাব—কেন পড়ব, কি পড়ব এই বিষয়ে কোন পরামর্শ বা নির্দেশ নেই।

এবিষয়ে গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য কি ও স্থান কোথায় তার আলোচনা সংক্ষেপে করা হ'য়েছে। এখানে আর দুই একটা কথা বলছি।

পড়ার প্রবৃত্তি ও অনুরাগ বাল্য ও কৈশোরে জাগাতে হয়—এই বয়সেই অভ্যাসসমূহ গঠিত হয়। ভাল ভাল বই পড়তে পড়তে এই বয়সেই বালকের হৃদয়ে ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে আদর্শের প্রতি একটা আকর্ষণ জেগে ওঠে। আমাদের দেশে এখন প্রায় প্রতি বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে কিশোর সাহিত্যের ভাল বই আছে—আবার অন্যান্য লাইব্রেরীতেও শিশুবিভাগ খোলা হ'য়েছে বা খোলার চেষ্টা হচ্ছে। এই সব লাইব্রেরিতে গ্রন্থাগারিকের বা শিক্ষক মহাশয়ের পরামর্শ ও নির্দেশমত ছেলেরা যদি পৌরাণিক কাহিনী, রামায়ণ মহাভারত, কাব্য, জীবনী, ইতিহাস, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার কথা, দেশের কথা, শিল্পকৃতির কথা, বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের কথা প্রভৃতি পাঠ করবার অভ্যাস সুরু করে, তবে তাদের মন গ্রন্থাগার অভিমুখী হ'য়ে গড়ে উঠবে এবং ছেলেবেলাতেই উত্তম পুস্তক পাঠের রুচি সৃষ্ট হবে। গ্রন্থাগার-প্রচেষ্টার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে এইখানে - এই শিশু, বালক ও কিশোরের চিত্তক্ষেত্রে।

দেশে এখন নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপক চেষ্টা সুরু হয়েছে। যারা নিরক্ষর থেকে কয় বৎসরের চেষ্টায় সাক্ষর হচ্ছেন, ছোট ছোট লাইব্রেরিতে তাঁদের যথাযোগ্যরূপ পড়ার ব্যবস্থা না করলে পড়ার অনভ্যাসে তাঁরা আবার প্রায় নিরক্ষর হ'য়ে উঠবেন। এখানেও ছোট ছোট লাইব্রেরির উপযোগিতা মনে রাখা দরকার।

ছোট বড় সকল গ্রন্থাগারেই ভাল ছবি, ছবির বই, এলবাম্, পট, প্রাচীর চিত্র, যন্ত্রসহযোগে চিত্র-প্রদর্শনের ব্যবস্থা প্রভৃতি রাখা প্রয়োজন। ছবির মধ্য দিয়ে ছেলেদের দেশ-বিদেশের সঙ্গে পরিচয় হয়। আগে আপন দেশের সম্যক্ পরিচয় তাদের পাওয়া প্রয়োজন—নতুবা ছবির মধ্য দিয়ে প্রথমেই যদি তারা মাত্র বিদেশের ঐশ্বর্য-বিস্তার, জাঁকজমক আড়ম্বর ক্যাসনের সহিত পরিচিত হয় তবে তাদের মনে নিজের অকিঞ্চিৎকরতা ও হীনমন্যতার সঞ্চার হবে, রুচিও বিকৃত হবে—এত বড় বিপদ আমাদের আর নেই। চিত্রে আমাদের ছেলেরা আগে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হোক, ভারত দর্শন করুক, দেশের সাধু মহাপুরুষ, বীর নেতা ও মনীষীর সঙ্গ লাভ করুক, কণারক ভুবনেশ্বর পুরীর মন্দির দেখুক, মীনাক্ষী কাঞ্চি অরুণাচলম্ চিদম্বরম্ প্রভৃতি মন্দির ও গোপুরম্ দেখুক, তাজমহল মতিমসজিদ্ দেওয়ানী আম দেওয়ানী খাস দেখুক, অজন্তা ও ইলোরার গুহামন্দির খাজুরাহো রাজপুতানা ও অমৃতসরের মন্দির, হিমালয়ের ভুবনমোহন সৌন্দর্য, ভারতের বিভিন্ন স্থানের অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে চিত্রের মধ্যে দিয়ে তাদের পরিচয় হোক, নবভারতের বিভিন্ন প্রচেষ্টা—নদী নিয়ন্ত্রণ, সেচ-পরিকল্পনা প্রভৃতির

সহিতও তারা পরিচিত হোক তারই সঙ্গে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের বীর, মনীষী, বিজ্ঞান-সাধকের ছবি এবং তথাকার চিত্র ও ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখে তাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তার লাভ করুক। এই কার্য গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সুরু হওয়া দরকার।

কয়েক বৎসর হল কয়েকটি জেলার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ভ্রাম্যমাণ বিভাগ খোলা হয়েছে। এই বিভাগের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সমধিক। পুস্তক আদানপ্রদানের সঙ্গে এই বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পরস্পর পরিচয় ঘটে এবং ক্রমে সহযোগিতার সম্পর্কে গড়ে ওঠে। আদানপ্রদানের ব্যবস্থায় বিভিন্ন লাইব্রেরির বহুমূল্য পুস্তক বহু পাঠকের হাতে গিয়ে পৌঁছে। আর গ্রাম-গ্রন্থাগারের সহিত আদানপ্রদানে ভ্রাম্যমাণ বিভাগ যে মধ্যস্থের কাজ করে তাতে শুধু বই পড়া হয় না, গ্রাম এবং গ্রাম-গ্রন্থাগারের পরিচালকগণের সহিত ক্রমে একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠে পরস্পরের শক্তিবৃদ্ধি ও সহানুভূতির পথ প্রশস্ত হয়। মানুষের কাছে কল্যাণ-কর্মের সূত্রে যাওয়া আসা করলেই মানুষ আপন হয়ে ওঠে। গ্রন্থাগার-আন্দোলনে এই আপন-করে-নেওয়ার শক্তিই সৃষ্টিক্ষম ও আনন্দময় হয়। গ্রাম-সহরের ব্যবধান ভেঙে দেবারও ইহা অন্যতম পন্থা।

আজকাল কয়েকটি গ্রন্থাগারকে যুক্ত ক'রে একটি করে অঞ্চল গ্রন্থাগার সৃষ্ট হ'য়েছে। অঞ্চল গ্রন্থাগারে তথা জেলার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে জেলার বিভিন্ন স্থান হতে পুরাতন পুঁথি, প্রত্নতত্ত্বমূলক ভাস্কর্যের নিদর্শনাদি, শিল্পজাত দ্রব্যের নমুনা, পুরাতত্ত্ব ইতিহাস বিষয়ে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি রক্ষা করা প্রয়োজন। এই সকল ভবিষ্যতে দেশের ইতিহাস রচনার উপাদান স্বরূপ ব্যবহৃত হতে পারবে।

গ্রন্থাগার আপন পাঠকমণ্ডলী সৃষ্টি করবার জন্য গ্রন্থাগারে পাঠচক্র খুলতে পারেন। কোন কোন গ্রন্থাগারে কোথাও রবীন্দ্র পাঠচক্র, কোথাও গান্ধী পাঠচক্র, অরবিন্দ পাঠচক্র খোলা হয়েছে। সংবাদপত্র ও পত্রিকাদি পাঠের জন্য পাঠকেন্দ্র খোলা দরকার। পাঠকেন্দ্রে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রধান প্রধান প্রবন্ধের নাম তালিকাভুক্ত করে টাঙিয়ে দিলে পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে ও পাঠে সহায়তা করা হবে। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে নানা বিষয়িণী বক্তৃতার আয়োজন করা দরকার। এজন্য ভারতীয় সংস্কৃতি বক্তৃতামালা, লোকশিক্ষা বক্তৃতামালা বা অনুরূপ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রন্থাগার পরিষদ করেছেন। কোন কোন জেলা গ্রন্থাগারও সেই পথ নিয়েছেন। এই শিক্ষণ বিজ্ঞানসম্মত এবং গ্রন্থাগার পরিচালনায় এর উপযোগিতা সমধিক। এরূপ শিক্ষণ এক্ষণে আবশ্যিক হওয়াই প্রয়োজন।

বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৯২৪ সালে। সে সময় উদ্যোগিগণের পুরোভাগে ছিলেন ৺কুমার নৃপীন্দ্র দেবরায় মহাশয়, তাঁকে ও তাঁর সহকর্মিগণকে আজ আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি, তাঁদের আশীর্বাদ আমাদের পাথেয়স্বরূপ।

এইবার কবির কথা বলে শেষ করি—

দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম নিতেছে কি বিশাল প্রাণ!
পোহায় রজনী, আসিছে জননী
বিপুল নীড়ে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

ভারতের এই নবজাগরণ যেন আমাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সর্বভাবে সঞ্জীবিত করে তোলে—বিধাতার নিকট এই আমার প্রার্থনা।

গত ৩১ মার্চ তারিখে পঞ্চদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে বিষ্ণুপুরে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ হইতে সংক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হইল। স্থানাভাবে পূর্ণ অভিভাষণটুকু দিতে না পারিয়া সম্পাদক দুঃখিত।

ছাত্রজীবনের এক অধ্যায় ঃ বাগেরহাট কলেজ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে উঠিয়া পূজার পূর্বেই কলেজে ফিরিয়া গেলাম, কিন্তু ম্যালেরিয়া যাহাকে ধরে তাহাকে কি সহজে ছাড়িতে চায়। আবার জ্বর হইল, দেশে পুনরায় প্রস্থান করিলাম। এবারে প্রায় দুই মাস এক নাগাড়ে বাড়ীতে থাকি। জ্বর কখনও বাড়ে কখনও কমে। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। এই সময় কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে কয়েকখানি ভাল ভাল বই পড়িয়া ফেলি। প্রথমেই মনে পড়ে টলষ্টয়ের সুবিখ্যাত Twenty Three Tales-এর কথা, পড়িতে পড়িতে মন কোথায় চলিয়া যাইত। আমরা যে জগৎ চর্মচক্ষে দেখি, যে ঘটনাবলীর সঙ্গে আমরা অহরহ পরিচিত, তাহার অন্তরালে একটি অজানা পরম শক্তি ক্রিয়া করিতেছে। টলষ্টয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এই অদৃশ্য জগতের বিবিধ উপলব্ধির কথাই যেন আজ সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠকগণের নিকট বলিয়া যাইতেছেন। সেই কবে বইখানি পড়িয়াছি, এখনও তাহার অন্তর্নিহিত ভাব-জগতের কথা মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে।

এই সময় মেকলের কতকগুলি রচনাও পাঠ করি। তাঁহার ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেষ্টিংসের উপর লিখিত প্রবন্ধগুলি ইংরেজী গদ্য সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া এখনও গণ্য। মেকলের কি আবেগপূর্ণ বর্ণনা ; শব্দসংযোগের কি পারিপাট। সকল কথা যে তখন বুঝিতে পারিয়াছি তাহা বলি না। লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেষ্টিংসকে সে যুগে আমরা কোন মতেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে পারি নাই। কিন্তু এই বিরুদ্ধ ভাবনা সত্ত্বেও মেকলের কাব্যধর্মী সাবলীল রচনা পাঠে তখন কি এক অদ্ভুত মাদকতায় আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। ঐ সময় ইহা যে কত ভাল লাগিয়াছিল তাহা বলিতে পারিব না। পরবর্তী কালে পাঠ করিলে এতটা অনুভব করিতাম কিনা বলিতে পারি না। মনীষী রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত পাঠে তরুণ বয়সের ঐরূপ মাদকতার সমর্থন পাইয়াছি। তিনি অবশ্য একথাও লিখিয়াছেন যে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেকলের রচনার মোহিনী শক্তি দূরীভূত হইয়াছে। পরিণত বয়সে তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে কত ভাবে অলীক যুক্তিজাল বিস্তার করা হইয়াছিল। অলীক হইলেও লেখনীর মুখে উহা পাঠককে শেষ পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইত। মেকলের বক্তব্য বিষয় যাহা থাকিত, তাহার ছটায় তাহা অতি বিস্তার করিয়া বলিতে তিনি ভালবাসিতেন। একারণ ইংলণ্ডের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া মনে হয় দুইখণ্ডে দুই তিন বৎসরের কথাই মাত্র লিখিতে পারিয়াছিলেন।

আর একটি কথাও এই প্রসঙ্গে বলি। পত্র পত্রিকা পাঠে আমার অত্যধিক ঝোঁকের বিষয় পূর্বে বলিয়াছি। দৈনিক সংবাদপত্র পাঠের তেমন সুযোগ তখন ছিল না। পরবর্তী কালের বাংলা সংবাদপত্রের প্রচার বাহুল্যের বিষয় আমরা তখন কল্পনাও করিতে পারি নাই। শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে ইংরেজী পত্রিকাগুলিরই সমধিক প্রচার ছিল। কেমন করিয়া পরিচিত হইয়াছিলাম স্মরণ নাই—দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে বাগের-

হাটের এক মুদ্রাকর বাবুর নিকট হইতে প্রত্যহ পূর্ব দিনের বা সন্ধ্যার সেই দিনেরই 'বেঙ্গলী' ইংরেজী দৈনিকখানি লইয়া আসিতাম। আবার তাহা পাঠের পর যথারীতি ফেরৎ দিতাম। অসুখের সময় দেশে গিয়া আমি বেঙ্গলীর সাময়িক গ্রাহকও হইয়াছিলাম। বেঙ্গলীর ইংরেজী কত সহজ সরল! দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করায় বেঙ্গলীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদ করিয়াছিলেন। তখন ইহার সম্পাদক হন আজীবন সংবাদপত্রসেবী পৃথ্বীশ চন্দ্র রায়। তিনি সুরেন্দ্রপন্থী উদারনৈতিক ছিলেন, কিন্তু বেঙ্গলীতে সুরেন্দ্রনাথ তথা উদার-মতাবলম্বীদের সমালোচনা দেখিয়া বুঝিতাম সাংবাদিক হিসাবে তিনি বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। পৃথ্বীশ বাবু এবং তাঁহার সহকর্মিদের সহজ সরল রচনা ও প্রবন্ধাদি পাঠে আমরা ছাত্রেরা বেশ উপকৃত হইয়াছিলাম। কিন্তু একথা বলিতে হইবে যে, সুরেন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছেদের পর হইতে 'বেঙ্গলী'র মর্যাদার' ভাঁটা পড়িতেছিল, তাহার পূর্ব গৌরব আর কখনও ফিরিয়া আসে নাই। অসহযোগের যুগে 'সার্ভ্যান্ট' (Servant) এবং স্বরাজ্য দলের উত্থানে 'ফরোয়ার্ড' আসিয়া ক্ষেত্র একচেটিয়া করিয়া লয়।

১৪

পূজার ছুটি শেষ হইবারও কিছু পরে বাগেরহাটে গেলাম এবং কলেজে যথাপূর্ব যোগ দিলাম। সত্তেরর ডিসেম্বর মাসে স্কুলে পরীক্ষায় ফেল পড়িয়া যাই। অতএব পূর্বেকার প্রায় তিন বাদ কাল অধ্যয়নে মনঃসংযোগ করিতে পারি নাই। ছাত্রদের বাৎসরিক পরীক্ষা সন্নিকটবর্তী হওয়ায় ইহা আর সম্ভবও হইয়া উঠিল না। তাহাদের পাঠ-প্রস্তুতিতে নিজেকে যথাসাধ্য নিয়োজিত করিতে হইল। এইরূপে আরও মাসখানেক কাটে, ইহার পর আসিল আমার পড়ার পালা। দেখি রাত্রির প্রথম যামে হট্টগোলের মধ্যে পাঠে মন দেওয়া বড়ই কঠিন, তখন অন্য উপায় ধরিলাম। ইহাই এখন একটু বলি।

রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন করিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধুর একজন প্রধান চেলা। তাঁহার লেখা ব্রহ্মচর্য পুস্তকখানি কৈশোরে পাঠ করিয়াছিলাম। ইহাতে তিনি অন্যান্য বহু কথার মধ্যে লিখিয়াছিলেন যে, রাত্রির প্রথমার্ধে ঘুমাইবার পর দ্বিতীয়ার্ধে জাগিয়া পড়াশুনা করিলে যেমন স্বাস্থ্য ভাল থাকে তেমনি পাঠেও সহজে মনঃসংযোগ হয়। তিনি একটি ইংরেজী কথাও উদ্ধৃত করেন—"One hour's sleep before midnight is equal to two after that"। পুস্তকের উপদেশমত এবিষয়টি পরীক্ষা করিতেও তখন একবার অগ্রসর হই। কিন্তু ইহাতে সাফল্য লাভ করি নাই। এবারে পত্যুত্তর না দেখিয়া এই উপদেশ অনুসারে কার্য করিতে লাগিয়া গেলাম। মনে হইতেছে এক মাসের উপর এইরূপ পড়াশুনা করি—শেষরাত্রে দুইটা হইতে ভোর হবার পূর্ব পর্যন্ত। এইরূপে পড়াশুনা করায় আমার এতদিনের অভাব কতকটা মিটাইতে সক্ষম হইলাম।

এই সময়ের মধ্যে পাঠ্যপুস্তকগুলি ইংরেজী, ইতিহাস, সংস্কৃত, অঙ্কিক, একে একে নিবিড়ভাবে পড়িয়া ফেলি। ইতিহাসের প্রতি আমার স্বাভাবিক ঝোঁকের কথা হয়ত পূর্বেই বলিয়াছি, ইংরেজী বইগুলি পড়িয়া এবারে তদন্তর্গত বিষয়ের মর্মেও যেন প্রবেশ করিলাম। আমাদের তখন Prose Selections নামে একখানি ইংরেজী গদ্য বই পড়ান হইত। এই রকম Poetical Selections, Selections from the Bible, ইত্যাদি বইও ছিল। গদ্য সংকলন গ্রন্থখানিতে বড় ভাল ভাল কাহিনী পাঠ করিয়াছি। আনাতোল ফ্রান্সের The Lady's Juggler এখনও মনের পাতায় অনঙ্কন করিতেছে। এই গল্পটিতে

অনেকগুলি আপ্তবাক্য ছিল। তাহার মধ্যে একটি এই—'The living can wait, but the dead cannot'। লর্ড ব্রাইসের একটি কম্‌ভোকেশন (সমাবর্তন) বক্তৃতাও আমাদের পাঠ্য মধ্যে ছিল। এটিও বড় সারগর্ভ রচনা। ইহার মধ্যে ছিল—"Learning is a jealous mistress," অর্থাৎ বিদ্যাদেবী কোন দ্বিতীয়া সহ্য করেন না। পরবর্তী জীবনে ইহার সত্যতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। এই বক্তৃতাটি ব্যতীত ইহা জন স্টুয়ার্ট মিলেরও একটি প্রবন্ধ বা প্রবন্ধাংশ ছিল। কিন্তু তাহা আমাদের পাঠ্য-তালিকায় ছিল না বলিয়া পড়া হয় নাই। আমি অ-কবি। এই জন্যেই বোধ হয় পদ্যাংশের বিশেষ কিছু মনে পড়িতেছে না। অথবা কবি বলিতে পারেন, যাহা পড়ি বা দেখি সবই কবিত্বময় হইয়া যায় বলিয়া বিশেষ কিছু রেখ চিত্তপটে থাকিয়া যায় না। আমাদের এ দৃশ্যমান জগতের পিছনে একটি অদৃশ্য জগৎও রহিয়াছে। যাহার চক্ষু আছে সে এই দৃশ্যমান জগতের মতই অদৃশ্য জগতেরও সন্ধান পায়। কবিরা সাদা সোজা কথায় যে ভাব প্রকাশ করেন তাহাও এই অদৃশ্য জগতেরই নির্দেশ দেয়। অধিক কবিত্ব করিব না, সত্য কথা বলিতে কি, এই সময় ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগ জন্মে। অধ্যাপকদের অধ্যাপনা ইহাতে সহায়তা করিয়াছিল নিঃসন্দেহ। আর একটি বিষয়েও বিশেষ সাহায্য পাই। সেই কথাই এখন বলি।

ইংরেজী গদ্য ও পদ্য গ্রন্থ পড়িতে গিয়া দুইখানি "মোট বই"এর সাহায্য লই। মুন্সীমহলে এ ধরনের বইয়ের উপরে একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আছে। ছাত্রাবস্থায় আমারও খানিকটা বিতৃষ্ণা ছিল। কিন্তু 'মোট বই'এর ভিতরেও যে, ভাল ভাল লেখা বা আলোচনা থাকিতে পারে তাহার পরিচয় এইবারে প্রথম পাইলাম। সাধারণের মধ্যে যে সব বই প্রচলিত তাহার আশ্রয় না লইয়া দুইখানি অপ্রচলিত বই সংগ্রহ করি। সদ্য বইখানির রচয়িতা ছিলেন "B. Mazumder"। পদ্যখানি সরকার-কৃত বলিয়া মনে হইতেছে। এই দুইখানি বইই সাহায্য পুস্তক হিসাবে পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হই। যেমন মূল বই, তেমনি এ দু'খানি মোট। দুইয়ে মিলিয়া ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি কেমন যেন আমার মধ্যে একটা আন্তরিক অনুরাগ জন্মাইয়া দিল। বি. মজুমদার—ভদ্রলোকের সঙ্গে পরে আলাপ হয়। তিনি অধুনা বিখ্যাত ভট্টর বিমানবিহারী মজুমদার। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, অধ্যাপনা কার্য সুরু করিবার পরই মোট বই লেখার হাত দেন। তাঁহার গবেষক-জীবন বহু বৎসর পরে আরম্ভ হয়। সেই যে ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি আমার একটা প্রীতির ভাব জন্মিল, পরবর্তী কালে তাহার মূলকাণ্ডে আমাকে কঠিন ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে।

Test পরীক্ষা হইয়া গেল। এই পরীক্ষার ফল ভালই হইল। সহপাঠী বৃন্দাবনবাবু বাদ ও আমি, যতদূর মনে হইতেছে, ইতিহাসে উভয়েই সমান নম্বর পাইয়া প্রথম হইলাম। ইংরেজীতে আমার নামই ছিল প্রথমে। সেই যে মাসাধিক কাল শেষরাত্রে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহার ফলেই দুস্তর পরীক্ষা-বৈতরণী পার হইতে আমি সক্ষম হই। এই সময় হইতে final পরীক্ষা পর্যন্ত আকস্মিক ও স্বাভাবিক কারণে পাঠে মনোনিবেশ করার বিঘ্ন ঘটে। একারণ শেষ পরীক্ষার ফল ভাল হয় নাই বলিয়া পরবর্তী কালে অনেক দুর্ভোগ সহিতে হইয়াছে।

১১

এ সময়কার আর কয়েকটি বিষয় এখানে পর পর উল্লেখ করিব। লক্ষ্য করিলাম, অগ্রহায়ণ মাস হইতেই জেলখানার সংলগ্ন মাঠে তাঁবু পড়িয়াছে। বাগেরহাটে জরীপ কার্য সমাধা করিবার জন্য

কয়েকজন সেটেলমেণ্ট অফিসার আসিয়াছেন, তাঁহাদের জন্যই এই তাঁবু। এই অফিসারদের মধ্যে একজন ছিলেন বি. আর. সেন, পরবর্তী কালের বিখ্যাত ম্যাজিষ্ট্রেট বিনয়রঞ্জন সেন আই. সি. এস। যেদিনার তিনি salesman পড়েন। স্টেলম্যান পড়িতে চাওয়া সূত্রেই তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। প্রত্যহ সন্ধ্যায় কাগজ লইয়া আসিতাম, পরদিন সন্ধ্যায় তাঁহাকে ফেরৎ দিতাম। প্রত্যহ কার্যান্তে তাঁবুতে ফিরিয়া আসেন, কিন্তু কথা বলিবার মত আর কেহই না থাকায় কেমন যেন নিঃসঙ্গ বোধ করিতেন। তরুণ ছাত্র আমি। আমাকেই তিনি সঙ্গী করিয়া লইলেন। এক মাস কি দেড় মাস কাল সন্ধ্যার সময় এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টার উপর তাঁহার সঙ্গে কত কথাবার্তায়ই না কাটাইতাম, তাঁহার সঙ্গে কত কথাই না হইত। তিনি প্রথমেই একটি সর্ত করিয়া লইয়াছিলেন। আমাদের সব কথা ইংরেজীতে হইবে। তিনি কত গল্প করিতেন। তখন স্বরাজ্য দল নির্বাচনে জিতিয়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় প্রবেশ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় সদস্য তুলসীচরণ গোস্বামী এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"Let Britain stoop to conquer" কথাটির তারিফ করিয়াছিলেন সেন মহাশয় খুবই। Goldsmith-এর She stoops to conquer নামে একখানি নাটক আছে। এই নাম হইতেই গোস্বামী মহাশয় ঐ বাক্যটি প্রয়োগ করেন। বিনয়রঞ্জন দেখি ভারতবর্ষের মধ্যে যে কিছু ভাল আছে, বা ভারত-বাসীর মধ্যে যে কোন ভাল গুণ আছে, ইহা স্বীকার করিতেই চান না। আমরা গান্ধী যুগের মানুষ, মনে বড় দুঃখ পাইতাম। কিন্তু তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতে প্রবৃত্তি হইত না।

বিনয়রঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সতীর্থ ছিলেন। বিলাতে সুভাষচন্দ্র একবারেই আই. সি. এস পাশ করেন। তিনি প্রথম বারে অকৃতকার্য হইয়া দ্বিতীয়বারে উত্তীর্ণ হন। দেখিতাম, সুভাষ-চন্দ্রের কথা যখনই উঠিত তখনই তিনি তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতেন। একটি ব্যাপারে তাঁহার মুখে সুভাষচন্দ্রের প্রশংসা আর ধরে না। ব্যাপারটি কি? বিনয়রঞ্জন বলিতেন, সি. আর. দাশের ব্যারিষ্টারী পর ত্যাগ খুবই বড় কথা, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সিভিল সার্ভিস ত্যাগের কাছে ইহা একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া যায়। দাশ সাহেব জীবনে যথেষ্ট ভোগ করিয়াছেন। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছিয়া অমন ত্যাগ করার মধ্যে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ত্যাগ? সমগ্র জীবন, সমুদয় ভোগ সম্ভোগ উন্নতি তাঁহার সম্মুখে। এত সব প্রলোভন অগ্রাহ্য করিয়া তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন তাহার কি কখনও তুলনা হয়! ভারতীয় সংস্কৃতি-ঐতিহ্যবিমুখ বিনয়রঞ্জনের সুভাষচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ সপ্রশংস উক্তিতে আমি তখন মুগ্ধ না হইয়া পারি নাই। তাঁহার কথাগুলি আজও যেন আমার কর্ণে অনুরণিত হইতেছে।

বিনয়রঞ্জনের মুখে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কথাও কতই না শুনিতাম। একবার দক্ষিণ ফ্রান্সের কথা বলিতে বলিতে তিনি গদগদকণ্ঠ হইলেন। তিনি বলিলেন, ফ্রান্সের ঐ অঞ্চল সবুজ বহুল এবং শস্যশ্যামল। দেখিলেই বাংলার পল্লীর কথা মনে উদিত। এ যেন একেবারে বাংলাদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ইটালীর চিত্রকলা প্রভৃতির বিষয়ও তাঁহার মুখে শুনিতাম। তিনি একদিন বলিলেন, সংস্কৃত পড়িবেন—একজন পণ্ডিত ঠিক করিয়া দিতে হইবে। নতুন করিয়া আই. সি. এস্-দের একটি সংস্কৃত পরীক্ষা হইবে, পাশ করিলেই সাত শত টাকা পুরস্কার! পরীক্ষার মান প্রবেশিকা। ছাত্র সুশীলকে ধরিয়া বাগেরহাট উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতকে ঠিক করিয়া দিলাম।

এই বিনয়রঞ্জন ব্রিটিশ আমলে একজন কৃতী

সিবিলিয়ান বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। তিনি অতি মিষ্টা ও তৎপরতার সঙ্গে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নির্দেশাদি মানিয়া চলিতেন। সত্যাগ্রহ ও সেই সময়ের বিপ্লব আন্দোলন কালে তিনি বাংলা সরকারের প্রেস সেন্সর ছিলেন, এবং নবজাগ্রত স্বাধীনতা প্রচেষ্টার মূলে সংবাদ পত্র যাহাতে রসদ না যোগায় তৎপ্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার সাহায্যকারী প্রেস অ্যাডভাইজারী কমিটিতে অধুনা-খ্যাত জীবিত ও মৃত বহুলোক ছিলেন। যাঁহারা এ বিষয়টি লইয়া অধিকতর অনুসন্ধান করিতে চান তাঁহারা বাংলা সরকারের 'Red Book' (লাল মলাটের বলিয়া কি এই নাম ?) বইখানি পাঠ করিবেন। বিনয়রঞ্জন স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও ভারতরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এবং ইহার প্রতিনিধি রূপে বাহিরে বিভিন্ন উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদে ক্রমশ নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে প্রথম যৌবনে সেই যে মাসাধিক কাল কাটাইয়াছি তাহার স্মৃতি নানা কারণে এখনও উজ্জ্বল হইয়া আছে।

এই সময়কার আর একদিনের কথা বলি। বিনয়রঞ্জন বোধ হয় তখনও বাগেরহাটে। কি সূত্রে মনে নাই, মহকুমা পশুচিকিৎসকের সঙ্গেও আমার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। একদিন তিনি আমাকে সান্ধ্যভোজনে আমন্ত্রণ করিয়া করিলেন। তাঁহার বাড়ীতে আর একজন মাননীয় অতিথি আসিয়াছেন, নাম মনোমোহন চক্রবর্তী। পশু-চিকিৎসক ব্রাহ্ম ছিলেন। অবশ্য পূর্বে আমি ইহা জানিতাম না। মনোমোহন চক্রবর্তী বরিশালের একজন প্রবীণ ব্রাহ্ম-নেতা। তিনি সুকবি ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি ইহাতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। "ছেড়ে দে কাঁচের চুড়ি বঙ্গনারী....." প্রভৃতি স্বদেশী কবিতা ও সংগীত রচনা করিয়া তিনি তখনই প্রসিদ্ধ হন। আমরা তাঁহার সঙ্গে পংক্তি ভোজনে বসিয়া আহার করিলাম। ইহার পর কত গল্প! তিনি অনবরত এ-গল্প সে-গল্প বলিয়া গেলেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতে লাগিলাম। গল্প বলার ভঙ্গি কত সুন্দর ঠেকিয়াছিল। ইঁহার দুই একটি গল্প এখনও স্মরণ আছে। লোকচরিত্র যে কত রকমের হইতে পারে ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত স্থল। তিনি বলিলেন, একদিন ট্রেনে করিয়া যাইতেছি, ভিড় মন্দ ছিল না, দেখি একজন লোক বেঞ্চের উপরে চাদর মুড়ি দিয়া সটান শুইয়া, হু হু করিয়া কাঁপিতেছে। মাথার শীতে একটি হাঁড়িতে জল ভর্তি। আমাদের স্বতঃই ধারণা হইল, ম্যালেরিয়া জ্বরে এইরূপ কাঁপিতেছে। কিন্তু বলিব কি, ঘণ্টাখানেক পরে যেই ট্রেন একটি ষ্টেশনে পৌঁছিল, অমনি সে লাফাইয়া উঠিয়া ঐ চাদর সমেত সেখানে নামিয়া পড়িল। আমরা তো সকলে অবাক! লোকটি আমাদের এতক্ষণ কিরূপেই না ঠকাইয়া গেল।

আরও বহু ঘটনার কথা মনে আসিতেছে, কিন্তু পুঁথি আর বাড়াইব না। সহপাঠী সৌরীন্দ্রনাথ দত্তের বিবাহে বরযাত্রী হইয়া আমরা কয়েকজন নলঠায় যাই। বরযাত্রী, কাজেই আমাদেরও জামাই আদর। মূলঘর ষ্টেশনে নামিয়া ফকিরহাটের সন্নিকটে ভৈরব পার হইলাম, এবং ওপারে নলঠায় পৌঁছিলাম। শাদি বিবাহের দিন কনে পক্ষের আনুকূল্যে যে বাদ্যভাণ্ডের আয়োজন হইয়াছিল তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না। প্রবীণ বাদ্য-শিল্পীরা কত রকমারী তালে ঢাক, ঢোল, কাঁসী, সানাই-এ বাদ্য তুলিতেন, তাহা আর কি বলিব! সেই ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা সেই যে বাজনা শুনিয়াছিলাম তেমনটি আর কি কখনও শুনিতে পাইব! এই শিল্পটি অনুশীলনের অভাবে ক্রমশ মুহ্যমান হইয়া পড়ে। বর্তমানের স্বাধীন পরিবেশে সরকারী ও বেসরকারী আনুকূল্যে এই প্রাচীন বাদ্যশিল্পটিকে পুনরুজ্জীবিত করা যায় না কি?

বাগেরহাটে যখন পড়ি তখন বহুজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। সহপাঠীদের মধ্যে পুরাতন

কাহাকেও কাহাকেও পাইলাম। নূতন মিলিল বিস্তর। পুরাতনদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার মৌলিক এবং মন্মথনাথ ভট্টাচার্য এই দুইজনের কথাই বেশি করিয়া মনে পড়ে। অনন্তকুমারের ভিতরে পূর্বেকার সেই সহজ প্রীতি আর মিলে নাই, কিন্তু মন্মথনাথ দীর্ঘকাল আমার সহপাঠী থাকিয়া একান্তভাবেই যেন আপনার হইয়া গিয়াছিল। সে ছিল মস্ত বড় খেলোয়াড়। উচ্চতর শিক্ষায় অধিকতর অগ্রসর হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি তথা সহজ স্বাভাবিক প্রীতিপূর্ণ চিত্ত তাহাকে চিরনবীন রাখিয়াছে এবং ইহাই বোধ হয় জীবনের দুঃখ-কষ্ট বড় কপাটের চড়াই উৎরাই পার হইয়া সহজ মানুষরূপে বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহাকে শক্তি দিয়াছে। নলিনাক্ষ, ক্ষেত্রনাথ, মৃণালকান্তির কথা এপ্রসঙ্গেও উল্লেখ করিয়াছি। আরও এমন অনেকে ছিল, যাহাদের প্রীতির বন্ধনে আমি আবদ্ধ হইয়া ছিলাম কিন্তু তাঁহাদের অনেকেরই নাম এখন আর স্মরণ নাই।

উপসংহারে এই দুই বৎসরের আর একটি কথা লিখিয়া আমার স্মৃতিচিত্র শেষ করিব। পরীক্ষার পর মে মাসে মুলঘরে খুলনা জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন হয়। বন্ধুবর অতুলচন্দ্র সমাদ্দারের সঙ্গে সেখানে যাই। মুলঘর একটি গণ্ডগ্রাম। ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থের বাস। কত পাকা ঘর বাড়ী, আর কত রাস্তা! মুলঘর হাই স্কুলটি একতলা। ইহার চারিদিকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। ইহার একটি প্রকোষ্ঠে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। আমরা গিয়া কিন্তু উঠিলাম এক অন্যলোকের বাড়ীতে, শুনিয়াছিলাম তিনি কোন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ঐ বাড়ীতেই অতিথি হইয়াছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীপুর নিবাসী শরৎকুমার রায় চৌধুরী সদলবলে। কি দীর্ঘাকৃতি। একচক্ষু বলিয়া তিনি হাই কোর্টের জজ হইতে পারেন নাই শুনিয়াছি। কি আদরযত্নেই না তিনদিন ঐ স্থানে কাটাই। জেলা সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী ও লেখক নেপালচন্দ্র রায়—গৌরবর্ণ খুটখুটে চেহারা, খুবই মিষ্টভাষী এবং আলাপী। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতি হইবার কথা। তিনি না আসিতে পারায় তাঁহার বদলে প্রথম দিনে সভাপতির কার্য্য করেন দেশগত-প্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে এই দ্বিতীয়বার দেখিলাম। আজানুলম্বিত পরিহিত অনিলবরণ রায়ও তাঁহাদের সঙ্গে কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নির্দেশে দ্বিতীয় দিন সভাপতি হইলেন খুলনা জেলার সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা নগেন্দ্রনাথ সেন। তিনি সাতক্ষীরার দুর্ভিক্ষের সময় বোম্বাই পর্যন্ত গিয়া বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সম্মেলনের খুঁটিনাটি কার্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু মনে নাই। তবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে মূল বাড়ীতে গিয়া সাক্ষাৎভাবে এবারেও আলাপাদি করিয়াছিলাম। সেখান হইতে দেশের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। ইহার পর উচ্চতর শিক্ষার জন্য কলিকাতায় চলিয়া যাই। জীবনের এই দুইটি বৎসর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমার উপর কত যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা বলিয়া ফুরাইতে পারিব না।

———

ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকের ডায়েরী

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথম যখন আমি গ্রেড শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যোগ দিই তখন ক্লাসে আমার দুই দিকে দুইজন সুইড সহপাঠি ছিলেন। মাসকলি পর্যন্ত সহপাঠিরা আমাকে Mr. Sinha বলিয়া সম্বোধন করিয়া ছিলেন। তারপর একদিন ঘটনা চক্রে আমরা ঘনিষ্ঠতর বন্ধুর সম্পর্কে আবদ্ধ হইলাম। সেদিন হইতে তাহারা আমাকে "লক্ষ্মীশ্বর" বলিতেন। কিন্তু আমার নামটা ভারী বলিয়া "লাখী" বলিতেন। আর আমি Herr Pearson না বলিয়া একেবারে প্রথম নাম 'পেডার' বলিয়া সম্বোধন করিতাম। "আপনি" শব্দের প্রতি সুইডিশ শব্দ "নী" "তুমি"র প্রতিশব্দ "দু"। সেই হইতে আমরা পরস্পরকে "দু" বলিয়াই সম্বোধন করিতাম।

ভোজনান্তে কফি পানের পালা সাঙ্গ হইলে গৃহকর্তা অতিথিদিগকে অপেরা থিয়েটার প্রভৃতি রঙ্গশালায় আমন্ত্রণ করেন। এইরূপ আমন্ত্রণ কেহ প্রত্যাখ্যান করেন না। টেলিফোন যোগে টিকেট কেনার ব্যবস্থা হয়। এই প্রমোদন রাত্রি নয়টা বা এগারটা পর্যন্ত চলে। পরে গৃহকর্তা অতিথিদিগকে সঙ্গে করিয়া পদব্রজে কোন নৈশীন রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করেন। সেখানে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে রাত্রিকালীন সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে রাত্রির আহার সমাধা করেন। ভোরবেলা একটা কি দুইটার সময় সকলেই পরস্পরকে সেই সুখময় দিনের জন্য ধন্যবাদ দিয়া যার যার ঘরে ফিরিয়া যান। সহরে অতিথি আপ্যায়নের প্রথা এইরূপই বটে: অবশ্য অন্যরূপ যে না হয় তাহা নহে। কখনও কখনও থিয়েটার অপেরায় না যাইয়া বাড়ীতে বসিয়াই গল্পগুজবে কাটান বা তাস পাশা খেলা হয় এবং রাত্রির আহার শেষ করিয়া অতিথিগণ স্ব স্ব গৃহে বসিয়া যান। আসল কথা, সুইডিশ গৃহস্থবাড়ীতে অতিথির সমাদর অসাধারণ।

পল্লী অঞ্চলে অতিথি আপ্যায়ন প্রথা কতকটা স্বতন্ত্র রকমের। ভোজনান্তে সকলেই গৃহচুল্লীর পাশে আসিয়া আরাম করিয়া বসেন। চুল্লীতে কাঠের আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয় এবং ঘরের বাতি নিবাইয়া দেওয়া হয়। চুল্লীর অগ্নিতে সকলের চেহারা উজ্জ্বল হইয়া উঠে। মীরবে গৃহকর্ত্রী সকলকে কাফিতে আপ্যায়িত করেন এবং ধূমপান করিতে করিতে সকলে গল্পগুজব করেন। পল্লীর গৃহস্থ বাড়ীতে গৃহচুল্লীর পাশে বসিয়া কেহ বা পল্লী-সঙ্গীতে সকলকে আনন্দদান করেন, কেহ বা পিয়ানো বা গিটার অথবা বেহালা সংযোগে প্রাচীন লোকগীতি পরিবেশন করেন। শীতের দিনে নিমন্ত্রিতদের আসর জমজমাট হইয়া উঠে। আর বস্তুতঃ ইহাই সে দেশের প্রাচীন প্রথা। পল্লীবাসী বন্ধুদের গৃহে অতিথি হইয়াই আমি সে দেশের লোকসঙ্গীত আয়ত্ত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সে দেশের বহু পল্লীগৃহে আমি আতিথ্য উপভোগ করিয়াছি। কখনও এই চুল্লীর পাশে বসিয়াই গভীর চিন্তার বিনিময় চলে। অতিথি আপ্যায়নে সুইডিশ প্রচুর খরচ করেন এবং তাহা দেশবাসীর আয়ের প্রাচুর্যের লক্ষণ।

খ্রীষ্ট জন্মোৎসব সে দেশের বৃহত্তম উৎসব বলা চলে। এই উৎসবের সপ্তাহকাল পূর্ব হইতেই গৃহিণীরা সব বাড়ী পরিষ্কারের ও গুছাইবার কাজে

লাগিয়া যান। গৃহে গৃহে উৎসবের সজ্জায় ধুম পড়িয়া যায়। পাইন গাছের ডাল বসিবার ঘরের এক কোণে বসাইয়া আলোকে ও রঙ্গিন সজ্জায় মণ্ডিত করা হয়। বাহিরের দোকানপাট, রেলওয়ে ষ্টেশন প্রভৃতিও উৎসবের সজ্জায় সজ্জিত হয়। গৃহে গৃহে প্রচুর খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করিয়া রাখা হয় যাহাতে সকলেই নিশ্চিন্তে উৎসব পালন করিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিপূর্ণ বিশ্রামসুখ ও উপভোগ করিতে পারে।

খ্রীষ্টমস দিবসে উৎসব পর্ব আরম্ভ হয় ভোজন দ্বারা। সেদিন খাদ্য সামগ্রীর বিচিত্রতা উল্লেখযোগ্য। উৎসবের বিশেষ খাদ্য এক প্রকার সিদ্ধ মাছ, সুইডিশ ভাষায় এই মাছকে Lutfisk বলা হয়। এই মৎস্য আহারে অভ্যস্ত হইতে হয়। দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য, চালের পায়েস। সে দেশে ভাতের প্রচলন নাই কিন্তু খ্রীষ্ট পূর্বদেশীয় ছিলেন; সেজন্য সেদিন এই পায়েস আহারের ব্যবস্থা। এই পায়েসে একটি মাত্র বাদাম বা সে-জাতীয় শুকনো ফল থাকে। যাহার পাতে এই ফলটি পড়ে তাহাকে ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী মনে করা হয় অর্থাৎ তিনি অবিবাহিত হইলে এরূপ মনে করা হয় যে তিনি শীঘ্রই জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীলাভ করিবেন। ইহা হয়ত একটা প্রাচীন সংস্কার মাত্র কিন্তু এই নির্দোষ প্রথাকে অবলম্বন করিয়া হাস্যামোদের বন্যা প্রবাহিত হয়। এই ভোজন উপলক্ষে বিশেষ ধরণের পানীয় তৈরি করা হয়। এই উৎসবের প্রধান খাদ্য রান্না করা বা আগুনে ঝলসান শূকরের মাংস। মাংস টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া সিদ্ধ আলু ও পাউরুটি-মাখনের সঙ্গে আহার করা হয়। উৎসবের ভোজন ব্যবস্থা অনেক বাড়ীতে রান্নাঘরেই করা হয় যাহাতে গৃহিণী নূতন নূতন বস্ত্র সহজে পরিবেশন করিতে পারেন। উৎসবের ভোজন শেষ করিতে বেশ সময় লাগে। ভোজন সমাপ্ত করিয়া সকলে উৎসব-হলে সমবেত হন। পাইন ডালে মোমবাতি অথবা বিজলী বাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। বৃহৎ সাজানো টেবিলের উপর সুদৃশ্য মোমদানীতে মোমবাতিগুলি জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। আলোকসজ্জায় গৃহ অলঙ্কৃত হয়। আলোকমালায় সজ্জিত টেবিলের চারিদিকে সকলেই যার যার আসন গ্রহণ করেন এবং তখন কফিপান আরম্ভ হয়। বাদাম খাওয়া সেদিনকার বিশেষ রেওয়াজ। বাড়ীতে শিশু থাকিলে কেহ Christmas Father সাজিয়া আবির্ভূত হন। Father-এর ঘাড়ে বৃহৎ ঝোলা থাকে, ঝোলার ভিতর হইতে তিনি একটি একটি উপহার বাহির করেন ও দান করেন। প্যাকেটের উপর কবিতা থাকে। সকলেই উপহার পায়। প্যাকেট খুলিবার সময় বেশ আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হয়। কিন্তু বাড়ীতে শিশু না থাকিলে Father-এর আবির্ভাব হয় না—তবে উপহার বিনিময় অবশ্যই হয়। এই উৎসব উপলক্ষে সকলেই সকলকে কিছু না কিছু উপহার দিয়া থাকেন। গভীর রাত্রে উৎসব পর্ব সমাপ্ত হয়। তখন আবার কফি পরিবেশন করা হয় অথবা এক প্রকারের মদ গরম করিয়া পান করা হয়। এই মদকে Glogg বলা হয়। পরদিন প্রাতে কেহ কেহ নিকটবর্তী গির্জাগুলিতে আলোক-মালায় ও উৎসবসজ্জায় উজ্জ্বল হইয়া থাকিতে দেখে।

আমাদের দেশে ভারতবর্ষে যেমন আমরা চা খাই, ঠিক সেরূপ কফিপান সুইডেনে চলে। কেহ কোন গৃহে উপস্থিত হইলে গৃহকর্ত্রী অভ্যাগতকে কফি ও দিনের হাতে প্রস্তুত কেক দ্বারা আপ্যায়িত করেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমিহিরকুমার সেন

শিক্ষাবিদ্ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের স্থান যে কত উচ্চে তাহা তাঁহার দেশবাসী আমরাই বুঝিতে চাহি না। পেস্টালৎসি, ডিউই প্রভৃতি বিদেশী শিক্ষাবিদ্‌গণের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদানের প্রণালী ও শিক্ষাবিষয়ে চিন্তা যে কত উচ্চ তাহা বুঝিতে হইলে বিশ্বভারতীর শিক্ষানুষ্ঠানগুলির কার্যক্রম বুঝিতে হইবে। শুধু "গাছতলায় পড়ানো" গোছের অস্পষ্ট ধারণা রাখিয়া বিচার করিলে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় করা হইবে। এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক সুনীলচন্দ্র সরকারের লেখা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা বিষয়ে প্রবন্ধগুলি পড়িয়া দেখিবার কষ্টটুকু অন্ততঃ স্বীকার করুন, তবে বুঝিব যথার্থই আপনারা রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী, শতবার্ষিকী উৎসব করিবার অধিকারী। শুধু হুজুকে পড়িয়া যদি কেহ রবীন্দ্র-উৎসব করিতে আসেন, তবে মনে হয় তিনি যেন মার্ক এণ্টনীর কথাগুলি বিপরীত অর্থে নূতন করিয়া ব্যবহার করিতেছেন, "I come to bury Tagore, not to praise him."

শিক্ষণ পদ্ধতির বিষয়টি বিশেষ করিয়া তুলিয়া ধরিতেছি, কারণ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক চিন্তার মূর্ত প্রতীক। এই শিক্ষণ পদ্ধতিকে কাজে লাগাইবার জন্য গুরুদেব শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল কাটাইয়াছেন। তাঁহার ধর্ম ছিল Religion of Man—মানব ধর্ম। "সম্পূর্ণ মানুষ" তৈয়ারী করিবার কারখানা ছিল তাঁর বিদ্যায়তনগুলি। Total education বা সর্বাঙ্গীন উন্নতির শিক্ষাই ছিল তাঁর চিন্তার বিষয় ও কর্মের লক্ষ্য। তিনি নিজে যেমন সর্বতো বিকাশিত ছিলেন, তেমনি ছাত্রদের বিকাশও পূর্ণ বিকাশ হউক, ইহাই ছিল তাঁর বাসনা ও চেষ্টা। শোনা যায়, স্বয়ং ভগবানও নিজের মত করিয়াই প্রথম মানবকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। একটু কারুশিল্প, একটু খেলাধুলায় দক্ষতা, বয়লটীতে কিছুটা পারদর্শিতা, গান গাহিতে না পারিলেও গানের ব্যাকরণ বোঝা ও সমঝদার হওয়া, অভিনয়ে যোগদান ও এককালের সঙ্গে তথাকথিত "লেখাপড়া"ও কিছুটা যাহাতে হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া গুরুদেব তাঁহার ছাত্রদের শিক্ষাদান করিতেন। সেই শিক্ষার পুষ্টিলাভ করিয়া অনেকে আজ শুধু দেশে নয়, বিদেশেও খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। এখনো সেই শিক্ষা প্রণালীই বিশ্ব-ভারতীতে অনুসৃত হয়। নিঃসন্দেহে বলা যায়, ভারতবর্ষের অপর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রতিটি ছাত্র যাহাতে 'চৌকস' হইয়া ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয় না। ছাত্রদের সংখ্যাধিক্যের জন্য সে সব জায়গায় আদৌ ঐ প্রণালী সম্ভবপর হয় না। শিক্ষা সমাপনান্তে শান্তিনিকেতন আশ্রম হইতে বিদায় লইয়া ছাত্রছাত্রীরা যখন অন্যত্র কর্মব্রতী হয় বা সংসারের অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে যায়, তখন তাহারা যেখানেই যাক, একটু ছবি, একটু সুর, একটু খুশির ভাব, এবং এমন একটি সংস্কৃতি লইয়া যায়, যাহার বিশেষত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাহাদের পঠনোত্তর জীবনের ব্রত যেন এই—

"সংসার মাঝে দু'একটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দু'একটি কাঁটা করে দিব দূর—
তারপরে ছুটি নিব।"*

* রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবের কলিকাতার এক সভায় প্রদত্ত ভাষণ হইতে গৃহীত।

সমালোচনা

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

সৃষ্টিতত্ত্ব। দ্বিতীয় খণ্ড [বিশালত্ব]। শ্রীআদিনাথ সেন। ৩২ বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা ১৯। পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৮০। প্রাপ্তিস্থান : ন্যাশনাল কমার্শিয়াল সিণ্ডিকেট, ৯৩।১ এম, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা ৯।

সৃষ্টিতত্ত্বের প্রথম খণ্ড শিক্ষায় ইতিপূর্বে সমালোচিত হইয়াছে। বর্তমানে আলোচ্য গ্রন্থ দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তকের সূচনা, কৈফিয়ৎ ও উদ্দেশ্য প্রথমখণ্ডেই দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে সৃষ্টির বিশালত্বের কথাই বলা হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায় দিয়া ইহার আরম্ভ, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইহার শেষ। লেখক অতি সুন্দর ভাবে আমাদের বোধগম্য করিয়া বিষয় উপস্থাপনা করিয়াছেন। বিজ্ঞানের চর্চা দিন দিন দেশে বাড়িতেছে, শুধু বিদ্যালয়ে নয়, সাধারণ পাঠকসমাজেও এরূপ পুস্তকের বোদ্ধাদের সংখ্যা আশা করি বাড়িয়াই চলিয়াছে, আদিনাথ বাবু প্রবীণ বয়সে অন্তরের তাগিদে এই শ্রেণীর যে সকল পুস্তক লিখিতেছেন, আমাদের পাঠকবর্গের সেজন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

এরূপ পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবে দেখিতেছি, প্রলয় অবশ্যম্ভাবী না হইলেও ধ্বংস স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলিয়াই ইনি বিবেচনা করিতেছেন। 'কোন কিছু অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইলে, স্বাভাবিকভাবে ধ্বংসের পথেই যায়। এখনি পৃথিবীতে অনেক অতিকায় জানোয়ার নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। মানব ইতিহাসেও, অনেক জাতির বিষয়ে, এই দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বর্তমানে পরমাণবিক বোমা হইতেও, জগতের ঐরূপ পরিণাম হইতে পারে (হিন্দুশাস্ত্রের প্রলয়ের ধারণা তুলনা করা যায়)।' ৪২ পৃঃ

ভাল প্রেসে ছাপা, কাগজও ভাল—বিষয়বস্তুর সহিত সঙ্গত। তবে দুইটি বিষয়ে গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। পরিচিত বাংলা শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ দেওয়া কেন? যেমন 'অসীম' বলিলেই তো যথেষ্ট, সঙ্গে আবার বন্ধনী দিয়া Infinite কেন? পারিভাষিক শব্দও তো নয়। রুচিবিজ্ঞানই যথেষ্ট, Aesthetics কেন? প্রতিবেশীই বুঝিতে পারি, Neighbour কেন? দ্বিতীয়, সামান্য কিছু মুদ্রাকর প্রমাদও রহিয়া গিয়াছে, Siderial (১১ পৃঃ), Jeanes (১৭ পৃঃ) আন্দ্রা (১১ পৃঃ)। অবশ্য এসব ত্রুটি সামান্য। পুস্তকের মূল্য বা মর্যাদা ইহাতে ব্যাহত হয় নাই।

পুস্তকের বহুল প্রচার বিশেষ কাম্য।

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৯শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ | ৭ম সংখ্যা

আলোচনা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের দাবি

শিক্ষার আকাশ বা বায়ুমণ্ডলে ঝটিকার আভাস দেখা দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকেরা—রাজ্যের প্রায় ৩৩ হাজার শিক্ষক আগামী ১১ সেপ্টেম্বর হইতে কর্মবিরতি শুরু করিবেন। তাঁহাদের চার দফা দাবি পূরণ না করিলে কর্মবিরতি অবলম্বন করা হইবে। দফাগুলি এই: (ক) শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্নস্তরের সহিত সংযোগ সাধনের নিমিত্ত একটি সংযোগসাধন কমিটি গঠন করা; (খ) মাধ্যমিক শিক্ষকদের পর্যাপ্ত সংখ্যায় প্রতিনিধি সহ একটি স্বয়ংশাসিত গণতান্ত্রিক মাধ্যমিক পর্ষদ্ গঠন করা হইবে; (গ) মাধ্যমিক শিক্ষকগণের বেতন সংশোধনের জন্য একটি বেতন বোর্ড গঠন করা; (ঘ) সেসন জজের সমকক্ষ বা অধিক মর্যাদার বিচারবিভাগীয় একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে সভাপতি করিয়া একটি কর্মনিরাপত্তা কমিটি গঠন করা।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন শুনিতে পাই। এই দাবিগুলি খুব সাংঘাতিক ধরনের বলিয়া মনে হইতেছে না; ইহাদের পূরণ না করিলে সমগ্র মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্র কিভাবে বিপন্ন হয় আর পূরণ করিলেই বা কি লাভ হয়, তাহা জানি না। সুতরাং এই সংগ্রামের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারিলাম না।

ব্যয়বরাদ্দ কমানো চলিবে না

মাতৃখানে কথা উঠিতেছিল যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনার সম্মুখে নিরাকরণ অর্থসঙ্কটের জন্য শিক্ষার খাতে যে ব্যয় হইবার কথা ছিল তাহা কমানো হইবে, এবং যোজনার খানিকটা অংশ ছাঁটাই করা হইবে। পরে যখন শ্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখ মেয়েদের বরাদ্দ খাতে নির্ধারিত অর্থ ব্যয়ে ছাঁটাই হইবে জানিয়া ও মন্ত্রীমণ্ডলকে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উদাসীন দেখিয়া পদত্যাগ করিলেন, তখন সন্দেহ রীতিমত আশঙ্কায় পরিণত হইল।

সম্প্রতি প্রায় দেড়হাজারের অধিকসংখ্যক শিক্ষকের উপস্থিতিতে এক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সেমিনারের উদ্বোধন করিতে গিয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এবিষয়ে আশঙ্কা অমূলক বলিয়া ঘোষণা

করিয়াছেন। তিনি বলেন—কেন্দ্রীয় সরকারের সুবৃহৎ পরিকল্পনায় সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত, শিক্ষকদের মেধাবী পুত্রকন্যা সকলেই যাহাতে বিনা বেতনে শিক্ষা লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা সরকার করিবেন।

বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভাষাসংকটের মধ্যে এক ভাষা এক লিপি প্রচলনের দ্বারা ঐক্য বাড়িবে, না ব্যাহত হইবে, তাহা লইয়া পণ্ডিতেরা আলোচনা করুন, কর্মীরা কাজ করুন।

শিক্ষানীতির নবরূপ

অধিকাংশ মধ্যবিত্ত জনগণঅধ্যুষিত শিল্প-সম্ভাবনাময় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষানীতি তাহার সংখ্যাধিক অধিবাসীর সর্বাধিক কল্যাণকল্পে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন এই বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করিয়া রাজ্য সরকার উহার শিক্ষা সংক্রান্ত প্রচলিত নীতির মৌলিক পরিবর্তন সাধনের সিদ্ধান্ত সম্প্রতি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

সারা দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মাভাবের দিনে আত্ম-প্রতিষ্ঠাকামী বলিষ্ঠ মধ্যবিত্ত সমাজগঠনের প্রয়োজনে এবং চাকুরীনির্ভরপ্রবণতা রোধের উদ্দেশ্যে সরকার সারা রাজ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে যাহাতে এই দিকটির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় সেজন্য রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ কমিশনের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের জন-সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষায়তন স্থাপনের নির্দেশ দিয়াছেন কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গের ক্ষেত্রে এই রাজ্যের বিবিধ সমস্যার ব্যাপক কর্মহীনতা, ক্রমবর্ধমান বিদ্যার্থী সংখ্যা এবং রাজ্যের বিশ্লায়নের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চাহিদানুযায়ী বৃত্তির আবেদন জানান হইয়াছে।

এই রাজ্যে বর্তমানে মাত্র ২১টি পলিটেকনিক হইয়াছে এবং ইহা বর্তমান জনসংখ্যার অনুপাতেও কম।

কেবল কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রেও এখন অনুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক কেবল প্রথম বিভাগের বিদ্যার্থীদের প্রবেশাধিকার দিবার যে সুপারিশ করা হয় রাজ্য সরকার উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং আপাততঃ এই সুপারিশ কার্যকরী করা স্থগিত রাখিয়াছেন।

রাজ্যসরকার এই দাবী জানাইয়াছেন যে, কেবল প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণদের লওয়া হইলে বাকী দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণদের শিক্ষায় বঞ্চিত করা হইবে। সুতরাং উক্ত ব্যবস্থা কার্যকরী করার পূর্বে রাজ্যে অধিক সংখ্যক বৃত্তিমূলক ও কার্যকরী শিক্ষায়তন স্থাপিত হইবে। ঠিক এই কারণে রাজ্যসরকার আরও শিক্ষায়তন স্থাপনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

আরও জানা গিয়াছে যে, বিশ্বালয়ের পরবর্তী স্তরে যাহাতে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার্থীরা অধিক সুযোগ সুবিধা পায় সেদিকেও কেন্দ্রীয় সরকারের সহানুভূতিশীল দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ১২৫টি কলেজ আছে তন্মধ্যে অর্ধেক সংখ্যক প্রায় সরকারী অর্থে ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়া থাকে, সরাসরি ১৩টি কলেজ সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং ৪১টি 'অনুদত্ত' হিসাবে সরকার পরিচালনা করিতেছেন।

প্রকাশ, রাজ্য কলেজগুলিতে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস করিয়া শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করার উপর মঞ্জুরী কমিশন গুরুত্ব দিতে জানাইয়াছেন, কিন্তু এই ব্যবস্থায় অসুবিধার সৃষ্টি হইবে বলিয়া ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন।

পশ্চিমবঙ্গে কারিগরী শিক্ষার উপর গুরুত্ব

দেওয়ার সহিত শিক্ষকদের শিক্ষাব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন বলিয়া রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র সাংবাদিকদের সহিত সাক্ষাৎকারে জানান।

তিনি বলেন যে রাজ্যে প্রায় ৭০।৮০ হাজার শিক্ষকশিক্ষিকার শিক্ষণব্যবস্থার জন্যও আয়োজন করা স্থির করা হইয়াছে।

মেদিনীপুর জেলা শিক্ষকসম্মেলনে

প্রায় একহাজার শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্ যোগদান করেন এবং কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর ইহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রাজ্য সরকারের শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

অধ্যাপক কবীর বলেন যে, সমাজে যতদিন না শিক্ষকের স্থান ও সম্মান উন্নীত হইবে, এবং যতদিন না শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হইবে ততদিন শিক্ষার সংস্কার সম্ভব নয়। শিক্ষা সংস্কারের গোড়ার কথা শিক্ষক, এবং দেশের সমগ্র উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তি—উহার প্রসার এবং সার্থকতার মূল কথা হইতেছে শিক্ষা। সমাজ শিক্ষকের কথা চিন্তা করিবে এবং শিক্ষক সমাজের কথা চিন্তা করিবেন—ইহাই নীতি হওয়া উচিত।

তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন ১০০৲ টাকা হওয়া উচিত।

নিজেদের বেতনের জন্য শিক্ষকগণের দাবি উত্থাপন করা উচিত নহে, কিন্তু রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের প্রাথমিক কর্তব্য, তাঁহাদের বেতনবৃদ্ধির জন্য দাবি পেশ করা ও আন্তরিকভাবে ঐ বিষয়ে চেষ্টা করা। তিনি মেদিনীপুর জেলার প্রাথমিক শিক্ষকদের 'চেক'-এর মাধ্যমে বেতন দানের ব্যবস্থা চালু করার জন্যও কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান।

১৯৬৬ সালের মধ্যে সারা ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইবে। তিনি বলেন, মেদিনীপুর জেলা বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি। এই মহাপুরুষের জন্য মেদিনীপুর গর্ব বোধ করিতে পারে। বিদ্যাসাগর সারা ভারতে স্থান পান নাই, কিন্তু তিনি রামমোহন ও গান্ধীজীর সমান স্তরের মানুষ বিদেশীরা মনে করেন। ব্যাপকভাবে বিদ্যাসাগরের জন্মোৎসবের চেষ্টা করা হইবে বলিয়া তিনি জানান।

সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীবিকুঞ্জবিহারী মাইতি এম পি অভ্যাগতগণকে সংবর্ধনা জানাইয়া বলেন যে, তৃতীয় পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার এবং শিক্ষকদের আর্থিক মান উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন, তাহার পরিপূর্ণ সুযোগ ও সদ্ব্যবহারের পটভূমি প্রস্তুতির জন্যই এই সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, বর্তমানে শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ যে সমস্ত অসুবিধা ও দুরবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন, সেগুলির সমাধানের চেষ্টা করাও এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। এই জন্য স্থায়ী সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

মেদিনীপুর জেলা-স্কুল-বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ডাঃ রাসবিহারী পাল প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়মিত-ভাবে বেতন দান, শিক্ষকের দার্জিল যুক, তাঁহাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও গ্র্যাচুইটি এবং তাঁহাদের ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক স্তরে অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় লইয়া আলোচনা করেন। তিনি জানান যে, রাজ্যসরকার জেলা স্কুল বোর্ডকে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন নিয়মিতভাবে দিবার জন্য একমাসের বেতন অগ্রিম দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি আরও জানান যে, প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন দিবার জন্য রাজ্য সরকার স্কুলবোর্ডকে ৩২ লক্ষ টাকা অগ্রিম দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

হিন্দী বিশ্ববিদ্যালয়

দক্ষিণ ভারতে মহীশূর সরকার হিন্দী প্রচারের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করিয়াছেন। ভারতের সংহতির কথা বিবেচনা করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার এবিষয়ে চিন্তা করিতেছেন।

বয়স্ক শিক্ষা সাহিত্য প্রতিযোগিতা

দরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা হইতে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের লোকশিক্ষা পরিষদ জানাইতেছেন যে এ বৎসরও লোকশিক্ষা পরিষদের পরিচালনায় সদ্য-সাক্ষর-বয়স্কদের উপযোগী গল্প, নক্সা, একাংক নাটিকা, ভ্রমণ-কাহিনী ইত্যাদি লেখার একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। লেখাটি ফুলস্কেপ কাগজের অনধিক তিনপৃষ্ঠার মধ্যে হওয়া প্রয়োজন। উপরোক্ত ঠিকানায় রচনাটি ১৯৬১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে পৌঁছানো চাই। লেখকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট ভাবে লেখা দরকার।

যাঁহাদের রচনা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইবে তাঁহাদের যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার দেওয়া হইবে। শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি পরিষদের মুখপত্র "সমাজ শিক্ষা"য় লেখকের নামেই প্রকাশিত হইবে।

চরিত্রগঠন না হইলে কোন শিক্ষাই শিক্ষা নয় এবং যাহা শিখিলাম তাহা কার্যে পরিণত করিবার অভ্যাস না হইলে চরিত্রও গঠিত হইল না।

চরিত্রগঠনে প্রাচীন ভারতের ছাত্রজীবনের ব্রহ্মচর্য—পবিত্রতা-ব্রত, দারিদ্র্যব্রত ও শ্রমব্রত—অবশ্য গ্রহণীয় ও অনুষ্ঠেয়।

রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষা (২)

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীঅমাথনাথ বসু

একদিন ভারতবর্ষে যখন তার নিজের সংস্কৃতি ছিল পরিপূর্ণ, তখন যন্ত্রলাঘবকে সে ভয় করত না, লজ্জা করত না ; কেননা তার প্রধান লক্ষ্য ছিল অন্তরের দিকে। সেই লক্ষ্য নির্ণয় করা, অভ্যাস করা, তার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। অবশ্য তারই এক সীমানার বৈষয়িক শিক্ষাকে স্থান দেওয়া চাই, কেননা মানুষের সত্তা ব্যবহারিক পারমার্থিককে মিলিয়ে। যে মানুষ উপকরণ নিয়ে বড়াই করে সে জানে না আসলে সে কতই গরীব। বাইসিকলের আদর কমাতে চাই নে কিন্তু ছুটো সজীব পায়ের আদর তার বেশী। যে শিক্ষায় এই সজীব পায়ের জীবনীশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে তাকেই বড় বলি, যে শিক্ষায় প্রধানত আসবাবের প্রতিই মানুষকে নির্ভরশীল করে তোলে তাকে মূঢ়তার বাহন বলব। যে দারিদ্র্য শক্তিহীনতা থেকে উদ্ভূত সে কুৎসিত। কথা আছে শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। তেমনি বলা যায়, সামর্থ্যবানেরই ভূষণ অকিঞ্চনতা। অতএব সামর্থ্য শিক্ষা করা চাই তোগের অভ্যাস বর্জন করে। সামর্থ্যহীন দারিদ্র্যেই ভারতবর্ষের মাথা হেঁট হয়ে গেছে, অকিঞ্চনতায় নয়। অক্ষমকে দেবতা ক্ষমা করেন না।

• • •

'আমরা সব কিছু পারব' এই কথা সত্য করে বলবার শিক্ষাই আত্মাবমাননা থেকে আমাদের দেশকে পরিত্রাণ করতে পারবে একথা ভুললে চলবে না। আমাদের বিদ্যালয়ে সকল কর্মে সকল ইন্দ্রিয়মনের তৎপরতা প্রথম হইতে অনুশীলিত হোক এইটেই শিক্ষাদাধনার গুরুতর কর্তব্য বলে মনে করতে হবে। আমাদের শিক্ষালয়ে নবীন প্রাণের মধ্যে অক্লান্ত উদ্যোগিতার হাওয়া বয়েছে যদি দেখতে পাই তাহলেই বুঝব দেশে লক্ষ্মীর আগমন সকল হতে চলল। এই আগমন ইকনমিকসে ডিগ্রী নেওয়ার নয় ; চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ করায়, সকল অবস্থার জন্য নিজেকে নিপুণভাবে প্রস্তুত করায়, অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিত্য চর্চায় নয়, পৌরুষ চর্চায়।

—শিক্ষা ও সংস্কৃতি—

• • •

শিক্ষার প্রথমপর্বে উপকরণলাঘব অত্যাবশ্যক। একান্ত বস্তুনিরপেক্ষ স্বভাবে প্রকাশ পায় চিত্তবৃত্তির মূলতা। সৌন্দর্য ও সুব্যবস্থা মনের জিনিস। সেই মনকে মুক্ত করা চাই কেবল আলস্য ও অনৈপুণ্য থেকে নয়, বস্তুভূয়স্ততা থেকেও। রচনা-শক্তির আনন্দ তখনই সত্য হয় যখনই তা জড়বাহুল্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। বাল্যকাল হতেই ব্যবহারসামগ্রী সুনিয়ন্ত্রিত করবার আত্মশক্তিমূলক শিক্ষা আমাদের দেশে অত্যন্ত উপেক্ষিত হয়। সেই বয়সেই প্রতিদিন অল্প কিছু উপকরণ, যা সহজে হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাই দিয়েই সৃষ্টির আনন্দকে উল্লাসিত করবার চেষ্টা যেন নিরলস হতে পারে এবং সেই সঙ্গেই সাধারণের সুখ স্বাস্থ্য সুবিধা-বিধানের কর্তব্যে ছাত্রেরা যেন আনন্দ পেতে শেখে। আশপাশ-পরিবেশের প্রতি ছেলেদের আত্মকর্তৃত্ব চর্চাকে আমাদের দেশে অসুবিধাজনক আপদজনক উদ্ধতা বলে করে সর্বদা আমরা দমন করি। এতে করে

পরনির্ভরতার লজ্জা তাদের চলে যায়, পরের প্রতি আবদার বেড়ে ওঠে, এমন কি ভিক্ষুকতার ক্ষেত্রেও তাদের অভিমান প্রবল হতে থাকে। তারা আত্মপ্রসাদ পায় পরের ত্রুটি নিয়ে কলহ করে। এই লজ্জাকর দীনতা চারিদিকে সর্বদাই দেখা যাচ্ছে। এর থেকে মুক্তি পাওয়াই চাই।

—আশ্রমের শিক্ষা

• • •

প্রাচীন ভারতবর্ষের মতে যতদিন অধ্যয়নের কাল ততদিন ব্রহ্মচর্য পালন এবং গুরুগৃহে বাস আবশ্যক। ব্রহ্মচর্যপালন বলিতে যে কৃচ্ছ্রসাধন বুঝায় তাহা নহে। সংসারের মাঝখানে যাহারা থাকে তাহারা ঠিক স্বভাবের পথে চলিতে পারে না। নানা লোকের সংঘাতে নানা দিক হইতে নানা ঢেউ আসিয়া অনেক সময়ে অনাবশ্যক রূপে তাহাদিগকে চঞ্চল করিতে থাকে—যে সময়ে যে সকল স্নায়ুবৃত্তি ভ্রূণ অবস্থায় থাকিবার কথা তাহারা কৃত্রিম আঘাতে অকালে জাগ্রত হয়; ইহাতে কেবলই শক্তির অপব্যয় হয় এবং মন দুর্বল ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। অথচ জীবনের আরম্ভকালে বিকৃতির সমস্ত কৃত্রিম আবরণ হইতে স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ রাখা নিতান্তই আবশ্যক। প্রবৃত্তির অকালবোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নবোদ্গমের অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্যপালনের উদ্দেশ্য।

• • •

শুধু এই ব্রহ্মচর্যপালন নয়, তাহার সঙ্গে বিশ্ব-প্রকৃতির আনুকূল্য থাকা চাই। • • • কাজের ঘূর্ণির মধ্যে ঝাড়মুড় ভাঙিয়া পড়িবার পূর্বে শিখিবার কালে বাড়িয়া উঠিবার সময়ে, প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা স্বচ্ছ আকাশ, মুক্তবায়ু, নির্মল আলোক, উদার দৃশ্য—ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়।

• • •

ভ্রূণকে গর্ভের মধ্যে এবং বীজকে মাটির মধ্যে নিজের উপযুক্ত খাদ্যের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গোপনে থাকিতে হয়। তখন দিনরাত্রি তাহার একমাত্র কাজ খাদ্য শোষণ করিয়া নিজেকে আকাশের জন্য, আলোকের জন্য প্রস্তুত করা। তখন সে আহরণ করে না, চারিদিক হইতে শোষণ করে। প্রকৃতি তাহাকে অনুকূল অন্তরালের মধ্যে আহার দিয়া বেষ্টন করিয়া রাখে; বাহিরের নানা আঘাত অপঘাত তাহার নাগাল পায় না এবং নানা আকর্ষণে তাহার শক্তি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে না।

ছাত্রদের শিক্ষাকালও তাহাদের পক্ষে এইরূপ মানসিক ভ্রূণ অবস্থা। এই সময়ে তাহারা জ্ঞানের একটি সজীব বেষ্টনের মধ্যে দিনরাত্রি মনের খোরাকের মধ্যেই বাস করিয়া বাহিরের সমস্ত বিভ্রান্তি হইতে দূরে গোপনে যাপন করিবে, ইহাই স্বাভাবিক বিধান। এই সময়ে চতুর্দিকে সমস্তই তাহাদের অনুকূল হওয়া চাই যাহাতে তাহাদের মনের একমাত্র কাজ হয়—জানিয়া এবং না জানিয়া খাদ্য শোষণ, শক্তিসঞ্চয় এবং নিজের পুষ্টি সাধন করা।

• • •

সংসার কাজের আয়গা এবং নানা প্রবৃত্তির লীলাভূমি। সেখানে এমন অনুকূল অবস্থার সংঘটন হওয়া বড়ো কঠিন যাহাতে শিক্ষাকালে অখণ্ডভাবে ছেলেরা শক্তিলাভ এবং পরিপূর্ণ জীবনের মূল পত্তন করিতে পারে। শিক্ষা সমাধা হইলে গৃহী হইবার যথার্থ ক্ষমতা তাহাদের জন্মিবে। কিন্তু সংসারের সমস্ত প্রবৃত্তি-সংঘাতের মধ্যে যথেচ্ছ মানুষ হইলে গৃহস্থ হইবার উপযুক্ত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না—বিষয়ী হওয়া যায়, ব্যবসায়ী হওয়া যায়—কিন্তু মানুষ হওয়া কঠিন হয়।

• • •

খোলা আকাশ, খোলা বাতাস এবং গাছপালা

মানব সন্তানের শরীরমনের সুপরিণতির জন্য যে অত্যন্ত দরকার একথা বোধহয় অত্যন্ত কেজো লোকেরাও একেবারেই উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। বয়স যখন বাড়িবে, আপিস যখন টানিবে, লোকের ভিড় যখন ঠেলিয়া লইয়া যাইবে, মন যখন নানা মতলবে নানাদিকে ফিরিবে, তখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ হৃদয়ের যোগ অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাহার পূর্বে যে হৃদয়দল আকাশবায়ুর চিরন্তন ধাত্রীক্রোড়ে জন্মিয়াছি, তাহার সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় হইয়া যাক, মাতৃস্তন্যের মতো তাহার অমৃতরস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদারত্বয় গ্রহণ করি—তবেই সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে পারিব।

—শিক্ষাসমস্যা

ছাত্র জীবন : সিটি কলেজ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

এখন সিটি কলেজে পড়ার কথা বলি। আমি এই কলেজে দুই বৎসর (১৯২৪-২৬) বি. এ পড়িয়াছি। ইতিপূর্বে অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রসঙ্গে এই সম্বন্ধকার কথা কিছু কিছু বলা হইয়াছে। কাহিনী পূর্ণাঙ্গ করিতে গেলে এখানে হয়ত কিঞ্চিৎ পুনরুক্তি ঘটিবে, তবে আশা করি পাঠক-পাঠিকা ইহা মার্জনা করিবেন।

আই-এ পরীক্ষা দিবার পর এক নাগাড়ে প্রায় তিন মাস বাড়ীতে থাকি। পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্বেই সিটি কলেজের প্রখ্যাত অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের সঙ্গে তাঁহার বায়রের-কাঠীর বাড়ীতে একাধিকবার সাক্ষাৎ করি। তিনি আমার পিতৃদেবের সহপাঠী, তাঁহার মুখে এইরূপ শুনিয়াছিলাম। আমি তাঁহার সহপাঠীর পুত্র, তিনি যেন স্বতঃই আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। কলিকাতায় বি-এ পড়িব, এই ইচ্ছা আমার মনে অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল। অন্যান্য বিষয়ের মত বিদ্যার কেন্দ্রও এই কলিকাতা। এখানে আসিলে নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ সম্ভব হইবে নূতন অনেক কিছু জানা যাইবে—এই সকল কারণেই হয়ত তখন আমার মনে ঐরূপ ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। কলিকাতায় গিয়া তাহার সহিত আমি যেন দেখা করি, এই কথা উপেন্দ্রবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন।

পরীক্ষার ফল বাহির হইল। পরীক্ষার পূর্বে আমি পাঠে তেমন মনোযোগী হই নাই, ইহার ফলও হাতে হাতে পাইলাম। আমি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছি দেখিয়া অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। একারণ কলিকাতায় কলেজে পড়ার ইচ্ছাটা সুবিধা পাওয়া সম্ভব ছিল তাহাও হয়ত আর হইবে না এইরূপ আশঙ্কাও তখন খুবই করিয়াছিলাম। কিন্তু ইচ্ছা যেখানে বলবতী, সেখানে অন্য কোন বাধা টিকে না। আমিও কলিকাতায় রওনা হইলাম। পথিমধ্যে যশোহর জিলার সোহাগড়ায় একদিন কাটাই। সেখান হইতে ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ৺দ্বারিকা নাথ পোদ্দারের কনিষ্ঠ পুত্র ৺কানাইলাল পোদ্দারের সঙ্গে কলিকাতায় চলিয়া আসি। তখন পোদ্দার-দের আড়ৎ-বাটী ছিল উল্টাডাঙ্গার খালের ধারে। এই বিতল বাটীটি এখনও রহিয়াছে। তখন ইহার

পশ্চাতে বিস্তর খালি জায়গা পড়িয়া ছিল। এইরূপ খালের ধার দিয়া যত আড়ৎ-বাটী (পাকা কি কাঁচা) তাহাদের প্রত্যেকের সংলগ্ন ঢের জমি ছিল। এখন ঐ অঞ্চলে গেলে ইহা বুঝা কঠিন হইবে। সেখানে কতই না নূতন নূতন ঘরবাড়ী মাথা উঁচাইয়া উঠিয়াছে। এই আড়ৎ-বাটীতে ১৯২৪ সনের ৩রা জুলাই উপস্থিত হইলাম। এখানে একরকমে এগার দিন থাকি। পণ্ডিতপ্রবর উপেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণের সঙ্গে পূর্বনির্দেশ মত সাক্ষাৎ করিলাম। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলে তিনি আমাকে নিশ্চয়ই বেশ কিছু সুবিধা করিয়া দিতে পারিতেন, তাঁহার ভাব দেখিয়া এইরূপ মনে হইল, কিন্তু মুখে এমন কিছু আমাকে কখনও বলেন নাই। তিনি যথাসাধ্য আমার জন্য করিবেন আশ্বাস দিয়া কলেজে যাইতে বলিলেন। বাড়ী হইতে যৎসামান্য টাকা কড়ি যাহা আনিয়াছিলাম তাহা হইতে কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হই।

কলিকাতায় কোথায় থাকিব, কোথায় যাইব? দেখি অধ্যাপক উপেন্দ্রবাবু তাহার কতকটা সুরাহা করিয়া ফেলিয়াছেন। তখন রামমোহন রায় হোস্টেলের তিনটি তলার প্রত্যেকটিতেই হোস্টেলের ছাত্রদের আলাদা ভোজনালয় বা Establishment ছিল, এবং প্রত্যেক তলায় দুইজন করিয়া যোগ্য ছাত্রের নিম্নরচায় আহারের ব্যবস্থা ছিল। হোস্টেলের সুপারিন্টেডেন্ট ছিলেন সিটি কলেজিয়েট স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক অন্নদাচরণ সেন। উপেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিয়া ত্রিতলের এসটাবলিস্-মেন্টে আমার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কলেজের পশ্চিমে বলাই সিংহ লেনে সিটি কলেজের ভাড়া করা এক মেস-বাড়ী ছিল, তাহার নিম্নতলে আমি একটি সীট ভাড়া লইলাম, মাসিক হার পাঁচ টাকা। দুবেলা আহারের সুবিধা হওয়ায় শুধু কলেজের বেতন এবং সীট ভাড়া আমাকে দিতে হইত। অপরাপর ব্যয় তখন যৎসামান্যই ছিল। এই সব ব্যয় নির্বাহ হইত পিতৃদেব প্রেরিত টাকার দ্বারা। এইরূপে কলিকাতার কলেজে বি-এ পড়ার ব্যবস্থা হইল।

২

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হইয়া বিদ্যার্জনে অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে লাগিলাম। সিটি কলেজের সুবৃহৎ অট্টালিকা, চারতলা বাড়ী। মাঝে 'এল্' আকারে তেতলা রামমোহন রায় হোস্টেল, ভিতরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। কলেজের ছাত্রসংখ্যা শুনিলাম বাইশ শত। কলিকাতার প্রথম শ্রেণীর সরকারী বেসরকারী যে কোন কলেজ হইতেই ইহার ছাত্রসংখ্যা বেশি। তখন আমরা ইহা লইয়া গর্ব করিতাম। তবে এখনকার তুলনায় এ সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে দেখি কত জেলার লোক। ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, খুলনা-যশোহর, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া-মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রাজসাহী-মালদহ, ২৪ পরগণা, খাস কলিকাতা—কত জেলা ও অঞ্চল হইতে ছাত্রেরা আসিয়া এখানে ভিড় করিতেছে। আবার অবাঙ্গালী ছাত্রও কিছু কিছু ছিল। কলেজের মত হোস্টেলে মেসেও কত জায়গার লোক! বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে এই যে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সুযোগ ইহা কালে বড়ই সুফলপ্রদ হইয়া উঠিয়াছিল। যুগ যুগ ধরিয়া প্রতিটি শিক্ষায়তনে এইরূপ মেলামেশা চলে। ইহার ফলে সেই তরুণ বয়সে পরস্পরের ভিতরে আত্মীয়তাবোধ জন্মাইবার সুযোগ আমরা তখন পূর্ণমাত্রায় লাভ করি। ভাষা সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমরা যে অঞ্চলেরই লোক হই না কেন, কলিকাতার ভাষা অনুকরণ করিতে প্রত্যেকেই যত্ন লইতাম। আবার এই ভাষাই ছিল আমাদের মধ্যেকার lingua-franca। ইহা না হইয়া উপায়ও ছিল না। চাটগাঁয়ের ছাত্র দুইজন একত্র হইয়া যখন কথাবার্তা বলিত, তখন

অপরের পক্ষে উহা বুঝা মোটেই সম্ভব ছিল না। অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ একদিন পড়াইতে পড়াইতে আমাদের বলিয়াছিলেন যে, তিনি প্রথম যৌবনে কলিকাতায় পড়িতে আসিয়া সহপাঠীদের সঙ্গে ইংরেজীতেই কথা কহিতেন। কারণ বৈষম-সিংহের ভাষা অপরে তো বুঝিবে না! আমার কলিকাতার কলেজের এক একটি শ্রেণী যেন এক একটি প্রতিনিধিমূলক এসেম্ব্লী বা কংগ্রেস।

আমি যখন কলেজে ভর্তি হই, তখন কলেজের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি গণিতশাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার কথা পূর্বে বরিশালের নেতা পূজ্যপাদ অশ্বিনীকুমার দত্তের মুখে কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম। সতীশচন্দ্র ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন কালে তিনি অশ্বিনীকুমারের সহযোগীরূপে বিস্তর কার্য করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের তিন (৩) আইনে ১৯০৮ সনে যে নয়জন বঙ্গ সন্তানকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজবন্দী করা হয়, তাঁহাদের মধ্যে সতীশচন্দ্র ছিলেন অন্যতম। কলেজে ভর্তি হইবার অল্পকাল পরেই শুনিলাম তিনি ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছেন। অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের সভাপতিত্বে কলেজপ্রাঙ্গণে ছাত্র ও অধ্যাপকগণ সতীশচন্দ্রের একটি বিদায়-সংবর্ধনা সভায় মিলিত হন। আমি তখন কলেজে অল্পদিন মাত্র ঢুকিয়াছি, কিন্তু সতীশচন্দ্রের বিষয় আমি ও পূর্বেই কিছু কিছু জানিতাম। সংবর্ধনা সভায় আমি দুই তিন পৃষ্ঠা পরিমিত কিছু লিখিয়া পাঠ করি। সতীশচন্দ্রের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় তখন ছিল না, পরেও কখনও হয় নাই; কিন্তু তাঁহার উত্তর দান কালে তিনি যাহা বলেন, তাহাতে বুঝিতে পারিলাম আমার কথা তাঁহার মর্মস্পর্শ করিয়াছিল। আমি এই মর্মে লিখিয়াছিলাম যে, তিনি পূর্বে অশ্বিনীকুমারের সহযোগীরূপে বরিশালে অবস্থান করিয়া স্বদেশ সেবার আয়োজন করিয়াছিলেন। ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষরূপে তিনি যেন উহাতে পুনরায় যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়া দেন। সেই বিদায়কার সভায় অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র এবং আর কেহ কি বলিয়াছিলেন তাহা এখন আর সঠিক স্মরণ নাই।

কলিকাতায় পৌঁছিয়াই আমার স্বগ্রামবাসী বন্ধুবর শরৎচন্দ্র ভদ্রের সঙ্গে যোগস্থাপন করি। সে তখন কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিয়া একটি সেবা-প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিল। ইহার একটি ছোটখাট গ্রন্থাগারও ছিল। তখন বর্ষাকাল। চন্দ্রগ্রহণ হইবে। চীফ্ এসাইকিউটিভ অফিসার সুভাষচন্দ্র বসুর উৎসাহ উদ্যোগে কলিকাতার বিভিন্ন ঘাটের জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়। উক্ত সেবা-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আমরা সিটি কলেজের কয়েকজন ছাত্রও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিলাম। মধ্যরাত্রে সে কী বর্ষা! নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটে লড়ি ধরিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বৃষ্টিতে ভিজিলাম। কোন কোন চতুর সেবক বৃষ্টির সময় সন্নিকটের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করে। আমি এরূপ না করায় তাহাদের কাহারও কাহারও নিকট হইতে মৃদু ভর্ৎসনাও পাইলাম। পরদিন হাটে শেষ রাত্রে সুভাষচন্দ্র বসুকে সমস্ত খোঁজ খবর লইতেও তখন দেখি। গ্রহণান্তে আমরা পুনরায় স্বস্থানে চলিয়া যাই।

৩

ভর্তি হইবার কয়েকদিন পরেই কলেজের পঠন-পাঠন শুরু হইল। ইতিহাসের প্রতি আমার স্বাভাবিক ঝোঁক, কিন্তু এই সময় ইংরেজী যেন আমাকে পাইয়া বসে। ইংরেজী সাহিত্য চর্চায় বিশেষ সুবিধা হইবে এই আশায় আমি ইতিহাসের পরিবর্তে ইংরেজীতে অনার্স লইলাম। ইতিহাস এবং সংস্কৃত আমার অন্য দুইটি বিষয় হইল। কলিন টীক হইলে আমাদের পাঠক্রম অনুসারে পড়াও আরম্ভ হইল।

এই সময় আমাদের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন দুইজন—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত (পরে ডক্টর) বিনয়চন্দ্র সেন। বিনয়চন্দ্র রায়বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের পুত্র। বয়স অল্প, লম্বা ছিপছিপে চেহারা, তিনি আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথমদিককার বেশির ভাগই পড়াইয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতাকালে অনর্গল ইংরেজী বলিয়া যাইতেন, গলাও বেশ চড়া ছিল। ছাত্র এবং অধ্যাপক উভয়ের বয়সের তারতম্য বেশি ছিল না। মনে হয়, উভয়ের মধ্যে বন্ধুতা ঘটিবার এ একটি কারণ। ডিরোজিওর বেলায়ও দেখিয়াছি, তাঁহার এবং তাঁহার ছাত্রদের বয়সের পার্থক্যও ছিল খুবই কম। ছাত্রগণ তাঁহার একেবারে পোঁড়া হইয়া উঠিয়াছিল ঐ সময়। অবশ্য এই ধরনের বন্ধুতার মূলে অধ্যাপনা গুণটিও যে সক্রিয়ভাবে কার্য করে তাহা বলাই বাহুল্য।

ভূপেনবাবু ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক। বয়স অপেক্ষাকৃত অধিক, তিনিও দীর্ঘাকৃতি, কিন্তু চেহারা দেখিয়া মনে হইত তেমন বলশালী নন। তিনি আমাদের 'মডার্ন ইউরোপ' পড়াইতেন। যতদূর স্মরণ হয়, বইখানিতে সপ্তদশ, অষ্টাদশ পুরাপুরি এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরের মাত্র ঘটনাবলীর আলোচনা সন্নিবদ্ধ ছিল। ভূপেন্দ্রনাথ প্রথম আলাপেই বাগেরহাট কলেজের জনার্দন বাবুর কথা বলিয়াছিলেন এবং ইহাতে বুঝিলাম উভয়েই উভয়ের পরিচিত। ভূপেন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে বক্তৃতা দিয়া যাইতেন। তাঁহার ইংরেজী ছোট ছোট, কাটা কাটা বাক্য আমাদের বড় ভাল লাগিত। ইতিহাসের প্রতি আমার স্বাভাবিক অনুরাগের পরিচয় কী সূত্রে জানি না তিনি অবিলম্বেই পাইয়াছিলেন এবং আমিও সত্বর তাঁহার স্নেহলাভে ধন্য হই। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে আমাদের কিছুকাল ভারত ইতিহাসের ব্রিটিশ আমলের কথা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সরকার পড়াইয়াছিলেন। তাঁহার কথা পরে আরও বলা যাইবে।

একসময়ে সিটি কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপনার খুবই সুনাম ছিল। এই সুনামের মূলীভূত কারণ অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের শকুন্তলা পড়ান। আমাদের পূর্বযুগে এক একটি বিষয়ে এক একটি কলেজের অধ্যাপনার খ্যাতি ছাত্রদের মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সিটি কলেজের সুপণ্ডিত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের শকুন্তলা অধ্যাপনা শুনিতে অন্যান্য কলেজের সংস্কতানুরাগী ছাত্রেরা আসিয়া ক্লাসে যোগ দিত। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের Shakespeare পড়ানোর খ্যাতি আমাদের সময়েও শুনিতাম। এক সময়ে তাঁহার ক্লাসে অপরাপর কলেজের ছাত্রেরা আসিয়া ভিড় করিত। ললিতকুমারের বঙ্কিম-সাহিত্য সমালোচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বাহির হয় এবং এজন্যও সাহিত্যিক মহলে তাঁহার তখন বিশেষ প্রসিদ্ধি। এইরকম রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অধ্যাপক জানকীনাথ ভট্টাচার্য, স্কটিশ চার্চ কলেজের রজনীকান্ত দে প্রভৃতিরও নানা বিষয়ে অধ্যাপনা নৈপুণ্যের কথা সর্বত্র জানাজানি হইয়াছিল।

পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তখন প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় উপনীত। তিনি এ সময়ে আর শকুন্তলা পড়ান না। আমাদের অন্যতম পাঠ্য ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' তখন তিনি আমাদিগকে পড়াইতেন। তাঁহার অধ্যাপনারীতি লক্ষ্য করিয়া বুঝিতাম, একসময়ে তাঁহার ঐরূপ সুনাম হইবার যথেষ্ট হেতু ছিল। উপেন্দ্রনাথ বরাবর পড়াইয়া যাইতেছেন, ছাত্রদের প্রতি তাঁহার স্নেহবাৎসল্য যেন উছলিয়া পড়িত। সম্মুখের বেঞ্চিতে বসিয়াও তাঁহার সব কথা অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত না, কিন্তু স্বাভাবিক

প্রীতিবশে তিনি যেন আমাদের সকলকেই আপন করিয়া লইয়াছিলেন। অধ্যাপক সতীশচন্দ্রের কলিকাতা ত্যাগের পর উপেন্দ্রনাথ কলেজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের গুরু দায়িত্বভার নিজস্কন্ধে লইয়াছিলেন। এজন্যও তাহাকে বিস্তর সময় দিতে হইত। বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়াম, তাহার উপর এই গুরুকার্য এই সবের দরুণ তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া যায় এবং তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। ইহার পর তিনি আর পূর্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া পান নাই। তবে কলেজের অধ্যাপনা কর্মে তিনি ইহার পরও বহু বৎসর লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার অসুস্থতার পূর্বেই আমি কলিকাতা পরিত্যাগ করি।

উপেন্দ্রনাথ ছিলেন আদর্শ শিক্ষাব্রতী। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রীতির কথা প্রত্যেকে প্রথম আলাপেই বুঝিতে পারিতেন। কিশোর বয়স হইতে ছেলেমেয়েরা যাহাতে সংস্কৃত ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়া রস পাইতে পারে সে নিমিত্ত কয়েকখানি ছোট ছোট সংস্কৃত সাহিত্য-পুস্তক তিনি সংকলন করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত 'ভোজ প্রবন্ধ' আমাদের সময়ে প্রবেশিকা ক্লাসের সহ-পাঠ্যরূপে পড়ান হইত। যাতে ছেলেরা যাহাতে সংস্কৃত-ভাষা-সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে এবং ইহার ভিতরকার রসানুভূতিতে সক্ষম হয় সেজন্য কলেজী শ্রেণী পর্যন্তও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার Higher Sanskrit Grammar সংস্কৃতে বি-এ অনার্স এবং এম-এ ক্লাসের ছেলেরাও অনুসরণ করিয়া বিশেষভাবে উপকৃত হইত। এই ধরনের পুস্তক আজকাল চালু আছে কিনা জানি না। উপেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যেরও চর্চা করিয়াছিলেন। নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষের একখানি জীবনী তিনি লেখেন। শুধু কলেজের নয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ কর্তৃমহলেও তাঁহার বেশ সুনাম ছিল। তিনি তাঁহাদের নির্দেশিত বিবিধ কার্যেও সানন্দে যোগ দিতেন। মনে হইতেছে অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়াছি, স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে একসময় সিটি কলেজের অর্থনৈতিক অবস্থা ছাত্রাভাব হেতু খুবই খারাপ হইয়া পড়ে। তখন তাঁহাদিগকে মাসিক দশ পনর টাকা বেতন লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। এই সময় কলিকাতার একটি বিত্তশালী প্রথম শ্রেণীর কলেজ হইতে প্রস্তাব আসে—তিনি ঐ কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ গ্রহণে সম্মত হইলে, মাসিক দুইশত টাকা বেতনে সেখানে নিযুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ কলেজটিকে এত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন যে, তখন তিনি ঐ প্রস্তাব সবিনয়ে অগ্রাহ্য করেন। এরূপ একজন ত্যাগপূত নিষ্ঠাবান শিক্ষাব্রতীর সান্নিধ্যলাভে আমি ধন্য হইয়াছি।

সংস্কৃতের আর একজন অধ্যাপক ছিলেন সুপণ্ডিত সত্যেন্দ্রনাথ সেন। তিনি যশোর জেলার প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা নগেন্দ্রনাথ সেনের সহোদর। সত্যেন্দ্রনাথ আমাদিগকে 'মনুসংহিতা' হইতে পাঠ্যাংশ পড়াইতেন। তিনি অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে শ্লোকগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া বুঝাইয়া দিতেন। তিনি রক্ষণশীল হিন্দু। মনুসংহিতা পাঠনার ভার তাঁহার উপর দেওয়া যোগ্যতম বিবেচনাই হইয়াছিল। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্য পুস্তক কয়েকখানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সিটি কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি রাজনীতিতেও যোগ দেন। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সপক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য তিনি দিল্লীর কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে সসম্মানে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহা অবশ্য আমাদের কলেজ ছাড়িবার পরে। শকুন্তলা পড়াইতেন আর একজন অধ্যাপক। দুঃখের বিষয় তাঁহার নাম ঠিক স্মরণ হইতেছে না। শকুন্তলা অতি ভাল বই, জার্মান কবি গ্যেটে তো ইহার অনুবাদের অনুরাগে পড়িয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন। কলেজে পড়ার

সময় এই উৎসাহ, ভগ্নস্তূপের নাটকখানির মর্মে প্রবেশ করিয়া রসগ্রহণ করিতে পারিয়াছিলাম কিনা সন্দেহ। মূলে কি অনুবাদে ইহা যতই পাঠ করি না কেন ইহার রসসম্ভোগে পরবর্তী কালে তেমন আর বেশ পাইতে হয় নাই। সংস্কৃতের আরও অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক বিপিনচন্দ্র গুহের সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় হয়। কিন্তু তাঁহারা আমাদের সাধারণ ক্লাসে কখনও পড়ান নাই।

৪

অন্যান্য বিষয় পঠন-পাঠনের কথা বলিবার পূর্বে এখানে এই সময়কার আর কয়েকটি ঘটনা সম্বন্ধে কিছু বলি। প্রসঙ্গত বাংলা পাঠনার কথা প্রথমেই উল্লেখ করিব। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কল্যাণে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় স্থান পাইয়াছিল বটে, কিন্তু কি ইণ্টারমিডিয়েট, কি বি-এ সকল পরীক্ষায়ই ইহার যে অবস্থায় রেখিয়াছি তাহা মনে হইলে এখনও দুঃখবোধ করি। ইণ্টারমিডিয়েট পড়িবার সময় বাংলার ক্লাস কখনও হইয়াছিল কিনা ঠিক স্মরণ নাই। কিন্তু বি-এ অধ্যয়নকালে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে সপ্তাহে এক পিরিয়ড করিয়া বাংলা ক্লাসও 'রোলকল' হইত। কিন্তু ইহার পায়সেন্টেজ পরীক্ষাকালে গণনা করা হইত না বলিয়া কম ছেলেই ক্লাসে উপস্থিত থাকিত। তবে আমাদের ক্লাসে মনে হয় মাতৃভাষার প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ বশতঃই কিছু কিছু ছেলে বেশি সংখ্যায় আমরা উপস্থিত থাকিতাম। আমাদের নির্দিষ্ট কোন পাঠ্য বই ছিল না, তবে যতদূর মনে হয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিদ্যাসাগর জীবনী" এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ" আমাদের অনুশীলন করিবার কথা ছিল।

অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকার শুধু অর্থনীতিতে নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেও খুবই ব্যুৎপত্তির সঙ্গে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার উপরই ভার পড়িল আমাদের বাংলা ক্লাস লইবার। বিশেষ কোন পাঠ্য বই না থাকায় তিনি প্রথম প্রথম আমাদের কোন কোন বিষয় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া তাহার উপর রচনা লিখিতে বলিতেন। এইরূপ একটি রচনার বিষয় ছিল—শিক্ষায় বাহন, অথবা—বাংলা শিক্ষার বাহন হইতে পারে কিনা—এইরূপ। আমরা কয়েকজনেই প্রবন্ধ লিখিলাম। প্রমথনাথ আমার রচনাটিকেই প্রথম স্থান দিলেন। এই সময় হইতে তিনি আমার প্রতি যে স্নেহ-প্রীতি প্রদর্শন করিতে থাকেন অদ্যাবধি তাহা এতটুকুও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। যতদূর মনে পড়ে তাঁহার নির্দেশে আমার প্রবন্ধটি ক্লাসে ছাত্র বন্ধুদের সম্মুখে পাঠ করি। ইহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে এই মর্মে লিখিয়াছিলাম যে—বিদেশী ভাষায় যাহা কিছুই পড়ি না কেন, তাহা চিত্তপটে কখনও তেমন করিয়া রেখাপাত করিতে পারে না, যেমন করিবে মাতৃভাষায় কিছু পড়িলে। মহাজনদের এই কথাটিও প্রবন্ধে তুলিয়াছিলাম—"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ"—"তিলপিত তেল পরাণ" এ বাক্যাংশটি এ প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয়। প্রমথনাথ কোন কোন বইয়ের ভাল ভাল অংশও মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন।

কলেজে ভর্তি হইয়াছি বেশি দিন হয় নাই। তখনও বর্ষাকাল। অধ্যাপক প্রমথনাথ একদিন বড় কলেজের দুইটি ছেলের সঙ্গে আমাকেও লইয়া শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে গেলেন। বোটানিক গার্ডেন সেই আমার প্রথম দেখা। তখন নৌকায় বা ষ্টীমারে ওখানে যাইতে হইত। আমরা ষ্টীমারে গিয়াছিলাম। কত বড় উদ্যান, কত ঝিল। বড় বড় রকমারী গাছপালা, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠাতাদের মত সেই বহু পুরাণো বটবৃক্ষের

প্রকাণ্ড অট্টালিকা তখন খানিকটা মজরে পড়িয়াছিল। আমরা এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরিয়া গাছপালা দেখিতে দেখিতে একটি কোণের ধারে ফাঁকা জায়গায়, চারিজনে গিয়া বসিলাম। প্রমথবাবু নানা কথায় আদর জমাইয়া রাখিলেন। আমরা তিনজন শ্রোতা মনিবিষ্টচিত্তে তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলাম। সেখানে এইরূপে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পুনরায় টাদার যোগে হাইকোর্টের নিকটে বাসুঘাটে অবতরণ করিলাম। ইহার পর যে যাহার বাসস্থানে চলিয়া আসি।

কলিকাতায় আসিয়া এবারে যেন স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া পড়িলাম। কৌতূহলের অবধি নাই, যেখানেই কোন সভা সমিতির কথা শুনিতাম অমনি ছুটিয়া যাইতাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ব্রাহ্ম ছাত্রসংঘের উদ্যোগে তখন মাঝে মাঝে সাধারণ সভা হইত। অন্যান্য সমাজহিতকর কোন কোন সভায়ও উপস্থিত থাকিতাম। রবিবারের উপাসনা সভায়ও মধ্যে মধ্যে যাইতাম। এইরকম কয়েকটি সভার কথা মনের পাতায় জল জল করিতেছে। প্রথমেই অধ্যাপক ব্রজসুন্দর রায়ের একটি বক্তৃতার কথা মনে পড়ে। ব্রজসুন্দর বাবুর সম্বন্ধে পরে আরও কিছু বলিব। তিনি ব্রাহ্ম যুবসংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় জীবন ও জীবিকা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতার বক্তব্য মনে পড়ে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ এবং জীবিকা নির্বাহের সদুপায়গুলি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীহট্টের লোক। চলতি ভাষার কথা বলিলেও শ্রীহট্টের টান সহজেই কানে লাগিত। কিন্তু তাঁহার ভাষণটি এত তথ্যবহুল ও মনোজ্ঞ হইয়াছিল যে আমরা প্রায় ঘণ্টাখানেক তাহা মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিয়াছিলাম। তখন আমি খানিকটা শ্রুতিধর ছিলাম। ঘরে ফিরিয়া বক্তৃতাটি লিখিয়া ফেলি। এইরূপ আরও কোন কোন বক্তৃতা যাহা আমার ভাল লাগিত ঘরে ফিরিয়া লিখিয়া রাখিতাম। এগুলি সংরক্ষিত হইলে কত চিন্তার খোরাকই না আজ এসবের মধ্যে পাওয়া যাইত।

আর একদিনের কথা। এদিনকার বক্তা অধ্যাপক সরোজেন্দ্রনাথ রায়। তিনি ইংরেজীর টিউটর রূপে সিটি কলেজে প্রবেশ করেন। শেষে সেখানকার অধ্যাপক পদে ব্রতী হন। আমরা যখন কলেজে পড়ি তখন তিনি কখনও কখনও আমাদের ইংরেজী টিউটরিয়াল ক্লাস লইতেন। আমাদের না পড়াইলেও তাঁহার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমি পরিচিত হইয়াছিলাম। তিনি আমার সহপাঠী শ্রীযুক্ত প্রেমকুমার চক্রবর্তীর ভগিনীপতি এবং ব্রাহ্মসমাজের আচার্য গুরুদাস চক্রবর্তী মহাশয়ের জামাতা। সরোজেন্দ্রবাবু পরে বিলাত যান এবং সেখান হইতে বি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি আজীবন শিক্ষাব্রতীর কার্য করিয়া বর্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সরোজেন্দ্র বাবুর ঐদিনের বক্তৃতার বিষয় কি ছিল ঠিক স্মরণ নাই, কিন্তু তাঁহার কতকগুলি কথা এখনও কানে বাজিয়া আছে। তিনি অধ্যাপকের অধ্যাপনা কার্য যে অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে করা উচিত এ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া শেষে এই মর্মে বলিয়াছিলেন যে, এমন বহু অধ্যাপক দেখা যায় যাঁহাদের কেহ কেহ অধ্যাপনা কার্য বাদে ছুতার মোকাম চালাইতেছেন বা ছাপাখানার মালিক হইয়া লোকের উপরে খবরদারী করিতেছেন। অধ্যাপনা যে অধ্যাপকের মূল বৃত্তি—সে কথা যেন তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া যান। পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ বৎসর পূর্বে অধ্যাপকদের মাসের বই লেখার ব্যবসা আজিকার মত এতটা উৎকট-হইয়া উঠে নাই। সেদিনে তিনি হয়ত ইহার কথাও বলিতেন। পরবর্তী কালে জীবিকার্জনের নিদারুণ পরিশ্রম সত্ত্বেও সামান্য অবসর যাহা পাইয়াছি তাহা গবেষণা কার্যে লাগাইতে গিয়া

এই কথাই বারবার মনে হইয়াছে যে, কলেজের অধ্যাপকগণ বৎসরে ছয় মাসাধিক কাল ছুটি ভোগ করেন। তাঁহারা যদি এই দীর্ঘ অবসরকাল বিদ্যা-চর্চায় কাটান তাহা হইলে এদেশে বিবিধ বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা বঙ্গভারতীর কতই না মুখোজ্জ্বল হয়। আজিও সরোজেন্দ্রবাবুর কথাগুলির ব্যঞ্জনা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সময় সময় আরও ভাল ভাল সভা হইত। কলিকাতার অনুন্নত জাতিগুলির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে সে যুগে একটি সোসাইটি বা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সভার আনুকূল্যে বাংলার বিভিন্ন জেলায় নমঃশূদ্র ও অন্যান্য অনগ্রসর জাতিগুলির মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহার দ্বারা উহাদের শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে। এই প্রতিষ্ঠানটির একজন প্রধান কর্মী ছিলেন রায় সাহেব রাজকুমার দাশ। তিনি একটি বক্তৃতায় এই সমিতির কার্যকলাপের কথা তথ্যপ্রমাণ সহযোগে ঘণ্টাখানেক ধরিয়া আমাদের শুনাইলেন। এতটা সময় কখন চলিয়া গেল আমরা বুঝিতেই পারিলাম না। ইংরেজীতে একটি কথা আছে—"Facts are more eloquent than speeches." অর্থাৎ মুখে বাগাড়ম্বর না করিয়া ঘটনাগুলি বা তথ্যগুলি চোখের সামনে ধরিতে পারিলে তাহা আমাদের মর্মস্পর্শ করে। ঐদিনকার বক্তার অবিরাম তথ্য-ভিত্তিক ভাষণে বারবার এই কথাটির সত্যতা আমরা উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ এই সময় চীন ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসেন। চীন ভ্রমণে তাঁহার সঙ্গী ছিলেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু ও ডক্টর কালিদাস নাগ। ক্ষিতিমোহন বাবুর মুখে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত এই সময়কার কোন কোন কৌতুককর কাহিনী বহু পরে শুনিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ আগষ্ট মাসের শেষ নাগাদ কি প্রায় সদলবলে চীন ভ্রমণ হইতে সদলবলে ফিরিয়া আসেন। কলিকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে একটি সাধারণ সভার আয়োজন হইল, শুনিলাম রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চীন পর্য্যটনের অভিজ্ঞতা বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। আমি অন্যত্র এই বিষয়ের কথা লিখিয়াছি। এখানে বিস্তারিত বলিব না। তবে একটি হল-ঘরে নীচে ও ব্যালকনিতে এত জনসমাগম পূর্বে আর কখনও দেখি নাই। লোকের অন্ত ভিড়—কিন্তু টুঁ শব্দটি নাই। রবীন্দ্রনাথ এক ঘণ্টারও উপর অনর্গল বক্তৃতা দিয়া গেলেন। তিনি বক্তা ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার কথা বলার ধরন ধারণে লোকে যেন চমৎকৃত হইয়া যাইত। আমরা ব্যালকনিতে মাঝামাঝি জায়গায় ছিলাম। রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি কথাই স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিলাম। মনে রাখিবেন, তখন কিন্তু মাইকের আবির্ভাব হয় নাই। মেসে ফিরিয়া আসিয়া স্মৃতি হইতে এ বক্তৃতাটিও লিখিলাম। সেদিনকার বক্তৃতার অনুলিপি কোথায়ও প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। আমার লেখাটি অন্যান্য অনেক লেখার মতই কোথায় উবিয়া গিয়াছে। পূজার ছুটির পূর্বে তিন মাস মাত্র কলিকাতায় থাকিয়া এইরকম কলেজের ভিতরে ও বাহিরে কতই না বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে থাকি।

(ক্রমশঃ)

শিক্ষা-নিকেতন

শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য

দেখিতে দেখিতে শিক্ষা-নিকেতনের ক্ষুদ্র জীবনের আর একটা বৎসর কাটিয়া গেল। ১৯৩৫ সালে ইহার প্রথম সূচনা হইলেও ১৯৫৩ সালে বর্তমান রূপে ইহার কার্যারম্ভ হয়। সেই হিসাবে আজ শিক্ষা-নিকেতন তাহার আট বৎসর অতিক্রম করিয়া নবম বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে।

শিক্ষা-নিকেতনের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনাধীনে যে কয়টি শিক্ষা ও সেবা-প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে তাহাদের বিগত বৎসরের কার্যবিবরণ এইখানে সংক্ষেপে দেওয়া হইল।

শিশু-ভবন

এই বৎসরে শিশুভবনে ৪০ জন ছাত্র ছিল। তাহার মধ্যে ১৯টি ছেলে ও ২১টি মেয়ে। ২৫টি তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর, ১৩টি উন্নত শ্রেণীর এবং ২টি মুসলমান। শিশুভবনের সমস্ত ছাত্রকেই জলখাবার দেওয়া হয়—মুড়ি বা চিঁড়া, দুধ, গুড়, তরকারি এবং সম্ভব হইলে কিছু সময়ের-ফল। সরকারের নিকট হইতে যে টাকা পাওয়া যায় তাহাতে এই জলখাবারের খরচ কুলায় না। সেইজন্য গ্রামবাসীদেরও এই বিষয়ে সাহায্য করিতে হয়। এই বৎসরে কেহ মুড়ি, কেহ তরকারি, কেহ ফল এবং কেহ বা নগদ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। মুদীপাড়ার মেয়েরা রান্না করিবার জন্য মুঁটে দিয়েছেন। এই বৎসরে যাঁহারা নিয়মিতভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমহম্মদ ইব্রাহিম ও শ্রীরণজিৎ ভট্টাচার্যের নাম করা যাইতে পারে।

শিশু-ভবনের অধিকাংশ ছাত্রই দরিদ্র। সেইজন্য জলখাবার ছাড়াও তাহাদের কয়েকজনকে দুপুরে খাইতে দিতে হয়। এই বৎসরে প্রতিদিন গড়ে ১৩ জন ছাত্রকে এইভাবে খাইতে দেওয়া হইয়াছে। ইহার জন্য প্রয়োজনীয় চাল গ্রামবাসীরা দিয়াছেন। তরকারি বেশির ভাগই শিশুভবনের বাগানে উৎপন্ন হইয়াছে। সময়ে সময়ে নিম্ন-বুনিয়াদী ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে এবং কখনও কখনও গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কিছু কিছু তরকারি পাওয়া গিয়াছে। অন্যান্য খরচ বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে দান হিসাবে পাওয়া গিয়াছে।

দরিদ্র ছাত্রদের প্রয়োজনীয় জামাকাপড়ও দিতে হয়। এ বৎসর ৩০ জন ছাত্রকে ৬০টি জামা ও প্যান্ট দেওয়া হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে বিশেষ-ভাবে ৩৪৭ টাকা দান সংগৃহীত হইয়াছিল।

এই বয়সে খেলাই ছেলেদের কাজ। তাহা হইলেও ছেলেরা কিছু কিছু কাজের কাজও করিয়া থাকে। শিক্ষকেরা শিশু-ভবনের বাগানে তরিতরকারির চাষ করেন, ছেলেরা তাঁহাদের এই কাজে নিয়মিতভাবে সাহায্য করে। এই বৎসর শিক্ষক ও ছাত্রদের মিলিত চেষ্টায় শিশু-ভবনের বাগানে ১৮।০ আঠার মণ দশ সের তরকারি উৎপন্ন হইয়াছে।

শিশুভবনে দুইজন শিক্ষিকা, একজন গুরুমা, একজন পরিচারিকা ও একজন প্রহরী আছে।

এই বৎসর ১২ জন ছাত্র এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া স্থানীয় প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছে। অনুন্নত শ্রেণীর যেসব ছেলেমেয়ে পূর্বে স্কুলে যাইত না, শিশু-ভবনের শিক্ষার ফলে তাহারা এখন স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

এই বিদ্যালয়টি বিশেষ করিয়া অনুন্নত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্য করা হইয়াছিল। কিন্তু উন্নত শ্রেণীর ছেলেমেয়ে তাহাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া এই বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয়। তাহাদের বাদ দিলে এই বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রই অনুন্নত শ্রেণীর। এই বৎসরে এই বিদ্যালয়ে মোট ১০১ জন ছাত্র ছিল, তাহার মধ্যে ৬৩ জন ছেলে ও ৩৮ জন মেয়ে। ছাত্রদের মধ্যে অনুন্নত শ্রেণীর ৫১ জন, উন্নত শ্রেণীর ৪৪ জন এবং মুসলমান ১ জন। এই বিদ্যালয়েও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য দুপুরে খাইবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। এই বৎসর প্রতিদিন গড়ে ২৭ জন ছাত্র খাইয়াছে এবং তাহার জন্য মোট ১৩৩১ টাকা খরচ হইয়াছে। প্রয়োজনীয় চাল গ্রামবাসীদের নিকট হইতে মুষ্টিভিক্ষার দ্বারা সংগ্রহ করা হইয়াছে। বর্ধমানের সহৃদয় চাউল-ব্যবসায়ী শ্রীরামলাল গুপ্ত এই উদ্দেশ্যে মাসে ১ মণ করিয়া চাউল দিয়াছেন। প্রয়োজনীয় তরিতরকারি ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে নিজেরাই তৈয়ারী করিয়াছে। চাল এবং তরিতরকারি ছাড়া অন্যান্য জিনিস কিনিতে হইয়াছে। কয়েকটি বন্ধুর দানে ইহা সম্ভব হইয়াছে। যাঁহারা এই উদ্দেশ্যে নিয়মিত-ভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীসুশীল কুমার ঘাস ও শ্রীশক্তিপদ মল্লিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দরিদ্র ছাত্রদের জামাকাপড় দেওয়া হইয়াছে। এই জামাকাপড়ের কিছুটা ছাত্রদের কাটা সুতায় তৈয়ারী হইয়াছে এবং কিছুটা কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ বৎসর ৫০ জন ছাত্রকে ৫০টি জামা ও ৫০টি প্যান্ট দেওয়া হয়।

এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদের কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। সুতা কাটা এবং বাগান করাই এখানকার প্রধান কাজ। এ বৎসর অধিকাংশ চরকা খারাপ হইয়া যাওয়ায়, এই বৎসরের কাটা সুতার পরিমাণ মাত্র ৪০ তোলা হইয়াছে। উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ১০৪ মণ।

এই বিদ্যালয়ে ৫জন শিক্ষক, ১ জন ওরসা ও ১ জন প্রহরী আছে। ইহার পরিচালনব্যয় বর্ধমান জেলা স্কুল-বোর্ড দিয়া থাকেন।

আমাদের সংবিধানে প্রাথমিক স্তরের সমস্ত ছেলেমেয়েদের আবশ্যিক শিক্ষার প্রতিশ্রুতি আছে; ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কয়েকটি জেলার কতকগুলি অঞ্চলকে আবশ্যিক-শিক্ষা-অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও সকল ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। ইহার বাধা কোথায় এবং কিভাবে এই বাধা দূর করা যাইতে পারে তাহা ভাবিবার প্রয়োজন হইয়াছে। আমাদের এখানে আমরা এ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা এবং কিছু কাজ করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং আমার মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ইহাই এই বিষয়ে প্রথম চেষ্টা।

স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষার সম্বন্ধে দেশবাসীর আগ্রহ বাড়িয়াছে এবং তাহার ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা হইলেও এখনও অনেক ছেলেমেয়ে স্কুলে আসে না। তাহাদের বাপ মা তাহাদের খাওয়াইতে পারে না, একটু বড় হইতে না হইতে তাহাদের জীবিকার জন্য পরের বাড়ীতে চাকরি করিতে হয়। স্কুলে আসা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এইসব ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে তাহাদের খাইবার ব্যবস্থা আগে করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের ব্যবস্থাও চাই, অসুখে বিসুখে চিকিৎসার ব্যবস্থাও চাই।

যদিও আমরা কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করিতেছি এবং কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের গভর্নমেন্ট হিসাবে সরকারেরই এই সকল ব্যবস্থা করার কথা, তাহা হইলেও আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় সরকারের পক্ষে ইহার সম্পূর্ণ ভার লওয়া সম্ভব

হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, দেশবাসী হিসাবে জনসাধারণেরও তো করণীয় আছে। বিদ্যালয়ও এই বিষয়ে খানিকটা সাহায্য করিতে পারে। আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখিতেছি, সকলে মিলিয়া সমবেতভাবে চেষ্টা করিলে এই সমস্যার সমাধান করা মোটেই শক্ত নয়।

এ বৎসর ১৭ জন ছাত্র এই বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করিয়া উচ্চতর বিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য গিয়াছে। তাহার মধ্যে ১৫ জন উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছে।

উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়

প্রধানতঃ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। তাহা হইলেও কিছু কিছু বাহিরের ছাত্রও এখানে আসিয়া থাকে। এই বৎসর এই বিদ্যালয়ে ৬৯ জন ছাত্র ছিল, তাহার মধ্যে ৬৪ জন ছেলে এবং ৫ জন মেয়ে। এই বিদ্যালয়ে বেতন দিতে হয়। এই বৎসর ১৯ জন ছাত্র অর্ধ বেতনে পড়িয়াছে। এই ১৯ জনের মধ্যে ৫ জনের অর্ধেক বেতন শিক্ষা-নিকেতন হইতে দেওয়া হইয়াছে। তাহার জন্য ১১৫·০২ টাকা খরচ হইয়াছে। ৫ জন ছাত্রীর বেতন সরকারের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে।

প্রচলিত বিদ্যালয়ের স্বল্প সময়ের মধ্যে ছাত্রদের কাজের এবং লেখাপড়ার উপযুক্ত অবসর পাওয়া যায় না বলিয়া কিছুদিন হইতে এই বিদ্যালয়ের কাজের সময় বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ছেলেরা সকালে আসে এবং সন্ধ্যার পূর্বে যায়। দুপুরে স্নানাহারের জন্য দেড় ঘণ্টা ছুটি থাকে। এই সময়ে নিকটবর্তী গ্রামের ছেলেরা বাড়ি গিয়া খাইয়া আসে। দূরবর্তী গ্রামের ছেলেদের পক্ষে বাড়ি যাওয়া সম্ভব হয় না বলিয়া বিদ্যালয়েই তাহাদের খাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। এ ব্যবস্থা ছেলেরাই করিয়া থাকে এবং ইহা তাহাদের শিক্ষার একটা অঙ্গ।

দুপুরের খাওয়ার জন্য ছেলেদের বাড়ি হইতে মাসে ৫ সের করিয়া চাল আনিতে হয়। যাহারা পারে না তাহাদের চাল স্কুল হইতেই দেওয়া হইয়া থাকে। চাল ছাড়া অন্যান্য খরচ ছেলেদের কৃষি ও শিল্পের আয় হইতে নির্বাহ হয়। এই বৎসরে দুপুরের খাবারের জন্য ৬৫০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

সুতা কাটা, কাপড় বোনা এবং জামা প্যান্ট সেলাই করা এই বিদ্যালয়ের একটি কাজ। আমাদের ইচ্ছা ছিল, প্রত্যেক ছাত্রই তাহার নিজের প্রয়োজনীয় জামা প্যান্ট তাহার এই কাজের ভিতর দিয়া করিয়া লইবে। কিন্তু কার্যতঃ তাহা সম্ভব হয় নাই। তবে, ছেলেদের এই কাজের থেকে দরিদ্র ছাত্রদের জামা কাপড়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে। এই বৎসরে ছেলেদের যে জামাকাপড় দেওয়া হইয়াছে তাহার মূল্য ২৩৭ টাকা।

এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা চাষের কাজ ছাড়া কিছু কাঠের কাজও করিয়া থাকে। এই বৎসরে তাহাদের এই সমস্ত কাজ হইতে মোট টাকা আয় হইয়াছে।

এই বিদ্যালয়ে ৬ জন শিক্ষক, ৩ জন শিল্প-শিক্ষক ১ জন সঙ্গীত-শিক্ষক, ১ জন চিত্র-শিক্ষক, ১ জন শুশ্রূষা, ১ জন কেরানী, ২ জন পরিচারক ও ১ জন প্রহরী আছে। সঙ্গীত-শিক্ষক ও চিত্র-শিক্ষক এই বিদ্যালয় ছাড়া শিক্ষা-নিকেতনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই বিদ্যালয়ে একজন চিকিৎসক আছেন, তিনি সমস্ত ছাত্রদেরই স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

এই বৎসরে এই বিদ্যালয় হইতে ১৮ জন ছাত্র এখানকার পড়া শেষ করিয়া অন্য বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছে তাহার মধ্যে ১৪ জন শিক্ষা-নিকেতনের শিল্প-বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছে।

শিক্ষা-বিদ্যালয়

ছেলেরা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। অন্য বিদ্যালয়ের

অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরাও এই বিদ্যালয়ে আসিয়া থাকে। এই বৎসরে এই বিদ্যালয়ে ৫৯ জন ছাত্র ছিল। তাহার মধ্যে ২৭ জন এখানকার উচ্চ ভূমিধারী বিদ্যালয়ের এবং ৩২ জন অন্য বিদ্যালয়ের।

এই বৎসরে এই বিদ্যালয়ে বেতন লওয়া হইয়াছে। ১২ জন দরিদ্র ছাত্র অর্ধবেতনে পড়িয়াছে। বর্তমান বৎসরে এই বিদ্যালয়কে আগামী তিন বৎসরের জন্য অবৈতনিক করা হইয়াছে এবং শতকরা ৫০ জন ছাত্রকে প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে মাসিক ২০ টাকা এবং তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে মাসিক ৩০ টাকা হারে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এতদিন এই বিদ্যালয়ে ১২০ জন ছাত্রের পড়িবার ব্যবস্থা ছিল। সম্প্রতি এখানে ২০০ জন ছাত্র লইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এতদিন এখানে কাঠের কাজ, লোহার কাজ এবং ফিটিং, মেশিন ও ইলেকট্রিকের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা ছিল। এখন ওয়েল্ডিং এবং কোল্ডিং-এর কাজও শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

আমাদের দেশে দক্ষ শ্রমিকের একান্ত অভাব। দেশে কলকারখানার প্রসার বাড়িতেছে এবং সেইজন্য দক্ষ শ্রমিকের অভাবও ক্রমশঃ বেশি হইতেছে। দেশের ছেলেদের উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া এই অভাব দূর করিতে হইবে। একথা যেমন সত্য তেমনই ইহাও সত্য যে আমাদের শিল্পসৃষ্টির কাজ কেবল বড় বড় কয়েকটি কারখানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না, গ্রামে গ্রামে আমাদের এই কাজ ছড়াইয়া দিতে হইবে। ইহার জন্যও উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। প্রচলিত উচ্চ বিদ্যালয়ে এই শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। সেইজন্য আজ দেশের সর্বত্র এই জাতীয় বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছে। ইহারই তাগিদে এই শিল্প-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

এটি প্রথমে দুই শ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল। এখানে দুই বৎসর সাধারণভাবে শিল্প-শিক্ষা লাভ করিয়া ছেলেরা আসানসোলে এক বৎসর একটি বিশেষ শিল্প শিক্ষা করিত। পরে ইহা তিন শ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়াছে এবং এখন এইখানের ছেলেরা যাহাতে তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বৎসরে ৯টি ছেলে এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাহির হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে ৪ জন শিক্ষানবিশ হিসাবে দুইটি কারখানায় কাজ করিতেছে।

এই বৎসরে এই বিদ্যালয়ে ৬ জন শিক্ষক, ৫ জন শিল্প-শিক্ষক, ৩ জন কেরানি, ৩ জন পরিচারক এবং ১ জন প্রহরী ছিল।

শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়

শিক্ষা-নিকেতনের তত্ত্বাবধানে একটি নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। এই মহাবিদ্যালয়ে বর্তমানে ৬০ জন শিক্ষার্থী লইবার ব্যবস্থা আছে। এই বৎসর এখানে ৫৮ জন শিক্ষার্থী ছিল। সম্প্রতি এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া এখানে ১২০ জন শিক্ষার্থী লইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

এই মহাবিদ্যালয়ে এই বৎসর ৪ জন অধ্যাপক, ১ জন শিল্প-শিক্ষক, ৫ জন পরিচারক ও ১ জন প্রহরী ছিল।

এই মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষা দিবার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সেইজন্য শিক্ষার্থীদের নিজেদেরও কাজ করিতে হয়। এই বৎসরে শিক্ষার্থীরা তাহাদের কৃষিক্ষেত্রে ৩৮০ মণ ধান ও ২৬৷ মণ শুরুকারি উৎপন্ন করিয়াছে এবং ৩৯ সের সুতা কাটিয়াছে।

শুরুষা-শিক্ষণ-কেন্দ্র

গত ১৯৫৭ সাল হইতে শিক্ষা-নিকেতনে একটি শুরুষা-শিক্ষণ-কেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে এবং

গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ১৯৮ জন শুরুমা এখানে শিক্ষা লাভ করিয়াছে। শিক্ষা সমাপ্তির পর ইহাদের প্রায় সকলেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এবং প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে কাজে নিযুক্ত হইয়াছে।

শুরুমা-শিক্ষণ-কেন্দ্রের শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশি হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আগ্রহাতিশয্যে শিক্ষা-নিকেতনকে আর একটি কেন্দ্রের ভার লইতে হইয়াছে। শিক্ষা-নিকেতনে স্থানাভাবের জন্য হুগলী জেলায় হরিপালে স্বর্গীয় আশুতোষ দাস প্রতিষ্ঠিত কল্যাণ-সংঘ-প্রাঙ্গণে এই দ্বিতীয় কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে এবং এতদুদ্দেশ্যে সেখানে গৃহনির্মাণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে হুগলী জেলা বোর্ডের অনুগ্রহে তাঁহাদের হরিপালস্থ পুরাতন দাতব্য চিকিৎসালয় ভবনে এই কেন্দ্রের কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

এই বৎসরে দুইটি শিক্ষণ-কেন্দ্র হইতে ৭৭ জন শিক্ষার্থী তাহাদের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

প্রত্যেকটি কেন্দ্রে ২ জন শিক্ষিকা ও ১ জন প্রহরী আছে।

সমাজ-শিক্ষা-কেন্দ্র

নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষার জন্য শিক্ষা-নিকেতনের তত্ত্বাবধানে তিনটি শিক্ষা-কেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে। দুইটি পুরুষদের জন্য এবং একটি মেয়েদের জন্য। এই বৎসর পুরুষ শিক্ষা-কেন্দ্র দুইটিতে ৬০ জন এবং মহিলা কেন্দ্রটিতে ১৭ জন শিক্ষার্থী ছিল। প্রত্যেক কেন্দ্রে ২ জন করিয়া শিক্ষক আছেন।

এই কেন্দ্রগুলিতে যাহারা লেখাপড়া শিখিতে চায় তাহাদের লেখাপড়া শেখানো ছাড়াও সমাগত শিক্ষার্থীদের আলাপ আলোচনা ও পাঠের ভিতর দিয়া সাধারণ সামাজিক জ্ঞান দিবার চেষ্টা করা হয়। মহিলা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের গৃহস্থালীর জন্য প্রয়োজনীয় কিছু কিছু হাতের কাজও শেখানো হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, সামাজিক শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে শিক্ষার্থীদের লইয়া কিছু কিছু সমাজ-সেবার কাজ করা হয় এবং গ্রামের উৎসব ও আনন্দানুষ্ঠানে সাহায্য করা হয়। সমাজ-শিক্ষা-কেন্দ্রের গ্রন্থাগার হইতে নব-শিক্ষিত বয়স্কদের পড়িবার জন্য বই দিবার ব্যবস্থা আছে।

সমাজ-সেবা-কেন্দ্র

সমাজ-সেবা-কেন্দ্রে খেলাধূলা, আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা এবং গ্রামের রাস্তাঘাট মেরামত করা ও গ্রামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা থাকিলেও, আমাদের এখানে গ্রামবাসীদের অসুখে-বিসুখে শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজ-সেবা-কেন্দ্রে দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেওয়া হয়, কলেরা বসন্তে লোককে চেষ্টা করিয়া ইনজেকশন ও টিকা দেওয়ানো হয় এবং দুরারোগ্য রোগীদের হাসপাতালে পাঠাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। রেডক্রশ এবং ইউনিসেফের সাহায্যে শিশু ও রোগীদের দুধ দেওয়া হয়। এই বৎসরে ৬০৫০ জন রোগীকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এবং ১৭ জন শিশু, ১ জন বৃদ্ধ ও ২ জন রোগীকে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে দুধ দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থাগার মণ্ডল

শিক্ষা-নিকেতন আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের সহিত যুক্ত ৮টি গ্রামে ৮টি শাখা গ্রন্থাগার আছে। ইহা ছাড়া শিক্ষা-নিকেতনের ৪টি বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার হইতে বই দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বৎসরে ৪৬ বার বই দেওয়া-নেওয়া হইয়াছে এবং এইভাবে ব্যবহৃত বইয়ের সংখ্যা ১৬১৮। আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে বসিয়া এই বৎসরে যাহারা পড়িয়াছে তাহাদের সংখ্যা ৪১৫৯।

বাণীচিত্র-প্রচার-বিভাগ

এই বিভাগের বাণীচিত্র সহযোগে গ্রামে গ্রামে শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা আছে। এ বৎসরে ভায়নামো এবং প্রজেক্টর খারাপ হইয়া যাওয়ায় অনেক দিন কাজ বন্ধ ছিল। সেইজন্য প্রচারের ব্যবস্থা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। মোট ৬৪ টি গ্রামে এই বৎসরে ছবি দেখানো হইয়াছে এবং আনুমানিক ২৭৭৫০ জন লোক ছবি দেখিয়াছে।

শিক্ষা-সম্প্রসারণ-বিভাগ

যাহারা স্কুল কলেজের বাহিরে থাকিয়াও পড়াশোনা করিতে চায়, এই বিভাগে প্রধানতঃ তাহাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। যাহারা বাড়িতে পড়াশোনা করিতে চায় তাহাদের উৎসাহ দিয়া বিশ্বভারতীর লোক শিক্ষাসংসদের পরীক্ষা দেওয়ানো হয়। এই বৎসরে মোট ৪ জন বিভিন্ন পরীক্ষা দিয়াছে।

মাতৃ ও শিশু-কল্যাণ-কেন্দ্র

সমাজ-কল্যাণ-পর্ষদের সহায়তায় শিক্ষা-নিকেতনে মায়েদের এবং শিশুদের চিকিৎসার জন্য একটি চিকিৎসা-কেন্দ্র পরিচালনা করা হইয়া থাকে। এই বৎসর এই কেন্দ্রে মোট ৯৯ জন মা এবং ৩০৫২ জন শিশুর চিকিৎসা করা হইয়াছে।

চক্ষু-চিকিৎসা কেন্দ্র

আশুতোষ চক্ষু-চিকিৎসা-সমিতির সহায়তায় গত কয়েক বৎসর শিক্ষা-নিকেতনে দরিদ্র ছানি-রোগীদের ছানি কাটার ব্যবস্থা করা হইতেছে। হরিপালের সেবাব্রতী ডাক্তার স্বর্গীয় আশুতোষ দাস ইহার প্রবর্তন করেন এবং তাঁহার পরলোক-গমনের পর তাঁহার অন্যতম সহকর্মী শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় তাঁহার নাম অনুসারে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া এই কাজ চালাইয়া যাইতেছেন। কলিকাতার নামজাদা চক্ষু-চিকিৎসক শ্রীঅনাদিচরণ ভট্টাচার্য সমস্ত রোগীদের ছানি কাটার এবং হরিপালের শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক রোগীদের পরিচর্যার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই বৎসর এই কেন্দ্রে ৩৮টি রোগীর ছানি কাটা হইয়াছে এবং তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন।

আশুতোষ-চক্ষু-চিকিৎসা-সমিতি প্রধানতঃ এই কেন্দ্রের পরিচালন ব্যয় বহন করিলেও শিক্ষা-নিকেতনকেও ইহার জন্য কিছু খরচ করিতে হয়। সে টাকা বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। এই বৎসরে এই উদ্দেশ্যে ৮৬৬·৮১ টাকা পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে ৫১৬·৭৬ টাকা খরচ হইয়াছে এবং ২৫০ টাকা আশুতোষ চক্ষু-চিকিৎসা-সমিতির তহবিলে দান করা হইয়াছে।

শিক্ষা-নিকেতনের অগণিত শুভানুধ্যায়ীর শুভেচ্ছা ও সমস্ত বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে শিক্ষা-নিকেতনের পক্ষে তাহার এই সামান্য সেবার কাজ হইয়াছে। আজিকার শুভদিনে আমরা শিক্ষা-নিকেতনের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাদের সকলকে স্মরণ করিতেছি।

---

*শিক্ষা নিকেতনের বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত সম্পাদকীয় বিবরণী।

ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকের ডায়েরী (৫)

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

ডেনমার্ক

ভূমিকা : ১৯৫৩ সালে তৃতীয়বার ডেনমার্কে Unoএর ফেলোরূপে অবস্থানকালে এই ডায়েরী লেখা হইয়াছিল, কিন্তু পূর্বে ১৯৩৪ সালে ডেনমার্কের এসপেরান্তো ফেডারেশনের আমন্ত্রণে প্রথম সেদেশে যাই। এসপেরান্তে ফেডারেশনের পক্ষ হইতে শ্রীহলগের হানসেন (Mr. Holger Hansen) সমগ্র দেশে আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমার তখনকার বক্তৃতার বিষয় ছিল "রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন" এবং "মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা"। তখন দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন চলিতেছিল। বক্তৃতার প্রসঙ্গে অনেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেন, আমিও যথাসাধ্য উত্তর দিতাম। বস্তুতঃ শান্তিকামী ডেনিশেরা মহাত্মার অহিংস রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিবিধি মনোযোগের সঙ্গে অনুসরণ করিতেন। একটি কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার। ডেনমার্কের মত ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে ইউরোপীয় বৃহত্তর শক্তির দ্বন্দ্বে যোগদান করা অর্থহীন, তখন এই রূপ একটা বোধ ডেনিশদের মনে জাগিয়াছিল এবং সেজন্য দেশের সামরিক ব্যবস্থাও অপ্রয়োজন, এরূপ মত সেদেশে অনেকে পোষণ করিতেন—বিশেষতঃ তখনকার দিনের সোশিয়্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টির সভ্যগণ। প্রধান শহর কোপেনহাগেনে তখন মিস নোল (Miss Noll) নাম্নী একজন বৃদ্ধা এসপেরান্তো ভাষাভাষীর আমার সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তিনি ও তাঁহার পরিবারের সকলেই নিরামিষ ভোজী ছিলেন। মিস নোলের বয়স তখন ৬৫ এবং তাঁর মাতা ৯৫ বৎসর বয়স্কা ছিলেন। এ পরিবারের সকলেই ভারতীয় চিন্তাধারার অনুরাগী ছিলেন। মিস নোল একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানরা ডেনমার্ক অধিকার না করার ভুল পরে বুঝিয়াছিল, ডেনমার্ক অধিকার করিলে যুদ্ধের সময় খাদ্যরসদের অভাব হইত না এবং তিনি এই আশঙ্কা তখন প্রকাশ করিয়াছিলেন যে দ্বিতীয়বার মহাসমর বাধিলে জার্মানরা আর এই ভুল করিবে না অর্থাৎ ডেনমার্কও দখল করিবে। তাঁহার এই আশঙ্কা পরে সত্যঘটনায় পরিণত হইয়াছিল। জার্মান 'অকুপেশন'-এর ফলে ডেনমার্ক খুব ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং যুদ্ধোত্তর কালে আতলান্তিক প্যাক্টে যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছে। প্যাক্টে যোগদানের ফলে দেশের প্রচুর অর্থও আত্মরক্ষার জন্য খরচ হইয়াছে—যাহার ফলে দেশের শিক্ষা ও সমাজগঠনের কাজও কতকটা ব্যাহত হইতেছে। জার্মান অকুপেশন'-এর ক্ষত এখনও সম্পূর্ণ শুকাইয়া যায় নাই।

ডেনমার্কের সকল অঞ্চলের বাসেতীয় দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় যাহাতে আমি প্রত্যক্ষ করিতে পারি, সেই কথা মনে রাখিয়াই হলগের হানসেন আমার ভ্রমণসূচী রচনা করিয়াছিলেন, ডেনমার্কের কৃষিবিদ্, শিক্ষাবিদ্ ও সমাজসেবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগস্থাপনের ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ডেনমার্ক দেশটিকে ভিতর হইতে জানাই ছিল আমারও মুখ্য উদ্দেশ্য—আর বক্তৃতা ছিল সেই উদ্দেশ্য পূরণের অবলম্বন। ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর হইতে পরবর্তী বৎসরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শান্তিপ্রিয় শিক্ষায় উন্নত দেশটি ঘুরিয়া দেখিয়াছিলাম। বহুলোকের সঙ্গে তখন পরিচয় হইয়াছে। সে সময়ে আমাকে বড় একটা হোটেলে থাকিতে হইত না। এসপেরান্তো ভাষাভাষীরা আমাকে অতিথিরূপে

নিজ নিজ গৃহে আমন্ত্রণ করিতেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ দেখার পর ডেনমার্ক এবং পরে হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডে এসপেরান্তো ভাষাভাষীদের সংস্পর্শে আসিয়া আমি অনুভব করিয়াছিলাম যে এই আন্তর্জাতিক ভাষার মাধ্যমে একটি উদার বিশ্বমানব সমাজ অলক্ষ্যে পৃথিবীতে গড়িয়া উঠিতেছে এবং শিবিরোধী আন্তর্জাতিক ভাষার মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্যও রূপ লইয়াছে, বিভিন্ন জাতির একটি মিলনভূমি তৈরী হইয়াছে।

তখন আমি অনুমানও করিতে পারি নাই যে নবজাগ্রত প্রাচ্যদেশেও ভাষার বিভ্রাট দেখা দিবে। এই ডায়েরী যখন লিখি তখনও মনে হয় নাই যে সিংহলে ভাষার দ্বন্দ্ব প্রকট হইয়া উঠিবে, অহিংসা আন্দোলনের মাধ্যমে লব্ধ ভারতের স্বাধীনতা ও ঐক্য ভাষার কণ্টকে শঙ্কাকুল হইবে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভাষা-বিভ্রাট আজ আমরা নিজেদের দেশে যেরূপ দেখিতেছি, সেরূপ এক অবস্থা ইউরোপেরও বিভিন্ন দেশে দেখা দিয়াছিল। ডক্টর জামেনহফ নিজের আত্মজীবনীতে তাঁহার জন্মস্থান বিয়ালিস্টক শহরের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে আন্তঃকলহের যে ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন, সেই ছবির সঙ্গে আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতির অদ্ভুত সাযুজ্য আছে। বালক জামেনহফ ভাষার দ্বন্দ্বে নিষ্পাপ মানুষের দুর্দশা দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে হৃদয়ের যোগ স্থাপন করিতে হইলে এমন একটি ভাষা চাই—যাহা কাহারও মাতৃভাষা নহে, যে ভাষা কাহারও মাতৃভাষার গৌরবকে খর্ব করিবে না। মনীষী টলস্টয় এই ভাষা আয়ত্ত করিয়া ডক্টর জামেনহফকে আশীর্বাণী পাঠাইয়াছিলেন এবং জাতিনিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ভাষা এসপেরান্তো পরভাষার পেষণ হইতে সকলের মাতৃভাষার গৌরব ও দাবীকে রক্ষা করিবে, এই আশা জানাইয়াছিলেন। ১৯০৯ জামেনহফ শতবার্ষিকী উৎসব পৃথিবীর সকল দেশেই পালিত হইয়াছে, ইউনেস্কো (Unesco) জামেনহফকে মহামানব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ এসপেরান্তো আমার নিকট বিদেশের সমাজের অন্তর্দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল।

• • •

ডেনমার্কের ভৌগোলিক বিবরণ, জনসংখ্যা ও অন্যান্য অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্য

স্কানডেনাভীয় দেশসমূহের মধ্যে একমাত্র ডেনমার্কের অংশবিশেষ মূল ইউরোপীয় ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। উত্তর দেশসমূহের ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতির আপাতদৃষ্টিতে সাদৃশ্য যতখানি বাহির হইতে চোখে পড়ে, ঠিক ততখানি পার্থক্যও বিদ্যমান; কিন্তু তাহা সমাজজীবনে অন্তরঙ্গ ভাবে প্রবেশ করিলেই জানা যায়। ভৌগোলিক পার্থক্য ইহার এক কারণ। ডেনমার্ক দেশটি ৪৯৩টি দ্বীপের সমষ্টি। মাত্র শত এক দ্বীপে লোকবসতি আছে, অন্যগুলি জনমানবহীন। ডেনমার্কের একমাত্র জুট-ল্যাণ্ড (Gutland) নামক পেনিনসুলা মূল ইউরোপীয় ভূখণ্ডের সহিত স্থলভাগে যুক্ত, এবং এই পথেই প্রধান ইউরোপীয় দেশসমূহের প্রভাব ডেনমার্কে সহজে প্রবেশ করে।

প্রধান শহর কোপেনহাগেনকে Paris of the North বলে। আর দেশের জনসংখ্যার তুলনায় প্রধান শহরটিও বেশ বড়। ডেনমার্কের বৃহত্তম ও উল্লেখযোগ্য দ্বীপগুলির নাম ও আয়তন এইরূপ :—

সেলাণ্ড (Sjaelland)	আয়তন	২, ৭০৯ বর্গ মাইল
ফুয়েন অথবা ফ্যান (Fonnen)	,,	১, ১৪৯ ,, ,,
লোল্যাণ্ড (Lolland)	,,	৪৭০ ,, ,,
ফালস্টার (Falster)	,,	১৯৮ ,, ,,

উত্তর ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে ডেনমার্ক আয়তনে ক্ষুদ্রতম। সামগ্রিক আয়তন ১৭,১১৬ বর্গমাইল। ১৯৫০ সালের গণনানুযায়ী লোকসংখ্যা ৪২,৮১,২৭৪ জন। ফেরোদ্বীপ ও গ্রীণল্যাণ্ড

ডেনমার্কের অন্তর্গত হইলেও এই হিসাবে গণনা করা হয় নাই।

প্রধান নগর কোপেনহাগেন সেল্যাণ্ডে অবস্থিত; সেজন্ত সেল্যাণ্ডের লোকবসতি সর্বাপেক্ষা ঘন অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে ৮৪২·৩। জুটল্যাণ্ডে লোকবসতি সর্বাপেক্ষা কম অর্থাৎ প্রতি বর্গ মাইলে মাত্র ৬১·৮। দেশের সমগ্র অধিবাসীর শতকরা ২৬·৬ জন প্রধান নগর কোপেনহাগেনের অধিবাসী; শতকরা ৩৮·৬ জন প্রাদেশিক শহরগুলির বাসিন্দা আর শতকরা ৩৪·৮ জন পল্লীর অধিবাসী।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ডেনমার্ক কৃষিপ্রধান দেশ। ডেনমার্কের ভূমি ও আবহ কৃষির অনুকূল। কৃষিজীবিদের অধিকাংশই ক্ষেতখামারের মালিক। ভাগের চাষ ডেনমার্কে নাই বলিলেই হয়।

গোপালককে ডেনিশ কৃষিজীবিদের মধ্যমণি বলা হয়। দেশের কৃষকজীবন অতি সুসংবদ্ধ। ছোট মধ্যম ও বড় আকারের ক্ষেতখামারের মালিকদের পৃথক পৃথক সংস্থা আছে এবং এই সংস্থাগুলিই দেশের কৃষকদের আর্থিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। কৃষকদের গার্হস্থ্য দুগ্ধদান ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্ত experimental স্টেশন আছে। দেশের কৃষিজীবিরা নিজেদের কাজে বিশেষ মনোযোগী এবং একাগ্রমনে কৃষি ও গো-পালনের কাজ করে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে কৃষকমাত্রই কৃষিবিদ্যালয়ে (কৃষিবিদ্যালয় দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে) অথবা বৃহৎ কার্যে কৃষিশিক্ষা গ্রহণ করে, অনেকে একাধিকবার কৃষি বিদ্যালয়ে যায়,—উদ্দেশ্য নিজের কার্যের উন্নতি বিধান। নিজেদের খামারের উন্নতি-কল্পে কৃষকদের এই চেতনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষও কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু কৃষকদিগকে আধুনিক উন্নত কৃষকে পরিণত করার জন্ত যে-শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন তাহা ভারতবর্ষে আছে কি? আর যাহারা কৃষকদের উন্নতির জন্ত সরকারী ভাবে কাজ করেন, তাঁহারাও নিজেদের ক্ষেতখামার পরিচালনা করেন না, তাঁহাদের অধিকাংশের শিক্ষা পুথিগত শিক্ষা, আদর্শ কৃষকের জীবনও তাঁহাদের কাম্য বলিয়া মনে হয় না।

ডেনমার্কে কমবেশী ২০৫,০০০ খামার আছে। তন্মধ্যে ১০,০০০ খামার কৃষকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। মধ্যমাকারের কৃষিক্ষেত্রের মালিকের সাধারণতঃ একজন বা একাধিক সাহায্যকারী থাকে। কিন্তু ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী (ক্ষুদ্রাবতন খামারের সংখ্যা ১১০,০০০) স্ত্রীর সহায়তায় চাষবাসের কাজ চালাইয়া থাকেন। তাছাড়া প্রায় দুই বড় বড় কার্ম আছে এবং সেইগুলিতে বহু মজুর খাটিয়া থাকে।

সমগ্র চাষভূমির আয়তন ১৯৪৮ সালে ৪,১১৯,০০০ একর ছিল। এই ভূমির মধ্যে ২,০৭৫,০০০ একর ভূমিতে শস্তের চাষ হইত, ১৭৩,০০০ একর ভূমিতে root crop হইত এবং ২,০৭২ ০০০ একর ভূমিতে গবাদির খাদ্যের জন্ত চাষ হইত। সেই বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে ৩,৮০০,০০০ টন শস্ত উৎপন্ন হইয়াছিল। উৎপন্ন root crop এর পরিমাণ ছিল ২৩,১০০ টন, এবং উৎপন্ন গবাদির খাদ্য ছিল ৭৮৭,০০০ টন। একই বৎসরে দুধ ৪০০,০০০ টন, মাংস ১১৬,০০০ টন, মাখন ১৭৮,০০০ টন এবং পনির ৪৬,০০০ টন পাওয়া গিয়াছিল। পরবর্তী বৎসরে ঐ সকল দ্রব্যের উৎপন্ন হার শতকরা ২০ হইতে ৪০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

গৃহপালিত পশুর সংখ্যাও আনিয়ার মত। ১৯৪৮ সালে ডেনমার্কে গরুর সংখ্যা ছিল ২,৮০০,০০০; শূকরের সংখ্যা ছিল ২,৪০০,০০০ আর ঘোড়ার সংখ্যা ছিল ৩৬৪। গৃহপালিত পাখীর (বিশেষতঃ মুরগীর) সংখ্যা ছিল ২১,৮০০,০০০। পরবর্তী বৎসরে ঘোড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই, কিন্তু অন্যান্য সকল পশুপক্ষীর সংখ্যাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল।

পুস্তক-পরিচয়

[শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন]

ছোটদের মহাভারত। শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। ওরিয়েন্ট লংম্যান্‌স্ প্রাইভেট লিমিটেড। দাম দুই টাকা। ১৯৬১

ছেলেমেয়েদের জন্য মহাভারত ও রামায়ণ বাংলা ভাষায় নাই, একথা বলা চলে না। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের লেখা বই তো সকলেই কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ করি। তথাপি আরও লেখার, নূতন করিয়া লেখার প্রয়োজন আছে, স্বীকার করি।

এই বইখানি একজন চিত্রশিল্পীর লেখা; ইহাই বিশেষত্ব। পূর্ণবাবু পৌরাণিক চিত্র খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, চিত্রগুলি আবার বিবিধ বর্ণে উজ্জ্বল। সাধারণত এই শ্রেণীর বইয়ে লেখাটাই প্রধান, ছবিগুলি অপ্রধান, টীকা বা ভাষ্য। এখানে ছবিগুলি প্রধান, লেখা তাহার ব্যাখ্যা, অর্থাৎ চিত্রশিল্পীর বই যেমন হওয়া উচিত। কিন্তু লেখকের লেখা অংশেও প্রসাদ গুণ আছে এবং ভাষার বাঁধুনি ভাল। বই খুলিলেই যদিও 'শ্রীমদ্ভাগবৎ' কথাটা চোখে পড়ে, তবু মুদ্রাকরপ্রমাদ খুব কমই আছে, নাই বলিলেই চলে।

ছোটদের জন্য যখন বই, তখন পর্বাদির নামগুলিও সংক্ষিপ্তভাবে একটু ব্যাখ্যা করিয়া দিলে ভাল হইত। অনুশাসন পর্ব, সৌপ্তিক পর্ব—এরূপ নামের কিছুটা ব্যাখ্যা শুধু ছোটদের জন্য নয়, বড়দের জন্যও দরকার বৈকি।

'ছোটদের' সমাজে এই পুস্তকের সমাদর হইবে অবশ্যই আশা করা যায়।

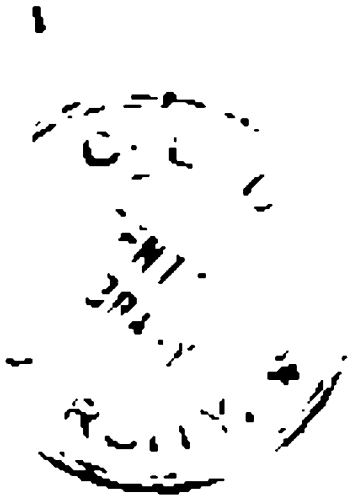

শিক্ষা

স হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৯শ বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৬৮ | ৮ম সংখ্যা

আলোচনা

স্মরণে

আমাদের পূর্ব সংখ্যায় একটি ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ সেনের পরলোক-গমনের কথা আমাদের শিক্ষায় উল্লেখ করা হয় নাই। তাঁহার অতর্কিত মৃত্যুর সংবাদে আমরা সকলেই ব্যথা অনুভব করিয়াছিলাম। তাঁহার নিজস্ব বিষয়ে যেমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনি তাঁহার হৃদয়ে ছিল ছাত্রদের জন্য প্রচুর ভালবাসা। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, খোঁচা দিবার সুযোগ পাইলে অবশ্য ছাড়িতেন না। কিন্তু তাঁহার খোঁচার মধ্যেও থাকিত সহানুভূতির হাসি। রোগে ভুগিতে হয় নাই, সহসা চলিয়া গেলেন। শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে স্মরণ করি।

আরও একজনের কথা স্মরণ করি—রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের পরিচালক শুধু ছিলেন না, শিক্ষার নির্দেশে শিক্ষাদানের ভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিল্পের দিকে ঝোঁক ছিল, কৃষিবিজ্ঞান ও শিল্পে তাঁহার অধিকার ছিল। শ্রীনিকেতনে শিল্পোৎপন্ন হয়—তাহাতে তিনি কয়েক বৎসর পূর্বে যে মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহা 'শিক্ষায়' প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহারও অতর্কিতে ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণে সকলেই নিরতিশয় ব্যথিত, বিশেষত গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকীর মধ্যেই তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার শক্তি যতটা কার্যকরী হইতে পারিত, ততটা হয় নাই—ইহা বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই

এ বৎসর কলেজে ছাত্রভর্তির সমস্যা বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে। 'পরীক্ষায় পাস করিয়াছি, পড়িবার সুযোগ পাইব না কেন?' এ প্রশ্ন খুবই সমীচীন। কর্তৃপক্ষ যদি শিক্ষার ব্যবস্থা না করিতে পারেন তবে এতগুলি ছেলেমেয়ে, যাহাদের জিজ্ঞাসা অতৃপ্ত, অথচ শক্তিসামর্থ্য আছে, তাহারা করিবে কি? মফঃস্বলের ছেলেরা নিজ নিজ মেসায় পড়িবে, কলিকাতার ছেলেরা কলিকাতায় পড়িবে, একথা বলিলে চলিবে না। শিক্ষার ধারার বদল হইয়াছে, বিজ্ঞানের দিকে

ঝোঁক পড়িয়াছে, সুতরাং সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। কলেজে ভিড় হইবে না? ঠিকই তো, তবে আরও কলেজ খুলিতে হইবে, শিক্ষাদানের মান কমিয়া না যায়, তাহা করিতে হইবে। জনসেবকে উদ্ধৃত কলিকাতা ও তাহার আশেপাশের কয়েকটি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সংখ্যা হইতে দেখা যাইতেছে, স্থান এখনও শূন্য আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ বিষয়ে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন, তিনি যথাসাধ্য এই সমস্যা নিরাকরণে চেষ্টিত আছেন। দেখিতেছি, সিটি কলেজেও কর্তৃপক্ষ সাধ্যমত ব্যবস্থা করিতেছেন।

বয়স্ক শিক্ষা

সম্প্রতি নূতন দিল্লীতে বিশ্বশিক্ষা সম্মিলনী হইতেছে। তাহারই এক শাখার উদ্বোধন করিতে গিয়া ডক্টর শ্রীমালী বলিয়াছেন, বয়স্কশিক্ষা আজকাল গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে—তাহার ব্যাপক ও গভীর প্রসার লক্ষণীয়। আমরা বয়স্ক-শিক্ষা বলিতে এ পর্যন্ত যাহা বুঝিয়াছি, এখন তাহা চলিবে না। বহুলপরিমাণে অক্ষর শিক্ষা ও কিছু পড়িতে ও লিখিতে শেখানই মনে করিয়াছি বয়স্কশিক্ষা, এখন দেখা যাইতেছে নানা সমস্যা জগতে দেখা দিয়াছে এবং সেই সকল সমস্যা জানা ও তাহাদের সমাধান করাও বয়স্কশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে লোকের দায়িত্ব আসিতেছে, আবার দায়িত্বের সঙ্গেও শিক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

এব্রাহাম লিঙ্কনের সময়ে যখন নিগ্রোদের দাসত্বপ্রথা আইন করিয়া দেওয়া হয়, তখন হইতে শিক্ষা আমেরিকান স্বাধীন সমাজে হইতেছে স্বাধীনতার অস্ত্র—শুধু অর্জনের জন্য নয়, সংরক্ষণের জন্যও বটে। আমাদের সমাজেও নিত্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নূতন চাহিদা আসিতেছে। বিজ্ঞান শিক্ষা আমাদের বয়স্কদের সকলের জন্যই বড় প্রয়োজন, তেমনি আফ্রিকার নবলব্ধ স্বাধীনতা পাইয়া বহুজাতির সংসারে যে মহাজাতি গড়িয়া উঠিতেছে, সংবাদপত্রে তাহার প্রগতি বুঝিতে পেলেও যে ইতিহাস ভূগোল ও নৃতত্ত্ব নূতন করিয়া সকলের জানিতে হইবে এবং বুঝিতে হইবে বিভিন্ন মহাদেশের মানবপ্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ। এই পরিপ্রেক্ষিতে না দেখিলে সবই অযথার্থ হইবে।

রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষা (৩)

সঙ্কলিত

শ্রীঅনাথনাথ বসু

(পূর্বানুবৃত্তি)

শিক্ষা করিবার একটা বয়স আছে, সেটা বাল্যকাল। এই সময়টাতে আমাদের শরীর মনের পরিণতি সাধনের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের বাধাহীন যোগ থাকা চাই। সেই সময়টা ঢাকা-ঢাকির সময় নয়, তখন সত্যতা একেবারেই অনাবশ্যক। • • যেমন করিয়াই হউক সত্যতার সঙ্গে একটা রফা দরকার। অন্তত একটা বয়স পর্যন্ত সত্যতার এলেকাকে সীমাবদ্ধ করা চাই। আমি খুব কম করিয়া বলিতেছি সাত বছর। সে পর্যন্ত শিশুর সভ্যতার কাজ নাই, সভ্যতার কাজ নাই। সে পর্যন্ত বর্বরতার যে অত্যাবশ্যক শিক্ষা তাহা প্রকৃতির হাতে সম্পন্ন হইতে দিতে হইবে। • • এই প্রাকৃতিক শিক্ষা যে কেবল ছেলেদের তাহা নহে, ইহাতে আমাদেরও উপকার আছে। আমরা নিজের হাতের কাজে সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়া সেইটেতেই আমাদের অভ্যাসকে এমন বিকৃত করিয়া ফেলি যে স্বাভাবিককে আর কোন মতেই সহজ দৃষ্টিতে দেখিতে পারিনা। • মানুষের সভ্যতা কৃত্রিমের সহায়তা লইতে বাধ্য, সেইজন্য এই কৃত্রিম যাহাতে অভ্যাসদোষে আমাদের কর্তা হইয়া না ওঠে যাহাতে আমরা নিজের গড়া সামগ্রীর চেয়ে সর্বদাই উপরে মাথা তুলিয়া থাকিতে পারি এদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার। • • •

ভারতবাসীর খালি গা কিছুমাত্র লজ্জার নহে ; যে সভ্য ব্যক্তির চোখে ইহা অসহ্য সে আপনার চোখের মাথা খাইয়া বসিয়াছে।

• • • •

শরীর সম্বন্ধে কাপড় জুতা মোজা যেমন আমাদের মন সম্বন্ধে বই জিনিসটা ঠিক তেমনি হইয়া উঠিয়াছে। বইপড়াটা যে শিক্ষার একটা সুবিধাজনক সহায়মাত্র তাহা আর আমাদের মনে হয় না, আমরা বইপড়াটাকেই শিক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ঠিক করিয়া বসিয়া আছি। মাস্টার বই হাতে করিয়া শিশুকাল হইতেই আমাদিগকে বই মুখস্থ করাইতে থাকেন। কিন্তু বইয়ের ভিতর হইতে জ্ঞান সঞ্চয় করা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম নহে। প্রত্যক্ষ জিনিসটাকে দেখিয়া শুনিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া সঙ্গে সঙ্গেই অতি সহজেই আমাদের মনশ্চক্তির চর্চা হওয়া স্বভাবের বিধান ছিল। অন্যের অভিজ্ঞাত ও পরীক্ষিত জ্ঞান, তাও লোকের মুখে শুনিলে তবে আমাদের মন সহজে সাড়া দেয়। কারণ মুখের কথা তো শুধু কথা নহে, তাহা মুখের কথা ; তাহার সঙ্গে প্রাণ আছে। চোখমুখের ভঙ্গী, কণ্ঠের স্বরলীলা, হাতের ইঙ্গিত—ইহার দ্বারা কানে শুনিবার ভাষা, সঙ্গীত ও আকার লাভ করিয়া চোখকান দুয়েরই সামগ্রী হইয়া ওঠে। শুধু তাই নয়, আমরা যদি জানি, মানুষ তাহার মনের সামগ্রী সমস্ত মন হইতে আমাদিগকে দিতেছে, সে একটা বই পড়িবামাত্র দিতেছে না, তাহা হইলে মনের সঙ্গে মনের প্রত্যক্ষ সম্মিলনে জ্ঞানের মধ্যে রসের সঞ্চার হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মাস্টারদের বই পড়াইবার একটা একটা উপলক্ষ্যমাত্র। আমরাও বই পড়িবার একটি উপসর্গ। ইহাতে ফল হইয়াছে এই, আমাদের শরীর যেমন কৃত্রিম আড়ালে পড়িয়া পৃথিবীর সঙ্গে গায়ে গায়ে যোগটা হারাইয়াছে এবং হারাইয়া এমন অত্যন্ত

হইয়াছে যে সে যোগটাকে আজ ক্লেশকর দুঃসাধ্য বলিয়া মনে করে, তেমনি আমাদের মন এবং বাহিরের মাঝখানে বই আসিয়া পড়াতে আমাদের মন জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের স্বাদশক্তি অনেকটা হারাইয়া ফেলিয়াছে। • • •

জগৎকে আমরা মন দিয়া ছুঁই না, বই দিয়া ছুঁই।

• • • •

এইরূপে বই পড়ার আবরণে মন শিশুকাল হইতে আপাদমস্তক আবৃত হওয়াতে আমরা মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করার শক্তি হারাইতেছি।• • আমরা বইয়ের লোককে চিনি, পৃথিবীর লোককে চিনি না। • • যখন আমরা বড়ো কথা, বইয়ের কথা লইয়া আলোচনা করিতে পারি, কিন্তু সহজ আলাপে, সামান্য কথা আমাদের মুখ দিয়া ঠিকমতো বাহির হইতে চায় না, তখন বুঝিতে হইবে দৈবদুর্যোগে আমরা পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছি, কিন্তু আমাদের মানুষটি মারা গিয়াছে। • • মানুষ হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে মানুষের স্বাদ মরিয়া যায়।

• • • •

এমনি করিয়া পুঁথি ও কথার অরণ্য মানুষের চারদিকে নিবিড় হইয়া উঠিতেছে। প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ ক্রমশই দূরে চলিয়া যাইতেছে। মানুষের অনেকগুলো মনের ভাব উৎপন্ন হইতেছে যাহা কেবল পুঁথির সৃষ্টি। • • মানুষের মনের চারিদিকে এই যে অতি নিবিড় পুঁথির অরণ্যে ঘুলির জাল ধরিয়াছে ইহার মোহজাল আমাদিগকে মাতাল করিতেছে; শাখা হইতে শাখান্তরে কেবলই চঞ্চল করিয়া মারিতেছে; কিন্তু যথার্থ আনন্দ, গভীর তৃপ্তি দিতেছে না। নানাপ্রকার বিদ্রোহ ও মনোবিকার উৎপন্ন করিতেছে।• • স্বভাবের সঙ্গে জীবনের বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির প্রকাণ্ড অসামঞ্জস্যই ইহার কারণ। • •

• • • •

বইপড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধবিশ্বাস যেন জন্মিতে না দেওয়া হয়। প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার হইতেই যে বইয়ের সকল আহরিত হইয়াছে, অন্তত: হওয়া উচিত এবং সেখানেও যে আমাদেরও অধিকার আছে একথা পদে পদে জানানো চাই। বইয়ের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বেশী হইয়াছে বলিয়াই বেশী করিয়া জানানো চাই। এদেশে অতি পুরাকালে যখন লিপি প্রচলিত ছিল তখনও তপোবনে পুঁথি ব্যবহার হয় নাই। তখনও গুরু শিষ্যকে মুখে মুখেই শিক্ষা দিতেন এবং ছাত্র তাহা খাতায় নহে, মনের মধ্যেই লিখিয়া লইত। এমনি করিয়া এক এক দীপশিখা হইতে আর এক দীপশিখা জ্বলিত। • • যথাসম্ভব ছাত্রদিগকে পুঁথির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। • • বইগুলা যে কি করিয়া তৈরী হইতে থাকে তাহা প্রথম হইতেই অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে তাহারা নিজেদের মনের মধ্যে অনুভব করিতে থাকুক; তাহা হইলেই বইয়ের যথার্থ ফল তাহারা পাইবে অথচ তাহার অন্ধশাসন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে এবং নিজের স্বাধীন উদ্যমের দ্বারা জ্ঞান লাভ করিবার যে স্বাভাবিক মানসিক শক্তি তাহা ঘাড়ের-উপরে-বাহির-হইতে-বোঝা-চাপানো বিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইবে না। • • শিশুর মন যতটুকু শিক্ষার উপরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করিতে পারে অল্প হইলেও সেইটুকু শিক্ষাই শিক্ষা, আর যাহা শিক্ষা নাম ধরিয়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয় তাহাকে পড়ানো বলিতে পার, কিন্তু তাহা শেখানো নহে।

—আবরণ—

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ

শ্রীগৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

নব জাগরণের যুগের ঐতিহ্য হচ্ছে অতীতের সাথে বর্তমানের মহামিলন। রবীন্দ্রনাথের ভিতর আমরা সেই ঐতিহ্যের স্ফুরণ দেখতে পাই। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচ্যাবেশে তিনি উপনিষদের যুগকে প্রাধান্য এবং পাশ্চাত্ত্যের গণতন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীকে স্থান দিয়েছেন। তিনি শুধু কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি সমগ্র মানব। তাঁর প্রতিভার যাদুকরী দণ্ড যা কিছু স্পর্শ করেছে তাই সজীব ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। আমরা তাঁকে যদি শুধু শিক্ষক হিসাবেই পেতাম তবু তিনি জাতীয় জীবনে শিক্ষার পথিকৃৎ হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে রইতেন। শিক্ষাবিষয়ক তাঁর বিভিন্ন রচনাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে একটি অমর গ্রন্থ হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে রইবে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ একটা বিশেষ দেশ বা কালের ছিল না। তাঁর শিক্ষা একটা সামাজিক শিক্ষা। তিনি তাঁর অপূর্ব ভাষায় বলেছেন, 'বিশ্বকে বিদ্যালয় দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শিক্ষা।' চিন্তাশীল শিক্ষাব্রতী লিখেছেন, 'ঐ ভাবে শিক্ষা পাইলে তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে।···প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নাই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে বলেই তাকে বড় মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ প্রবলতাকে চায়নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সংগে যোগে।' শিক্ষার্থীর স্বভাবকে মেনে নিয়ে তাকে কৃত্রিমতা থেকে মুক্তি দেবার জন্য এই ছাত্রদরদী শিক্ষাবিদের লেখনী থেকে বেদনা ও অশ্রু ঝরে পড়েছে। তিনি বলেছেন, 'শিশু যে এ্যালজাব্রা না করিয়াই ইতিহাসের তারিখ মুখস্থ না করিয়াই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেইজন্য সে কি অপরাধী? তাই সেই হতভাগ্যদের নিকট হইতে তাহাদের আকাশ বাতাস, তাহাদের আনন্দ অবকাশ সমস্তই কাড়িয়া লইয়া শিক্ষাকে সর্বপ্রকারেই তাহাদের পক্ষে শাস্তি করিয়া তুলিতে হইবে? না-জানা হইতে ক্রমে ক্রমে জানিবার আনন্দ পাইবে বলিয়াই কি শিশুরা অশিক্ষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে না? আমাদের অক্ষমতা ও বর্বরতা বশতঃ জ্ঞানশিক্ষাকে আমরা যদি আনন্দময় করিয়া তুলিতে না পারি, তবু চেষ্টা করিয়া ইচ্ছা করিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরতা পূর্বক নিরপরাধ শিশুদের বিদ্যাগারকে কেন আমরা কারাগারের আকৃতি দেই?'

উপনিষদের যুগে আশ্রমিক শিক্ষাদর্শ ছিল লোকালয় থেকে দূরে—গুরুর আশ্রমে থেকে, শিষ্যদের গোপালন ও অনাড়ম্বর-সরল-গার্হস্থ্য জীবন যাপনের ভিতর দিয়ে শিক্ষাদান করা। গুরু শিষ্যের মধুর মিলন, কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা এবং উচ্চ চিন্তাই ছিল ঐ যুগের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। আশ্রমিক শিক্ষায় ব্যক্তিকে সুখী করা যেত এবং আশ্রম লোকালয় থেকে দূরে থাকায় একটা মধুময় জীবনধারা শিক্ষার্থীর ভেতর ছড়িয়ে দেবার সুযোগ ছিল। সেই ছাত্রসমাজ যখন সংসার-জীবনে প্রবেশ করতেন তখন আপন প্রভাবে সমাজকে উন্নততর অবস্থায় নিয়ে যেতে পারতেন।

উপনিষদের ঋষি রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী যুগে যে-

আশ্রমের সৃষ্টি করলেন তাতে আমরা ঐ শিক্ষার কিছু রূপান্তর দেখতে পাই। বৃহত্তর সংসার থেকে শিক্ষালয় দূরে প্রতিষ্ঠা করতে হবে কিন্তু বৃহত্তর সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না এই ছিল তাঁর উপদেশ। শুধু শিশুর ভেতর একটা মিলনের সুর তাঁর আশ্রমিক শিক্ষায় ছিল। অতীতে বৌদ্ধ মঠ এবং আশ্রমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নিজের সুখ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা হতো না। অতীতে এই সুখ সুবিধার প্রতি অবজ্ঞা থাকায় তাঁরা ব্যবহারিক বিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ দিকটা ভঙ্গ করেননি।

পাশ্চাত্যের রুগ্ন যেদিন প্রকৃতির বুকে শিশুকে ছেড়ে দিতে বলেছিলেন সেদিন ইউরোপীয় বস্তু-সভ্যতায় অভ্যস্ত মানুষের দৃষ্টিতে বিপুল আলোড়ন এনেছিল। কিন্তু প্রকৃতির পূজারী রবীন্দ্রনাথের চোখে বিশ্বপ্রকৃতি যে রুগ্নের চেয়ে অনেক বেশি প্রাণপূর্ণ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। প্রকৃতির পরিবেশের ভিতর শিক্ষাদানের কথা তিনি বিশেষ-ভাবে চিন্তা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন প্রকৃতি শিক্ষার্থীর প্রকৃত শিক্ষক। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'বালকের হৃদয় যখন নবীন, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়-শক্তি যখন সতেজ, তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমিতে অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও, তাহাদিগকে ছুটির আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিও না।'

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁর কণ্ঠে তিরস্কার ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। মুক্ত শিক্ষাব্রতী বলেছেন, 'আমাদের সমস্ত জীবনের বিরুদ্ধে, যেখানে, সেখান হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে। বাধা ভেদ করিয়া যেটুকু রস নিকটে পৌঁছিতেছে সেটুকু আমাদের জীবনের শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাদর্শনে যা বলেছেন তার মূল কথা হচ্ছে, 'সুগমতা, সরলতা সহজতাই যথার্থ সভ্যতা; বহু আয়োজনের জটিলতা বর্বরতা; বস্তুত তাহা গলদ্ঘর্ম অক্ষমতার ও পাকার জঞ্জাল। কতকগুলো জড়বস্তুর অভাবে মনুষ্যত্বের সম্ভ্রম যে নষ্ট হয় না, বয়স অধিকাংশ স্থলেই স্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়—এ শিক্ষা শিশুকাল হইতে বিদ্যালয়ে দিতে হইবে। নিষ্ফল উপদেশের দ্বারা নহে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা।.....আমাদের বিদ্যালয়ে অনাবশ্যককে খর্ব করিবার একটা আদর্শ সর্বপ্রকারে স্পষ্ট করিতে হইবে।' তিনি উপদেশ দিয়েছেন, 'বই পড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধ সংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়।' পেস্টালজি ফ্রিইটর মত শিক্ষার কর্মকে গ্রহণ করার বিষয় তিনি বিশ্বাস করতেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য আমরা জানতে পারি। তিনি লিখেছেন, 'প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষভাবে কোন না কোন হাতের কাজে যথাসম্ভব সুদক্ষ করে দেওয়া চাই। হাতের কাজ শিক্ষাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আসল কথা, এইরকম দৈহিক কৃতিত্ব চর্চায় মন সজীব ও সতেজ হয়ে ওঠে। যে সব ছেলেকে আমরা নির্বোধ বলে মনে করি তাদের অনেকেরই সুপ্তচিত্ত এই দৈহিক কর্মদক্ষতার সোনার কাঠির স্পর্শ অপেক্ষা করে আছে।'

রবীন্দ্রনাথ পুঁথি, জ্ঞান বা কর্মের শিক্ষার কথা বললেও তিনি সর্বোপরি বোধের বা সম্পূর্ণতার শিক্ষায় যেমন বিশ্বাসী ছিলেন তেমনি আবার শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর মতে ধর্ম সমাজ-মঙ্গলকর ও সমষ্টির কল্যাণকামী হওয়া কর্তব্য। শৈশব থেকেই শিশুকে প্রতিটি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলে সকল ধর্মের সুন্দর ও পবিত্র ভাবগুলি শিক্ষার্থীর জীবনে রূপায়িত করলে মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম ও সৌহার্দ স্থাপিত হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

তিনি বিভিন্ন দেশের কৃষ্টি ও সভ্যতাকে ভারতের তীর্থক্ষেত্র শান্তিনিকেতনে মিলিত

করেছেন। তা ছাড়া ব্যবহারিক জীবনে কলা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী শিক্ষাক্ষেত্রে এনে তিনি শিক্ষা ও জীবনের ভেতর একটা নিবিড় মিলনের জন্য চেষ্টা করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন বিশ্বমানবের মহামিলন। মানুষ পরস্পরের বৈরীভাব ভুলে পৃথিবীর এই 'তীর্থ নীড়ে' এসে একত্রিত হবে এই ছিল তাঁর কামনা। তাই আমরা শান্তিনিকেতনকে দেখি কত বড় আন্তর্জাতিক সম্পদ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের প্রতি কি প্রগাঢ় তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। কত বড় তাঁর দৃষ্টিভংগী। সমস্ত বিভেদ ও বাধাকে দূরে সরিয়ে মানুষের এই মহা-মিলনের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আমরা যেমন স্নেহশীল ও মানবদরদী দেখি তেমনি আমাদের ঘরের আচার ব্যবহার রুচি ও প্রবৃত্তির ধারা—এককথায় আমাদের চিরপরিচিত মধুর রূপটি শান্তিনিকেতনে দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারি না। যেখানে পাশ্চাত্যের জৌলুস নাই, আছে প্রাচ্যের ভাবগম্ভীর মূর্তি। শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির বুকে আন্তর্জাতিক ও স্বদেশীয় সংস্কৃতির আলিঙ্গন আমাদের বিস্ময়মুগ্ধ করে তোলে।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন মানুষের অন্তর্নিহিত সুরুচি ও সৌন্দর্যকে যদি আমরা বিকশিত করে তুলতে পারি তবে মানুষ আর পরস্পরকে হিংসা দ্বেষ করবে না বরং মানুষ শান্তি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যাবে। তিনি মনে করতেন কৃষ্টিগত উন্নতির দ্বারা মানুষের সাংস্কৃতিক সাম্য ও মৈত্রী ঘটবে এবং আপাতিক দ্বন্দ্ব ও অসাম্য দূরীভূত হবে।

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষাকে তিনি প্রথম স্থান দিয়েছেন। আজও আমাদের সমাজে এমন সব ব্যক্তি আছেন যাঁরা মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে অপাংক্তেয় মনে করেন এবং শিশুদের বৈশব থেকেই ইংরাজি শিক্ষা ও ইংরেজের চালচলন শিখিয়ে গর্ব অনুভব করেন। মাতৃভাষার মরদী শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ গর্ব সহকারে বলেছেন, 'আমি সম্পূর্ণ বাংলা ভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলাম।... আমার বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরাজি-বর্জিত এই শিক্ষা চলেছিল।'

তিনি শুধু শিক্ষাব্রতী ছিলেন না। তিনি ছিলেন শিক্ষক সমাজের গুরু। একাধারে শিক্ষাগুরু ও শিক্ষকগুরু হিসাবে তিনি জাতীয় ইতিহাসে অম্লান হয়ে রইবেন। তাঁর দু একজন সহকর্মী অধ্যাপকের সহিত পরিচিত হয়ে আমি তাঁদেরই ভিতর রবীন্দ্রনাথের স্পর্শ অনুভব করেছি। আমার মনে হয়েছে এই সকল শিক্ষা জলে উঠেছে একটি শিখার দ্বারা, একটি প্রাণের দ্বারাই এইসব প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। সেই শিখা সেই প্রাণ রবীন্দ্রনাথ।

তিনি ছিলেন জাত-শিক্ষক। জাত-শিক্ষক বলেই শিক্ষা বিষয়ে লিখিত তাঁর বিভিন্ন রচনাবলী আজ অর্ধশতাব্দী পরেও আমাদের কাছে আজকের দিনের চিন্তাধারা বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন, 'যিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের ডাক শুনলেই তাঁর ভিতরকার আদিম ছেলেটা বেরিয়ে আসে।' রবীন্দ্রনাথের ভিতরের সদাজাগ্রত সেই শিশু-রবীন্দ্রনাথ তাই শিশুদের হাসি কান্না, দুঃখ-আনন্দ এবং চাওয়া-পাওয়ার কথা গভীরভাবে চিন্তা করে শিক্ষাজগতে এক গভীর আলোকপাত করেছেন। এই শিক্ষা-প্রেমিক শিশুদরদী শিক্ষাব্রতীর লেখনী থেকে অমৃত ঝরে পড়েছে। তিনি লিখেছেন,

'ইহাদের করো আশীর্বাদ।
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি,
নন্দনের এনেছে সংবাদ।
ইহাদের কর আশীর্বাদ।'

ছাত্র জীবন : সিটি কলেজ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

৫

এখন আবার কলেজের পড়ার কথায় আসি। ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি আমার যে ক্রমে অনুরাগ জন্মে তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাঠক পাঠিকা ইতি-পূর্বেই পাইয়াছেন। ইতিহাসের প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও ইংরেজী সাহিত্যের উপর আমার যে অনুরাগ জন্মিয়াছিল তাহাই যেন আমাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। আমি ইংরেজী সাহিত্যের অনার্স লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম। পাস এবং অনার্স ক্লাসে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠারম্ভেই কয়েকজন বিশিষ্ট অধ্যাপকের সান্নিধ্যে আসিলাম। তাঁহাদের কথা একে একে বলিতেছি। কিন্তু ইহার পূর্বে আর একজনের বিষয় এখানে উল্লেখ করিব। একদিন অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র জনৈক ইংরেজ ভদ্র-লোককে আমাদের ক্লাসে লইয়া আসিলেন এবং তিনি তাঁহাকে আমাদের নিকট এই বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন যে, তিনি বাঙ্গালী ছাত্রদের পড়াইতে খুবই ভালবাসেন এবং যতদিন সম্ভব তিনি আমাদিগকে পড়াইবেন, অবশ্য তিনি ইহার বিনিময়ে কলেজ হইতে কিছু লইবেন না। এই কথাগুলি শুনিয়া এই ভদ্রলোকের প্রতি প্রথম দর্শনেই আমরা আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। ইঁহার নাম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সাহেবের পরিচয় আমরা পরে আরও পাই। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়া আসেন। তিনি কিছুকাল উক্ত কলেজের অধ্যক্ষতাও করেন। অধ্যক্ষপদ হইতে তিনি শিক্ষা অধিকর্তার (D. P. I.) পদে উন্নীত হন। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে উচ্চতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি এই পদ ত্যাগ করেন। এই সময়েই হেরম্ববাবু তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে কিছুকালের জন্য তাঁহাকে সিটি কলেজে পড়াইবার সুযোগ করিয়া দেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পরে সুবিখ্যাত 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক পর্যন্ত হইয়া ছিলেন।

আমাদের একখানি Selections from English Prose পাঠ্য ছিল; আকারে ছোট কিন্তু সারগর্ভ রচনায় ঠাসা। বেকন মিল্টন হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিখ্যাত ইংরেজী গদ্য লেখকের রচনার ভাল ভাল অংশ এখানে গ্রথিত হইয়াছিল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আমাদিগকে এই বইখানি পড়াইবার ভার লন। তিনি সুনিপুণভাবে প্রত্যেকটি রচনার বিষয়বস্তু লইয়া আলোচনা করিতেন। যতদিন আমরা এই বইখানি তাঁহার নিকট পড়িয়াছি ততদিন অতি মনোযোগের সঙ্গে তাঁহার বক্তৃতার মর্মগ্রহণে তৎপর ছিলাম। মিল্টনের চিন্তা ও সাহিত্য বিষয়ক সেই তেজব্যঞ্জক উক্তিগুলি এখনও আমার মনে গাঁথা রহিয়াছে। ভাব-প্রকাশের স্বাধীনতা—কি সাহিত্য, কি জাতীয় উন্নতির পক্ষে যে একান্ত আবশ্যক, তাঁহার রচনার মধ্যে এই কথাটি সুস্পষ্ট করিয়া লেখা ছিল। রামমোহন রায় মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে এদেশে ও বিলাতে যে বিখ্যাত আবেদন পত্রখানি প্রেরণ করেন তাহাতে মহামতি মিল্টনের ঐ শাশ্বত উক্তিগুলি তিনি উদ্ধৃত করেন বলিয়া মনে হইতেছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের উচ্চারণেও খানিকটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতাম। তিনি মধ্য-ইংলণ্ডের মানুষ, খাঁটি ইংরেজী উচ্চারণ তাঁহার মুখে। তিনি 'often' শব্দটিকে 'অফ্‌টেন' উচ্চারণ করিতেন। সচরাচর কিন্তু আমরা 'অফন্' উচ্চারণ

উচ্চারণ-ই শুনিতাম। তিনি একদিন কোন একটি রচনা পড়াইবার সময় প্রসঙ্গত আমাদের বলিয়াছিলেন যে, কোন ভাষায় তোমার যে দখল জন্মিয়াছে তাহা পরীক্ষা করা যায় একটি উৎকৃষ্ট মানের সাহায্যে। ইংরেজী হইতে তুমি মাতৃভাষায় যদি মর্মানুগ অনুবাদ করিতে পার তাহা হইলে বুঝিব তুমি ইংরেজীতে বেশ ব্যুৎপন্ন হইয়াছ। আবার মাতৃ-ভাষা কি অন্য যে কোন ভাষা হইতে যদি ইংরেজীতে ভাল অনুবাদ করিতে পার তাহা হইলেও ঐ কথাই প্রমাণিত হইবে। আবার সে ভাষা হইতে অন্য ভাষায় ভালভাবে যদি অনুবাদ করিতে পার তাহা হইলে দুইটি ভাষায়ই সে তুমি আয়ত্তে আনিয়াছ ইহাও তখন বুঝিতে পারিব। ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের এই কথাগুলির সারবত্তা যে কত, পরবর্তীকালে তাহা নানা সূত্রে উপলব্ধি করিয়াছি। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ পূজার ছুটির পূর্ব পর্যন্তই আমাদের পড়াইয়াছিলেন, মনে হইতেছে।

অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র সাধারণ ক্লাসে আমাদের বাইবেল পড়াইতেন। তাঁহার পড়ানর ধরনধারণ পূর্বে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুক্তি করিব না। কোন ভাষার উপরে সম্পূর্ণ দখল জন্মাইতে গেলে তাহার প্রধান প্রধান প্রচলিত গ্রন্থগুলির মূল আমাদের আগা দরকার। এই অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়টি হেরম্ববাবুর অধ্যাপনাগুণে আমরা তখনই খানিকটা বুঝিতে পারি। অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ আমাদিগকে সাধারণ ক্লাসে মহামতি বার্কের *Speech on American Taxation* বইখানি পড়াইতেন। Honours ক্লাসে তাঁহার *Speech on American Conciliation* পড়াইতেন অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র। এই দুইটি বক্তৃতাই আলাদা আলাদা পুস্তকে গ্রথিত হইয়াছিল। উভয় বক্তৃতাই ইংরেজী সাহিত্যে ক্লাসিকস্-এর মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় যুবকদের মনে জাতীয় ভাবনা তথা স্বাধীনতা স্পৃহার উন্মেষে এ দুইখানি বই কম রসদ জোগায় নাই। আর তখন বিভিন্ন কলেজে এই দুইখানি বই পাঠ্যসূচীর মধ্য দিয়া এই ভাব উন্মেষে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষাব্রতিগণ সে যুগে কতই না সহায়তা করিয়াছিলেন। ব্রজমোহন কলেজে (বরিশাল) অশ্বিনী কুমার দত্ত স্বয়ং ছাত্রদের এই বক্তৃতাগুলি পড়াইতেন, কলিকাতায় রিপন কলেজে ইহা পড়াইতেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহের অধ্যাপনার ভিতরেও এই ভাবের কতকটা স্পর্শ পাইতাম। রজনীকান্ত স্বদেশী আন্দোলনের সময় ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং সরকারী বিষদৃষ্টি সত্ত্বেও কলেজটিকে সুকৌশলে পরিচালনা করিতে সক্ষম হন। আবার সরকারী ছলাকলার দরুণই শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে ব্রজমোহন কলেজ ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে হয়। ইহার পর অপর কোন কোন কলেজ ঘুরিয়া দীর্ঘকাল সিটি কলেজের অধ্যাপক পদে কার্য করিয়াছিলেন। পরে তিনি ইহার অধ্যক্ষ পদেও বৃত হন।

আমরা যখন তাঁহার নিকট পড়ি, তখন তিনি প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপনীত হইয়াছেন। কি জানি কেন তিনি নিয়তই সর্ববিষয়ে একটা অনাসক্তির ভাব প্রকাশ করিতেন। আমাদের তরুণ মনে ইহা তখন তাচ্ছিল্য বলিয়াই মনে হইত। পরে তাঁহার একখানি বিস্তারিত আত্মজীবনী পাঠ করিয়াছি এবং ইহা পাঠান্তে আমাদের তখনকার ধারণা কতকটা দূর হইয়াছে। রজনীকান্ত আমাদের নিকট খুব গম্ভীর প্রকৃতির বলিয়াও তখন মনে হইত। তিনি গ্রীক সাহিত্যে সুপণ্ডিত, সক্রেটিসের উপরে তাঁহার গবেষণাগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের একখানি ক্লাসিক। কিশোর বয়সে প্রবাসীর পৃষ্ঠায় সক্রেটিসের চারিটি কথোপকথনের তৎকৃত অনুবাদ পাঠ করিয়া চমৎকৃত হই। রজনীকান্তের অধ্যয়ন

অনুবাদ সম্বন্ধে আমার লঙ্কাভাজন জনৈক শিক্ষকের মুখেও ঐ সময় খুবই শুনিতাম। এখন তাঁহাকে চাক্ষুষ দেখিয়া এবং তাঁহার নিকটে পাঠ লইতে সক্ষম হইয়া বিনম্রভাব সত্ত্বেও নিজেকে ধন্য মনে করিতে লাগিলাম।

বার্কের এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বক্তৃতা দুইটি এখনও ছেলেরা পাঠ্য বই রূপে পড়ে কিনা জানি না, তবে বলি শুধু ইংরেজী গদ্য সাহিত্যের নমুনা হিসাবে নয় অন্যান্য নানা কারণেও এ দুইটি প্রত্যেকেরই পাঠ করা উচিত। প্রথম বক্তৃতাটির বিষয়বস্তু ছিল—আমেরিকাবাসী কর দেয়, সেই কর দ্বারা তাহাদের উপর ইংরেজ শাসনব্যপদেশে খবরদারী করে, কিন্তু ইহাতে করদাতাদের কোন হাত নাই, তাহাদের কথা শুনিবারও তখন কোন ব্যবস্থা ছিল না। বার্ক বলেন, করদাতাদের কথা শুনিবার এবং দাবী মানিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ কারণ সেখানে প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থার আশু প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। "No taxation without representation"—প্রতিনিধি-মূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত না হইলে প্রজাদের উপর কর স্থাপন করার অধিকারও শাসক জাতির নাই—এই মর্মের কথাগুলি আমাদের পূর্বেকার এবং সম-সময়ের লোকের মুখে অতীব সত্য বলিয়া ধরা দিয়াছিল, একারণ আমাদের মর্মস্পর্শ করিতেও সক্ষম হয়। দ্বিতীয় বক্তৃতাটিও ঐ একই বিষয় সম্পর্কিত। আমেরিকাবাসীদের মন পাইতে হইলে শাসকজাতির হৃদয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কি কি সার্থক উপায়ও তখনই অবলম্বন করা প্রয়োজন এই কথাগুলিই দ্বিতীয় বক্তৃতাটিতে বিশদভাবে বর্ণিত হয়। বার্কের একটি কথা এখনও মনে পড়ে "when reason fails, force remains; when force fails, what remains?" রজনীকান্ত ও হেরম্বচন্দ্র এই বক্তৃতা দুইটি আমাদের সাধারণ ও অনার্স ক্লাসে যথাক্রমে পড়াইয়াছিলেন। তবে রজনীকান্তের পড়ান ছিল বক্তৃতাধর্মী। ইহা তখন আমরা খুবই উপভোগ করিতাম।

রজনীকান্ত পড়াইবার সময় নানারূপ কৌতুককর গল্প আমাদিগকে বলিতেন। সব মনে নাই, কোন্ কোন্ কথার দৃষ্টান্তস্বরূপ এসব উল্লেখ করিতেন তাহাও এখন আর বলিতে পারিব না, তবে এ জাতীয় কিছু কিছু এখনও স্মৃতিতে রহিয়াছে। তিনি একদিন বলিলেন—একদা স্পেনের কোন স্থলে দুইজন লোকে মুখোমুখি হইবামাত্রই হাতাহাতি সুরু করিয়া দেন, যেন তাহাদের কত কালের শত্রুতা। অথচ পূর্বে কিন্তু তাহাদের কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। দেনাদার ও পাওনাদারের মধ্যে কোনকালেই বন্ধুত্ব থাকে না। রাস্তার একটি ফুটপাথ ধরিয়া পাওনাদার আসিতেছে দেখিলে দেনাদার দেখা হইবার ভয়ে ঐ একই ফুটপাথ হইতে রাস্তার অন্য ফুটপাথে সট্ করিয়া চলিয়া যায়। পাওনাদারের কিন্তু তেনদৃষ্টি, সে উহা দেখিয়া মনে মনে হাসে। আবার দুই বন্ধুতে বৎসর পরে দেখা, বিভিন্ন ফুটপাথ দিয়া আমরা যাইতেছি, তখন সংসারী লোক আমরা, পরস্পরে কি কথায় কি কথা বলিয়া ফেলি এই ভয়ে ভিন্ন ফুটপাথ হইতেই নমস্কার করিয়া প্রত্যেকে বিদায় লই। পূর্ব বন্ধুদের এড়াইয়া চলার মনোবৃত্তি আমাদের মধ্যে ক্রমশই বাড়িয়া চলে। একদিন কৃপণের কথায় বলিলেন—কৃপণেরা জলখাবার খায় কি দিয়া জান? এক গ্লাস জল ও তাহার সঙ্গে একখানি মাত্র বাতাসা। আবার অতি কৃপণও এক রকমের আছে। জলে বাতাসা দেখাইয়া এক সময়ে বাতাসাখানি খায়, অন্য সময়ে জল পান করে। লাউ চিংড়ীর উল্লেখ করিয়া একদিন বলেন—লোকে পয়সা করে কেমন করে জান? লাউ চিংড়ীর তরকারী হইল। খেতে নিশ্চয়ই স্বাদু। এ বেলা লাউ আর ও-বেলা লাউ হইতে বাহির করে চিংড়ী-গুলি রাখে তাহা খায়। তবেই তো লোকে পয়সা

করিতে পারে! তখন ইংরেজীতে কথাবার্তার রেওয়াজ। রজনীকান্ত এ সব কাহিনী ইংরেজীতে অতি মনোজ্ঞ করিয়া বলিতেন। নিজে থাকিতেন খুবই গম্ভীর, আমরা তো হাসিয়াই খুন!

অধ্যাপক রজনীকান্ত আমাদের অনার্স ক্লাসে পড়াইতেন লুইস ষ্টীভেন্‌সন্‌ কৃত *Virginibus Puerisque*—এটি লাটিন নাম। ইহার ইংরেজী মানে To young boys and Girls। বইখানি নানা কৌতুককর অথচ যুবকযুবতীদের অতি প্রয়োজনীয় কথায় ভরপুর। বিবাহের পূর্বে এবং পরে আমাদের কি ভাবে চলা উচিত, যুবকযুবতীদের মিলন সুখকর হয় কিরূপে, এই ধরনের সব কথা বইখানিতে সরল সহজভাবে লিখিয়াছেন গ্রন্থকার। আমরা ক্লাসে স্বভাবতই কম ছেলে। রজনীকান্ত পড়াইতে পড়াইতে কত কৌতুক করিতেন। অমন গম্ভীর প্রকৃতির রজনীকান্তের পরিহাসপ্রিয়তা আমাদের নিকট সহজেই ধরা পড়িত। বইখানির কোন কোন কথা যাহা আসা থাকিলে, যুবকযুবতীরা অনেক তুচ্ছ অনর্থ হইতেও রেহাই পাইতে পারেন তাহা এখনও মনে পড়ে। গ্রন্থকার বলিতেছেন—ভাষা তথা কথ্য ভাষার ভেদ-বৈষম্য শুধু জেলায় নয়, পল্লীতে পল্লীতে। এই ভাষা লইয়া আমরা কতই না পরস্পরকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করি। কিন্তু এইরূপ পার্থক্য স্বাভাবিক কারণেই ঘটিয়া থাকে এবং ইহাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে অনেক অশান্তির হাত হইতে আমরা রেহাই পাইতে পারি। বইয়ের এই স্থানটি পড়িতে পড়িতে তখন আমার একটি আগেকার ঘটনার তাৎপর্য বুঝিতে পারি। বাল্যকালে একদিন শুনি পার্শ্ববর্তী গ্রামের একজন কথায় কথায় বলিলেন—"কিয়া"। এই কথাটির মানে—"কেন"। আমাদের গ্রামের লোকেরা যাহাকে বলে 'কেন' ঐ 'কিয়া' দ্বারা তাহাই বুঝান হয়। কেন এরকমটি হয়? এইরকম দুইটি, তিনটি, চারিটি, পাঁচটি—যত দূর দূর গ্রামে যাইবেন ততই একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে লোকের কথার ভাষায় কিছু কিছু পার্থক্য ঘটিতেছে। এই রকম বিভিন্ন জেলায় হইয়া থাকে। আমি যে মহকুমার অধিবাসী তাহার পার্শ্ববর্তী একটি মহকুমার এলাকায় এই রকম কথ্য ভাষার পার্থক্য খুবই দেখিয়াছি। একটি শব্দ আমরা ব্যবহার করি "নামাও" ঐ মহকুমার অধিবাসীদের মুখে শুনিতাম 'ওলাও'। নববিবাহিতা স্ত্রী যদি "ওলাও"র দেশে গিয়া কথাটির মানে না বুঝেন এবং কোন জিনিস নামাইবার পরিবর্তে তুলিয়া রাখেন, তাহা হইলে ব্যঙ্গ বিদ্রূপত বটেই, আরও অনেক কিছু তাহার কপালে জুটিতে পারে। গ্রন্থকার ষ্টীভেন্‌সন্‌ উক্ত বইখানিতে এই সব বিষয়ে আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

আবার একদলে বলেন—ভাবী দম্পতি কি রকম হওয়া উচিত। তুমি নিজে শিল্পী, স্টুডিওতে বসিয়া সারাদিন ছবি আঁকিয়া আঁকিয়া ক্লান্তদেহে হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছ, তখন তুমি যদি দেখ, তোমার স্ত্রীও নিবিষ্টচিত্তে ছবি আঁকিতে লাগিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে তখন তোমার মনের অবস্থা কিরূপ হইবে? আবার কবিতা বা গল্প অনেকক্ষণ ধরিয়া লিখিতেছ—একটু অবসর বিনোদন প্রয়োজন, তুমি যদি স্ত্রীর ঘরে গিয়া দেখ তিনিও কবিতা বা গল্প লিখিতে বসিয়া গিয়াছেন তাহা হইলে তোমার মনের অবস্থা কি দাঁড়াইবে? ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন—একই কর্মে রত দম্পতীর দাম্পত্য-জীবন সচরাচর সুখের হয় না। বিপরীত কর্মে রত নারীপুরুষের মিলনই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে উহা সুখকর হইবে নিঃসন্দেহে। অবশ্য গ্রন্থকারের এরূপ উক্তির ব্যতিক্রমও আছে। কিন্তু এই ব্যতিক্রমগুলি ইংরেজীতে বলিতে গেলে *"Exceptions prove the rule"*। যেমন বই তেমনি পড়ান। রজনীকান্তের পাঠনায় আমরা এ বাণির মর্মে প্রবেশ করিতে সক্ষম হই।

৬

কবিতা ও নাটক পড়ার কথায় আসা যাক। আমাদের সময় বি-এ পাস-কোর্সে পল্‌গ্রেভের 'গোল্ডেন ট্রেজারী' পাঠ্য ছিল। দুইখানি ইংরেজী কবিতার সোনেট বা 'সোনালী' আওয়াই শুধু নয়, বাস্তবিকই ইহা স্বর্ণ খনি। ইংরেজী কাব্যসাহিত্য হইতে কত রত্নই না খুঁজিয়া খুঁজিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল। পল্‌গ্রেভের রসবোধের খুবই তারিফ করি। এই কবিতার 'স্বর্ণখনির' সঙ্গে তিনিও অমর হইয়া রহিয়াছেন। শুনিতে পাই, এই বই এখন আর পড়ান হয় না। ইহার স্থান অন্য সংকলন গ্রন্থ দখল করিয়া লইয়াছে। তবে ইংরেজী সাহিত্যে প্রবেশেচ্ছু মাত্রেরই এখনি অবশ্য-পাঠ্য হওয়া উচিত। গোল্ডেন ট্রেজারীর একখানি 'নোট্' বা সাহায্যপুস্তক ছিল, হরিনাথ দে কৃত। যেমন মূল বই তেমনি এই "নোট্"। হরিনাথ দে'র কথা এখন হয়ত অনেকে জানেন না। কলিকাতার 'হরিনাথ দে রোড' নামটির মধ্যেই তাঁহার যতটুকু পরিচিতি। কিন্তু হরিনাথ বহু তাবাবিদ্, সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। আমরা তাঁহাকে দেখি নাই বটে, কিন্তু আমাদের ছাত্রাবস্থায়ও তাঁহার বিদ্যাবত্তার যথেষ্ট প্রশংসা শুনিয়াছি। তিনি বত্রিশটি ভাষা জানিতেন বলিয়া তাঁহার এত খ্যাতি। নোট বইখানিতে এক একটি কবিতাংশের মানে বুঝাইতে গিয়া তিনি অনুরূপ ভাবব্যঞ্জক বহু উদ্ধৃতি ইংরেজী সাহিত্য হইতে পরিবেশন করিয়াছিলেন। যতদূর মনে পড়ে কবিতাই বেশি ছিল। তবে মধ্যে মধ্যে গদ্য হইতেও উদ্ধৃতি থাকিত। মূল কবিতা সংগ্রহ এবং এই সাহায্যপুস্তক দুইখানিই তখন আমাদের ইংরেজী সাহিত্যের রসগ্রহণে বড়ই সহায় হইয়াছিল।

Golden Treasury পড়াইতেন অধ্যাপক প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় (সংক্ষেপে, পি-এন্-সি)। প্রিয়নাথ বাবু সাহিত্যিক চটপটে মানুষটি। তিনি বিদগ্ধীক ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ক্রমে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তাঁহার বাসভবনে বহুবার গিয়াছি। পাঠ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার জন্য হয়ত বেশির ভাগ যাইতাম। কিন্তু তিনি পারিবারিক কোন কোন কথাও আমাকে বলিয়া মনের ভার লাঘব করিতেন। তিনি বড় ভাল মানুষটি ছিলেন। তাঁহার এই বইখানি পড়ানে আমরা খুব মনোযোগ দিয়া শুনিতাম। তিনি সময়ে সময়ে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বক্তৃতা দিতেন। তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুঁটিয়া খুঁটিয়া পড়াইতেন, তাহাতে উহা কেমন যেন নীরস হইয়া পড়িত। মাঝে মাঝে দেখিতাম তাঁহার পড়ানর কারণ হরিনাথ কৃত সাহায্য পুস্তকেরই অনুসারী হইয়া উঠিতেছে। তথাপি আমরা সম্মুখভাগে যাহারা বসিতাম তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঘনিষ্ঠ সংস্রবেও আসিয়াছিলাম, সকলেই শ্রদ্ধাবিনতচিত্তে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতাম এবং এতদিন পরে ত এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাঁহার অধ্যাপনাগুণে আমরা ইংরেজী কবিতার স্বর্ণখনি হইতে রসগ্রহণে খানিকটা সক্ষমও হইয়াছিলাম। প্রিয়নাথ বাবু সাদাসিদে সরল মানুষটি ছিলেন। তাঁহার সেই কালো কোট পাতলুন পরা চেহারা এখনও চোখের সামনে ভাসিতেছে। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থবোধ করিতেছি।

পল্‌গ্রেভের 'গোল্ডেন ট্রেজারী'র এখন চল নাই বটে, কিন্তু ইহার ভিতরকার সেই অমর কবিতাগুলি কি এখনকার ছাত্র-ছাত্রী বা পাঠক-পাঠিকা পড়ার সুযোগ পান না? কবি Words-worth-এর অমরত্বের উপর ("Ode on Immortalily") কবিতা কত উচ্চভাবাপন্ন অথচ চিত্তহারী! তাঁহার লিখিত কত কবিতাংশ সকলের মুখে মুখে উচ্চারিত হইত। "The child is father of the Man" পংক্তিটি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের একটি কবিতার অংশ। ইহার ভাব লইয়া ঐ সময় আমাদের নিবন্ধ লিখিতে হইত। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের

To A skylark শীর্ষক কবিতার শেষ দুই পংক্তি কিরূপ গভীর চিন্তা-প্রসূত !

"Type of the wise who soar but never roam
True to the kindred points of Heaven and Home."

তাঁহার 'Lucy Poems' আমরা স্কুলে পড়িয়াছি। আবার বি-এ ক্লাসেও পড়িতে হয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা পড়িতে পড়িতে আমি অজ্ঞাতসারেই যেন তখন তাঁহার পোঁড়া হইয়া উঠিয়াছিলাম। শেলীরও অনেকগুলি কবিতা ঐ বইখানিতে সন্নিবেশিত ছিল। Skylark-এর উপর তাঁহারও একটি দীর্ঘ অপূর্ব্ব কবিতা আছে। রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিতেন, ইহার সঙ্গে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের skylark-এর তুলনাই হয় না। আমি কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থেরই পোঁড়া রহিয়া গেলাম।

Keats আর একজন খ্যাতনামা কবি। মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি মারা যান। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার কবিত্ব-শক্তির কি অদ্ভুত স্ফুরণ হইয়াছিল !

"Beauty is truth—truth beauty"
"A thing of beauty is a joy for ever."

তাঁহার এক একটি উৎকৃষ্ট কবিতার শাশ্বত ভাব-ব্যঞ্জক পংক্তি। Gray's Elegy-ও তখন আমাদের পড়ান হইত অনার্স ক্লাসে। এই কবিতাটি যে কতবার পড়িয়াছি বলিতে পারিব না। স্কুলেও আমাদের এই কবিতাটি পড়ান হইয়াছিল, কিন্তু তখন ইহার ভাব বুঝিবার বা রসগ্রহণের বয়স আমাদের নয়। বি-এ পড়িবার সময় এই কবিতাটি পাঠে যেন আমাদের সম্মুখে একটি নূতন জগৎ খুলিয়া গেল। আমরা বড়দের লইয়া এত মাতামাতি করি, কিন্তু গ্রামের পল্লীতে অনাহারে অনিদ্রায় অভাবের তাড়নায় কত প্রতিভা যে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহা আমাদের কাহারও একরকম চোখেই পড়ে না। সামান্য সাহায্য পাইলে এখানকার সাধারণ লোকেরাও এক একজন বড় কবি হইতে পারিতেন, সেনাপতি হইতে পারিতেন, রাষ্ট্রনায়ক হইবারও যোগ্যতা তাঁহারা লাভ করিতেন। কবিতাটির মর্ম্মস্থলে প্রবেশের সুযোগ ঘটিল এই সময়ে। অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র কবিতাটি আমাদের পড়ান। তাঁহার সেই সনাতন ধরনে অনবরত ডিক্সনারী, রেফারেন্স বই, লাইব্রেরী হইতে আনাইতেন এবং নূতন নূতন শব্দ উৎপত্তির কথা ঐ সকল পুস্তক দেখিয়া দেখিয়া আমাদের বুঝাইয়া দিতেন। আবার কখনও সাধারণভাবে ব্যাখ্যাও করিতেন। এই সুবিখ্যাত কবিতাটির কোন কোন অংশ এখনও মনে পড়ে—

"Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathomed caves of ocean bear :
Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness on the desert air."

গ্রে'র 'এলিজি' বাঙ্গালী চিত্তে যুগে যুগে বেশ একটা আলোড়ন আনিয়াছে। কবি ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী বাংলা ছন্দে ইহার একটি সুন্দর অনুবাদ করেন। বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী গোপালচন্দ্র ঘোষ (অধ্যক্ষ ভক্টর জ্যোতির্ময় ঘোষের পিতৃদেব) ছাত্রাবস্থায়ই ইহার একটি সংস্কৃত অনুবাদ করিয়া শিক্ষা বিভাগ হইতে প্রশংসা লাভ করেন। কবিবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন দে-ও এলিজির একটি সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন।

এখন নাটকের কথায় আসা যাক। বি-এ পাস ও অনার্স ক্লাসে আমাদের চারিখানি নাটক পড়িতে হইত, সেক্সপীয়র কৃত ; আধুনিক নাটক ও একখানি ছিল Justice নামে, ইহার লেখক গল্‌স্‌ওয়ার্দি। সেক্সপীয়রের নাটকগুলির মধ্যে Othello ও Mer-

chant of Venice পড়ান হইত সাধারণ ক্লাসে। অনার্স ক্লাসে পড়িতাম Macbeth ও King Lear। আমাদের সময় ওথেলো পড়াইতেন অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র রায়, এলাহাবাদ-প্রবাসী বিখ্যাত কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের পুত্র। অবশ্য পরে ইহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। সুরেশচন্দ্র দীর্ঘকাল যাবৎ সিটি কলেজে অধ্যাপকের পদে কর্ম করিয়া শেষে ইহার অধ্যক্ষ হন। তিনি কিছুকাল পূর্বে পরলোক গমন করিয়াছেন। সুরেশচন্দ্রের ওথেলো পড়ানোর বেশ একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতাম। নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন ব্যক্তি অবতীর্ণ হইয়া বিভিন্নভাবে কথা বলে। রঙ্গমঞ্চে যখন ইহা অভিনীত হয় তখন পৃথক পৃথক ব্যক্তির উপর পৃথক পৃথক ভূমিকার ভার পড়ে; কিন্তু নাটক পড়াইবার সময় বড় বিপদ। এক ব্যক্তিকেই বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া বিভিন্নভাবের কথা বলিতে হয়। আবার শুধু বলা নয়, তাহা এই একই ব্যক্তি বুঝাইয়া দিয়া থাকেন।

অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র আমাদের ওথেলো পড়াইবার কালে বিভিন্ন ব্যক্তির ভূমিকায় বিভিন্ন ভাবভঙ্গি সহকারে তাহাদের মুখের কথাগুলি আমাদিগকে কি মনোজ্ঞ করিয়াই না শুনাইতেন। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেক্সপীয়র পড়ানোর সুখ্যাতি আমাদের সময়েও লোকের মুখে মুখে শুনা যাইত। তাঁহার অধ্যাপনা আমরা শুনি নাই। কিন্তু অধ্যাপক সুরেশচন্দ্রের সেক্সপীয়র পড়ানও আমাদের বেশ ভাল লাগিত। তিনি সাধারণ ক্লাসে ওথেলো পড়াইতেন। ওথেলো নাটকের চরিত্রগুলি আমাদের চোখের সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উঠিত। ওথেলো কত বড় বীর, অসমসাহসী দেশ বিদেশে পর্যটন করিয়া ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হন, এ কারণ তাঁহার অভিজ্ঞতাও প্রচুর। এমন বীর ওথেলো সৈনিক ব্যাপারে নির্বুদ্ধিতার চরম পরিচয় দিয়াছেন। নহিলে ডেস্‌ডিমোনার মত রূপবতী সতী-সাধ্বী মহিলাকে নিতান্তই সন্দেহবশে নিধন করিতে অগ্রসর হইবেন কেন? কেসিয়াস্ তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিল, কিন্তু দুশমন ইয়াগোর চক্রান্ত-জালে সে ক্রমে ওথেলোর বিষনজরে পড়িল। ডেস্‌ডিমোনা ও কেসিয়াসের মধ্যে যে অবৈধ প্রণয় ঘটিয়াছে দুশমন ইয়াগো ওথেলার মনে এই বিশ্বাসই জন্মাইয়া দেয়। ওথেলো পড়িতে পড়িতে আমরা যেন কোন্ অজানা রাজ্যে চলিয়া যাইতাম। বিষনিভৃক ইয়াগো কিন্তু ওথেলোকেও প্রথমাবধি ভাল চোখে দেখে নাই। ইহার প্রমাণ তাঁহার সম্পর্কে ইয়াগোর এই উক্তিগুলি: "Preferment goes by letter and affection, and not by gradation, when every second stood heir to the first." এই কথাগুলি আফ্রিকার বিষেও অতীব সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে। শুধু ওথেলো কেন, সেক্সপীয়রের অন্য বহু নাটকেও এমন সব কথা রহিয়াছে যাহা আজ প্রবাদরূপে গণ্য। "He is more sinne'd against than sinning", 'to be or not to be, that is the question' "Frailty, thy name is woman"—এ সকল এবং অনুরূপ আরও অনেক কথা সেক্সপীয়র পাঠক মাত্রেরই মনে পড়িবে। সেক্সপীয়র মার্চেন্ট অফ্ ভেনিসের একস্থানে বলিয়াছেন:—'সঙ্গীত যে ভাল না বাসে সে মানুষ খুন করিতে পারে, সে দেশের শত্রু।'

ওথেলো ছাড়া সেক্সপীয়রের আরও তিনখানি নাটক আমরা পড়িয়াছি—ম্যাকবেথ, কিং লীয়র, ও মার্চেন্ট অফ্ ভেনিস। শেষোক্ত গ্রন্থখানি পাঠে বুঝা যায়, ইহুদীদের উপরে অ-ইহুদি ইউরোপীয়গণের কি আক্রোশ। শাইলক নিয়তিশয় কৃপণ ছিলেন, তাই বলিয়া তাঁহার গায়ে থুথু ফেলা—এ কি শিষ্টাচার। সুরেশচন্দ্র ম্যাকবেথ কি কিং লীয়র পড়াইতেন ঠিক মনে পড়িতেছে না। সাধারণ ক্লাসে দুইখানি এবং অনার্স ক্লাসে দুইখানি সেক্সপীয়রের নাটক পাঠ্য

হিসাবে পড়িয়াছি। সেক্সপীয়রের নাটকগুলি আমার মত আরও হাজারো জনার পড়িতে ভাল লাগিয়াছে ও লাগিবে। তবে এখানে আমার কথাই বিশেষ-ভাবে বলিতেছি। গ্রীষ্মের ছুটিতে যখন দেশের বাড়ীতে যাই, তখন পুরানা বইয়ের দোকান হইতে একখানি সেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী কিনিয়া লই। এই পুস্তক হইতে আমাদের পাঠ্য বইগুলি বাদে সেক্স-পীয়রের আরও বহু নাটক ঐ সময় পড়িয়া ফেলি। তখন এই সব পাঠে কতখানি আনন্দ পাইয়াছিলাম বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। জুলিয়াস সীজার, এজ ইউ লাইক ইট, টেম্পেষ্ট, হ্যামলেট, All's well that ends well প্রভৃতি একে একে পাঠ করি। সব বইয়ের সব কথাই যে তখন বুঝিয়াছি তাহা নয়, তবে উহাদের প্রত্যেকটি হইতেই বীর রস, মধুর রস, হাস্য রস, বীভৎস রস, কতকটা উপভোগ করিতে সক্ষম হই। স্কুলে Lamb's Tales form Shakespeare আমরা পড়িয়াছিলাম। নাটক-গুলির কাহিনী অংশ ইহা হইতে পূর্বে জানিতে পাই। এবারে মূল পড়িয়া ইহার ভিতরকার রস-মাধুর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে খানিকটাও সক্ষম হইলাম। আরও দেখিলাম ল্যাম্ব মহোদয় সেক্সপীয়রের কথা-গুলি যথাসম্ভব হুবহু রাখিয়া কাহিনী রচনায় কি নৈপুণ্যই না প্রদর্শন করিয়াছেন। সেক্সপীয়রের প্রধান চারিখানি নাটক আমাদের পাঠ্য, কাজেই ইহার উপরে লিখিত সমালোচনা পুস্তকও আমাদের পাঠ করিতে হইয়াছিল অনেক। ব্রাডলি'র চারি-খানি বিয়োগান্ত নাটকের উপরে বিশদ বক্তৃতাবলী পড়িতে বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। ডাউডেন হাডসনের সমালোচনা পুস্তকও আমরা তখন পড়ি। কিন্তু এ দুইখানি, বিশেষতঃ শেষোক্ত পুস্তক বড়ই খটমটে লাগিত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অত বড় বিজ্ঞানী হইয়াও সেক্সপীয়রের খুবই ভক্ত ছিলেন। মূল নাটক এবং ইহার উপর লিখিত সমালোচনা পুস্তকগুলি তাঁহাকে পাঠ করিতে দেখিয়া পরবর্তী-কালে কতই না বিস্ময় মানিয়াছি। এক সময় জলপাইগুড়িতে এক অধ্যাপকের বাড়ীতে কিছুকাল ছিলাম। বাড়ীর কর্তাকেও তখন সেক্সপীয়রের নাটকগুলি তন্ময় হইয়া পড়িতে দেখিয়াছি। সেক্স-পীয়রের নাটকগুলি আমাদের জীবনে কতই না রসদ জোগাইয়াছিল। পরে সেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলীর একটি সুষ্ঠু সংস্করণ ক্রয় করিয়া পুনরায় ঐ সব কথা পাঠে নিবিষ্ট হই। সেক্সপীয়রের আদি-রসাত্মক সনেটগুলির সঙ্গে হয়ত অনেকেরই পরিচয় এযুগেও ঘটিয়া থাকিবে।

ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়নের কথা বলিতে গিয়া অনেক কথাই বলা হইল; আরও কিছু এখানে বলা দরকার। ইংরেজীতে অনার্স লইলে ইংরেজী ভাষাতত্ত্ব এবং ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসও পাঠ করিতে হইত। আমরা শেষোক্তটির পাঠ লইয়া-ছিলাম অধ্যাপক ব্রজসুন্দর রায় মহাশয়ের নিকট হইতে। তাঁহার কথা ইতিপূর্বেই একবার বলিয়াছি। যেমন ইংরেজ জাতের ইতিহাস তেমনি ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস। কত বৈচিত্র্য; ক্রমবিকাশের কত বিস্ময়কর পর্ব, এই সাহিত্যের ইতিহাসের স্তরে স্তরে আমরা প্রত্যক্ষ করি। ব্রজসুন্দর বাবু এই ইতিহাস আমাদের পড়াইয়াছিলেন। ব্যক্তিগত ভাবে আমি নানা কারণে তাঁহার স্নেহ-প্রীতি লাভে সমর্থ হই। তাঁহার অধ্যাপনার বৈশিষ্ট্য যে বিশেষ লক্ষ্য করিতাম এমন মনে হয় না, কিন্তু ব্যক্তি ব্রজসুন্দরের চিত্রপট বড়ই সুন্দর ছিল। আমাদের কলেজ ছাড়িবার পর, তাঁহাকে লইয়া সরস্বতীপূজার সময় একবার কতই না গোলমাল হয়। তিনি সেবে কলেজ ছাড়িয়া শিলংয়ের একটি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া যান। অবসর জীবনেও তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছি বহুবার। বুঝিতাম, আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ-ভালবাসা তখনও অটুট রহিয়াছে।

ইংরেজী ভাষাতত্ত্ব বিষয়টি পড়াইতেন যতদূর মনে

হয় অধ্যাপক প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়। ভাষাতত্ত্ব পড়িতে তখন আমার বড়ই ভাল লাগিত। পরবর্তীকালে জানিতে পাই, গত শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ভাষাতত্ত্বের আলোচনা হইতেই এশিয়া ও ইউরোপ খণ্ডের বিভিন্ন জাতির মূলগত ঐক্যের সন্ধান পণ্ডিতগণ পান। আর ইহা হইতেই বিবিধ বিষয়ে আলোচনার সুবিধা হয়। ভাষাতত্ত্বের মূল কথা—এক একটি শব্দের আনুপূর্বিক ইতিহাস। যেমন 'Tellen' শব্দটি, এটি আসিতে অ্যাংলো-স্যাক্সন শব্দ। ইহার মানে To count' অর্থাৎ গণনা করা। আমরা এক, দুই, তিন এইরূপ গণনা করিয়া থাকি। ঐ শব্দটির দ্বারা এইরূপ গণনা করা বুঝাইত। গণনা করিতে হইলে কথা বলিতে হয়—সেযে এ শব্দটির মানে হইল কথা বলা বা শুধু বলা। শব্দটিরও রূপান্তর ঘটে। ব্যাঙাচির ক্রমবিকাশের কথা আপনারা জানেন। প্রথমে ইহার লেজ থাকে, বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে লেজটি খসিয়া যায়। তখন ইহার পরিপূর্ণ রূপ দেখি 'ব্যাঙ'এর মধ্যে। 'Tellen' শব্দটিরও শেষে 'en' লেজটি খসিয়া গেল—ইহা রূপ লইল 'Tell' শব্দে। এইরকম কতশত ভাষার রূপ বদলাইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার মানেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে—তাহার ইয়ত্তা নাই। বিভিন্ন ভাষার তত্ত্বকথা লইয়া পণ্ডিতগণ যুগে যুগে রত হইয়াছেন। বাঙলা ভাষাতত্ত্বেরও একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস এবং ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তর বই পুথি রচিত হইয়াছে, এখনও হইতেছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কয়েকখানি দেখি, কিন্তু ভাষাতত্ত্বের উপর পুস্তকাদির বড়ই অসদ্ভাব।

— —

ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকের ডায়েরী

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সমাজের আর্থিক পরিস্থিতি ও সংস্কার

ডেনমার্কবাসীদের জীবনে আর্থিক অবস্থার তারতম্য ও বিভেদ সামান্য। বস্তুতঃ পৃথিবীর যে ডেমোক্রেটিক দেশের সমাজ আর্থিক ও শিক্ষানৈতিক দিক দিয়া সাম্য অবস্থা লাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ডেনমার্ক একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। অর্থ ও শিক্ষানৈতিক এই সাম্যাবস্থা দেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে এমন একটি রূপ দিয়াছে—যাহা সেই দেশে কিছুকাল থাকিলে সহজেই চোখে পড়ে। ডেনিশরা সহজে বিদেশীদিগকে আপন করিয়া লইতে পারে, পথে ঘাটে বিদেশী কেহ চোখে পড়িলে ব্যস্ত হইয়া সাহায্য করিতে আসে।

ডেনমার্ক ইনকমটেক্স্ পদ্ধতি এইরূপ যে অতিরিক্ত ধনসঞ্চয় কাহারও পক্ষে সম্ভব নয় আর ভূমির মালিকানা-আইনের সংস্কার এতদূর গড়াইয়াছে যে বৃহৎ খামারের সংখ্যাও অতি নগণ্য। কোন জোরজবরদস্তি বা রিভলিউশনের মাধ্যমে ইহা সংঘটিত হয় নাই ; দেশবাসীর সংহতিবোধ ও শিক্ষার গুণেই তাহা সম্ভব হইয়াছে। ১৯১৯ সালে যে ভূমি আইন প্রণয়ন করা হয়, সেই আইনের বলে বৃহৎ বৃহৎ ফার্মগুলির অংশবিশেষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফার্মে রূপান্তরিত করা হইয়াছে আর সেজন্য বড় ফার্মের মালিকেরা গবর্ণমেণ্ট হইতে মূল্যও পাইয়াছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে সমাজ-উন্নয়ন আইনের সংস্কারের ফলে নিম্নবিত্তদের আর্থিক অবস্থা ক্রমশই উন্নত হইয়া উঠিয়াছে।

১৯৪৭-৪৮ সালের গণনানুযায়ী টেক্সদাতাকারীদের মধ্যে শতকরা ৭'১ জনের বাৎসরিক আয় ১০০০ ক্রাউন, শতকরা ১৭'২ জনের বাৎসরিক আয় ২০০০ হইতে ৫০০০ ক্রাউন। শতকরা ২৫'৫ জনের বাৎসরিক আয় ৫০০০ হইতে ১০,০০০ ক্রাউন, আর শতকরা ৫ জনের আয় ১০,০০০ ক্রাউনের উর্ধ্বে। জনসাধারণের আয়ের এই সমতা ডেনমার্কবাসীদের অধীনে যে সাম্য ও ঐক্যের সন্ধান দিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রবল আয়ের অসমতা সমাজ-জীবনে পরস্পরের মধ্যে অনৈক্যের একমাত্র কারণ নয়, অন্য অনেক কারণ থাকে। বস্তুতঃ সম-আয় পর্যায়ের পল্লীবাসী ও শহরবাসীর মধ্যে তুলনাই করা যায় না। অল্প রোজগারী পল্লীবাসী অধিকতর আয়কারী শহরবাসী অপেক্ষা বহুগুণ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন।

১৯৩০ সাল পর্যন্ত স্কানডিনেভীয় দেশসমূহের মধ্যে ডেনমার্ক সমাজ উন্নয়নমূলক আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অগ্রণী ছিল, কিন্তু পরে সুইডেন প্রথম স্থান অধিকার করিয়া লয়। ইহার একাধিক কারণ আছে। একটি এই যে, যুদ্ধের সময় ডেনমার্ক হিটলার কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। যুদ্ধের সময়টা ডেনমার্কবাসীর পক্ষে চরম বিপর্যয়ের সময় ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য অচল অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের পূর্বেই ডেনিশ সমাজ এমন এক উন্নত স্তরে পৌঁছিয়াছিল যে বিপর্যয়ের দিনেও দেশবাসী ধৈর্য রক্ষা করিয়া সুদিনের অপেক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ফলে যুদ্ধোত্তর কালে আবার দেশ ও সমাজ উন্নয়নে দেশবাসী তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে যুদ্ধের পূর্বেই অর্থাৎ ১৯৩৩ সালে ডেনিশ পার্লামেণ্ট বিশেষ

বিশেষ সমাজ উন্নয়ন আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় তখন আর সেইগুলিকে কার্যকরী করা সম্ভব ছিল না।

ডেনিশ সমাজের অবস্থা ভাল করিয়া জানিতে গেলে কতকগুলি মৌলিক তথ্য মনে রাখা প্রয়োজন। ১৯১০ সাল হইতে জনসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ১৯৪৬ সালে হাজারে ২৩'৪ জন করিয়া বাড়িয়াছে। মৃত্যুর হার সেই বৎসরে হাজারে ১০'২ জন। সেই সময় হইতে ক্রমাগত কয়েকবৎসর যাবৎ জন্মের হার মৃত্যুর হার অপেক্ষা বেশী হইতেছে। মানুষের আয়ের আলোক বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সকল দেশে এরূপ হইতেছে। ১৯৪৭ সালে এক বৎসরের অনধিক শিশুর মৃত্যুর হার শতকরা ৪'১ ছিল আর পুরুষদের গড়পড়তা আয়ু ৬৫'২ বৎসর এবং নারীদের ৬৯'৭ বৎসরে দাঁড়াইয়াছিল।

প্রধান নগর কোপেনহাগেনের পর বৃহৎ অরহুস্ শহর (Aarhus), জনসংখ্যা ১১০,০০০; ওডেন্সে (Odense) জনসংখ্যা ৯৪,০০০ আর অলবর্গ জনসংখ্যা ৬২,০০০। তাহাড়া আরও দশটি শহর যাহাদের লোকসংখ্যা ২০,০০০ হাজারের উর্ধ্বে। কোপেনহাগেনের দুইটি শহরতলীতে ২০,০০০ করিয়া লোকের বাস।

১৯১৫ হইতে নারীপুরুষ সকলের সমান ভোটাধিকার আছে এবং পার্লামেন্টে ও মিউনিসিপ্যালিটিতে নারীরা সদস্য হইতে পারেন। ১৯৪৮ সালে দেশের লোকসভাতে (Folketing) ১৪৯ সদস্য মধ্যে ১৪ জন মহিলা সদস্য এবং রাজ্যসভাতে (Landsting) ৭৬ জন সদস্য মধ্যে ১১ জন মহিলা সদস্য ছিলেন। দেশের মিউনিসিপ্যালিটিতে মোট সদস্য সংখ্যা তখন ১১,৪৮৯ জন ছিলেন। তন্মধ্যে ৩৪৫ জন ছিলেন মহিলা। কিন্তু মিউনিসিপ্যাল-অভিভাবক বোর্ডে মহিলা সদস্যের সংখ্যার হার ছিল শতকরা ৪৭'৬ জন। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে সামাজিক আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেশের নারীরা পুরুষদের প্রায় সমপর্যায়ে কাজ করিতেছেন।

দেশের শতকরা ২৮ জন কৃষি ও মৎস্য ব্যবসায়ের ৩১ জন ইনডাষ্ট্রি ও হাতের কাজে, ১৯ জন ব্যবসা-বাণিজ্য ও ট্রান্সপোর্টের কাজে জীবিকার্জন করে। ১৯৪০ সালের গণনায় জানা যায়, দেশের শতকরা ৬৮ জন সকল রোজগারী ছিল।

মাতৃ ও শিশুমঙ্গল

ডেনমার্কের মাতৃ ও শিশুমঙ্গল ব্যবস্থাদির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়িয়াছে। সন্তানসম্ভবা নারীরা বিনাখরচে ডক্টর ও নার্সদের সাহায্য পায়। সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে ও পরে মায়েরা বিনামূল্যে দৈনিক দুধ পান। সন্তান-সম্ভবাগণ সন্তান প্রসবের পূর্বে ছয়মাসকাল দিনে আধ লিটার এবং সন্তান প্রসবের পরে ছয়মাসকাল এক লিটার করিয়া দুধ খাইতে পান।

কোপেনহাগেন ও অন্যান্য শহরগুলিতে নার্সেরা মাসে দুইদিন বাড়ী বাড়ী যাইয়া শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং মাতাদিগকে সন্তানপালন সম্পর্কে যথোচিত নির্দেশ দেন। এই ব্যবস্থার কারণ এই যে, সাধারণতঃ ঘরেই শিশুর যত্নের ত্রুটি ঘটে। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্যই এই ব্যবস্থা। প্রয়োজন হইলে নার্সেরা সারাদিন থাকিয়া হাতে কলমে শিশুর যত্নপ্রণালী দেখাইয়া দেন। তাহাড়া অভিভাবকমাত্রই বিনাব্যয়ে নিজেদের শিশুদের স্বাস্থ্য ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করাইতে পারেন। শিশু-জীবনের প্রথমবৎসর ডাক্তার তিনবার বিনাখরচে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং পরে প্রতিবৎসর একবার করিয়া পরীক্ষা করেন। সাত বৎসর বয়সে শিশুরা আবশ্যিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে এবং সেই পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু থাকে। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে, বলাই বাহুল্য।

নার্সিং শিক্ষার ব্যবস্থা

দেশময় শিশুমঙ্গল ব্যবস্থা কার্যকরী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য নার্সিং-শিক্ষার ব্যবস্থাকেও পুষ্ট করিতে হইয়াছে।

ডেনমার্ক, জনতা কলেজের জন্য বিখ্যাত; এই উচ্চ জন-শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্মও ডেনমার্কে। ১৯৩৪ সালে ডেনমার্ক ঘুরিবার সময় আমি অধিকাংশ জনতা কলেজেরও শিক্ষা-প্রণালী অনুধাবন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। পরে ১৯৪৩ সালে UNO এর ফেলোরূপে ডেনমার্ক পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করি যে পাঁচটি ধর্মা—বোরকপ (Borkop), উব্বেরোপ (Ubberup), ফারেভেইলজে (Farevelje) ও তেস্টরূপ (Testrup) নামক জনতা কলেজকে নার্সিংশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। দেশের প্রয়োজনেই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ইহা সমাজ প্রগতিরই লক্ষণ। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাতের ও আঠার বৎসরের মেয়েদিগকে নার্সিং-বিদ্যার হাতে খড়ি দেওয়া হয়। তাহাড়া অরহুস (Aarhus) বিশ্বালয়ে (১৯৩৮) দেশের স্বাস্থ্য-বিভাগের তৎপরতায় "পোস্ট গ্রেজুয়েট স্কুল অব নার্সিং" শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৩৭ সালে পার্লামেন্টে এক বিশেষ আইন পাস করা হয়। এই আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেশের শিশু-স্বাস্থ্যের উন্নতি ও শিশু-মৃত্যুর হার রোধের জন্য দেশময় নার্সিং পরিচালনা ও শিক্ষা দিবার জন্য অভিজ্ঞ নার্স তৈরী করা; নার্সিং-বিদ্যায় সুনিপুণ পারদর্শিনীগণ যাহাতে দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কল-কারখানায় ও টি. বি. হাসপাতালে সুষ্ঠুভাবে কাজ করিতে পারেন এবং শিশুমঙ্গল সমিতি চালনা করিতে পারেন; দ্বিতীয়তঃ এরূপ শিক্ষিতা নার্স মিউনিসিপ্যালিটি নিযুক্ত করিলে রাষ্ট্রকোষের অর্থ সাহায্য পাইবেন। ঐ উদ্দেশ্যকে রূপ দিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নার্সিং ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়। এই ডিপার্টমেন্টে তিনটি পৃথক কোর্স আছে যথা—(1) Public Health Nursing, (2) Administration in Nursing Service and Nursing Education এবং (3) Teaching in Schools of Nursing.

নার্সিং শিক্ষার এই উদ্যোগের ইতিহাস আছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে ডেনমার্কে শিশু-মৃত্যুর হার একেবারে কম ছিল না। ইহার কারণ অনুসন্ধানের ফলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, শিশুদের তৎকালীন খাদ্য ব্যবস্থাই শিশু-মৃত্যুর জন্য বিশেষ-ভাবে দায়ী। ১৯৩০ সালেও শিশু-মৃত্যু হার প্রথম বৎসরে ৮ ছিল, কিন্তু শিশুমঙ্গল ব্যবস্থার ফলে ১৯৪৮ সালে মৃত্যু হার ৩·৪ পর্যন্ত নামিয়া যায়। ১৯৩৭ সালে একটি শিশুমঙ্গল আইন প্রবর্তন করা হয়। এই আইনের বলে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে Public Health Nurses-এর বেতনের অর্ধেক রাজ্যকোষ হইতে দিবার ব্যবস্থা হয়। পরবর্তী বৎসর হইতে অধিকাংশ মিউনিসিপ্যালিটি Public Health Nurses মোতায়েনে তৎপর হইয়া উঠেন। এই নার্সদের প্রধান কাজ গৃহে গৃহে যাইয়া মাতাদিগকে সন্তানপালন হাতে কলমে শিখাইয়া দেওয়া। কোন শিশুর জন্ম হওয়ার দু'চার দিন পরই নার্সেরা ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের গৃহে যাইয়া শিশু-পরিচর্যার কাজে মাতাদিগকে সাহায্য করেন। নার্সের এই সাহায্য গ্রহণ করা না করা অবশ্য মায়েদের উপর নির্ভর করে। সন্তান পালনে অভিজ্ঞ যাঁরা তাঁরা এই সাহায্য ইচ্ছা করিলে নাও লইতে পারেন; কিন্তু কার্যতঃ সকল মাতাই নার্সের সাহায্য লইয়া থাকেন। ইহার কারণ এই যে, গৃহেই শিশুর যত্নের ত্রুটি ঘটে, আর দ্বিতীয়তঃ পল্লীর মাতাদের পক্ষে শিশুসন্তান সঙ্গে লইয়া দূরের ক্লিনিক-এ যাওয়া আসা কষ্টসাধ্য হয়। অবশ্য বড় বড় শহরে ক্লিনিক নিকটে থাকিলে শহরের মাতারা শিশুদিগকে ক্লিনিকে দেখাইতে পারেন।

পূর্বে সুইডেনের মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল সম্পর্কে লিখিয়াছি। ডেনমার্কের ব্যবস্থা অনেকটা সুইডেনের মত। ১৯৩৪-৩৫ ও পরে ১৯৫৩ সালে ডেনমার্ক ঘুরিবার কালে শহরে পল্লীতে বহু শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান ঘুরিয়া দেখিয়াছি। আজ এখানে তিন ধরনের তিনটি পৃথক শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের বিবরণ দিতেছি। শিশুমঙ্গল ব্যবস্থাদি এ-দেশে কিরূপ তাহা এ বিবরণ হইতে আশা করি বুঝা যাইবে।

ডেনমার্কের সকল শহরেই নার্সারি ও কিণ্ডার-গার্টেন অর্থাৎ শিশু-বিদ্যালয় আছে। শিশুমাতারা বাহিরে কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার পূর্বে শিশুদিগকে এই সকল প্রতিষ্ঠানে রাখিয়া যান, আর শিশুরা দিনের বেলাটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই থাকে, উপযুক্ত শিক্ষা ও যত্ন পায়।

শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান : কোপেনহাগেন নগরের এক প্রান্তে 'উত্তরস্লেভ' (Utterslev) নামক শিশু-প্রতিষ্ঠানে একদিন পর্যবেক্ষণে কাটাইয়াছিলাম। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৪৪ সালে নগর পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানে পাঁচ ভাগ আছে যেমন :—

এক :—আড়াই বৎসর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের নার্সারি।

দুই :—আড়াই হইতে সাত বৎসর বয়সের শিশুদের বিদ্যালয় বা কিণ্ডারগার্টেন।

তিন :—যে সকল বালকবালিকা আবশ্যিক বিদ্যালয়ে যোগ দিয়াছে—অবসর কালে তাহাদিগকে উপযুক্ত কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা।

চার :—তরুণ বয়স্কদের জন্য একটি ক্লাব। ইহা সন্ধ্যার পর খোলা হয়।

পাঁচ :—একটি অভিনব কিণ্ডারগার্টেন—যেখানে স্নায়ু-দুর্বল শিশুদের রাখিয়া বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা করেন।

একজন অভিজ্ঞা মহিলা এই প্রতিষ্ঠানটি চালনা করেন এবং প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন বাড়ীতে বাস করেন।

প্রথমোক্ত নার্সারি পরিচালনা করেন এক শিক্ষিতা নার্স। এই প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময়ে শিশুদিগকে লইয়া আসিলে বাড়ীর পোষাক বদলাইয়া প্রতিষ্ঠানের পোষাক পরানো হয় আর এই পোষাকেই শিশুরা থাকে; আবার বাড়ী লইয়া যাওয়ার সময় বাড়ীর পোষাক পরাইয়া দেওয়া হয়। কোনপ্রকার ইনফেকশন যাহাতে না হওয়ার সেই জন্যই এই ব্যবস্থা। শিশুদের সকল প্রকার যত্ন প্রতিষ্ঠানে লওয়া হয়। যে সকল শিশু অপেক্ষাকৃত দুর্বল তাহাদের জন্য 'রেডিও-থেরাপী' (radio therapy)-এর ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয়তঃ কিণ্ডারগার্টেন পরিচালনা করেন এই বিদ্যার পারদর্শিনী একজন অভিজ্ঞা মহিলা; এই সেকশনে কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী আছেন। প্রত্যেক শিক্ষয়িত্রী ২০ জন করিয়া শিশুর ভারপ্রাপ্ত। প্রত্যেক ক্লাসে শিশুদের জামাকাপড়ের জন্য wardrobe, বসিবার ঘর ও খাওয়ার টেবিলের ব্যবস্থা আছে।

বিদ্যালয়ের বাহিরে শিশুদের অবসর-কালীন কাজ :—এই সেকশনে সাধারণ বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা ছুটির পর সমবেত হয়। এখানে বহুপ্রকারের শিল্পকাজ শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। খেলার মাঠে বিবিধ খেলার ব্যবস্থা আছে। বাগান করিবার উপযোগী ছোট ছোট প্লট তৈরী আছে। ছেলেমেয়েরা যার যার রুচিমত কোন শিল্প বা বাগানের কাজ করে কিন্তু খেলাধূলা সকলেই করে। প্রত্যেকটি শিল্প, বাগানের কাজ ও খেলা-ধূলার জন্য শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আছেন। সেকশনটি বিকাল পাঁচটা হইতে আটটা পর্যন্ত খোলা থাকে। ছেলেমেয়েরা এখানে আপনাপন ঘর হইতে রুটি মাখন লইয়া আসে। প্রতিষ্ঠান হইতে সকলকেই দুধ খাইতে দেওয়া হয়।

তরুণদের ক্লাবটি ক্লাবের সদস্যরাই চালনা করে। ইহা সন্ধ্যার পর খোলা হয়। ঘরে যে সকল খেলা চলে সেই সকলের ব্যবস্থা আছে।

দুর্বল স্নায়ুবিশিষ্ট ২০টি শিশুর জন্য একটি পৃথক কিণ্ডারগার্টেন আছে। শিশুদের থাকা ও খাওয়া এবং শুইবার ব্যবস্থা আছে। শিশুমনস্তত্ত্ববিশারদ ও অভিজ্ঞ নার্সেরা এ বিভাগটি দেখাশুনা করেন।

উপরে একটি শিশু-প্রতিষ্ঠানের কথা লিখিয়াছি, এবার অন্য ধরণের একটি শিশু-গৃহের কথা লিখিতেছি।

শিশুগৃহ :—কোপেনহাগেনের উপকণ্ঠে ট্রেপিলে-লাগেন (Trepilelagen) নামক স্থানে অবস্থিত একটি শিশুগৃহ। ইহা আবাসিক প্রতিষ্ঠান। তিন হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়স্ত শিশুরা এই গৃহে থাকিয়া শিক্ষা পায়। কৃত্র পিতামাতার সন্তান অথবা বিচ্ছিন্ন পিতামাতার সন্তান অথবা যে সকল শিশুর বাবা মা বা অভিভাবক নাই, শুধু তাহারাই এ প্রতিষ্ঠানে বাস করে। এই গৃহের ছাত্রসংখ্যা ৩১ জন। ৭ জন শিক্ষয়িত্রী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের কাজ করেন।

এই গৃহে তিন হইতে নয় বৎসর বয়স্কদের থাকা-খাওয়া ও যাবতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু নয় বৎসরের অধিক বয়স্ক বালকবালিকারা নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে যাইয়া লেখাপড়া শিখে।

শিশুমঙ্গল ব্যবস্থার এরূপ বহুদিক আছে।

ভারতবর্ষে শিশুমঙ্গল কাজ স্থানে স্থানে আরম্ভ হইয়াছে সত্য, কিন্তু দেশের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি এরূপ নয় যে আতীয়ভাবে সকল শিশু ও মাতৃমঙ্গলের কাজ সম্ভব। তবুও এ কথা বলিব যে, শিশু ও মাতৃমঙ্গলের সার্বজনীন ব্যবস্থা যতদিন পর্যন্ত না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত সবল সুস্থ নাগরিক আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা দেশে শিশুকে 'বাল গোপাল' নাইকে 'গোবাচ্চা' বলিয়া শ্রদ্ধা দেখাই অথচ সমাজে বালক শিশুরীর সংখ্যাও কম নয়। শিশু ও মাতৃমঙ্গলের সার্বজনীন ব্যবস্থা যতদিন পর্যন্ত না হইতেছে ততদিন পর্যন্ত নিরাশ হইয়া বসিয়া থাকাও কাজের কথা নয়।

দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িতেছে, অভিভাবক-সঙ্ঘও গড়িয়া উঠিতেছে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের সমবেত প্রচেষ্টায় বেসরকারীভাবে শিশুমঙ্গলের ব্যাপক প্রচেষ্টা সম্ভব কি না, তাহা ভাবিয়া দেখার সময় আসিয়াছে। রাষ্ট্রকোষের অর্থসাহায্য না পাইয়াও সমাজ-পরিচালকেরা শিশুমঙ্গল কাজে অনুপ্রাণিত হইলে তাহা সমাজ নিশ্চিতই লাভবান হইবে।

শিশুশিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথ

(শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন)

বাঙালীকে যিনি গানের রাজা করে গেছেন, যাঁর গীতাঞ্জলি জগৎকবিসভায় সমাদর পেয়েছে, যাঁর কণ্ঠে উপনিষদের উপদেশ নবরূপ ধারণ করে হিংসাপীড়িত ধরাকে সঞ্জীবিত হওয়ার মন্ত্র দিয়েছে, তাঁর আর এক মূর্তি ছিল, তাঁর ইস্কুলে। তিনি নিজে ইস্কুলে পড়ার সামান্য কিছু আস্বাদন জীবনে পেয়েছিলেন, কেতাবমত স্কুল কলেজে তিনি পড়তে পারেন নাই। কিন্তু শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁর সূত্রগুলি এত চমৎকার যে আজও তা কাজে লাগবে—চিরকালই কাজে লাগবে। কারণ তাঁর দৃষ্টি ছিল গভীর, অন্তর্গামিনী—মূলে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে।

চল্লিশ বৎসর বয়সে কেন একটা নতুন বিদ্যালয় খুলে বসলেন, সে জন্য তাঁর ভ্রাতাদের কাছে এবং নিজের কাছেও যে কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে

আমাদের বোঝাবার অনেক কিছু আছে। আমরা তো সর্ব্বদাই জিজ্ঞাসা করি, শান্তিনিকেতনের বুনিয়াদ কোথায় এবং কি? কবি বলেছেন, কী কাণ্ড। বুনিয়াদ বলে জানতে চাওয়াটার মূলে যে ভুল! বাড়ী ঘরের বুনিয়াদ হয়, কিন্তু যে ভাব মূলে আছে, সে ভাব তো বীজের মত, গাছ হলে আর তাকে আলাদা করে দেখা যায় না। ইট কাঠ পাথর সিমেন্টের আমরা আজ যতই দাম দিই না কেন, শিক্ষার প্রাণবস্তু আছে অন্যত্র। তার বীজ অন্যত্র। সুতরাং শান্তিনিকেতনের বুনিয়াদি তাদের ঘরে।

আসলে তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কোনও নূতন তত্ত্ব প্রচারের জন্য নয়, ছেলেবেলায় বিদ্যালয়ে গিয়ে নিজে কি দেখেছিলেন সেই অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করেই তাঁর এ বিষয়ে কর্মের সূত্রপাত।

মাতৃস্তন্যে শিশু পুষ্টি লাভ করে; শিশু মাকে আঁকড়ে ধরে, সঙ্গে সঙ্গে তার আহারও পায়। জগতের সব চেয়ে সেরা সেই মাতৃস্তন্য পান, সে আহারে শরীর পুষ্ট হয়, প্রাণ পায় শক্তি। জগতের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যে কার্যকারণযোগে নয়, প্রেমের সম্বন্ধ, এই শিক্ষাও মায়ের কাছ থেকে শিশু সর্বপ্রথমে পায় এই পথেই। লাভের হিসাবে কাজের দিক দিয়ে নয়, প্রেমের হিসাবেও একটা আছে।

'ধূলামাখা এই ধরণীর সন্তান শিশুরা, ফুল যেমন সূর্যের আলো চায়, বাতাস চায়, তাদের দেহমনও তেমনি আলো চায়, বাতাস চায়। ছেলে চট করে গাছে চড়ে একেবারে মগডালে উঠে বসলো, অতি মাত্রায় ডিসিপ্লিনে বিশ্বাসী শিক্ষক এ দৃশ্য দেখলে ভাববেন "অংশী" এর পিছনে যে মানুষের প্রকৃতি পরিচয়ের স্বাভাবিক প্রয়াস তা তিনি হয়তো বুঝতে পারবেন না। কবি গর্ব করে বলছেন, আমার বিদ্যালয়ের ছাত্ররা গাছপালার আকৃতির সঙ্গে নিজের মত একটা পরিচয় লাভ করছে এবং এটা শিক্ষার উপেক্ষণীয় অঙ্গ নয়। কবি নিজে যে জগতে ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছিলেন সেখানে গাছের সঙ্গে কোনও নিকট সম্বন্ধ ছিল না—বটগাছ ঘুরেই ছিল। কিন্তু কবি চেয়েছিলেন তাঁর বিদ্যালয়ের ছেলেরা যেন বুঝতে পারে যে, জগতে গাছপালারও একটা বিশেষ স্থান আছে, বাতাস থেকে কার্বন নিয়ে 'ফোটোফিল' বা পত্রহরিৎ করে বলে শুধু নয়, কাজের দিক দিয়ে নয় প্রাণবন্ত বলে, নিজেদের প্রাণ আছে বলে এইখানে তাদের সঙ্গে আমরা আছি।

তাই তিনি শিক্ষা থেকে আড়ম্বরকে বাদ দিয়ে সরল ভাবে প্রকৃতির কাছে শিশুকে রেখে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।

যে তোতা গান গাইত, শাস্ত্র পড়তে জানত না, কায়দাকানুন কাকে বলে তার ধার ধারত না, তার জন্যে খাঁচা তৈরি করে শিক্ষার ব্যবস্থাটা পাকা করা হোল। তার করুণ কাহিনীর মধ্যে কবি দিয়েছেন আধুনিক শিক্ষার ব্যর্থতার ইতিহাস। পেটের মধ্যে শুকনো পাতা খসখস গজগজ করে, পাখি নাচায় না, গান গায় না, ওড়ে না, দানা না পেলে চেঁচায় না পর্যন্ত, তোতাকাহিনীর সতর্কবাণী কি আজও আমাদের কানে বাজে না? এই মৃত্যুর বিরুদ্ধেই তো আমাদের তিনি সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন।

শিক্ষার আদর্শ কি, সিঁড়ির গরাদের হাতে মুকুল আগুনে ভাজা হবে, না শিক্ষার্থীর জীবন ঘড়ির মত দম দিলেই চলবে, এ সব কথা কবিকে কখনও উদ্‌ভ্রান্ত করতে পারেনি। তিনি ফুল সম্বন্ধে কাটাছাঁটা মত নিয়ে তো কাজ আরম্ভ করেন নাই। তবে প্রাচীন ভারতের চতুষ্পাঠীর আদর্শ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, সন্দেহ নাই। শিক্ষকতা পেশা নয়, জীবন যাপনের একটা প্রকার, উন্নত আদর্শের অনুশীলন, ছাত্র ও শিক্ষক একই অবস্থায় জীবনের সমস্যা সমাধান করে চলেছেন, এই ধারা—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যা শিক্ষাকে স্বাধীন করে রেখেছিল, তার স্বপ্ন কবি দেখেছিলেন। একত্র বাস, সমান অকৃতি,

সমান হৃদয়—শুধু বেদমন্ত্রে নয়, চতুষ্পাঠীর জীবনেও ছিল, শিক্ষকের ভালবাসাই একটা পরম সম্পদ। বড় দুঃখেই তিনি বলেছিলেন, শিশু চায় মাটি, আমরা মাটি কেড়ে নিয়ে তাকে শেখাই ভূগোল, সে চায় ভাষা আমরা তাকে শেখাই ব্যাকরণ, সে চায় মহাকাব্যের আস্বাদ, আমরা তার সামনে সন তারিখের তালিকা রাখি। কিন্তু নীরব শিক্ষাই যে সার্থক শিক্ষা, আকাশে বাতাসে মহাভাবের সৃষ্টি যেখানে সেখানকার নিত্য একটা শিক্ষা নিশ্বাসে নিশ্বাসে আসবে, এই ধারণা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি অর্জন করেছিলেন। সঙ্গীত, সাহিত্য প্রভৃতির শিক্ষা তো শুনে শুনে হয়, সান্নিধ্য থেকে জ্ঞান হয়—শিশুরা তাদের সহজ প্রকৃতি অনুসারে এসব শিখে নেয়। গৃহপালিত শুক পাখি যেমন পণ্ডিতের ঘরে থেকে বিদ্যার্থীদের শুদ্ধ উচ্চারণ শিখিয়ে দিত, এ হয়তো প্রাচীন ভারতের শুধু কাব্যের বর্ণনা নয়, প্রকৃত ঘটনারও উল্লেখ। গুরুর সেবার জন্য গুরুগৃহে বাস, অর্থাৎ সান্নিধ্যের জন্য। সেই সন্নিধি, যার কথা ভারতবর্ষে পুণ্যতোয়া নদীর স্মরণেও হয়। গুরুদেবের লোকান্তরিত হবার পরেও গান্ধীজী বলেছিলেন, শান্তিনিকেতনের আকাশে বাতাসে গুরুদেবের স্পর্শ আছে। এখানেও সেই সন্নিধিরই কথা। আমরা যাকে বলি স্থান মাহাত্ম্য। বই পড়ে নয়, পরীক্ষা পাশ করে নয়, জীবনের যে আদর্শ আমাদের প্রতিটি কর্মে ফুটে উঠছে, সেই আদর্শ যা সংক্রামক। বড়দের পক্ষে একথা যতখানি খাটে, ছোটদের বেলায় তার চেয়ে অনেক বেশি, কারণ তাদের সহজবুদ্ধি নানাপ্রকার অভ্যাস ও চিরাগত নীতির দ্বারা বিকৃত হয় নি।

তাই কবি শিশুদের কণ্ঠে, শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীদের কণ্ঠে গান দিয়েছেন—আশ্রমের আকাশ-ভরা কোলে তাদের শুভ্র ফুলছে, নিত্য নূতনতা তার আর ফুরাতে চায় না। সকাল সন্ধ্যায় নীলগগনের সোহাগ, তরুমূলের মেলা, আমলকি পাতার নাচ—তার প্রভাব শিশুকাল থেকে বহু বয়স পর্যন্ত চলেছে, মনের মাঝে প্রেমের সেতার তার সুরে বাঁধা রয়েছে—এই প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মিলনই যে শিক্ষার বড় কথা, বিশেষ করে শিশু শিক্ষার।

পাঠ্যপুস্তকের বাহুল্য, পুস্তকস্থা মা সরস্বতীর বিদ্যার ভার, সরঞ্জামের অভাব—এ সব বড় কথা নয় এমন কি আজকালকার বেতনভুক সাততলা স্কুলবাড়িও বড় কথা নয়, সে তো প্রয়োজনের খাতিরে, কিন্তু যে প্রেম শিশুদের কাছে বড়দের সহজ করে ধরতে ও মেলাতে পারে, সেই প্রেমই যে চাই সর্বপ্রথমে। বিনোবাজীর একটা কথা খুব মনে পড়ে—বলেছিলেন, আমরা যে সবরমতীতে থাকতাম, আশ্রমে কি বাপুর কাছ থেকেই শিখেছি, বা (কস্তুরবা) যে অন্ন পরিবেশন করতেন, তার থেকে কি কিছু শিখি নাই—প্রেম শিখি নাই? প্রাপ্তবয়স্কদের, কিশোরদের চেয়েও শিশুদের হৃদয় উন্মুক্ত। তারা সহজেই আপন হয়। শিক্ষকের অন্তরে যদি ভালবাসা থাকে তবে তাদের শিখাবার পথ সহজ হয়। কবিগুরুর ছাত্র জীবনে সেন্টজেভিয়ারের একজন শিক্ষকের কথা মনে করুন—সেই স্নেহমাখা প্রশ্ন, 'টাগোর, তোমার কি অসুখ করিয়াছে?' —এই স্নেহই শিশুকে সরলতায় অভিদিক্ত করে জ্ঞানের পথ তার সুগম করবে, গুরু শিষ্যের সম্বন্ধকে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতায় আনন্দময় যোগ রক্ষার চেষ্টা চলতে থাকবে :*

---

*"সমাজ কল্যাণ" রবীন্দ্র ভারতী সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।

আচার্য্য বাণী

"শিক্ষিত বাঙ্গালী তরুণের ব্যর্থ জীবনে এ হাহাকার আর কতদিন শুনিতে হইবে তাহা বাঙ্গালীর ভাগ্যবিধাতাই বলিতে পারেন!

• • • •

"আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর প্রধান একটি দোষ এই যে, ইহা আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে শিখায় না।

• • • •

"আমি বাঙ্গালী, সুজলা সুফলা বাংলা দেশকে আমি ভালবাসি। বাঙ্গালী সবল হউক, সুস্থ হউক, আপনার পায়ে আপনি নির্ভর করিয়া দাঁড়াক, ইহাই আমি নিরন্তর কামনা করি।

• • • •

"বাঙ্গালীর দৈহিক পরিশ্রমের ক্ষমতা আছে। বিদ্যাবুদ্ধিও আছে এবং অন্যান্য গুণাবলীও যাহা আছে তাহার দ্বারা বাঙ্গালী পৃথিবীর মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ জাতি হইতে পারে।"

[আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের শতবর্ষ জন্ম-জয়ন্তী পালন উপলক্ষে আচার্য্যদেবের কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করা হইল—সম্পাদক]

শিক্ষা

ম হি কল্যাণকৃৎ কস্তিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৯শ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৬৮ | ৯ম সংখ্যা

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

আলোচনা

ধর্মঘট—ছাত্র ও শিক্ষক

ধর্মঘটের নামে দেশে প্রায়ই অধর্ম আসিয়া আক্রমণ করে। মহাত্মা গান্ধী যে ধর্মঘটের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং ব্যাপক প্রবর্তনের জন্য সকলকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, আমরা তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়াছি, অনুকরণ করিয়াছি (অবশ্য অন্য ভাবে), এবং তাহার বিষময় ফল হইতে অব্যাহতি পাইতেছি না। ব্রত উপবাসের সঙ্গে ছিল যে ধর্মঘটের সম্বন্ধ, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, আর এখনকার ধর্মঘটের অর্থ হয়তো 'মারি অরি পারি যে কৌশলে।' শিক্ষকেরা বুঝিয়াছেন, ধর্মঘট চাই, নতুবা প্রাপ্য আদায় হইবে না; কিন্তু প্রাপ্য রীতিমত আদায় হইতে হইতেই দেশের জিনিষ যে আরও দুর্মূল্য হইয়া গিয়াছে, যেখানে ছিলাম সেইখানেই আছি—সারা রাত্রি দাঁড় বাহিয়াও সকালে আবিষ্কার করি যে নৌকার দড়ি ঘাটেই বাঁধা আছে! অভাব অনটন অতি বাস্তব কঠোর সত্য; যুগে যুগে রাবণের যুগেও সকলেই তাঁহার সমভাবাপন্ন ছিলেন না, এবং সামাজিক পরিবেশও নিশ্চয় একেবারে এখন হইতে স্বতন্ত্র ছিল। এখনকার দিনে প্রতিপত্তির মূলও অন্যত্র, মর্যাদাও অন্যরূপ। কিন্তু যে ডালেতে বসিয়াছি তাহা ছেদন করিয়া নিজের জীবনস্রোত রুদ্ধ করিয়া দেওয়া—যতই অল্পকালের জন্যই হউক—ইহাতে মন সায় দেয় না। সরকার যদি ধর্মঘটীদের চাপে না পড়িয়া, সর্বদা অবস্থা ও নিজেদের ভাণ্ডার বুঝিয়া এবং শিক্ষকের প্রতি পূর্ণ দরদ দিয়া ব্যবস্থা করিতেন, তবেই মঙ্গল হইত।

কিন্তু ছাত্রধর্মঘট! আন্দোলন করিবার আদিক তো তাহারা শিখিয়াই লইয়াছে। সৌহার্দ্যে তাহারা সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই ধর্মঘট করিতেছে। শিক্ষকের প্রতি সহানুভূতি লইয়া তাহারা ধর্মঘট করিতেছে। ইহার শেষ কোথায়! সুপরিকল্পিত পাঠক্রমের ছক যে এখানে কাটিয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভরসা দিয়াছেন যে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত দেখিলে শিক্ষকদের সত্যাগ্রহ করিবার আর প্রয়োজন থাকিবে না। আশা করি সত্যই আমাদের

এই দুর্ভাগা দেশে শিক্ষকদের অর্ধাভাব অনিত অসন্তোষ সরকার ইচ্ছায় দূর করিবেন।

সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধেও শিক্ষকসংঘ আশঙ্কা করিতেছেন যে তাঁহাদের দাবিও পে-কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় নাই, যদিও সরকার উপস্থিত করিবেন বলিয়া ভরসা দিয়াছিলেন। এ অভিযোগ সত্য হইলে নিশ্চয়ই দুঃখের বিষয়; তবে এখনও সরকারি বিজ্ঞপ্তি জানা যায় নাই। সরকার যদি কথা দিয়া কথা না রাখেন, তাহা হইলে প্রতিকার কোথায়?

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির ভিত্তিতে ও তাহার আশায় রচিত। শিক্ষাই তো ভবিষ্যতের ভিৎ গড়িবে। আমাদের দেশ বড় হউক। শাসন ও শাসিতের ভেদ রাজনৈতিক তত্ত্বের দিক দিয়া এদেশে এখন অবান্তর; সুতরাং শিক্ষক ও দেশচালকদের মধ্যে বিরোধ থাকা উচিত নয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী গত ২ আগস্ট তারিখে দেশে বিদেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আচার্য ছিলেন দেশের শিক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তাঁহার ছাত্রদের সঙ্গে যে সম্বন্ধ ছিল তাহা ছিল অপূর্ব। ছেলেদের তিনি কত ভালবাসিতেন, তাহারাই ছিল তাঁহার নিত্যকার সঙ্গী, সুখদুঃখের ভাগী, তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা কত বিষয়ে কত জ্ঞান লাভ করিত, প্রেরণা পাইত, চরিত্রে দৃঢ় হইতে শিখিত। দীর্ঘজীবনে তিনি এমন একদল ছাত্র গড়িয়া তুলিয়াছিলেন যাহারা সেকালের তপস্যার আদর্শে মানুষ। গান্ধীজী প্রার্থনা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, আচার্য রায় পরীক্ষাগার সম্বন্ধে তাহাই বলিয়াছেন। উভয়ে কি মধুর প্রীতির সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল। আচার্য যে দরিদ্রের বন্ধু, তথাকথিত অস্পৃশ্যদের অধিকার পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য সচেতন ও সক্রিয়, যুক্তিক-উৎপীড়িত গ্রামের কৃষকদের হাতে আত্মনির্ভরতার প্রতীক চরকা দেওয়ার ও সংকট হইতে ত্রাণ করিবার জন্য উদ্যোগী।

তাঁহার অনেক কথাই আমরা শুনি নাই—কোন কথাটাই বা শুনিয়াছি? তথাপি গত সংখ্যায় শিক্ষায় আচার্যের কিছু বাণী প্রকাশ করিয়াছি। খুলনা জেলা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু কোনও ছাত্র-সংগঠন ও শিক্ষক-সংগঠন হইতে অনুরূপ অনুষ্ঠান দেখিতে পারিলে আনন্দিত হইতাম।

বুনিয়াদি শিক্ষার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ:

ঝাড়গ্রাম আউলগেরিয়া শবর কলোনী হইতে হরিজন সেবক সংঘের কর্মী শ্রীনির্মল চন্দ্র ঘোষ জানাইতেছেন:

আমি উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে কারিগরি শিক্ষার জন্য বয়ন শিল্প প্রবর্তন করিয়াছি। শিক্ষা গোড়া হইতেই আরম্ভ করা উচিত মনে করিয়া যিনি শিক্ষক তাঁহাকে একটা Box-loom ধার করিয়া আনিয়া নিজের হাতে তৈরী করিতে বলি। এজন্য তাঁহাকে কাঠ ও যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়, এবং নিজেও তাঁহাকে সাহায্য করি। একটা তাঁত তৈরী করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, মাকুও হাতে করা হইয়াছে। তাঁত ও মাকু, দুই-ই বেশ কাজের উপযোগী হইয়াছে। ছাত্রদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও এইভাবে করিতে চাই। ছাত্রেরা তাঁতের মাপ নিবে, এবং সেই মাপ অনুসারে কাঠ কাটিবে ও কাঠে কাঠে জোড়া দিবে। এভাবে করাতি, বাটালি প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইলে ভবিষ্যতে প্রয়োজন মত তাঁত ও মাকু নিজেরাই মেরামত করিয়া নিতে পারিবে। আমার বিশ্বাস, এ কাজ করা ছাত্রদের পক্ষে মোটেই কঠিন হইবে না এবং বুদ্ধি সহযোগে হিসাব করিয়া কাজ করার ফলে তাহারা যথার্থ শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইবে, যন্ত্র বিকল হইলে অসহায় বোধ করিবে না।

অবশ্য এরূপ করিতে গেলে কর্মীর নিজের ছুতারের কাজের জ্ঞান কিছুটা থাকা চাই। যদি না থাকে, তবে পূর্বাহ্নে তাহাকে এবিষয়ে কিছুটা শিখিয়া লইতে হইবে।

গুরুবন্দনা

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে প্রথম দেখি প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্র হিসাবে। সেটা ১৯১৬ সাল। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলেজে ভর্তি হব। উত্তরপাড়ার মুখুজ্যে পরিবারের ছেলেরা বংশানুক্রমে হিন্দু কলেজে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে এসেছে। আমিও প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলাম, বিজ্ঞান বিভাগে, রসায়ন (কেমিস্ট্রি) নিয়ে। প্রথম দিন রসায়নের ক্লাশ হবে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ক্লাশ নেবেন। ছাত্রমহলে আচার্যদেবের অসীম খ্যাতি। তরুণ হৃদয়ের উন্মুখ আগ্রহ নিয়ে বসে আছি। এমন সময়ে তিনি ক্লাশে ঢুকলেন—ছোটখাটো একটি সাধারণ মানুষ এসে অধ্যাপকের আসনে বসলেন। দেখে কে বলবে ইনি একজন দেশবিশ্রুত বৈজ্ঞানিক। বক্তৃতা আরম্ভ করেই প্রথমে যে ক'টি কথা বললেন সেগুলি আজও যেন আমার কানে বাজছে। তিনি বললেন, 'তোমরা আজ ফার্স্ট ইয়ারে এসেছ, জীবনে ফার্স্ট ইয়ার কবার আসে? একবারই। মনে কর যদি বছরের সেরে ফেল করলে তাহলেও তোমাকে লোকে আর ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে বলবে না, বলবে সেকেণ্ড ইয়ারের ছেলে। জীবনে সুযোগ একবারই আসে।' কথাগুলি খুব অনন্য-সাধারণ নয়, কিন্তু সেগুলি বলবার ভঙ্গীর মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা শ্রোতার কানে গেঁথে যায়, তার মনকে টেনে নেয়। আচার্যদেবের কথাগুলিও তেমনই আমার তরুণ হৃদয়কে একেবারে জয় করে নিল।

ছাত্রেরা হয় প্রথমে কোন বিষয়ে অনুরক্ত হয়, তার থেকে যিনি সে বিষয়টি অধ্যাপনা করেন তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়; অথবা প্রথমে অধ্যাপকের প্রতি অনুরাগ আসে, পরে তার থেকে তিনি যে বিষয়ে অধ্যাপনা করেন সে বিষয়ে ছাত্রের অনুরাগ জন্মায়। আচার্যদেবকে আমার এত ভাল লাগল যে তখনই মনে মনে ঠিক করে ফেললাম কেমিস্ট্রি নিয়ে নিজে গবেষণা করব, মাদাম কুরির মত নতুন এলিমেণ্ট, মৌলিক পদার্থ, আবিষ্কার করব, করে গুরুর চেয়ে বড় হয়ে তাঁকে গুরুদক্ষিণা দেব। প্রেসিডেন্সী কলেজে চার বছর কেমিস্ট্রির সঙ্গে আমার পরিচয় বিস্তৃততর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টির প্রতি আমার অনুরাগ গভীর হতে লাগল এবং আচার্যদেবের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা গভীর হতে চলল। মনে মনে আমি তাঁকে আমার শিক্ষাগুরুর পদে বরণ করে নিলাম। তাঁর চরিত্রের মধ্যে যে গুণটি আমাকে বিশেষ করে আকৃষ্ট করেছিল সেটি তাঁর নিরভিমান জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য নয়, বা তাঁর ছাত্রপ্রীতি বা সরল জীবনের আদর্শ নয়, সেটি হল তাঁর সুগভীর দেশপ্রেম। তিনি আমাদের দেশকে বড় করতে চেয়েছিলেন, জগৎসভায় আমাদের জন্য গৌরবময় স্থান করে দিতে চেয়েছিলেন তাঁর সমগ্র জীবন ও সাধনা দিয়ে।

প্রেসিডেন্সি কলেজে আরও অনেক প্রকৃত শিক্ষকের সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল; তাঁদের মধ্যে অনেকের কথাই আজ আমার মনে হচ্ছে। রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ মৈত্র তাঁর স্বচ্ছ ও দৃঢ় চরিত্র গুণে আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন। আচার্য জগদীশ-চন্দ্র, অধ্যাপক ডি. এন. মল্লিক, অধ্যাপক বিমানবিহারী দে, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

প্রভৃতিও তাঁদের বৈশিষ্ট্য দিয়ে আমাকে আকৃষ্ট করেছিলেন। আজও আমার মনে পড়ে অধ্যাপক মহলানবিশের প্রথম বক্তৃতার উৎসাহের দীপ্তি। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র হলেও আমার সৌভাগ্য হয়েছিল অধ্যাপক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, অধ্যাপক জাকেরিয়া, অধ্যাপক মনমোহন ঘোষ, অধ্যাপক কয়াজী, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির সংস্পর্শে আসবার। কিন্তু তাঁদের সকলের মধ্যে আচার্যদেব যেমন করে তখন আমার তরুণ হৃদয়কে নাড়া দিয়েছিলেন এমনটি আর কেউ করেন নি। এ যেন কুমারী হৃদয়ের 'নব নীরব প্রীতি।'

কলেজে পড়ছি এমন সময়ে ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হল। পরম উৎসাহে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে একেবারে মেতে গেলাম। দেশের বড় বড় নেতাদের স্বচক্ষে দেখলাম—এতদিন যাঁদের কথা শুধু দূর থেকেই শুনে এসেছি। দেশের এই পরম দুর্দিনে তাঁরা সবাই এসেছিলেন নূতন পথের সন্ধানে। জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পরেও কি দেশ পুরাতন রাজনীতির পথে চলবে? তখন নূতন পথ দেখালেন যিনি তিনিও আমার শিক্ষাগুরু আচার্য রায়েরই মত এমন একটি লোক যাঁকে বাইরে থেকে দেখলে সাধারণ মানুষ বলেই মনে হয়। পোষাকে পরিচ্ছদে, আহারে ব্যবহারে কোথাও কোন বিশেষত্ব নেই; কিন্তু কি অপূর্ব তাঁর কথা বলার ভঙ্গী! তার মধ্যে বাগ্মিতার চিহ্ন মাত্র নেই, পাণ্ডিত্যের কোন আস্ফালন নেই, রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির কোন নিদর্শন নেই। যেটা আছে সেটা তাঁর সুগভীর হৃদয়বত্তা, মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ও দরদ; আর আছে মানুষকে কাছে টেনে নেবার অপূর্ব শক্তি। সে শক্তি কিন্তু পরম শান্ত, কিন্তু তার তেজ কি! কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি দেশের দুরন্ত নেতাদের এমন করে সহজ ভাবে তাঁর পক্ষে টেনে আনলেন যেটা ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসে অভাবনীয়, অচিন্ত্যপূর্ব বলেই মনে হয়। তাঁরা অনেক তর্কাতর্কি করেও শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর প্রস্তাবিত অসহযোগ নীতিই গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলেন।

গান্ধীজী দেশের সকলকে একবৎসর একনিষ্ঠ-ভাবে অসহযোগ নীতি পালন করতে আহ্বান করলেন, বললেন 'আমি বলছি যে যদি আমরা এই একটি বৎসর পূর্ণভাবে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে অসহযোগ করতে পারি তাহলে আমরা এই এক বৎসরের মধ্যেই স্বরাজ পাব।' গান্ধীজীর আবেদন আমার মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করল সত্য, কিন্তু তাকে একেবারে নড়াতে পারল না।

কেমন করে জানি না আমার সৌভাগ্য হয়ে গেল গান্ধীজীর সান্নিধ্যে আসবার, তাঁর সঙ্গে কথা বলবার। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি করবে? আমি আমার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত প্রগল্‌ভতা দিয়ে দিয়ে তাঁকে আমার স্বপ্নের কথা, আমার আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বললাম। বললাম রসায়নে গবেষণা করে আমি রাদাম কুরির মত একটা নয় পঞ্চাশটা নতুন এলিমেণ্ট, মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করব, করে আমার বংশের ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করব। তিনি ধীর হয়ে সব কথা শুনে শান্তভাবে মৃদু হেসে বললেন, 'বেশ তো, তুমি পঞ্চাশটি এলিমেণ্ট আবিষ্কার করবে ধরো পঞ্চাশ বছরে। তাতে তো তোমার জীবনের পঞ্চাশ বছর কেটে যাবে, তারই একটা বছর না হয় আমাকে দাও, এই এক বছর না হয় এদেশের লোককে দিয়ে দেশের human elementকে নিয়ে একসঙ্গে চলো। তাতে না হয় তোমার পঞ্চাশের জায়গায় উনপঞ্চাশটা এলিমেণ্ট আবিষ্কার করা হবে, কিন্তু এই এক বছরে তোমার একটা নূতন এলিমেণ্টের সঙ্গে অমিষ্ট পরিচয় হবে।'

গান্ধীজী আমাকে আটখানা বইয়ের নাম লিখে দিয়ে বললেন, 'ক'দিন ধরে এই ক'খানা বই পড়ে

দেখ, তারপর কদিন পরে আমাকে জানিয়ে দিও তুমি কি স্থির করলে।'

বইগুলি দেখে নিতে আমার সাতদিনও লাগল না। মনে মনে আমি তখনই গান্ধীজীকে আমার গুরুর আসনে বসালাম ও সাত দিনের মধ্যেই একটা চিঠিতে তাঁকে জানিয়ে দিলাম, আমি মন ঠিক করে নিয়েছি, কলেজ ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিচ্ছি। গান্ধীজী উত্তরে লিখলেন, 'তুমি ঠিকই করেছ। এর জন্য তুমি কখনও অনুতাপ করবে না।'

যুগ্ম তারার মত গান্ধীজী ও আচার্য রায় আমার এই দুই গুরু প্রথমে আমাকে জীবনের পথ দেখিয়েছিলেন। তাঁদের আজ আমি প্রণাম জানাই। তাঁদের পথে আমি যেটুকু চলতে পেরেছি বা পারিনি সে তো আমার শক্তির পরিমাপে। তাতে তো আমার গুরুদের পরিচয় নেই। তাই আজ জীবনের সায়াহ্নে এক গুরুর চরণে ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়ে আমার এই গুরু-বন্দনা।

তারপর কতদিন কেটে গেল; জীবনের ধারা সলিল গতিতে এঁকে বেঁকে চলতে লাগল। কলেজ ছেড়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে চলতে চলতে মনে হল দেশের অর্থনীতি ঠিকমত গড়ে তুলতে না পারলে আমাদের রাজনৈতিক মুক্তি কোনো দিনই সুদৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। এর জন্য চাই এদেশের মানুষ এলিমেন্টকে, এদেশের মানুষের অন্তরের শক্তিকে আবিষ্কার করে তাকে ঠিক পথে চলতে সহায়তা করা। আমি আমার সাধ্য ও আমার আমার উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা দিয়েছি।

শক্তিমত এইভাবের আবিষ্কারকেই আমার জীবনের ব্রত করে নিয়েছি, আমার যুগল গুরুর স্মরণে।

১৯৩৪ সালে হুগলী ব্যাঙ্কের উত্তরপাড়া শাখা প্রতিষ্ঠার পঞ্চবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আচার্য রায়কে নিমন্ত্রণ করে আমি সভাপতি হবার জন্য। কিন্তু সভার ক্ষেত্রে কি জানি কেন আমার সাহসে কুলোলো না তাঁর সম্মুখে দাঁড়াতে। আমি কতকটা তাঁকে এড়িয়েই পাশে পাশে থাকলাম। কিন্তু সেদিন এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আচার্যদেব যে ক'টি কথা বললেন তা আমার গুরুর আশীর্বাদে, সেগুলি চিরদিন আমার জীবনের পাথেয় হয়ে আছে। আচার্য সেদিন বললেন, ধীরেন ছাত্রাবস্থায় তার আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছিল; সে যখন অসহযোগ করে কলেজ ছাড়ল তখন আমার মনে হল বুঝি তার সে আশা আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই থেকে যাবে। কিন্তু আজ আমি দেখছি সে বাঙলা দেশের যুবকদের সামনে নূতন এক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে, নূতন এক পথ দেখিয়েছে। বাঙালীর মস্তিষ্কের সে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে বাঙালীর অন্নসমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে এদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তির একটি পাথর পাকা করে বসাচ্ছে; এদেশের অতি সাধারণ লোকদের অন্তরের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে আবিষ্কার করে তার প্রয়োগের পথ প্রশস্ততর করে দিচ্ছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন এলিমেন্ট আবিষ্কার করার চেয়ে তো এ আবিষ্কার ছোট নয়। তাই আজ আমি তাকে আশীর্বাদ করছি, সে আজ

শিক্ষিত যুবক! নমঃশূদ্রকে দেশবাসী ভাই বলে তার সাথে একসঙ্গে খেতে দাঁড়াতে পার? বিবাহের সময় বরপণ গ্রহণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পার? তোমাদের বিবাহের বিজ্ঞাপন দেখে হতভম্ব লেগে যায়, এত বিচিত্র কুলশীলের তালিকাও তোমাদের আছে? তোমার বিয়ের যৌতুকের চাপে কত স্নেহলতা আত্মহত্যা করছে তার সংবাদ রাখ? বাবু, ঠিক ঐ সময়ে তোমার পিতৃভক্তির উৎস উথলে ওঠে—'কি করব, আমার তো পণগ্রহণে অনিচ্ছা কিন্তু বাবা বলছেন! ও বাবা! তিনি যে বুকে ধরে মানুষ করছেন সেই বুকে কি করে শেলবিদ্ধ করব? হায়রে বাবার দোহাই! হে উপাধিধারী যুবক! তুমি ঘোড়া গরু ও ছাগলের মত নিজেকে সর্বোচ্চ দরে বিক্রীত হতে দেও!

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

শিশুদের চিত্রের ক্রমবিকাশ

"শিশু এজন্য রাগ করে যাহাতে সে নিজের মনোজগতের কথা কোনও সহানুভূতি সম্পন্ন দর্শককে বুঝাইতে পারে, নিজের পিতামাতার নিকট নিজের ভাব প্রকাশ করে, যাহাদের নিকট হইতে সে চায় সহানুভূতি।"

—হার্বার্ট রীড

প্রত্যেক কাজ শুরু করিতে গেলে প্রথমে অর্থব্যয়ের ভিত্তি প্রস্তুত করিতে হয়। যদি এই ভিত্তি পাকা হয়, অর্থাৎ নিজের যাহা ধ্যেয় তাহা যদি পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে অগ্রসর হইবার পথ ও তাহার প্রকৃত স্বরূপ প্রস্তুত করা সহজ হইয়া যায়। যতক্ষণ উদ্দেশ্য পরিষ্কার না হয় ততক্ষণ পথ স্পষ্ট হইতে পারে না। যতক্ষণ আমরা কিরূপ মানুষ গড়িতে চাই তাহা মনে স্পষ্ট হইয়া না ওঠে, ততক্ষণ শিক্ষার স্বরূপ কি হইবে তাহা বলা অসম্ভব। কলা-শিক্ষারও ঐ কথা। কলা-শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির মধ্যে ও সমাজের মধ্যে আমরা কোন কোন গুণ সৃষ্টি করিতে চাই, তাহার দ্বারা জীবনে কি কি বিকাশ হয়, এ সকল কথা চিন্তা না করিয়া কলা-শিক্ষার পদ্ধতি রচনা কি করিয়া করা যায়?

আমরা আলোচনা করিতে গিয়া এই সকল সিদ্ধান্তের কথা ভাবিয়াছি। কিন্তু ইহাতেই কাজ চলিবে না। পদ্ধতি বা টেকনিক্ রচনা করিবারও পূর্বে আর একটা কথা প্রয়োজন, তাহা হইল এই যে—যাহা বাধ্যম তাহার বস্তুগুণ চেনা। যখন কোনও কিছু লইয়া কাজ করিতে হয়, তখন তাহার পূর্বে জানা প্রয়োজন যে এই বস্তুর প্রাকৃতিক গুণ কি। যেমন, কাঠ। আমাদের প্রয়োজনের পরিষ্কার ধারণা করি—একটা বাক্স চাই। এই প্রয়োজনের কথা ভাবিলে বাক্সের আকার প্রকৃতি কিরূপ হইবে তাহা স্পষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। যে বস্তু দিয়া বাক্স গড়িব, তাহা যে কাঠ, সে কথাও স্থির। এখন কাঠের গুণাগুণ জানা তো দরকার। তাহার 'রেশ' কেমন, কাটছাঁট করিতে গেলে কি সব চাই, কাঠ শক্ত না নরম, ভক্তা চিরিয়া করিতে হইবে, না কাঠ খোদাই করিয়া—এ সব কথা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, তবে তো বাক্স তৈরী হইতে পারিবে।

আমাদের আলোচনার বিষয় হইল শিশুদের কলা। যাহাদের দিয়া করাইতে হইবে তাহারা শিশু। একটা বাক্স তৈরী করিবার আগে যদি পূর্ব হইতে এতখানি প্রস্তুতি ও চিন্তার প্রয়োজন তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে উহার কত গুণ অধিক ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রস্তুতি করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া একটা ভুল তো সর্বদাই হয়। শিশুদের না বুঝিয়া আমরা উহাদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রস্তুত করি। এইজন্য যাহা করিতে চাই তাহা হইয়া ওঠে না। শিশুদের লইয়া কাজ করিতে হইবে। তাহাদিগকে কলা-শিক্ষা দিতে হইবে। কলা-শিক্ষার কথা সামনে রাখিয়া কলা-শিক্ষার আয়োজন করিয়াই যদি শিখাইতে হয় আর শিশুদের গুণাগুণের কথা মনে না থাকে অর্থাৎ শিশু-প্রকৃতি আর শিশু-স্বভাবের কথা যদি মনে না থাকে তাহা হইলে আমরা মোটেই অগ্রসর হইতে পারিব না। ঐরূপ করিলে তো আমরা তাহাদিগকে মানুষ না করিয়া তোতা করিয়া রাখিব। আর সে তোতা হইবে খাঁচার, জঙ্গলের নয়। প্রচলিত শিক্ষার ইহাই ছিল প্রকাণ্ড ভুল। শিক্ষক শিশুদের সেইসব কথা শিখাইতে চাহিতেন যেসব কথা শিশুর জগতের নয়,

বড়দের জগতের। সাধারণত শিক্ষার এই ধারাই এখনও চলিয়া আসিতেছে।

এই মূল কলা-শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করিবার কথা যদি মনে না-ই থাকে অন্তত এই কথা মনে রাখিতে হইবে। এই জন্ত প্রয়োজন যে কলাশিক্ষার পদ্ধতি প্রস্তুত করিবার পূর্বে জানিতে হইবে শিশুদের কলাগুণ কিরূপ। আমাদের দেখিতে হইবে যে শিশু যে পৃথিবীতে থাকে তা আমাদের জগৎ হইতে ভিন্ন। আর এই জন্ত তাহার চিত্র বড়দের চিত্র হইতে স্বতন্ত্র। এখন বুঝিতে হইবে কোন্ বয়সে শিশু কিরূপ চিত্র আঁকে।

এইজন্ত শিশুদের ও তাহাদের কলা অনুভূতির বিষয়ে ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে। আমাদের দেশে এ কাজ হয় না বলিলেই চলে। বিদেশে তো ইহা যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়। আমরা সেখানকার অনেক বিশেষজ্ঞের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়াছি। আমরা নিজেদের কাজে তাহাদের অভিজ্ঞতার কথা অনেক উপযোগী ও লাভজনক বলিয়া দেখিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অনুভব করিয়াছি যে শিশুদের জগৎ সবদেশেই একরূপই দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা নিজেরা নিজেদের পর্যবেক্ষণের গণ্ডির মধ্যে ইহাই দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি, যখন হইতে শিশু নিজের হাতে পেনসিল ধরিতে পারিল, তখন হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র শৈশবকাল পর্যন্ত যদি তাহাকে তাহার ইচ্ছামত ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে সে কিরূপ ছবি আঁকিবে? অর্থাৎ যদি এক, দুই, তিন বছরের শিশুর হাতে কাগজ, রং প্রভৃতি দেওয়া হয়, তবে সে তাহা দিয়া কোন্ ধরনের ছবি আঁকিবে? আর যদি সে তাহার পরেও এই ভাবে ছবি আঁকিয়া চলে তবে কিছু দিনের পর তাহার চিত্র কিরূপ হইবে? অর্থাৎ শিশুকে যদি তাহার ইচ্ছামত ছাড়িয়া দিয়া সর্বদা ছবি আঁকিতে দেওয়া যায় তাহা হইলে ঐ ছবির বিকাশ কি ভাবে হইতে থাকিবে?

দেখিয়াছি, শিশুর চিত্রে পরিবর্তন ক্রমশঃ হইতে থাকে। তাহার বয়সের পরিবর্তন হইতে থাকে। কারণ শিশু সর্বদা কিছু না কিছু নূতন কথা গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহার প্রত্যেক অনুভূতি তাহার বিকাশের গতি অল্পবিস্তর পরিবর্তিত করে।

কলা হইল আত্মপ্রকাশ। কলাকার তাহার কলার মাধ্যমে তাহার ভিতরের অনুভূতি, চিন্তা আদি প্রকাশ করে। সে ভাবে এই অনুভূতি বা চিন্তা অন্যকেও দিতে হইবে, তাহার কলার মাধ্যমে সে তাহা দিতে চায়। এমন কিছু কিছু অনুভূতি প্রভৃতি আছে যাহা স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া পড়ে। শুধু কলাকারের চিন্তা বা অনুভূতিই যে প্রকাশ হইতে পারে তাহা নয়, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার ভিতরের ব্যক্তিত্বকে কোন না কোনরূপে বাহিরে প্রকাশ করে। শিশুদের পক্ষে ইহাও স্বাভাবিক যে সে যা কিছু অনুভব করে, তাহা সে অন্যকে বলিবে। শিশুদের আরও একটা গুণ আছে। তাহা হইল এই—কিছু গোপন না করার গুণ। যাহা সে বলিতে চায় তাহা সে বলিয়াই ফেলে। অল্প বয়সে শিশুদের শব্দের ভাণ্ডারও অবিকাশিত থাকে। তাই কলাই তাহার আত্মপ্রকটনের এক প্রধান উপায়। তাহার আঁকা ছবির দ্বারা তাহার ভিতরের বিকাশ আমরা দেখিতে পাই এবং তাহার নিজস্বগুণের সন্ধান পাওয়া যায়। এই পর্যবেক্ষণ হইতে জানিতে পারি যে শিশু স্বাভাবিক কলার বিকাশ হইতে কি ভাবে পুষ্টি লাভ করে।

শিশুচিত্রের বিকাশক্রমের প্রধান প্রধান স্তর

আঁকি-বুকি
প্রতীক-যুগ
বাস্তবিকতার সঙ্গে পরিচয়
কিশোর বয়সে ও তাহার পরে

শিশুদের কলা-অনুভূতির বিষয়ে সাধারণত এই চার ক্রম দেখা যায়। এ সবের নিশ্চিত বয়স কষা কঠিন। এক ক্রম হইতে অন্য ক্রমে, তৃতীয় ক্রম হইতে চতুর্থ ক্রমে শিশু কবে প্রবেশ করিবে, সেকথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। কারণ তাহা শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। কোনও শিশু একটা বয়সে এক অবস্থায় আসে, কেহ বা সে অবস্থায় আসে অন্য বয়সে। ইহাও বলা চলে না যে সব শিশুর এক অবস্থায় একই সময় প্রয়োজন হয়। এমনও হইতে পারে যে কোনও শিশু প্রথম অবস্থা কয়েক সপ্তাহেই পার হইয়া যায়। কখনও কখনও দেখা গিয়াছে যে কিছু কিছু শিশু প্রথম অবস্থায়ই মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর পড়িয়া থাকে। এ বিষয়ে আরও সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিবার পূর্বে তার চারটি অবস্থিতর স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে।

কাটাকুটির স্তর

শিশু হাতে পেনসিল ধরিতে পারিলেই প্রথম প্রথম কাগজের উপর দাগ কাটিতে থাকে। এই সব দাগ কোনও বস্তুবিশেষের চিত্র নয়, শুধু উপকরণের সহিত পরিচয় ও শারীরিক পটুতা প্রকাশ করা এই স্তরে সম্ভব। শিশু বড়দের মত হাত চালাইতে চেষ্টা করে।

প্রতীক যুগ

হাত চালাইতে আরম্ভ করিবার পর সে বাহিরের জগতের আকারের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া ছবি আঁকিতে শুরু করে। সে বিশেষ বিশেষ আকারের সাহায্যে নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করে। এ আকার শিশুর নিজের অনুভূতির দ্বারা নির্মিত, দৃশ্যমান বস্তুর আকার, কিন্তু তাহা বস্তুর বাস্তবিক আকারের মত নয়। ইহাতে শিশু বস্তু 'যেমন জানি' বা 'যেমন অনুভব করি' এরূপ ছবি আঁকে, বস্তু দেখিতে কিরূপ সে রকম আঁকে না। সে মনে মনে বস্তুর 'প্রতীক' করিয়া লয়। যেমন মানুষের চেহারার স্থানে একটা গোলাকার আর তাহার মধ্যে তিন চারটি ছোট ছোট গোল (দুই চোখ, এক নাকের দাগ বা গোলা ও একটা মুখ)—ইহাই তাহার চেহারার প্রতীক। এইভাবে প্রত্যেক বস্তুর প্রতীক সব নব অনুভূতির ভিত্তিতে তাহার মনের মধ্যে গড়িয়া ওঠে ও বদলাইতে থাকে। এ বয়সের ছবি প্রতীক-প্রধান হয়। শিশু এ পর্যন্ত অন্তর্মুখীই থাকে।

বাস্তবের পরিচয়

ধীরে ধীরে এই প্রতীকেরও বদল হয়। কোনও বিষয়ে আজ যে জ্ঞান, কাল তাহা বাড়িতে পারে, বাড়িয়া থাকেও। কোনও বস্তুর কোনও অংশ আজ অনুভবের গোচর ছিল। অন্য সময় অন্য অংশ নজরে পড়িল। এই অনুভূতির প্রভাব ঐ বস্তুর প্রতীকের উপর পড়িল, অমনি তাহা বিকশিত হইল। উহাতে আরও কিছু যোগ করা হইল বা বদল হইল। যেমন, কোনও ব্যক্তির চেহারার প্রথম প্রতীক, এখনই যাহার উল্লেখ করিলাম। তাহার উপর নাকও চড়িল, কিছু অভিজ্ঞতার পর কান, চুল প্রভৃতিও আসিল। এ পর্যন্ত আসিল যে এই আকার যাহা এখনকার প্রতীক, তাহা দেখিতে বাস্তবিক আকারের মত লাগে। শিশু এই প্রতীক বস্তু যেমন দেখিতে থাকে, প্রত্যক্ষ বস্তুর আকারের সঙ্গে তেমন তেমন তুলনা করে, তুলনার দৃষ্টিতে দেখে, এজন্য বাস্তবিকতার জ্ঞান তাহার হইতে থাকে। ইহাতে তাহার চক্ষুর অভিজ্ঞতা কাজ করে আর তাহার ছবি হইতে থাকে বাস্তবিকতা প্রধান। এইজন্য এ অবস্থাকে 'বাস্তবের পরিচয়' বলা হইয়াছে। এই পরিবর্তনের অন্য কারণও থাকিতে পারে। শিশুর জীবন এ পর্যন্ত ছিল অন্তর্মুখী অর্থাৎ এতদিন সে অন্তরেই বাস করিত। বাহিরের বস্তুকেও সে এ সময়ে নিজেই অর্থ দিত, রূপ দিত। এই অন্তর্মুখ (সাবজেকটিভ) ভাবের পরে পরিবর্তন হয়,

ধীরে ধীরে শিশু বহির্মুখ হইতে আরম্ভ করে। তার দুনিয়া বদলাইতে থাকে। বাহিরের দুনিয়ার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ সে বুঝিতে আরম্ভ করে। সে নিজের মধ্য হইতে বাহির হইতে আরম্ভ করে। এ বয়সে তাহার আত্মপ্রকাশও বদল হওয়া চাই। বাহিরের যে বাস্তব জগৎ, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে গিয়া তাহারও দৃষ্টি বাস্তবিকতা-প্রধান হইয়া যায়। সেই কারণে তাহার চিত্রও বাস্তবধর্মী হইতে আরম্ভ করে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাইবে।

শিক্ষায় ইংরাজীর স্থান

শ্রীসুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত

স্কুল ফাইন্যাল অথবা উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে বিষয়ে ছেলেরা সবচেয়ে বেশী ফেল করে, তাহা হইল ইংরাজী, কিভাবে ইহার প্রতিকার করা যাইতে পারে, ইহা আধুনিক কালের একটা বড় সমস্যা। কেহ কেহ মনে করেন, যেহেতু এখন আর আমরা ইংরেজের শাসনাধীনে নাই, সেহেতু ইংরাজী এখন বাদ দিয়া দেওয়া যাইতে পারে। মাতৃভাষায় অনেক বই এখন পাওয়া যায়, ভবিষ্যতেও আরো অনেক বই পাওয়া যাইবে। সুতরাং এখন আর ছাত্রদের ঘাড়ে ইংরাজীর বোঝা চাপাইয়া দিবার কোন অর্থ হয় না। চাপাইয়া শুধু অযথা তাহাদের সময় নষ্ট করা হইতেছে। অর্থেরও অপচয় হইতেছে। তাহা ছাড়া ইংরাজী ভারতের অতীত দাসত্বের কলঙ্ক বহন করে। সুতরাং যত শীঘ্র এই ভাষা উঠিয়া যায়, ততই দেশের মঙ্গল। কিন্তু এই অভিমত মানিয়া লওয়া সঙ্গত নয়। ইংরাজী ভাষা থাকা দরকার, কেন না, ইহা আন্তর্জাতিক ভাষা এবং বিদেশের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করিতে ইহার বিশেষ প্রয়োজন, শুধু তাহাই নয়, ইংরাজী সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী ভাষা। শিল্প, কলা, বিজ্ঞানে এবং দর্শনশাস্ত্রে যে সকল অমূল্য রত্নরাজি রহিয়াছে, তাহা ইংরাজী ভাষায়ই লিখিত। সুতরাং ইংরাজী ভাষাকে বাদ দিয়া এই সকল জ্ঞানভাণ্ডার হইতে ছেলেদের বঞ্চিত করা মোটেই সমীচীন হইবে না। ইংরাজী আমাদের থাকিবেই, তবে কি করিয়া ছাত্রদের ইংরাজীতে ফেলের হার কমানো যায়, ইহাই ভাবিবার বিষয়। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, শিক্ষাদান-পদ্ধতি ভাল হইলে পরীক্ষার ফলও ভাল হইবে। কিন্তু দেখা যায়, অন্যান্য ভাল জিনিসের মত ভাল শিক্ষক পাওয়া এত সহজ নয়। সুতরাং ভাল অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রতি অযথা জোর দিয়া লাভ নাই। শিক্ষকেরা "যথাসাধ্য" ছেলেদের জন্য করিতেছেন, ইহা ধরিয়া লইতে হইবে। যদিও তাহা তাঁহাদের "আদর্শ সাধ্য" হইতেছে না। রাতারাতিই শিক্ষকের যোগ্যতা বাড়ানো যায় না বা সাধারণ শিক্ষকের স্থলে যোগ্য আদর্শ শিক্ষক নিয়োগ করাও সম্ভবপর নয়। অথবা শ্রমবিমুখ অযোগ্য শিক্ষককে উপদেশ ও উৎসাহ দিলেও তাহার কর্মদক্ষতা বাড়ানো যায় না। অতীতের শিক্ষকদের আদর্শ স্মরণ করাইয়া দিলেও লাভ হয় না। এদিকে আমরা শিক্ষকের কর্মদক্ষতা বাড়াইতে পারিতেছি না অথচ আমরা ছাত্রদের ইংরাজীতে ফেলের মাত্রা কমাইতে চাহিতেছি, ইহা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? ইহা সম্ভব হইতে

পারে, যদি পাঠ্যতালিকা পুনঃসংগঠন করা যায় এবং পরীক্ষার নমুনা বদলানো যায়।

স্কুল ফাইন্যালে পাঠ্যতালিকার দোষ : ছাত্রদের ইংরাজী সিলেবাস কি অত্যন্ত বেশী? স্কুল ফাইন্যালের নির্বাচিত বই দেখিলে যে উহা খুব বেশী তাহা মনে হয় না। তবে যে বয়সের প্রশ্ন স্কুল ফাইন্যালে করা হয় তাহার উত্তর করিতে ছেলেদের কষ্ট হয়। এই পরীক্ষা দিবার জন্য তাহাদের সপ্তাহিক পৃষ্ঠাব্যাপী অনেক নোট বই মুখস্থ করিতে হয়। কতগুলি নীরস নোট-বইয়ের উপর তাহারা নির্ভর করে। ফলে তাহারা স্বাবলম্বী হয় না। বিবিধ সম্ভাব্য প্রশ্ন আলোচনার বৃহদাকার নোটগুলিতে তাহারা প্রমুক্ত হয়। ফলে, ছেলেরা নিজের ভাষায় ইংরাজী লিখিবার ক্ষমতা লাভ করে না।

উচ্চতর মাধ্যমিক পাঠ্য-তালিকার দোষ—উচ্চতর মাধ্যমিক পাঠ্যতালিকার সর্বপ্রধান দোষ, ইহার কোন একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক নাই। ইংরাজী শিখানো হয় skill subject হিসাবে, content subject হিসাবে নয়। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কোন পাঠ্যপুস্তক থাকিবে না। ছেলেদের পরীক্ষায় শুধু সংক্ষেপকরণ, রচনা, চিঠিপত্র, কথোপকথন লিখিতে হইবে। এই জন্য নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীতে ত্রিশখানা পুস্তক মঞ্জুর করা হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু এই সকল বই হইতে কোন প্রশ্ন করা হয় না, সেই জন্য ছাত্ররা কেহ এই বইগুলি কিনে না, যত্নসহকারে কেহ পড়েও না। এতগুলি বইও ছেলেদের পড়ানো শিক্ষকদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

content vs skill : ছাত্রদের ইংরাজী skill subject হিসাবে শুধু পড়াইলে তাহারা সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। সাহিত্যের আধারস্থ বস্তুসমূহের জ্ঞানলাভের অভাবে তাহারা উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন তিন বৎসর ডিগ্রি কোর্স পড়িতে যায় তখন সেখানে তাহাদের সেক্সপিয়ার, মিল্টন, শেলী, ব্রাউনিং আয়ত্ত করা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা তাই ডিগ্রি ক্লাসে বা এম্, এ তে যাইয়া ইংরাজী সাহিত্যে খুব খারাপ ফল করে।

ভাবপ্রকাশ বনাম বোধশক্তি (Expression Vs comprehension) : প্রাক্‌স্বাধীনতার যুগে ইংরাজী শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজীতে সব কিছু প্রকাশ করা। ভাল ইংরাজী বলা ও লেখার উপর নির্ভর করিত কেরাণীগিরি ও অফিসারদের চাকুরী। তখন জাতির জাগরণেও ইহার মূল্য সমধিক ছিল। দেশের বড় বড় নেতারা ইংরাজীতে তাঁহাদের ভাবের আদান-প্রদান করিতেন। বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরা এই ভাষার মাধ্যমে এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইয়াছিল।

আমরা চাই বা না-ই চাই, হিন্দি আজ ইংরাজীর স্থলে আন্তর্জাতিক প্রাদেশিক ভাষা হইতে যাইতেছে। সুতরাং এখন আর ইংরাজীতে প্রকাশ করিবার মূল্য তত থাকিবে না। কিন্তু ইংরাজী যতদিন বিজ্ঞান ও কৃষ্টির অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার থাকিবে ততদিন ইংরাজী বই হইতে আমাদের অনেক জিনিস গ্রহণ করিতে হইবে। বর্তমানকালে ইংরাজীতে ভাবপ্রকাশ অপেক্ষা ইংরাজী বুঝিতে পারার মূল্য বেশী। সুতরাং যদি ছেলেরা এখন কলা ও বিজ্ঞানের আসল ইংরাজী বই পড়িয়া বুঝিতে পারে, এবং বইয়ের আহরিত জ্ঞান প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয় তবেই যথেষ্ট। ইহা অনাবশ্যক যে তাহারা উহা সুন্দর ইংরাজীতে ব্যক্ত করিতে পারিল বা পারিল না। উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সহজ ইংরাজী উদ্ধৃতি বুঝিবার ক্ষমতা নির্বাচনের জন্য স্থির করিয়া রাখা হইয়াছে, ৩০০ মার্কের মধ্যে ৩০ মার্ক একটা উদ্ধৃতি পড়িয়া প্রশ্নোত্তর করিবার জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহাই বোধশক্তি পরীক্ষা (Comprehensive test)। এই প্রশ্নের

উত্তর ছাত্রদের ইংরাজীতে লিখিতে হয়। এইভাবে ভাবপ্রকাশ ও বোধশক্তির যুগ্ম পরীক্ষা হইয়া থাকে। স্কুল ফাইন্যাল, উচ্চ মাধ্যমিক ও প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় কোর্সের পাঠ্যতালিকায় Precis-writing-এর ব্যবস্থা আছে। Precis লিখিতে বোধশক্তির যেমন দরকার ভাবপ্রকাশেরও তেমন প্রয়োজন হয়। ছেলেরা একটি উদ্ধৃতি পড়িয়া যখন তাহার অন্তর্নিহিত অর্থ ঠিকমত Idiomatic ইংরাজীতে শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারে না তখনই তাহারা ফেল করে। প্রতিকার :—ছেলেদের এই ফেলের হার কমানো যাইতে পারে, যদি তাহাদের ইহা ইচ্ছাধীন করিয়া দেওয়া যায় যে তাহারা ইচ্ছা করিলে ইংরাজীর উত্তর মাতৃভাষায় করিতে পারিবে, বোধ-শক্তির পরীক্ষায় উদ্ধৃতির প্রশ্নোত্তরও মাতৃভাষায় করিতে পারিবে। তবে যাহারা ইংরাজীতে উত্তর করিবে তাহাদের একটু বেশী নম্বর দেওয়া (A bit more credit) হইবে। আমরা এ-যাবৎ ভাষার প্রকাশের উপর জোর দিয়া আসিয়াছি, এখন বোধশক্তির উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করা দরকার।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মূল্যবান সামগ্রী গ্রহণ করিতে, ভারতীয় ভাষাকে নানাবিধ ভাবধারায় ও চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ করিতে, ছাত্রদের ইংরাজীতে বোধশক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ছাত্রদের বোধগম্যের ক্ষমতা একটুও ব্যাহত হইবে না যদি তাহাদের পরীক্ষাতে মাতৃভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে দেওয়া হয়।

একটা ভাষাকে বুঝিতে পারা সেই ভাষার ভাবধারাকে প্রকাশ করা অপেক্ষা সহজ, সুতরাং ইংরাজী বুঝিবার ক্ষমতা ছেলেদের বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইংরাজীতে ফেলের হার কমাইতে হইলে, আমাদের ইংরাজী পাঠ্যতালিকা ও পরীক্ষার পদ্ধতি বদলাইতে হইবে :—

প্রথমতঃ স্কুল ফাইন্যাল, উচ্চ মাধ্যমিক ও প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের মধ্যে একটা সমতা রক্ষা করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ ভাষা বুঝিবার দিকে, ভাষা প্রকাশের অপেক্ষা বেশী নজর দিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ তিনটি কোর্সেই (যথা স্কুল ফাইন্যাল, উচ্চ মাধ্যমিক ও প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয়) ইংরাজীকে শুধু প্রয়োগ বিজ্ঞানের দিক দিয়া পড়াইলে চলিবে না, Content Subject বা তাহার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুর দিক দিয়াও পড়াইতে হইবে।

চতুর্থ, প্রশ্নের ধরন এইরকম হইবে যেন ছেলেরা নোটবই মুখস্থ করিয়া উত্তর করিতে না পারে।

বই পড়ার উপর আগ্রহ জন্মানই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। কোন শিক্ষাবিদ্ বলিয়াছেন, জীবনে তিনি এরূপ দুঃখকষ্টের কথা জানেন না যাহা আধ ঘণ্টা ভাল বই পড়িলে নিবারণ করা যায় না। ভাষাকে শুধু Skill Subject বা প্রয়োগকৌশল হিসাবে পড়িলে আহারে বসিয়া ছুরি ও কাঁটার সদ্ব্যবহার মত হইবে, তাহাতে আহারের আনন্দ বা পরিপুষ্টি সাধন হইবে না, সুতরাং আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষাদানের যে সকল ত্রুটি রহিয়াছে, তাহা সমাধান করিতে হইবে। তাহা না হইলে ছেলেদের ইংরাজীতে ফেলের হার কমিবে না এবং ছেলেরা ইংরাজী পড়িয়া আনন্দও পাইবে না।

ছাত্রজীবন : সিটি কলেজ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

(৭)

সিটি কলেজে পুস্তকাগারে অনেক নূতন নূতন ভাল ভাল বই পাই। মেঘনাদবধ কাব্য, হেমচন্দ্রের কবিতাবলী ইত্যাদির সঙ্গে রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীও পাইলাম। রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে 'প্রবাসী' ও 'সবুজপত্রে'র মাধ্যমে কৈশোর হইতেই আমার কিছু কিছু পরিচয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু এতগুলি গল্প পদ্য রচনা ইতিপূর্বে আর কখনও দেখি নাই। পূজার ছুটিতে যতটা সম্ভব পড়িয়া ফেলিলাম। রবীন্দ্রনাথের কি অপূর্ব গল্পসংগ্রহ ছিল এই গ্রন্থাবলীতে। এখন সেগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন পুস্তকে হয়ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কোন একখানি বইয়ে এতগুলি গল্প পাওয়া এখনকার পাঠকের পক্ষে আর বুঝি সম্ভব নয়। স্কুলে দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে প্রধান শিক্ষক মহাশয় 'সবুজপত্র' হইতে "বোষ্টমী" গল্প আমাদের পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। আহা, সে কি সুন্দর গল্প। বোষ্টমী লেখকের নিকট আসিয়া বলিতেছে—ওহে, তুমি ত নবদ্বীপ-সুন্দর শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতিমূর্তি। গল্পগুলি প্রথমে আগাগোড়া পড়িয়া ফেলিলাম—একরাত্রি, ডাকঘর, পোষ্টমাষ্টার, ক্ষুধিতপাষাণ এবং এই ধরণের আরও কত গল্প পড়ি। কাবুলিওয়ালা বোধ হয় ইহাতে সন্নিবেশিত ছিল না। বহুস্থলে পল্লীগ্রামের বৈচিত্র্যময় দৃশ্য, কথা ও কাহিনী। আমরা পল্লীর মানুষ, এগুলি পড়িয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতাম। তখনকার অনুভূতি এখনও যেন মনপ্রাণ জুড়িয়া আছে। পরে শুনিয়াছি, এসকল গল্প অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে থাকাকালীন লিখিয়াছিলেন।

বইখানিতে উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা, চিঠিপত্র, প্রভৃতিও ছিল অনেকগুলি। ব্রাহ্মর্ষি, নৌকাডুবি, বৌঠাকুরাণীর হাট এই সংস্করণে সন্নিবেশিত হয়। রাজর্ষির নাটকীয় রূপ "বিসর্জন"ও ইহার মধ্যে ছিল মনে হইতেছে। 'চিরকুমার সভা' আর একটি উপাদেয় রচনা। আজকাল 'রম্য' কথাটির কতই না ছড়াছড়ি। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত, মুচিরাম গুড়ের জীবনী, এবং রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা আপনারা পড়িবেন এবং পড়িলে 'রম্য' কথাটির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। প্রবন্ধ সাহিত্য যে কত অপরূপ হইতে পারে তাহার প্রথম আস্বাদন পাইলাম। এই বইয়ের মধ্যে 'কাব্যে উপেক্ষিতা' প্রবন্ধটি আপনারা অনেকে হয়ত পড়িয়া থাকিবেন। সকলেই রাম-সীতার কথা বলে, লক্ষ্মণের কথা বলে, ঊর্মিলার কথা কেউ বলে না। কিন্তু অন্তরালে থাকিয়া লক্ষ্মণ-সহধর্মিণী ঊর্মিলা তিলে তিলে যে কিরূপ আত্মদান করিয়াছেন; তাহা ক'জনে বলে বা জানে? আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথই প্রথম রাজ-অন্তঃপুর-বাসিনী ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিতা ঊর্মিলার কথা সর্বজন-সমক্ষে অনবদ্য ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। এইরকম আরও কয়েকটি অন্তরালবাসিনী মহীয়সী মহিলার কথা তাঁহার এই প্রবন্ধে পাইয়াছিলাম। চিঠিপত্রের ভাষার মধ্যের বৈশিষ্ট্য সেই তরুণ বয়সেই লক্ষ্য করিতাম। রবীন্দ্রনাথের গদ্য পদ্য রচনা লইয়া সেযুগের সাহিত্যিকমহলে বেশ খানিকটা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ চলিত। অবশ্য আমাদের তরুণ বয়সেই ইহার কিছু অবসাদ হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা কথা বুঝি না—এইরূপ একটা সংস্কার এখনও

যেন লোকের মনে রহিয়া গিয়াছে। সেদিন ট্রেনে ফিরিবার কালে কাহারও কাহারও মুখে অনুরূপ কথা শুনিলাম। একবার কোন এক ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন—আপনি এত সহজ করিয়া লেখেন! কিন্তু লোকে বলে বড় কঠিন, বুঝি না। - রবীন্দ্রনাথ রঙ্গ করিয়া চণ্ডিদাসের কবিতারই উত্তর দেন, "সহজ সহজ সবাই কহয়ে সহজ বুঝে না কেহ?" রবীন্দ্রনাথ এখন জাতির চিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশে সরকার মনোযোগী। এসময়েও ঐরূপ 'বুঝিনা' কথা শুনিলে মনে বড়ই দুঃখ পাই।

পূজার ছুটির পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। পুনরায় পড়াশুনায় মন দিলাম। তবে একটু আগে যেমন বলিয়াছি, পাঠ্যাতিরিক্ত বই বেশি পড়িতাম। ইহাতে তখন কিছু ক্ষতিও হইয়াছিল। তবে এ ক্ষতিকে কখনও ক্ষতি বলিয়া মনে করি নাই। স্যাডলার কমিশনের কথা আজকাল ক'জন ছাত্র জানে! আমরা যখন স্কুলে পড়ি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও উন্নততর উপায় নির্ণয়ের নিমিত্ত বিলাতের শিক্ষাবিদ্ স্যর মাইকেল স্যাডলারের সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠিত হইয়াছিল। এই কমিশনে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একজন সদস্য ছিলেন। শুধু বাংলা দেশে নয়, বাংলার বাইরেও বিভিন্ন শিক্ষা-কেন্দ্র কমিশনের সদস্যগণ পরিদর্শন করেন। বহু ইওরোপীয় ও ভারতীয় শিক্ষাবিদের সাক্ষ্যও গৃহীত হইয়াছিল। কমিশনের মূল রিপোর্ট এবং এই সাক্ষ্য প্রমাণ কয়েক খণ্ডে মুদ্রিত হয়। এই রিপোর্টেই সর্বপ্রথম বলা হয় যে, উচ্চতর শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে প্রদানের নিমিত্ত ইন্টারমিডিয়েট মান পর্যন্ত স্কুলের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিয়া বি-এ হইতে এম-এ পর্যন্ত একক্রমে পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, সেখানেই এই ব্যবস্থা প্রথম অবলম্বিত হয়। পরে অন্যান্য কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ও এই ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে আরম্ভ করেন। স্বাধীনতার পরিবেশে পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি এই ব্যবস্থা অনুসৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বহু খণ্ডে মুদ্রিত এই রিপোর্ট আমি সিটি কলেজের লাইব্রেরীতে বসিয়া পড়িতাম, এবং শিক্ষা-বিদের বিভিন্ন উচ্চতর শিক্ষা কিরূপে সুষ্ঠুভাবে দেওয়া চলে সে সম্বন্ধীয় মতামত পাঠ করিতাম।

আমার আর একখানি প্রিয় বই ছিল "Gokhale's speeches"। এ বইখানি সম্বন্ধে পূর্বে সামান্য কিছু বলিয়াছি, এখন একটু বিস্তারিত করিয়া বলি। গোখ্‌লের পুরা নাম গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে। তিনি পুণা ফার্গুসন কলেজের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করিয়া বেজায় ত্যাগব্রত অবলম্বন করেন। ঐ কলেজটি ডেকান এডুকেশন সোসাইটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং কলেজের অধ্যাপকগণকে মাথাপিছু মাসে পঁচাত্তর টাকা মাত্র দেওয়া হইত। গোখ্‌লে অর্থশাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিও ছিল তাঁহার অসাধারণ। তিনি ক্রমে কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক হইয়া উঠেন। ১৯০৫ সনে বারাণসীধামে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে জাতীয় রাজনীতিতে দুইটি দল দেখা দেয়—মডারেট ও এক্সট্রিমিষ্ট। গোখ্‌লে মডারেট দলভুক্ত হইয়া পড়েন এবং কোন কোন কাজের জন্য ঐ সময়ে উগ্র-পন্থীদের নিকট তাজ্যও হইয়াছিলেন। কিন্তু গোখ্‌লের কর্মকুশলতা এবং চিন্তাশক্তি স্বদেশের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, আর্থনৈতিক এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ে প্রযুক্ত হইয়া আমাদের সবিশেষ উপকার সাধন করে। তিনি বাংলাদেশের বহু খ্যাতনামা মনীষীকে বন্ধুরূপে পাইয়াছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। সুপণ্ডিত ভট্টর পি. কে. রায় এবং তদীয় পত্নী সরলা রায় তাঁহার অত্যন্ত গুণমুগ্ধ বন্ধু ছিলেন। গোখ্‌লে মেমোরিয়াল স্কুল

প্রতিষ্ঠার দ্বারা রায়মহাশয় তাঁহার স্মৃতিকে বঙ্গদেশে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। মনীষীপ্রধান প্রফুল্লচন্দ্র গোখ্‌লে মহোদয়কে 'পুণ্যশ্লোক' বিশেষণে বিশেষিত করেন। গোখ্‌লে বহু বৎসর কেন্দ্রীয় আইন-সভার (তখন Imperial Legislative Council) সদস্য ছিলেন। প্রতি বৎসর বাজেট আলোচনা কালে তিনি যে সকল বক্তৃতা দিতেন তাঁহার প্রত্যেকটিই ছিল বিশেষ চিন্তাপূর্ণ এবং তথ্যভিত্তিক। বস্তুতঃ রাজনীতির আলোচনায় তথ্যকে প্রাধান্য দান—মনে হয় তাঁহার বক্তৃতাগুলিতে আমরা প্রথম পাই। স্বদেশী আন্দোলনের প্রাবল্যকালে সরকার পক্ষে মুদ্রাযন্ত্র দমন আইন, সভাবন্ধ আইন, প্রভৃতি যখন আইনসভায় বিধিবদ্ধ হয়, তখন তাঁহার বক্তৃতার ফলেই ইহাদের কোন কোন ধারা সংশোধিত হয়। আজকাল বাঙ্গালীর বড় দুর্নাম। চিন্তাশীলতা যেন তাহার মধ্যে দেখাই যায় না। কিন্তু একদিন 'পুণ্যশ্লোক' গোখলে বক্তৃতার মধ্যে এই কথাটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন "What Bengal thinks today India thinks to-morrow." বহুস্থলে বহুজন দ্বারা এই কথাগুলির পুনরুক্তি হইয়াছে এবং তাহার ফলে ইহার নূতনত্ব এখন আর মনেই আসে না। আবার আধুনিক বাঙালীর চিন্তাশূন্যতা দেখিয়া লোকে এই কথাগুলির সারবত্তাও উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু গোখলে মহোদয় সেযুগের বাঙালীর চিন্তাশীলতা এবং কর্মনৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই। তিনি একটি বক্তৃতায় ব্রিটিশজাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, যে জাতির মধ্যে ভট্টর রাসবিহারী ঘোষের মত ব্যবহার-শাস্ত্রবিদ্, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত কবি এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বসুর মত বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাকে তোমরা শত চেষ্টা সত্ত্বেও দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না।

গোখলে কেন্দ্রীয় আইন সভায় প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও আবশ্যিক করিবার জন্য একটি আইনের খসড়া উপস্থাপিত করেন। তিন বৎসর যাবৎ এই খসড়ার উপর আলোচনা চলে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় তিনটি তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা ঐ বক্তৃতা-গ্রন্থে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। শোনা যায় স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে এই বিলের বিরোধিতা করায় ইহা কার্যকর না করিবার পক্ষে সরকারের খুবই সুযোগ হয়। কিন্তু এই বক্তৃতাগুলি এখনও পাঠ করিলে ইহার সরলতা এবং বিষয়বস্তুর সারবত্তা আমাদের হৃদয়ঙ্গম না হইয়া পারিবে না। গোখলে যেমন মহাদেব গোবিন্দ রাণাডেকে নিজের গুরু বলিয়া মানিতেন তেমনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী গোখলে মহোদয়কে স্বীয় গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন। গোখলে দক্ষিণ-আফ্রিকায় গান্ধীপরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন পর্যবেক্ষণ করিতে গিয়া তাঁহার কার্যকলাপের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হন। স্বদেশে ফিরিয়া গান্ধী তথা এই আন্দোলন সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা আমাদের জাতীয়-সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। তিনি বক্তৃতার একস্থলে গান্ধী সম্পর্কে বলিয়াছিলেন—"He is a man among men" অর্থাৎ তিনি মনুষ্য-জাতির মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ। আরও কত কথা তখন গান্ধী সম্পর্কে পড়িয়াছি। এ ধরণের বড় বড় বক্তৃতা ছাড়াও ছোটখাট আরও বহু বক্তৃতা এই পুস্তকখানিতে গ্রথিত ছিল। বি-এ পড়িবার সময় গোখলের বক্তৃতাগুলি লইয়া আমি অধ্যয়ন অনুধ্যান করিতাম। তিনি শুধু সুপণ্ডিত ছিলেন না, তিনি ছিলেন সত্যকার স্বদেশপ্রেমিক, দরদী মানুষ। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পুণার ভারত সেবক সমিতি (Servants of India Society) দীর্ঘকাল জাতীয় সেবায় রত থাকিয়া দেশ বিদেশে জাতির আত্মশক্তি ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হয়।

সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র পাঠের প্রতি আমার

বরাবর ঝোঁক। কলিকাতায় আসিয়া ইহাতে খুবই সুবিধা হইল। 'বেঙ্গলী' তখন প্রায় অন্তর্হিত। 'দার্ভেন্ট' পত্রিকা কয়েকবৎসর বেশ গুমানের সঙ্গে চলিয়া আবার ও হাতে তখন কেমন তাটা পড়ে। এই সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত "ফরোয়ার্ড" পত্রিকার খুবই নাম। প্রচারও আশাতীত। আমরা তখন 'ফরোয়ার্ড' দৈনিকখানি নিয়মিত পড়িতাম। তখন রাজনৈতিক আকাশে বিভিন্ন মত ও পথ লইয়া কতই না বাদবিসম্বাদ। গান্ধীর মতাবলম্বীরেরা তখন 'নো-চেঞ্জার' নামে আখ্যাত। যাঁহারা ভিন্ন মতের, যেমন—চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু প্রভৃতি তাঁহাদের নাম দেওয়া হয় 'প্রো-চেঞ্জার' বা পরিবর্তনপন্থী। রাজনীতির কচকচি আমাদের তরুণ মনেতখন যে খুব রেখাপাত করিয়াছে তাহাত বলিতে পারি না। তবে আমরা সাধারণত মহাত্মা গান্ধীর অনুসৃত পন্থাকেই সবদিক শ্রদ্ধার চোখে দেখিতাম। স্বরাজ্য দল আইনসভার একটি মাত্র ভোটের জোরে মন্ত্রীদের পতন ঘটাইল কিনা তাহা আমাদের মনে তেমন কোন চাঞ্চল্যের উদ্রেক করিত না বা তাহা লইয়া আমরা আলোচনায়ও মাতিয়া যাই নাই। এই 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় একটি বিষয় ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইত। তাহা মহাত্মা গান্ধীর আত্মকথা। ইহাই পরে 'My Experiment with truth' শীর্ষক পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়া প্রকাশিত হয়। গান্ধীজি "নবজীবন" পত্রিকায় মাতৃভাষা গুজরাটীতে আত্মকথা লিখিতেন—ইহার ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইত তৎসম্পাদিত ইংরেজী সাপ্তাহিক "ইয়ং ইণ্ডিয়া"য়। 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় ইহা হইতে আত্মকথা অংশ নিয়মিতভাবে উদ্ধৃত হইতেছিল। আমরা তখন ইহা পাঠ করিয়া বিমোহিত হইতাম; আমাদের মনের শক্তিও বাড়িয়া যাইতেছে বোধ করিতাম। তখন কিন্তু ইংরেজী সংবাদপত্রেরই চলন ছিল শিক্ষিত মহলে বেশি। আজিকার দিনে তাহা বোধ হয় কল্পনাও করা যায় না। বর্তমানে বাংলা সংবাদপত্রের প্রচারবাহুল্য ঘটিয়াছে খুবই, কিন্তু মনোযোগের সঙ্গে আমরা ইহা পাঠ করি ক'জনে? শিরোনামা দেখিয়া হয়ত বিষয় সম্বন্ধে সত্যমিথ্যা বা অর্ধসত্য অর্ধমিথ্যা ধারণা করিয়া লই। প্রচার বাহুল্য হইলেও সংবাদপত্রপাঠে তৎপরতা যেন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। আবার সংবাদ-পত্রের মূল্য বৃদ্ধির জন্যও সাধারণের পক্ষে প্রত্যহ ক্রয় করিয়া মনোযোগের সহিত পড়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। আমি যে অঞ্চলে বাস করি সেখানে অন্তত তিন হাজার শিক্ষিত পরিবারের বসতি। কিন্তু হিসাব করিলে দেখা যাইবে, ইহার অনুপাতে অতি কম সংখ্যক পরিবারেই দৈনিক বাংলা ও ইংরেজী কাগজ আসিয়া থাকে। সংবাদপত্র যে সাধারণ শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ তাহা কার্যত যেন আমরা ভুলিতে বসিয়াছি।

বাঙালীর চিন্তাশীলতা তথা অগ্রগণ্যতা সম্বন্ধে গোখলে মহোদয়ের উক্তি কিছু আগে উদ্ধৃত করিয়াছি। গত যুগের বাঙালীদের নানা বিষয়ে কৃতিত্বের কথা স্মরণ করিয়া আমরা গর্ব অনুভব করি। কিন্তু ইহা যদি বর্তমানে বাঙালীর প্রাণে প্রেরণা না জাগায় তাহা হইলে এই গর্ব অনুভূতির সার্থকতা কি? অতীত বর্তমানের ভিত্তি। এই ভিত্তিকে অস্বীকার করিলে বর্তমান ধসিয়া পড়িবে। অথচ অতীত কৃতীর স্মৃতিমাত্র সম্বল লইয়া আমরা সুস্থ সবল হইতে পারি না। আমাদের প্রত্যেককে পূর্বসূরীদের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কর্ম-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। তবেই তো অতীতের স্মৃতির সার্থকতা। আজকাল যখন দেখি অধিক খেলায় প্রমত্ত হইয়া আমরা সময় কাটাইতেছি, নিজের দোষত্রুটির কথা একেবারে মনে না আনিয়া পরের নিন্দায় পঞ্চমুখ হইতেছি, তখন বর্তমানের এই নিশ্চিন্ত নিষ্ক্রিয়তা দেখিয়া জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড়ই সন্দিহান হইতে হয়। অতীত

গৌরবকে আমরা সর্বদা হৃদয়ে ধরিয়া রাখিব। তাই বলিয়া অহংকারে আত্মহারা হইলে চলিবে না। বাঙালীর চিন্তার জড়তা আমার দরুণ আমাদের চিত্তে হীনমন্যতাবোধ আস্তে আস্তে শিকড় গাড়িতেছে। ইহাকে উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। বৃথা অহংকারে মত্ত না হইয়া, চিন্তায় ও কর্মে আমাদিগকে সক্রিয় হইতে হইবে। বাঙালীর অগ্রগণ্যতা সম্বন্ধে সে যুগের গোখলে প্রভৃতি মনীষীগণ যে অমন স্পষ্টভাবে সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয়। তবে দেখিবেন, ইহা লইয়াই যেন আমরা বুক ফুলাইয়া বসিয়া না থাকি! আমরা তরুণ বয়সে গোখলের সারগর্ভ বক্তৃতাগুলি পাঠ করিয়া প্রাণে বাস্তবিকই বল পাইয়াছিলাম।

পূর্বে বলিয়াছি, আমি স্কুল হইতেই 'প্রবাসীর'-র পোঁড়া হইয়া উঠি। কলিকাতায় আসিয়া এই পত্রিকাখানি পুনরায় রীতিমত পাঠের সুযোগ পাইলাম। কোথা হইতে প্রতিমাসে এখানি জোগাড় হইত তাহা ঠিক মনে নাই, তবে পড়িতাম। ঠিক সময়ে হাতে না আসিলে স্টলে গিয়া—কি কি বাহির হইয়াছে দেখিয়া লইতাম। এখানে একবারের কথা বলি। রবীন্দ্রনাথের একটি সুন্দর দীর্ঘ কবিতা 'প্রবাসী'তে বাহির হয়। আমরা কয়েকজন একত্র হইয়া, আবার এককভাবে পড়িয়া ফেলি। পূজার ছুটির কিছু পরে নবেম্বরের শেষে সুভাষচন্দ্র বসুকে সরকার ১৮১৮ সনের তিন আইনবলে অকস্মাৎ গ্রেপ্তার করিয়া মান্দালয়ে নির্বাসনে পাঠান। তাঁহার সঙ্গে আরও দুইজন ঐ জেলে যান—সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এবং অনিলবরণ রায়। বিপ্লবাত্মক কর্মে লিপ্ত সন্দেহে আরও বহু ব্যক্তি এই সময় সরকার কর্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন। এই ব্যাপারটি লইয়া কলিকাতায় বেশ আলোড়ন উপস্থিত হয়, আলোড়ন ঠিক তরঙ্গের মত—একবার উঠিয়া আবার পড়িয়া যায়। তবে আমরা কিন্তু ইহা বেশিদিন ভুলিয়া থাকিতে পারিলাম না। দক্ষিণ আমেরিকার যুদ্ধ এবারের হইতে রবীন্দ্রনাথ ঐ কবিতাটির মধ্যে বাঙালী চিত্তের উদ্বেলতাকে বিধৃত করিয়া আমাদের সম্মুখে উহা আবার ধরিয়া দিলেন। ঐ কবিতাটির মধ্যে 'প্রবাসী'তে ইহা পাঠ করিয়া লোকেরা তাঁহাকে আবার ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। কাহাকে-কাহাকেও এমন কথাও বলিতে শুনিলাম যে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল পরে তাঁহার পূর্বযুগের কবিতার মত একটি চমৎকার কবিতা এবারে দেশবন্ধুকে পরিবেশন করিলেন।

'প্রবাসী'র কথা বলিতে গিয়া এই সময়কার আর একখানি পত্রিকার কথাও কিছু বলিতে হয়। এখানি তখন ছিল সাপ্তাহিক। সবে বাহির হইয়াছে মাত্র। কিন্তু প্রকাশের অল্পকালের মধ্যেই এখানি শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আমরা কলিকাতায় পড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই যতদূর মনে হয়, এই পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। ইহার উপরে সম্পাদকের নাম ছিল না। অন্য কোন সাধারণ নিয়মও তখন কেহ জানিতে পারে নাই। তবে আপার সার্কুলার (বর্তমান আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র) রোড কোথাও হইতে এখানি বাহির হয় এবং 'প্রবাসী'র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ—সাধারণের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। দেশবন্ধু চিত্ত-রঞ্জন বিল্ডিং সভায় ইহাকে একটি "চটি সাপ্তাহিক" বলিয়া ইহার উক্তিগুলির অ-যাথার্থ প্রমাণ করিতে চাহিতেন। ইহাতে পত্রিকাখানির খুবই প্রচার হইতে থাকে। ঐ সময় আমি পত্রিকাখানি স্টলে দেখিতাম। বোধহয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সরকার ইহার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা ও আলোচনা পদ্ধতির দিকে ক্লাসে কি ক্লাসের বাহিরে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহেই দেশবন্ধুর কোন না কোন কার্যের, বিশেষত তাঁহার স্বরাজ্য দলের কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে আলোচনা থাকিত। আলোচনার ভাষাও বেশ তীব্র অথচ রসাল ছিল। তিনি এই সময়ে পল্লী সংগঠনের

একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করিলেন। ইহা লইয়াও এই পত্রিকায় কতই না সমালোচনা হইল। পত্রিকার মনে হইতেছে তখন এই মর্মে লেখেন যে, চিত্তরঞ্জনের পরিকল্পনায় নূতন কিছুই নাই, বহু পূর্বে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজে ইহার একটি পূর্ণ রূপ দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দেশবন্ধুর হিন্দুমুসলমান চুক্তিরও ইহা ঐ সময় তীব্র সমালোচনা করে। লেখা সকলই ছিল বেনামীতে। মাঝে মাঝে ছদ্মনাম কিছু কিছু থাকিত। তখন আমাদের চিন্তারাজ্যে এই পত্রিকাখানি একটি নূতন দিক খুলিয়া দেয়। পরে ইহা রাদিকে পরিণত হয় এবং সাহিত্য সমালোচনার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। পত্রিকাখানির নাম 'শনিবারের চিঠি'।

———

ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকের ডায়েরী

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

ডেনমার্কের আবহ্নিক বিদ্যালয়

১৯৫৩ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে আমি কোপেনহাগেনের একটি ক্ষুদ্রতম আবহ্নিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করি ; শিক্ষার বিবিধ ব্যবস্থা ও পরিচালনা পদ্ধতি লক্ষ্য করাই আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল। বিদ্যালয়টির নাম—Norrevold, ১৮৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত, ছাত্র সংখ্যা—৬৭০।

এই বিদ্যালয়ে রান্নার ব্যবস্থা ছিল না, কেন্দ্রীয় পাকশালা হইতে ছাত্রছাত্রীদের খাবার আসিত। আমি যখন বিদ্যালয়ে পৌঁছি, তখন সর্বনিম্ন শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা লাকরুমে বসিয়া আহার করিতেছিল এবং অন্যান্য ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা যার যার ক্লাসে বসিয়াই আহার করিতেছিল। বিদ্যালয়ের সকল ছেলেমেয়ে একসঙ্গে বসিয়া আহার করিতে পারে তেমন ব্যবস্থার অভাব ছিল। এখানে আবার বলা ভাল, গত যুদ্ধের সময় ডেনমার্ক অধিকৃত হওয়ায় ফলে দেশের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ব্যাহত হইয়াছে এবং আত্মরক্ষার খাতে ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ার ফলে শিক্ষাব্যবস্থাকে এখনও প্রতিবেশী রাষ্ট্র সুইডেনের মত প্রগতিসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারে নাই। ডেনিশরা এ বিষয়ে নিজেরাই খুব সচেতন ; সংবাদপত্রেও এ সম্পর্কে আলোচনা প্রায়ই দেখা যায়। ১৯৩৪ সালে ডেনমার্ক পরিক্রমার সময়ে সমাজ-জীবনে যে আনন্দের ছবি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, এবার (১৯৫৩ সালে) তেমনটি দেখি নাই। অনুপেক্ষনের ধাক্কা খাইয়া দেশবাসী অনেকটা অন্তর্মুখী হইয়াছে—যেন নূতন চিন্তা ও নূতন ভাবধারা প্রকাশের পথ খুঁজিতেছে।

আমি উক্ত বিদ্যালয়ের "বিশেষ ক্লাশ" পরিদর্শন করিয়াছিলাম। ছাত্রছাত্রী যাহাদের বুদ্ধি ও ধারণা-শক্তি স্বাভাবিক অথচ মাতৃভাষায় দুর্বল, তাহাদের মাতৃভাষার জ্ঞানকে উন্নত করার জন্য এই বিশেষ ক্লাশের ব্যবস্থা। এই "বিশেষ ক্লাশে" প্রচুর Teaching-aid ব্যবহৃত হয়। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে বাংলাদেশেও এরূপ ঘটে। ছাত্রছাত্রী অঙ্ক ভূগোল বিজ্ঞানে পরীক্ষায় যেরূপ নম্বর পায়, মাতৃভাষায় কেহ কেহ তত পায় না। কিন্তু মাতৃভাষার জ্ঞান সকলেরই যথাসম্ভব উন্নত হওয়া প্রয়োজন, কারণ মাতৃভাষার মাধ্যমেই সাধারণের জীবনের ভাব সুস্পষ্ট রূপ

পাইতে পারে। এ বিষয়ে হয়ত আমাদের শিক্ষাবিভাগ ব্যবস্থা করিতেছেন।

উক্ত ডেনিশ বিদ্যালয়ে পাঁচটি ক্লাব আছে। ১৬০টি বিদ্যার্থী এই ক্লাব সমূহের সদস্য। যে কোন একটির সদস্য হইতে হইলে এক ক্রাউন (এক টাকার প্রায় সমান) ভর্তি ফি লাগে। পিতামাতারা যখন কর্মানুরোধে বাড়ীর বাহিরে থাকেন, তখন ছেলেমেয়েরা যাহাতে শুভজনক কাজ করিতে পারে, সেই ব্যবস্থার জন্যই এই ক্লাবের জন্ম। বিকাল তিনটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত ক্লাব খোলা থাকে। এই ক্লাবে বিভিন্ন বিষয় শেখান হয় যেমন (১) সূচের কাজ (২) লোকগীতি ও নাট্য (৩) কিলনস্ট্রিপ তৈরি (৪) ফটোগ্রাফি (৫) ছবি আঁকা ও মডেলিং। তাছাড়া ক্লাবের সমস্ত ছেলেমেয়েরা প্রতি বৎসর দশদিনের জন্য ভ্রমণে যায়। ফিরিয়া সকলেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতার পূর্ণ বিবরণ রচনাকারে লেখে। নিজেদের স্বাভাবিক আত্ম-প্রকাশের জন্যই এই ব্যবস্থা। আর এরূপ ক্লাব ডেনমার্কের অনেক বিদ্যালয়ের আছে।

১৫ই এপ্রিল (১৯৫৩) আমি Gresundsej নামক কোপেনহাগেনের মুহল্লার আর একটি বিদ্যালয়ে গিয়াছিলাম। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১২৮০। বিদ্যালয়ে দশটি ক্লাস, বিয়াল্লিশটি সেকসনে বিভক্ত। শিক্ষক সংখ্যা ৩৮, সকলেই শিক্ষকশিক্ষণ পরীক্ষায় পাশ করা। তাছাড়া দুইজন Part-time শিক্ষক আছেন—অতিরিক্ত বিষয় পড়াইবার জন্য।

এই বিদ্যালয়ের নিজস্ব রান্নাঘর আছে। ৩৫ জন মহিলা রান্নাঘরে কাজ করেন। তাঁহারা অতিরিক্ত আটটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর—মোট চারি হাজারের জন্য খাবার তৈরি করেন। তৈরি খাদ্য মোটরযোগে অন্যান্য বিদ্যালয়ে যথাসময়ে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

কোপেনহাগেনের প্রায় সকল বিদ্যালয়েই স্নান করার ব্যবস্থা আছে। শীতপ্রধান দেশে সকল বাড়ীতে স্নানের ব্যবস্থা বড় থাকে না; সেজন্য বিদ্যালয়ে সকল ছাত্রছাত্রীকেই মাসে কমপক্ষে দুইদিন বিদ্যালয়ের স্নানাগারে স্নান করিতে হয়। আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যেমন রোজ স্নান করি, শীতপ্রধান দেশে তেমন করার গরজ সকলের থাকে না; সেজন্য সকল বাড়ীতে স্নানের ব্যবস্থাও করা হইত না। কিন্তু স্বাস্থ্য অটুট রাখিবার জন্য স্নানের প্রয়োজন—এই জ্ঞান এখন সকলেরই হইয়াছে এবং স্নানের ব্যাপক ব্যবস্থা শীতপ্রধান দেশেও হইতেছে। বস্তুতঃ সর্বসাধারণের স্নানাগার এখন সকল দেশেই হইয়াছে। বিদ্যালয়ে যাহারা জিমন্যাস্টিক শেখে, তাহারা নিয়মিত গরমজলে স্নান করে।

বিদ্যালয়ের খাদ্য-ব্যবস্থা

কোপেনহাগেনের মিউনিসিপ্যাল স্কুলে সংবৎসর অর্থাৎ ছুটির সময় ছাড়া অন্য সকল দিনে (সাধারণতঃ ১৫ আগষ্ট হইতে ১৫ জুন পর্যন্ত) বিনামূল্যে বিদ্যালয়ে খাদ্য পরিবেশন করা হয়। প্রধান নগরের বিদ্যালয়ে যে খাবার পরিবেশন করা হয় তাহা এইরূপ :—

এক—চারি টুকরা রুটি (Rye-broad), রুটির উপর মারগারিন, ফলের সালাদ, কেরট (Grated Carrot), লিভার পেষ্ট (Liver paste), পনীর ইত্যাদি দেওয়া হয়। এই খাদ্যে প্রচুর ভিটামিন থাকে।

দুই—একটি করিয়া আপেল।

তিন—½ লিটার দুধ

যদি কেহ আরও খাইতে চায়, তাহা হইলে আর একখানা রুটি মারমেলাদ যোগে পরিবেশন করা হয়।

সর্বনিম্ন শ্রেণীর ছেলেমেয়েদিগকে ভিটামিন পিল খাইতে দেওয়া হয়। এই খাদ্য-ব্যবস্থা সম্পর্কে পরে লিখিব; তবে এইটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৪৮-৪৯ সালে বিদ্যালয়ের খাদ্যবাবদ রাষ্ট্রকে ৪,১৬৮,০০০ ক্রাউন অর্থাৎ ৪১ লক্ষ টাকার মত খরচ করিতে হইয়াছিল।

উপরে Grunddsvoj বিদ্যালয়ের কথা লিখিয়াছি, এরূপ একটি বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে কি খরচ হয় তাহা আমার সঠিক জানার ইচ্ছা হইয়াছিল। কোপেনহাগেন স্কুলবোর্ডের ভাইস ডিরেক্টর (Mrs Phillips Hanson)-কে অনুরোধ করায়, তিনি আমাকে ঐ বিদ্যালয়ের ১৯৫১-৫২ সালের খরচের হিসাব পাঠাইয়াছেন। এদেশে শিক্ষার জন্য কিরূপ ব্যয় হয় তাহা এই একটি সাধারণ বিদ্যালয়ের বাজেট দেখিলে ধারণা করা সহজ মনে করি, সেজন্য এখানে তাহা দিতেছি :—

প্রধান শিক্ষকের বেতন বৎসরে	১৮,৬৮৮·০৮ ক্রাউন
সহকারী প্রধান শিক্ষকের "	১৪,৯৬১·০৮ "
শিক্ষক সাধারণের বেতন	৪০৮,৪১৯·২৪
শিক্ষকদের অন্যান্য ভাতা :—	
(ক) খেলার মাঠে পরিদর্শন	২,৪৮০·০৭
(খ) ক্লার্ক	২,৯৫৭·৮২
(গ) অতিরিক্ত সময়ে ছাত্রদের দেখাশোনা করার জন্য	১,৩১৫·৭০
(ঘ) ছাত্রদের লাইব্রেরী	২,৯৬৪·১৭
(ঙ) অতিরিক্ত শিক্ষকের ভাতা	৪৫৮·৩৪
(চ) বিদ্যালয়ের প্রহরীর	২,৬৬৪·৬০
(ছ) যৌথ খাদ্য	১২০·০০
মোট—	১২,৯৯০·৭০
বিদ্যালয়ের ঘরোয়ানা	১১,১১৯·৫৭
পরিচারিকা (Charwoman)	৩৪,৭৫২·৪৪
মজুর	৩,১০৩·৬৫
আলানী ও আলো	৩৪,৩৫৯·৯০
ঘরবাড়ী মেরামত	২৫,০০০·০০
শিক্ষার সামগ্রী (Appliances)	২৫,৪১৭·৬৮
শিক্ষকদের লাইব্রেরী	১৪০·০২
স্কলারশিপ্ ও প্রাইজ	৯৫৯·২৭
ট্রাম, বাস ও ট্রেনভাড়া	৫৯৫·০০
প্রধান শিক্ষকের আফিসের সামগ্রী	৪৮৮·৭৩
টেলিফোন	৩৮৬·৪৯
আসবাব পত্র	৩,৩৬৬·৫২
স্নানাগারের সামগ্রী	৫,২৫৬·৪৭
শিক্ষক ও অভিভাবক সম্মেলন	৬৮৮১
অন্যান্য খরচ	৫৩·৯১
বিদ্যালয়ের ডাক্তারের ভাতা	৬,৬৩১·২০
বিদ্যালয়ের নার্স	৭,০৭৭·০০
বিদ্যালয়ের খাদ্য (Soboot meal)	১০৭,০০০·০০
মোট—	৭৯০,৩০৯·১১ ক্রাউন

এই সাতচল্লিশ হাজার তিনশত নয় ক্রাউন প্রায় একই পরিমিত টাকার সমান। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে একলক্ষ সাত হাজার টাকা বিদ্যালয়ে খাদ্য পরিবেশনের জন্যই ব্যয় হইয়াছে। বিদ্যালয়ে ডাক্তার ও নার্সের পথ্য খরচের ব্যবস্থাও লক্ষণীয়। এই খরচের হিসাব হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের বস্তু স্বাধীনদেশে কিভাবে পালিত হয়। খাদ্যাভাবে অপুষ্ট শরীর মন লইয়া বিদ্যার্থীরা যে বিদ্যালয়ের শিক্ষার সুযোগ জীবনে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না এবং ইহার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে জাতির জীবনে যে অপচয় ঘটিতেছে—এ বিষয়ে ভারতবর্ষের জনসাধারণ হয়ত এখনও সম্পূর্ণ সজাগ নহে। স্বাধীন ডেমোক্রেটিক দেশে জনমত এ সকল বিষয়ে সজাগ না হইলে, রাষ্ট্রের তরফ হইতেও কিছু করা সহজ নয়। আমি নিজে দীর্ঘকাল শিল্প-শিক্ষকতার কাজে বহু পল্লীর তরুণ ও যুবকদের সংস্পর্শে আসিয়াছি এবং নিজের অভিজ্ঞতা হইতে নিশ্চিত জানি যে বহুছেলে বয়সোচিত খাদ্য একেবারেই পায় না। ভারতবর্ষ বিশাল দেশ বটে, সেজন্য সমস্যাও অনেক। কিন্তু এখন শিক্ষার প্রসার স্বাধীন ভারতে হইতেছে ও বহুকাল হইতে থাকিবে। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির উপরই দেশেরও ভবিষ্যত নির্ভর করে। এ সময়ে পড়ুয়াদের উপযুক্ত খাদ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থার কথা আমাদিগকে ভাবিতেই হইবে। ইহা জাতির একটি মৌলিক সমস্যা মনে করিয়াই আমি Uno-এর কেন্দ্রোদ্ভূত বিদ্যালয়ের খাদ্য পরিবেশন-প্রথা ইউরোপের বিভিন্নদেশে দেখিয়াছি। ডেনমার্কের ব্যবস্থাও দেখিতেছি।

ডেনমার্কের বিদ্যালয়ে খাদ্য ব্যবস্থা ও ইহার ইতিহাস

বিগত শতাব্দীতেই ডেনিশ বিশ্ববিদ্যালয় খাদ্য পরিবেশন প্রথা আরম্ভ হইয়াছিল। তখন সমাজে

মঙ্গল সংস্থার উদ্যোগেই একাজ হইত এবং দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে বিদ্যালয়ে পথ্য খাদ্য পরিবেশন করা হইত। ক্রমে ক্রমে সমাজমঙ্গল সংস্থার কাজ শিক্ষানীতির অঙ্গ হইয়া উঠে। দেশবাসীও বুঝিয়াছিল যে ক্ষুধাকাতর ছাত্রছাত্রী রাষ্ট্র পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারে না। জনমতের চাপে ১৯০২ সালে বিদ্যালয় খাদ্য পরিবেশন প্রথা প্রথম আইনসিদ্ধ করা হয়। এই আইনের বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে এই ক্ষমতা অর্পণ করা হয় যেন দরিদ্র ছেলেমেয়েকে এবং উপযুক্ত খাদ্যাভাবে কাহারও শরীর অপুষ্ট মনে হইলে খাদ্য দানের ব্যবস্থা করিতে পারেন। ১৯৩৩ সালে এই আইনেরও সংস্কার সাধন করা হয়। এই নূতন আইনের উদ্দেশ্য পূর্ব আইনেরই অনুরূপ ছিল কিন্তু এই আইনের বলে রাষ্ট্রীয় অর্থকোষ হইতে সহায়তা দানের ব্যবস্থা হয় এবং বিনামূল্যে বিদ্যালয়ে খাদ্য দানের পথ প্রশস্ত করা হয়। ১৯৩৮ সালে পূর্ববর্তী আইনেরও সংস্কার হয়। পূর্বে বিদ্যালয়ে খাদ্য-পরিবেশন সমাজমঙ্গল কাজের অঙ্গ ছিল কিন্তু নূতন আইনে সে কাজ সম্পূর্ণ শিক্ষা বিভাগের কর্তব্যে পরিণত হয়। তাহাড়া আরও একটি অতিরিক্ত আইনের দ্বারা যুক্ত হইল, বিদ্যালয়ে খাদ্য পরিবেশন প্রথাকে পিতামাতা বা অভিভাবকের আয় নিরপেক্ষ করা হইল, ইহাতে বিদ্যার্থীকে বিনামূল্যে খাদ্য পরিবেশন করা স্থির হইল। রাষ্ট্রকোষের সাহায্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছুটি ছাটার দিন ছাড়া সমস্ত বিদ্যার্থীকে পরিবেশনের প্রথা এইভাবে ডেনমার্কে চালু হয়। এই খাদ্যপ্রথা ডেনমার্কে কত দ্রুত বিস্তারলাভ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা নিম্নোক্ত হিসাব দেখিলেই বুঝা যাইবে। ১৯৫০ সালে গ্রামীণ শহরের তিনটি অঞ্চলে (borongb) বহু শহরতলীর বিদ্যালয়ে এবং ত্রিশটি শহরে প্রবর্তিত হয়। এখানে ১৯৪৭ হইতে ১৯৫০ সালের হিসাব দেওয়া হইতেছে।

	১৯৪৭		১৯৪৯		১৯৫০	
	খাদ্য গ্রহণকারীর সংখ্যা	মোট বিদ্যার্থীর সংখ্যা	খাদ্য গ্রহণকারীর সংখ্যা	মোট ছাত্র সংখ্যা	খাদ্য গ্রহণকারীর সংখ্যা	মোট ছাত্র সংখ্যা
কোপেনহাগেন	৯,৬৬৩	৭২,১০০	৩৬,০০০	৭২,০০০	৪৯,৫০০	৭৪,০০০
দেশের অন্যত্র	১৮,০০০	৪০৯,৩০০	৪৮,০০০	৪১৮,০০০	৪৯,০০০	৪৩৭,০০০
মোট সংখ্যা	২৭,৬৬৩	৪৮১,৪০০	৮৪,০০০	৪৯০,০০০	৯৮,৫০০	৫১১,০০০

উপরোক্ত হিসাব হইতে জানা যায় যে বিনামূল্যে বিদ্যালয়ে খাদ্য গ্রহণকারীর সংখ্যা উক্ত সময় মধ্যে কতখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালে কোপেনহাগেনে এই সংখ্যা প্রায় চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশের অন্যত্র ১৯৪৭ সালের তুলনায় ১৯৫০ সালে আড়াই গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখানে পরিষ্কার করিয়া বলা ভাল যে ডেনমার্কের সমগ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে খাদ্য খায়। কিন্তু যে সকল শহরে খাদ্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে, সেই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে শতকরা ৪৪ জন বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে খাদ্য গ্রহণ করিতেছে। সমগ্র দেশের

সকল বিদ্যালয়ের তথ্য অনুসন্ধানে জানা যায় যে বিনামূল্যে বিদ্যালয়ে খাদ্য গ্রহণকারীর সংখ্যা সর্বত্র একরূপ নয়। ডেনমার্কের দ্বিতীয় শহর আরহুসএর (Aarhus) বিদ্যালয়ে শতকরা ৮০টি বিদ্যার্থী বিদ্যালয়ের খাদ্য গ্রহণ করে, কোপেনহাগেনে এই সংখ্যা শতকরা ৬৬ জন দেশের অন্যত্র এই সংখ্যা আরও কম। গেনটফ্‌তে (Gentofte) নামক কোপেনহাগেনের শহরতলীর বাসিন্দারা বেশ সমৃদ্ধ। সেখানে শতকরা ২২ জন মাত্র বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে খাদ্য পরিবেশনের সুযোগ গ্রহণ করে।

দেশরক্ষার খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় জন্য বিদ্যালয়ের খাদ্যদান প্রথাকে সার্বজনীন করা এখনও সম্ভব হয় নাই। ১৯৫১ সালের ১৮ জুন আর একটি নূতন আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। এই আইনের উদ্দেশ্য ব্যয় সঙ্কোচ অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণীর পড়ুয়াদের জন্যই কেবল খাদ্য ব্যবস্থা বলবত থাকিবে। কিন্তু সপ্তম শ্রেণী হইতে উপরের ক্লাশের পড়ুয়াদিগকে ½ লিটার দুধ দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে; বিদ্যালয়ের চিকিৎসাও যদি উপরের ক্লাশের কোন কোন ছাত্রছাত্রীকে স্বাস্থ্যহীনতার কারণে বিদ্যালয় খাদ্য খাইতে নির্দেশ দেন, তাহা হইলে সেরূপ পড়ুয়াদিগকে বিদ্যালয়ে খাদ্য খাইতেই হয়। আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষকে এরূপ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে যে বিদ্যালয়ে পুষ্টিকর খাদ্য ও দুধ অথবা দুধও ভিটামিন পিল প্রবর্তন করিতে পারেন এবং রাষ্ট্রকোষ হইতে সহায়তা পাইবেন।

বিদ্যালয়ের জন্য স্টেণ্ডার্ড খাদ্য সম্পর্কে সাহিত্য রচনা করা হইয়াছে। Practical Hygiene Research নামক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বহু গবেষণার পর এই সকল সাহিত্য প্রকাশ করিয়াছেন ও সময় সময় প্রকাশ করেন।

যে সকল প্রতিষ্ঠানে পক্ক খাদ্য দেওয়া হয় সেখানে তাহা শক্ত অথবা স্তিনারের অনুরূপ হইয়া থাকে। লাঞ্চ ও ডিনার দেওয়া সম্পর্কে স্থানীয় খাদ্যভাগকে বিবেচনা করা হয়। যে সকল পল্লী অঞ্চলে সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে প্রধান খাদ্য গ্রহণ প্রথা প্রচলিত, সে সকল অঞ্চলে রুটির সঙ্গে অন্যান্য জিনিষ (Sandirrhes) দেওয়া হয়। শহর অঞ্চলে সাধারণ দুপুরবেলাই বাড়ীতে প্রধান খাদ্য খাওয়া হয় এবং রাত্রিবেলা দুপুরের রান্নাকরা খাদ্যবস্তু গরম করিয়া খাওয়া হয়। এ সকল বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্য প্রথা বিবেচনা করিয়াই বিদ্যালয়ের খাদ্য স্থির করা হয় এবং লাঞ্চ বা ডিনারের ব্যবস্থা হয়।

বিদ্যালয়ের খাদ্যনীতির প্রধান কথা এই যে প্রত্যেকেই প্রয়োজনীয় কেলোরীর এক তৃতীয়াংশে এবং প্রোটিন, ভিটামিন প্রভৃতি এক দ্বিতীয়াংশ যেন বিদ্যালয়ে খাইতে পারে।

নরওয়ের বিদ্যালয়ের খাদ্য পরিবেশন প্রথার অনুসরণে ডেনমার্কের State Institute for Practical Hygienic Research বিদ্যালয়ের খাদ্য পরিবেশন প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করার নির্দেশ রচনা করিয়াছেন এবং তাহা Ministry of Labour and Social Welfare (১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫১) সালে প্রকাশ করিয়াছেন। এই নির্দেশগুলিও উল্লেখযোগ্য।

এক :—বিদ্যালয়ের খাদ্য পুষ্টিকর হইতে হইবে। খাদ্যাভ্যাস যাহাতে বিদ্যার্থীদের যথাযথ হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে, দুধ খাওয়ার অভ্যাস টিকমত হওয়া চাই এবং বাড়ীর বাহিরে—বাড়ীর অনুরূপ খাদ্য না হইলে খাওয়ার অভ্যাস করিতে হইবে।

দুই :—যাহারা বিদ্যালয়ে খাওয়া পরিবেশন করিতেন তাহারা শিক্ষক ও পরিবেশনকারীরূপে দেখিবেন যেন সুপরিদর্শনের অভাবে খাদ্যের অপচয় না ঘটে এবং শিক্ষার্থীদের উত্তম খাওয়ার অভ্যাস গড়িয়া উঠে।

তিন :—খাদ্য খাইবার পূর্বে অথবা পরে ছোটদের জন্য বিশ মিনিট এবং বড়দের জন্য পনের মিনিট

বিদ্যালয়ের আঙিনায় সুসংযত অথচ মুক্ত পরিবেশে থাকার অভ্যাস।

চার :—বিদ্যালয়ে হাত গ্রহণের ব্যবস্থা থাকিবার এবং নিম্নশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্য টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা রাখিতেই হইবে এবং Table-manners-এ যাহাতে অভ্যস্ত হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পাঁচ:—বিদ্যালয়ে খাওয়ার পৃথক কোঠা না থাকিলে সাধারণ ক্লাশ-কোঠা ব্যবহার করা যাইতে পারে কিন্তু খাদ্য পরিবেশনের পূর্বে ও পরে সকল জানালা খুলিয়া দিয়া কক্ষটিকে বিশুদ্ধ হাওয়া চলিতে দিতে হইবে এবং পড়ার ও লেখার সমুদয় বই খাদ্য পরিবেশনের পূর্বে সরাইয়া যথাস্থানে রাখিতে হইবে। বিদ্যার্থী সকলেই যাহাতে হাত ধুইয়া খাইতে আসে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হইবে।

ছয় :—খাদ্য গ্রহণের সময় শিক্ষক অথবা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয় কাহাকেও উপস্থিত থাকিতে হইবে। বিদ্যার্থীরা যাহাতে উপযুক্ত নির্দেশ ও সাহায্য পায় তাহা দেখিতে হইবে। সুসংযতভাবে যাহাতে খাওয়া হয় তাহা দেখিতে হইবে।

সাত :—যে সকল বিদ্যালয়ে প্যাক করা সেণ্ডোইচ বা লাঞ্চ পরিবেশন করা হয়, সেই সকল বিদ্যালয়ের ইন্-চার্জকে দেখিতে হইবে যে ক্ষুধা নিবৃত্তিকর পরিমিত সেণ্ডোইচ দেওয়া হয় এবং অতিরিক্ত টুকরা কেহ চাহিলে এমনভাবে পরিবেশন করিতে হইবে যেন খাদ্যের অপচয় না ঘটে।

যে সকল বিদ্যালয়ে থালায় খাদ্য পরিবেশন করা হয়, সেখানে প্রথমে অল্প অল্প করিয়া পরিবেশন করিতে হইবে, পরে বিদ্যার্থীদের ক্ষুধার রকম বুঝিয়া সেই পরিমিত খাদ্য পরিবেশন করিতে হইবে। চারি টুকরা সেণ্ডোইচ খাওয়া শেষ না করা পর্যন্ত অতিরিক্ত খাদ্য পরিবেশন করিতে নাই।

আট :—মুখে খাদ্য চিবাইবার সময় দুধ যেন কেহ না পান করে কিন্তু মুখে খাদ্যবস্তু না থাকিলে দুধ অবশ্যই পান করিতে পারে। দুধ একেবারে একটানা না পান করিয়া অল্প অল্প করিয়া অন্ন খাদ্যের ফাঁকে ফাঁকে পান করা শিখাইতে হইবে।

নয় :—বিদ্যার্থীদিগের প্রত্যেকের জন্য পরিমিত দুধ দিতে হইবে; শীতকালে দুধ সামান্য গরম করিয়া পরিবেশন করিতে হইবে।

দশ :—একটি আপেল অথবা কেয়ট খাইয়া খাওয়া শেষ করিবে কিন্তু ফল যাহাতে ভাল করিয়া চিবায়, সেই নির্দেশ দিতে হইবে। স্বাস্থ্যের পক্ষে চিবাইয়া খাওয়ার সুফল সম্পর্কে বিদ্যার্থীকে বুঝাইতে হইবে।

এগার :—খাওয়ার জন্য কাপ, থালা ইত্যাদি ব্যবহার করিলে তাহা গরম জলে ভাল করিয়া ধুইতে হইবে। Dishwashing Machine থাকিলে ভাল।

বারো :—যাঁটি খাবার তৈরি করবে, তাহাদিগকে apron, cap ইত্যাদি উপযুক্ত পোষাক দিতে হইবে। এই পোষাক সর্বদা ধুইয়া পরিষ্কার রাখিতে হইবে। শীতকালে গরম সুয়েটার বা অন্য কিছু গায়ে দিতে হইলে, তাহা পরিয়া উপরে পরিবেশনের পোষাক পরিতে হইবে।

উপরে বিদ্যালয়ে খাদ্য পরিবেশন সম্পর্কে লিখিলাম। ইহা হইতে বুঝা যাইবে বিদ্যালয়ে খাদ্য পরিবেশন সম্পর্কে এ দেশের সমাজ কত গুরুত্ব অর্পণ করে।

গত অর্ধ শতাব্দী যাবত বিদ্যালয়ে খাদ্য পরিবেশন করার ফলে সমগ্র দেশের অধিবাসীর স্বাস্থ্য অনেক উন্নত হইয়াছে। ইহার ফলে দেশবাসীর শ্রমের ক্ষমতা বাড়িয়াছে, জীবিকার মান উন্নত হইয়াছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বাড়িয়াছে। বিশেষতঃ অন্ন বিত্তশালীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি উল্লেখযোগ্য হইয়াছে।

উপযুক্ত ও পরিমিত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ প্রথার ফলে আজিকার ডেনমার্কবাসীর উচ্চতা ও ওজন পূর্বের তুলনায় বাড়িয়াছে বলাই বাহুল্য। কিন্তু খাদ্য ও স্বাস্থ্য বিশারদেরা মনে করেন যে সকলের খাদ্য গ্রহণ প্রথা এখনও ঠিক পর্যায়ে পৌঁছায় নাই। এখনও বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে নিম্নবিত্ত ও ধনীদের ছেলেমেয়ের বয়সোচিত বৃদ্ধির অভাব লক্ষিত হয়। বিশারদেরা মনে করেন যে ঘরে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব এবং খাদ্যাভ্যাস ঠিকমত না হওয়ার কারণেই তাহা ঘটিতেছে।

সমগ্র দেশবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য দেশবাসীকে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যথা সাধারণ পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাসের ব্যবস্থা এবং বিশেষ ব্যবস্থা। সাধারণ ব্যবস্থা সকলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য; আর বিশেষ ব্যবস্থাগুলি গর্ভবতী নারী, সন্তান প্রসবের পরে মাতা ও শিশুদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

স্কুলে খাদ্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ কালে এইটুকু লক্ষ্য রাখা হয় যে খাদ্য একঘেয়ে না হয় এবং স্থানীয় খাদ্য প্রথার সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে।

জাতির সামগ্রিক স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনান্তে খাদ্য ও পুষ্টির উন্নতির জন্য নিম্নবিত্তদিগকে বিশেষ রাষ্ট্রীয় সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। কতকগুলি পুষ্টিকর খাদ্য বিনামূল্যে অথবা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে দেওয়া হয় কিন্তু বিদ্যালয়ে পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশন ও প্রণালীতার মাধ্যমেই তাহা সার্থকরূপ লইয়াছে। বিদ্যালয়ে পড়িবার বয়সেই শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে; সেজন্যই বিদ্যালয়ের খাদ্য ব্যবস্থার উপর বিশেষ নজর দেওয়া হইয়াছে।

———

অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ

স্বামী সিদ্ধানন্দ

সংকলিত

মূল্য ঃ ১৫০ এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

সৎকথা

স্বামী সিদ্ধানন্দ

কর্তৃক সংগৃহীত

মূল্য ঃ ২৲ দুই টাকা

উদ্বোধন কার্যালয়, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা

শিক্ষা

ম হি কল্যাণরূপং কশ্চিদ্ ধর্ণ্ডিং তাত গচ্ছতি

১৯শ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৬৮ | ১০ম সংখ্যা

আলোচনা

অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য দীর্ঘকাল শিক্ষাব্রতে নিযুক্ত থাকিয়া অবসর লইয়াও পুরাপুরি সময় সাহিত্য ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে ব্যয় করিয়াছিলেন। আটাত্তর বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে। তিনি বিজ্ঞান শিক্ষক ছিলেন, আবার রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি সংযোগে সাহিত্যেও তাঁহার কৃতিত্ব কম ছিল না। তাঁহার বুঝাইবার ক্ষমতা যেমন চমৎকার ছিল, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীও তেমনি ছিল সর্বদা অক্ষুণ্ণ। বিশ্বভারতীর গ্রন্থবিভাগের সহিত তিনি অধ্যক্ষ হিসাবে যুক্ত ছিলেন। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা সম্পাদনে অনেককে তিনি টানিয়া আনিয়াছিলেন। শিক্ষার সমালোচনা, শাস্ত্রপ্রসারণ ও চর্চায় তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। শেষ বয়সেও তিনি বসুধারা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার মধুর ব্যক্তিত্ব বহু লোকের মন জয় করিয়াছিল। কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে বহু প্রতিষ্ঠানে তাঁহার নাম সর্বদা লোকের স্মৃতিপটে জাগরূক থাকিবে।

তাঁহার মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পূর্বে বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই সম্বর্ধনা তিনি অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন কে জানিত, তাঁহার ডাক আসিয়াছে—তাঁহাকে আর সভাসমিতিতে নিমন্ত্রণ করা যাইবে না।

ডাঃ সুবোধ মিত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রখ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ সুবোধ মিত্র বিদেশে অর্থাৎ ভিয়েনায় হঠাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। ডাক্তার মিত্র ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন, চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের তিনি ছিলেন প্রাণস্বরূপ। পরে তিনি কর্কট রোগাক্রান্তদের জন্য একটি হাসপাতাল খোলেন। নিজেও কর্কট রোগের অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে এক বিশেষ প্রণালী উদ্ভাবন করেন।

চিকিৎসার জন্য তো বটেই, সম্প্রতি প্রায় এক বৎসর হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবেও তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা কৃতজ্ঞচিত্তে কর্মীদের অনুযোগের জন্য তাঁহার ব্যবস্থার কথা স্মরণ করিবেন। ছাত্রেরা নানা সঙ্কটে তাঁহার উপর অনেকটা নির্ভর করিত।

শিক্ষক সংবর্ধনা

বীরভূম জেলার অবিনাশপুর গ্রামে প্রবীণ প্রধান-শিক্ষক হরকুমার মজুমদার মহাশয়ের সংবর্ধনা হইয়া গিয়াছে। বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধার পরিচয়ে বস্ত্র ও কিছু অর্থ দিয়া প্রণাম জানাইয়াছে, ইহা অতীব আনন্দের বিষয়। ছাত্রপরম্পরায়। ছাত্রেরা শিক্ষককে অন্তরের দানে অভিনন্দন করিতেছে, শিক্ষকের জীবনে ইহার চেয়ে আর কি কাম্য হইতে পারে?

শ্রীযুক্ত মজুমদার তাঁহার জীবনব্যাপী নিষ্ঠার দ্বারা যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা শিক্ষক সমাজকে প্রেরণা দিবে এবং বর্তমানে ছাত্র শিক্ষক সম্বন্ধে যে সকল অবিনয়ের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহার বিরুদ্ধে সুস্থ সবল ছাত্র সমাজের পরিচয় দানে ভবিষ্যতের উন্নতির পথ সুগম করিবে। শ্রীযুক্ত মজুমদারের জয় হউক, জয় হউক তাঁহার ছাত্রপরম্পরার।

রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষা (৪)

শ্রীঅনাথনাথ বসু

আমাদের বিদ্যালয়ে অনাবশ্যককে খর্ব করিবার একটা আদর্শ সর্বপ্রকারে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। চৌকি টেবিল ডেস্ক সকল মানুষের সকল সময়ে জোটা সহজ নহে। কিন্তু ভূমিতল কেহ কাড়িয়া লইবে না। চৌকি টেবিল সত্য সত্যই ভূমিতলকে কাড়িয়া লয়। এমন দশা ঘটে যে ভূমিতল ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলে সুখ পাই না, সুবিধা হয় না। ইহা একটা প্রকাণ্ড ক্ষতি। আমাদের দেশ শীতের দেশ নহে, আমাদের বেশভূষা এমন নয় যে আমরা নীচে বসিতে পারি না, অথচ পরদেশের অভ্যাসে আমরা আসবাবের বাহুল্য সৃষ্টি করিয়া কষ্ট বাড়াইতেছি। অনাবশ্যককে যে পরিমাণে অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিব সেই পরিমাণে আমাদের শক্তির অপব্যয় ঘটিবে। অথচ ধনী য়ুরোপের মত আমাদের সম্বল নাই, তাহার পক্ষে যাহা সহজ আমাদের পক্ষে তাহা ভার। কোন একটা সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিতে গেলেই গোড়াতে ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্রের হিসাব বড়াইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়। এই হিসাবের মধ্যে অনাবশ্যকের দৌরাত্ম্য বারো আনা।

যে দেশে শক্তির সীমা নাই, যে দেশে ধন কাঁচার কামার তরিয়া উপচিয়া পড়িতেছে সেই দেশের আদর্শে সমস্ত কাজের গঠন না করিলে আমাদের লজ্জা দূর হয় না, আমাদের কল্পনা তৃপ্ত হয় না। ইহাতে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির অধিকাংশই আয়োজনে নিঃশেষিত হইয়া যায়, আসল জিনিসকে খোরাক জোগাইতে পারি না। যতদিন মেজেতে খড়ি পাতিয়া হাত পাকাইয়াছি ততদিন পাঠশালা স্থাপন করিতে আমাদের ভাবনা ছিল না, এখন বাজারে শ্লেট পেন্সিলের আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু পাঠশালা হওয়াই মুস্কিল। সকল দিকেই ইহা দেখা যাইতেছে। পূর্বে আয়োজন যখন অল্প ছিল তখন সামাজিকতা অধিক ছিল, এখন আয়োজন বাড়িয়াছে এবং সামাজিকতায় ভাটা পড়িতেছে। আমাদের দেশে একদিন ছিল যখন আমরা আসবাবকে ঐশ্বর্য বলিতাম কিন্তু সভ্যতা বলিতাম না। কারণ তখন দেশে যাঁহারা সভ্যতার ভাণ্ডারী ছিলেন তাঁহাদের ভাণ্ডারে আসবাবের প্রাচুর্য ছিল না। তাঁহারা দারিদ্র্যকে সুগম্ভীর করিয়া সমস্ত দেশকে সুদৃঢ় ভিত্তি রাখিয়াছিলেন। অন্তত শিক্ষার দিকে যদি আমরা এই আদর্শে মানুষ হইতে পারি তবে আর কিছু না হউক যাহাতে আমরা কতকগুলি ক্ষমতা লাভ করি। খাটিতে বসিবার ক্ষমতা, মোটা পরিবার মোটা খাইবার ক্ষমতা, যথাসম্ভব অল্প আয়োজনে যথাসম্ভব বেশি কাজ চালাইবার ক্ষমতা। এগুলি কম ক্ষমতা নহে এবং এগুলি সাধনার অপেক্ষা রাখে। সুগমতা, সরলতা, সহজতাই যথার্থ সভ্যতা; বহু আয়োজনের জটিলতা বর্বরতা, বস্তুত তাহারা গলদ্‌ঘর্ম অক্ষমতার স্তূপাকার জঞ্জাল। কতকগুলা জড়বস্তুর অভাবে মনুষ্যত্বের মহত্ত্ব যে নষ্ট হয় না, বরঞ্চ অধিকাংশ স্থলেই স্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এ শিক্ষা শিশুকাল হইতে বিদ্যালয়ে লাভ করিতে হইবে—শিক্ষক উপদেশের দ্বারা নহে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের দ্বারা। এই নিতান্ত সহজ কথাকে সকল প্রকারে সাক্ষাৎভাবে ছেলেদের কাছে স্বাভাবিক করিয়া দিতে হইবে। এ শিক্ষা সহিলে যে তবু আমরা নিজের হাতকে পা-কে, ঘরের মেজেকে মাটিকে অবজ্ঞা করিতে অভ্যস্ত হইব তাহা নহে, আমাদের পিতা পিতামহকে ঘৃণা করিব এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের সাধনার মাহাত্ম্য যথার্থভাবে অনুভব করিতেই পারিব না।

শিক্ষাসমস্যা (১৩১৩)

আমার পাঠশালা

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে আমি যখন ছোটনাগপুর আসি তখন এই পাহাড়ী এলাকা গভীর অরণ্যময় ছিল।

ছোট ষ্টেশন থেকে একটু দূরে মাঠের মাঝখানে আমাদের বাড়ী ছিল। বাড়ীর উত্তরে ছিল উঁচুনীচু মাঠ, খানিকটা ধানক্ষেত, তার পরে আবার উঁচুনীচু তৃণহীন ঝাঁকরময় মাঠ, দক্ষিণে ছিল রেলের লাইন, পূব থেকে পশ্চিমে গয়ার দিকে চলে গেছে। তখনকার বাংলার অলভরা নদী নালা, দীঘি পুকুর, আর সবুজ ঝোপঝাড় গাছপালা দেখে অভ্যস্ত, তাই হঠাৎ প্রকৃতির এই রুক্ষরূপ দেখে মন খুব খারাপ হয়েছিল।

প্রথম প্রথম একলের সন্ধ্যা আমার কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত লাগতো। রাত না হতেই রাতের নিস্তব্ধতা এসে উপস্থিত হোতো। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতো, পৃথিবী যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়তো, পূবে পশ্চিমে কোথাও আলো জলতো না, আমার মনে হোতো এই পৃথিবীতে যে এতটুখানি আলো তা আমার ঘরের মধ্যে। বাইরে এসে দূরের মাঠের দিকে তাকালে মনে হোতো রাত্রির অন্ধকার একটা প্রকাণ্ড ঢেউএর মত ধীরে ধীরে যেন এগিয়ে আসছে, এখনি আমাকে গ্রাস করে ফেলবে।

অল্প দিনের মধ্যেই আমার মনের স্বাস্থ্য আবার ফিরে এল। তৃণহীন তরঙ্গিত মাঠ, এখানে ওখানে নিঃসঙ্গ মহুয়া গাছ, পাথর-ছড়ান পাহাড়ী নদীও যে সুন্দর ক্রমে ক্রমে তা অনুভব করতে লাগলাম। নতুন লোক দেখে এখানকার প্রকৃতি যেন ঘোমটা টেনে ফিরে দাঁড়িয়েছিল, আমি যখন এক বছরের পথচারীর মত বিদায় নিয়ে চলে গেলাম না তখন সে একটু একটু করে ঘোমটা ফাঁক করতে লাগলো। সেটা শীতকাল। বাড়ীর সামনের মাঠে বেড়াতে বেড়াতে দেখতাম, মাঠ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে শুরু হয়েছে বন। একদিন মাঠ পার হয়ে বনে গিয়ে ঢুকলাম। বড় বড় শালগাছ মাথা উঠে গেছে আকাশের দিকে। এক পা এক পা করে এগিয়ে যেতে লাগলাম, বনও গভীর হতে লাগলো। দু'একটা পাখী উড়ে যাবার শব্দ বা তাদের ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নাই, এত নীরব যে গা ছমছম্ করে ওঠে। আর না এগিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

তারপরে প্রায়ই যেতে লাগলাম বনের পথ ধরে বেড়াতে। যখনই গভীর অরণ্যে ঢুকে পড়তাম তখন কি যেন একটা অনুভূতি, হয়তো ভয়, হয়তো বিস্ময় মনকে অভিভূত করে ফেলতো। একদা আমার পূর্বপুরুষ অরণ্যবাসী ছিল, সেই আদিম স্মৃতি হয়তো আমার মনে জেগে উঠতো। চায়াসিবিড় সরু পথ দিয়ে চলতাম, কাঠবেড়ালি ছুটে পালাতো, গাছের ডালে ঘুঘু ডাকতো, বনফুলের মিষ্ট মিঠে গন্ধ ভেসে আসতো। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া এসে ডালপালায় দোলা দিয়ে চলে যেতো, অসংখ্য শুকনো পাতা মরমর করে ঝরে পড়তো। আবার যখন বাতাস থেমে যেতো, ঘুঘুর ডাক বন্ধ হয়ে যেতো, একটা বিরাট নিস্তব্ধতা বনকে রহস্যময় করে তুলতো, তখন আমি যেন বনবাসীর সঙ্গ থেকে হঠাৎ পৃথক হয়ে পড়তাম, নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হোতো।

এতদিন ভাবতাম খাঁটি ঘুঘু, বাঘ, ভল্লুকবাঘ, ভাল জল, নির্জন বাতাস ইত্যাদি দেহের খাদ্য এখানে প্রচুর, কিন্তু মনের খাদ্য কিছুই নাই। শহরের পাঠশালা ছেড়ে আসায় দুঃখ

হোতো। অরণ্যের সঙ্গে পরিচয় যতই ঘনিষ্ঠ হতে লাগলো ততই মনে হতে লাগলো, অরণ্যও এক পাঠশালা, এখানেও শিখবার অনেক আছে।

বেলাবেলা বেশী হলে যেমন মানুষের সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায়, তার প্রতি অন্তরের টান হয়, অহরহ তরুলতা পশুপক্ষীর কাছে থাকলে তাদেরও তেমন সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায়, তাদেরও প্রতি অন্তরের টান হয়। অরণ্যে বাস করতে করতে আমারও দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যেতে লাগলো, গাছপালা পশুপক্ষীর প্রতি একটা আত্মীয়তাবোধ জেগে উঠতে লাগলো। বাইরে থেকে দু'চার দিনের জন্যে যারা এখানে আসে তারা হয় শীকার করতে, না হয় গাছ কাটতে। শিকারী জঙ্গলে বাঘ বেঁধে বা জলের ধারে বসে বাঘ কিংবা হরিণ মারে, শিকারীর কাছে জানোয়ারের জীবনের চেয়ে তার চামড়ার মূল্য বেশী, জানোয়ারেরও যে বেঁচে থাকার একটা আনন্দ আছে তা সে বোঝে না। একটা মোটা সরল শাল গাছ পেলে কাঠুরে অতি যত্নে সেটাকে পরখ করে, তার উচ্চতার, দৃঢ়তার, মূল্য টাকার অনুপাতে মনে মনে কষে ফেলে। তারপরে কুড়ুল পড়তে থাকে ঘটাঘট্ ঘটাঘট্, গুড়িটার কতখানি হয়, ধীরে ধীরে কতটা বেড়ে চলে, অটল দৃঢ় গাছটা মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে। আরো গোটা কয়েক চোট, তারপরে আচমকা একটা মড়-মড় আওয়াজ, পরক্ষণে গাছটা হুড়মুড় করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, তালপালা মানুষের হাড়ের মতই মটমট করে ভেঙে যায়। কিন্তু লাভের দিক ছাড়া এই সরল দৃঢ় গাছটার হিসাব নেবার মত আর একটা দিক আছে তা কাঠুরের মাথায় পড়ে না। অথচ সে দিকটা কম নয়। একটা সতেজ প্রাণ, শাখা প্রশাখায় পল্লবগুচ্ছে জীবনের উল্লাসবোধ, বর্ষাতে যখন তার ফুল ফোটে মানুষের মতই তখন তার গোপন আনন্দশিহরণ, শীতের শেষে যখন পাকা ফলগুলি এলোমেলো হাওয়ায় ঝরঝর করে পড়ে তখন মানুষের মতই সার্থকতার পূর্ণ পরিতৃপ্তি। এইখানেই শেষ নয়, আরো আছে, অরণ্যলোকের সঙ্গে তার আত্মীয়তা, ঘুঘিয়া লতা তার শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে নিশ্চিন্তভাবে তাকে জড়িয়ে ধরে, কাঠবেড়ালি তালে তালে ছুটোছুটি করে, ঘুঘু বাসা বাঁধে।

কয়েক মাস কেটে গেছে, শীত গিয়ে বসন্ত এসেছে। অরণ্যের পাঠশালায় আমার পড়াশুনো অনেকখানি এগিয়ে গেছে। ফাল্গুন মাস, রাত্রে এখনও শীত, কিন্তু দিনের বেলা ভারি সুন্দর, বসন্তের উষ্ণ নিঃশ্বাসে প্রকৃতির চেতনা ফিরে এসেছে। গাছের পাতার রং বদলাতে সুরু হয়েছে। অরণ্যের রূপ দিনে দিনে বদলে যাচ্ছে। দুপুর বেলা একটা পলাশ গাছের তলায় শুয়ে পাখি উপরের দিকে তাকিয়ে। পলাশের আঁকাবাঁকা ডালে কোথাও একটি পাতা নাই, আছে পুঞ্জ পুঞ্জ লাল ফুল। এ এক অপূর্ব দৃশ্য, সত্যিই যেন ডালে ডালে আগুন লেগেছে। দেশে থাকে পলাশগাছ দেখেছি বটে, কিন্তু এমন কাছে বসে ভাল করে দেখিনি, তাই পলাশের প্রতি তেমন শ্রদ্ধা ছিল না। তাছাড়া, ছেলেবেলায় পড়েছিলাম পলাশফুল দেখতে সুন্দর হলেও গন্ধ নেই বলে কেউ করেনা আদর। সেটা পলাশের প্রতি মনকে অনেকখানি বিরূপ করেই রেখেছিল। এখন পলাশের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম, মুগ্ধ হলাম, গুণ বিচার করতে গেলে নাকের সাক্ষ্যই একমাত্র সাক্ষ্য নয়।

এই পুঞ্জ পুঞ্জ ফুলের মধ্যে দলে দলে শালিখ আর বুলবুলি লাফালাফি করে বেড়ায়। আরো দু'একটা পাখী আসে তাদের নাম জানি না। ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়ে এসে বসে আবার কলরব করে উড়ে চলে যায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ফুলের রাজ্যে পাখীদের ছুটি চলে।

চৈত্র মাস এসে গেছে, মহুয়ার ফুল ঝরতে সুরু করেছে। হলদেটে রং-এর ফুল, ঠিক যেন এক

একটি রসে ভরা বড় বড় কিসমিস্। আস্বাদ বেশ মিষ্টি, গন্ধটা কিন্তু উগ্র, অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। মহুয়া এদেশের একটা বড় সম্পদ। ফুল গরু মোষ তো খায়ই, মানুষও খায়, ফল থেকে যে তেল বার হয় বাজারে তার চাহিদা খুব। মহুয়ার ফুল থেকে মদ চোলাই হয় বলেই রসিক মহলে তার আদর বেশী। মহুয়ার ফুল রাত্রেই পড়ে, দিনের বেলা তেমন পড়ে না। সারারাত ফুল পড়ে, সকালবেলা মহুয়াতলা ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তখন সাঁওতাল মেয়েরা ছোট ছোট ঝুড়ি নিয়ে উপস্থিত হয়, হাসি গল্পে মহুয়াতলা মুখর হয়ে ওঠে, বেলা হলে ফুল ভরা ঝুড়ি মাথায় নিয়ে যে যার ঘরে ফিরে যায়।

জ্যৈষ্ঠ মাস এসে পড়ে, অরণ্যের রূপ একেবারে বদলে যায়। পলাশের ফুল শুকিয়ে হাওয়ায় উড়ে যায়, মহুয়ার ফুল ঝরে গিয়ে ফল বার হয়, কচিপাতার হালকা সবুজ রং গাঢ় সবুজে পরিণত হয়। মাঠের ঘাস মরে গিয়ে খোয়ার বার হয়ে পড়ে। এক অদৃশ্য চিত্রকর বসন্তের সূক্ষ্ম সুন্দর কারুকার্যকে ঢেকে দিয়ে একটা রুক্ষ মেটে রং-এর পোঁচ টেনে দেয়।

ভোরের আবছায়া অন্ধকারে পাখীর ডাকে বন মুখর হয়ে ওঠে। ঝির ঝির করে একটা ঠাণ্ডা বাতাস বয়, গাছের পাতা কেঁপে কেঁপে ওঠে, রাত্রে কোটা কদম্বফুলের মিঠে গন্ধ ভেসে আসে। কেবল পাখী কেন, সকালের এই স্বল্প স্নিগ্ধ প্রহরটুকু পশুরাও উপভোগ করে। বেলা বাড়ে, গরমও বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে একটা গরম বাতাস ওঠে, বনের মধ্যে দিয়ে সারাদিন হু হু করে বয়ে চলে। দু'চার মাইলের মধ্যে নদীর কোন ধাঁকে পাথরের কোলে হয়তো একটুখানি জল চিক চিক করে। সে জল করুনার জল, পাথরের তলা দিয়ে এসে ডোবাটিকে পূর্ণ করে রাখে, জ্যৈষ্ঠের রোদেও তা শুকোয় না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে পিপাসিত প্রাণীর আনাগোনা চলে। ভোরবেলা সাঁওতালী মেয়ে কলসী নিয়ে উপস্থিত হয়, পাতার ঠোঙা বানিয়ে কলসীতে জল ভরে, ডুবিয়ে জল ভরার মত সঙ্গতি সেখানে নাই। দুপুরে ক্লান্ত ঘুঘু আর ঘুঘুনি উড়ে এসে পাথরের ছায়ায় বসে, অসহ্য উত্তাপে ছোট ঠোঁট দুটি ফাঁক করে হাঁপায়, খানিক পরে ঠাণ্ডাজলে ঠোঁট ডুবিয়ে গলা ফুলিয়ে বার বার জল খায়। বিকেলের দিকে রোদের ঝাঁজ কমে এলে ময়ূর, তিতির আর বনমুরগী ডাকাডাকি করে সপরিবারে জল খেয়ে আসে। আরো খানিক পরে নদীর বুক জুড়ে যখন ছায়া পড়ে, পাহাড়ের নিভৃত আস্তানা থেকে বেরিয়ে কদাকার হায়না তখন জলের ধারে আসে। সাহসের বড় পা দুখানার উপর লম্বা ঘাড়টা উঁচু করে একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখে, তারপর শুরু করে জল খেতে। এমন সময় বনের পথ ধরে ভালুক এসে উপস্থিত হয়, চুপি চুপি চলাফেরা তার স্বভাব নয়, আদুরে প্রকৃতির জীব, নাচানাচি করতে ভালবাসে। হায়না ততক্ষণ জল খেয়ে নিঃশব্দে গা ঢাকা দেয়।

সন্ধ্যা যখন আরো ঘনিয়ে আসে, বাতাস একেবারে থেমে যায়, পাখী আর ডাকে না, তখন অতি সন্তর্পণে নদীতে নামে হরিণের পাল। বালুর উপর ছোট ছোট তীক্ষ্ণ খুরের দাগ কেলে এগিয়ে আসে, তিড় করে জল খায়, আবার সাবধানে ওপারের জঙ্গলে ফিরে যায়। তারপরে হঠাৎ যেন সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা আরো গভীর হয়, অরণ্য যেন স্থির হয়ে দাঁড়ায়, বনপথ ধরে একটি বিরাট বপু ধীরে ধীরে চলে আসে, সে চলায় এতটুকু চাঞ্চল্য নাই, এতটুকু শব্দ নাই। আবছায়া অন্ধকারেও হলুদ অবিনের উপর তার দেহের কালো ডোরাগুলো পরিষ্কার দেখা যায়। সম্রাটের মত বিপুল গাম্ভীর্য ভরে ধীরে ধীরে পা ফেলে সে জলের ধারে আসে, প্রকাণ্ড মাথাটা নীচু করে জল খায়—আওয়াজ হয় চক্ চক্, চক্ চক্।

শিশুদের চিত্রের ক্রমবিকাশ

শ্রীদেবীপ্রসাদের বক্তৃতা ও তার শিক্ষা হইতে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ব্যক্তির বিকাশের সোপান স্থির করা তাহার ব্যক্তিগত গুণের উপরেই নির্ভর করে না, এবং তাহার ব্যক্তিগত সামর্থ্য হইতেই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না যে তাহার বিকাশ এইরূপ কি সেইরূপ হইবে। ব্যক্তিত্বের বিকাশের সোপান গঠন করিতে গেলে তাহাতে সমাজের বরণধারণের অনেকটা হাত আছে, সমাজের চিন্তা ও রুচির প্রভাব ব্যক্তির উপর পড়ে।

শিশু প্রত্যেক কাজে বড়দের মত করিবার চেষ্টা করে। সে যে বড় নয় সে কথা কখনও অনুভব করে না। বড়দের যেমন করিতে দেখে, সে নিজেও তেমনি করিতে চায়। কলার ক্ষেত্রেও এই কথা খাটে। একটা বয়স পর্যন্ত সে বড়দের হইতে এতখানি পৃথক হইয়া থাকে, যে সে তাহার নিজস্ব পথে যথেষ্ট দূর পর্যন্ত বাড়িতে পারে। কিন্তু যখন বয়স বাড়ে, তখন আর সেরূপ হয় না, বদল হয়।

শুধু আজ নয়, বহুকাল হইতেই কলার মধ্যে সমাজের সকলের রুচির গতি বাস্তবের ধারাই অনুসরণ করে। শিল্পী ও বিশেষজ্ঞদের ছাড়িয়া দিলে, অধিকাংশ লোক এমন ছবি বা মূর্তি পছন্দ করে, যাহার মধ্যে বাস্তবিকতা বেশী আছে। ঘরের মধ্যে, পুস্তকের মধ্যে, আর অন্যত্র সকল স্থানে চিত্র অধিকাংশেই বাস্তবধর্মী (রিয়ালিষ্টিক) থাকে। শিশু যদি কাহাকে ছবি আঁকিতে দেখে, তাহা হইলে সেও সর্বদা এমনই সব চিত্রকর দেখে যাহারা বাস্তবের অনুরাগী।

ইহার ফলে শিশুর যখন কিছু জ্ঞান হইয়াছে বলিয়া মনে হয় তখন সে এই প্রকার চিত্রই আঁকিতে চেষ্টা করে। তাহার চিত্রও হইয়া দাঁড়ায় বাস্তবের অনুগামী।

দ্বিতীয় কথা এই যে শিশুর নিজের এক স্বতন্ত্র দুনিয়া আছে, কিন্তু এই কথা ভুলিলে চলিবে না যে সেও সামাজিক প্রাণী। সে কিছুটা নিজের জন্যও করে, আর কিছুটা করে সমাজের জন্য। তাহার এই যে সমাজের জন্য কিছু করাইয়া লয় অর্থাৎ সেই কাজ যাহা সে অন্যকে দেখাইবার জন্য করে ইহা তাহাকে বড়দের মত করিয়া বিকাশলাভ করিতে সাহায্য করে। এইজন্যও তাহার চিত্র একটা বয়স পর্যন্ত বাস্তবধর্মী হইয়া থাকে।

এইরূপ স্থলে যেখানে সমাজে এখনও লোক-কলার পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে এবং সত্যই সমাজে তাহার আদর হইয়া থাকে, সেখানে ব্যক্তির কলাবিকাশ কিভাবে হয় এই কথা আলোচনার উপযুক্ত। আদিবাসী সমাজে দেখুন, তাহাদের নিজস্ব একটা রুচি আছে। তাহাদের চিত্রকলার পরম্পরা বাস্তবধর্মী চিত্রকলা হইতে পৃথক হইয়া থাকে। তাহাতে বড়দের কাজও এইরূপ চেষ্টা হইতে দূরে থাকে যে চিত্রে বাস্তবিক আকারের প্রয়োগ থাক। এই কারণে ঐ সমাজের শিশুদের চিত্র কিশোর বয়সে উপনীত হইলেও বদলায় না। ইহার অর্থ তো এই দাঁড়াইল যে, আদিবাসী সমাজে শিশুর মধ্যে যাহারা কিশোর বয়সে বাস্তবধর্মী হইতে চায় তাহাদের চিত্র আর স্বাভাবিক হয় না। এইতো হইল সমাজের প্রভাব, কারণ ইহা স্বাভাবিক হইলে আদিবাসীও কিশোর বয়সে উপনীত হইলে বাস্তবিকতার দিকে ঝুঁকিত। হয়তো পরে সমাজের

রুচি ও পরম্পরার জন্য পুনরায় প্রতীক-প্রধান চিত্র আঁকিতে শুরু করিত। কিন্তু আদিবাসী সমাজে এইরূপ হইতে পারে না. শিশুর নিজের চিত্র অলঙ্কার বা প্রতীক-প্রধান হইয়া থাকে। শিশুর স্বাভাবিক চিত্র কিরূপ হয় ইহা তখনই দেখিতে পাওয়া যায় যখন সে নিজের জন্য আঁকে, কাহাকেও দেখাইবার জন্য নয়। ভিতরের বস্তু প্রকট হইয়া পড়ে, আর ঐ জন্য সেই কলাত্মক লীলা (aesthetical activity) তাহার গঠন-মূলক খেলা হয়, নকলের চেষ্টা হয় না।

কিশোর বয়স ও তাহার পরবর্তী কাল

শিশুর কৈশোর শিক্ষাবিদ্ ও কলাশিক্ষক উভয়ের পক্ষে একেবারেই স্বতন্ত্র বিষয়। এই বয়সকে সমস্যার বয়স বলা হইয়াছে। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ ইহাকে 'সংকট কাল' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। যাহা হউক, একথা স্পষ্ট যে শিশুদের এই বয়সে নূতন অনুভূতি হয়, দুনিয়া বদলাইয়া যায়। এমনও হইতে পারে যে মনের এই পরিবর্তনের হেতু তাহার শরীরের বিকাশও বটে। এ পর্যন্ত শরীর একভাবে বাড়িতেছিল, এখন তাহাতে ঢোলা লাগিল। সেজন্য ইহার এমন একটা অনুভূতি হয়, যাহা অধিকাংশ সময় তাহার মনকে ঘিরিয়া রাখে। সমাজের পরম্পরার জন্য সংকোচে ইহা প্রকাশ করে না। সে ইহা হইতে মুক্তি পায় না। মনের অবস্থাও বদলাইয়া যায়। মন অন্য কথা হইতে সরিয়া আসিয়া এদিকে ওদিকে বস্তুতে চড়িতে আরম্ভ করে। একাগ্রতা থাকে না। শরীরের বিকাশ তো একরূপ হইয়াই যায়, শরীরের ক্রিয়া-কলাপও বয়স্কদের মত হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু মনের বিকাশ এপর্যন্ত এমন হইতে পারে না, যাহাতে সে নিজে নিজেকে ঠিকমত বুঝিতে পারে।

বাস্তবিকতার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সময় শিশু জিনিসের বাস্তব আকারের বিষয় সজাগ হইতে আরম্ভ করে। আর কিশোর বয়সে, যখন তাহার মনের অবস্থাও বদলাইতে শুরু করে, তখন তাহার কলাকার্যে অতি গুরুতর প্রভাব পড়ে। বাস্তবিকতার সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন হওয়ার জন্য সে অচিরে মৈরাশ্যভাব উপলব্ধি করে। সে ছবি আঁকিতে যায়, কিন্তু ছবি সে যতটা দেখিতে পায় ততটা বাস্তব-ধর্মী হইতে পারে না। বস্তু ও চিত্রের মধ্যে তাহার চোখ-কানও ভেদ মানিতে চায় না, কিন্তু, তাহার হাত হার মানিয়া যায়। শিশুর মনের সাহস ভাঙ্গিয়া যায়, কলার দিক হইতে তাহার মন সরিয়া যায়। সর্বদাই কলাশিক্ষকদের বলিতে হয় যে এ অবস্থা যাহারা জাতশিল্পী তাহাদের দুই চারিজন ছাড়া প্রত্যেকের জীবনেই আসে। তাহাদের বক্তব্য এই যে ইহা প্রাকৃতিক বিকাশের একটা সোপান। তাহারা বলে যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই সংকটকাল উত্তীর্ণ হইতে হয়। এই অবস্থা বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে হইবে, কিন্তু এখানে শুধু এই কথাটি বলা দরকার যে আজিকার অবস্থায় কিশোর বয়সের এই সংকট না আসিয়া পারে না। কিন্তু শিক্ষার স্বরূপ ও তাহার ধারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত যতদিন না হইবে, ততদিন কেবল কলাশিক্ষা নয়, জীবনের সকল মুহূর্তেই আমাদের পক্ষে সমস্যা হইয়া থাকিবে।

এ পর্যন্ত শিশুদের চিত্রকলার বিকাশের প্রধান চার স্তর মোটামুটি উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন প্রত্যেক স্তর ও তাহার শাখাপ্রশাখার বিষয়ে আর একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাক।

কাটাকুটির স্তর

শিশুদের কলা সম্পর্কে অভিজ্ঞতার সর্বপ্রথম অভিজ্ঞতাকে কাটাকুটি নাম দেওয়া হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শিশু যাহা কিছু হাতে আসে, তাহার সহিতই পরিচয় করিতে চায়। এই পরিচয় প্রক্রিয়ার মধ্যে দুইটি কথা আছে। এক তো হইল এই যে শিশু বস্তুগুলি নিজের ঘরনে জানিতে

চায়, আর তাহার এই চেষ্টার মধ্যে বড়দের মত করিবার প্রয়াস।

উপকরণের জ্ঞান

এমন কোনও বস্তু যাহা দিয়া দাগ কাটা যায় অথবা যাহাতে লাইন টানা যায়, যদি শিশুর হাতে পড়ে আর যদি সে কাহাকেও তাহা প্রয়োগ করিতে দেখিয়া অথবা নিজেও কোন আকস্মিক কারণে বুঝিয়া লয় যে উহাতে দাগ কাটা যায়, তবে সে শিশু এই জ্ঞান প্রকাশ করিবে এবং বারবার অভ্যাসও করিবে। তাহার শরীর ও স্নায়ুর যতখানি বিকাশ, তাহার আঁকি-বুকি করিবার ধরনও ততখানি হইবে। যতক্ষণ শিশু আঙুল দিয়া ভাল করিয়া ধরিতে না পারিবে, ততক্ষণ সে সমস্ত হাতের পাঞ্জা দিয়া পেনসিল ধরিয়া টানিবে। ততদিন তাহার কব্জি ও কনুইও পৃথক পৃথক কাজ করিতে পারিবে না। এইজন্য এ বয়সের দাগ সে নিজে গোটা হাত দিয়া, এমন কি কাঁধ পর্যন্ত নাড়িয়া টানিতে থাকে। এই অবস্থাকে বিশেষ করিয়া স্নায়ু-উপযোগ-প্রধান বা muscular বলা যাইতে পারে। বালক এই প্রথম দাগ গোলাকার করিয়াই টানে।

স্নায়ু-উপযোগ-প্রধান স্তর

শিশু গোল আঁকে কেন? ওরূপ আঁকিতে বা দাগ কাটিতে হাত কোথাও বাধা পায় না। এই কারণে শিশুর কোথাও 'কণ্ট্রোলের' প্রয়োজন হয় না। ততদিন তাহার কণ্ট্রোল করিবার শক্তিও ততটা বিকশিত হয় না। কিন্তু কিছুদিন অভ্যাসের পর তাহার হাত কাগজের একধার হইতে অন্যধার পর্যন্ত চলিতে থাকে এবং কোণাকুণি হাত চালাইতে পারে।

এই অবস্থায় শিশু কোনও বস্তুর চিত্র আঁকিতে পারে না। সে শুধু দাগই কাটিয়া চলে। যদি প্রশ্ন করা যায়, কাহার ছবি আঁকিতেছ, তবে সে উত্তর দিতে পারে না, কারণ ছবি আঁকিবার পূর্বে বা আঁকিবার সময়ে তাহার মনে কোনও পরিকল্পনা থাকে না। ছবি আঁকিবার মধ্যে শরীরের নাড়া চাড়া হয়, আর যে ছবি আঁকা হয়, উহাই তাহার ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি বা আত্ম-প্রদর্শন।

কাটাকুটির নামকরণ

এ বয়সে পেনসিল প্রভৃতি চালাইবার অল্পবিস্তর অভ্যাস হইলে শিশু কখনও কখনও ইহাকে একটা নাম দিয়া থাকে। এই নামের সঙ্গে এই দাগ কাটার আকারের কোনও সম্বন্ধ থাকার প্রয়োজন নাই। সে শুধু এইটুকু জানিয়া সন্তুষ্ট যে উহা অমুক জিনিসের ছবি।

এই অবস্থার তৃতীয় সোপান হইল, শিশু তাহার এই কাটাকুটির ছবির কোনও আকারের অর্থাৎ কোনও বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য বোধ করে এবং দাগ কাটিতে কাটিতে সেই বস্তুর অনুযায়ী নাম দেয়। এ পর্যন্ত ছবি আঁকিবার সময় কাহার ছবি আঁকিতেছে তাহা সে জানে না। কিন্তু ইহার পরে যখন ছবি আঁকিতে বসে তখন অমুক ছবি আঁকিতেছে সে ধারণা থাকে। এই সেই অবস্থা, যখন তাহার মনের মধ্যে প্রতীকের কথা আরম্ভ হয়, ছবি আঁকিবার পূর্বে তাহার মনে একটা পরিকল্পনা উপস্থিত হয়।

সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আঙুল ও হাত চালাইবারও অভ্যাস হইতে থাকে। সে বড়দের মত হাত চালাইতে চায়। কাঁধ ও কনুইয়ের বদলে শুধু কব্জি ও পরে কব্জিও না চালাইয়া শুধু আঙুল চালাইতে থাকে। এখন হইতে শিশু যাহা আঁকে তাহা একটা পরিকল্পনা লইয়াই আঁকে। কোন কোন শিক্ষকের মত এই যে, পরিকল্পনা শিশুর মনের মধ্যে নিশ্চিত রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, পরিকল্পনার রূপ ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। যদি এক ধরণের আকারকে সে একটা বস্তুর নাম দেয়, সর্বদাই ঐ বস্তুর জন্য ঐ আকার দেওয়ারও তার প্রয়োজন

নাই। পরিকল্পনার সঙ্গে আঁকিবার অর্থ এই যে, যাহাই সে আঁকুক না কেন, জ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক, তাহার মনে তাহা স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। উহা যে তাহার বাহ্য ও অন্তরের অনুভূতির প্রকাশন।

শিশুর তো ঐরূপ সকল চেষ্টা এই অনুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য। যে দাগ সে টানে, যে কাটাকুটি দিয়া সে আরম্ভ করে, তাহাও ঐ প্রকাশের জন্যই। শুধু প্রভেদ এই যে এই প্রকাশ চেষ্টা এখন এমন রূপ গ্রহণ করে যাহা বয়স্কেরাও বুঝিতে পারে। আরম্ভকালে দাগ টানা বা বালু ও মাটি দিয়া কিছু না কিছু গড়িবার চেষ্টাও ভিতরের চিন্তা-ভাবনাকে স্থূলরূপে প্রকট করা ছাড়া আর কিছু নয়।

(ক্রমশঃ)

ছাত্রজীবন ঃ সিটি কলেজ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

(পূর্ব প্রকাশনের পর)

৮

এই সময়কার সভাসমিতি খেলাধূলা ও আমোদ উৎসবের কথা এখন কিছু বলি। কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস ৬ই জানুয়ারী, প্রতিবৎসর কতকটা স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশের মধ্যে উদ্‌যাপিত হইত। আমি যে দুই বৎসর কলেজে ছিলাম—দুই বৎসরই এই দিবসটি আগ্রহে প্রতিপালিত হইতে দেখিয়াছি। সকাল বেলা সভা হইত। সভার পৌরোহিত্য করিতেন অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র। তিনি ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতেন। সিটি কলেজের আদর্শ—"প্রজাবান্ লভতে জ্ঞানম্"। যতদূর মনে পড়ে অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র এই উক্তিটির উপর ভিত্তি করিয়াই কিছুক্ষণ বক্তৃতা করিতেন। সভা হইত তেতলার উত্তর দিককার কমন-রুমে। এটি বেশ লম্বা হল ঘর। আমরা ছেলের দল গিয়া এখানে ভিড় করিতাম। অধ্যাপক-রাও অনেকে আসিতেন। অধ্যক্ষ মহাশয়ের বক্তৃতার পরই সভার কার্য শেষ হইত এবং আমরা প্রত্যেকে একটি করিয়া কমলালেবু লইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতাম।

অন্যান্য সাধারণ সভা সমিতিও এই কমন-রুমে হইত। মনে পড়ে একবার আমেরিকার একটি একেশ্বরবাদী সমাজের পক্ষ হইতে ব্রাহ্ম-আচার্য হেরম্বচন্দ্র সরকারকে ডক্টর অব ডিভিনিটি (Doct. Divinity) উপাধি প্রদান করা হয়। আমরা কলেজে থাকিতেই এখানে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে একবার রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকও অভিনীত হইয়াছিল। কর্মজীবনে প্রবেশের কয়েকবৎসর পরে এই হলে মার্কিন কবি হুইটম্যানের শতবার্ষিকী জয়ন্তিথি উদ্‌যাপনকল্পে একটি সভারও অনুষ্ঠান হয়। ইহার উদ্যোক্তা ছিলেন বন্ধুবর কবি বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন 'প্রবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। আমাদের কলেজজীবনের সঙ্গে ইহার সাক্ষাৎ যোগ না থাকিলেও এখানে এ দুইটি বিষয় উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপককালের আরও দুইটি সভার কথা এখানে বলি। আজকাল সভাসমিতির ধুম প্রত্যেক কলেজেই শুনিতে পাই। কত

ইউনিয়ন তাহাতে কত বল। আমাদের সময় ছাত্র-ইউনিয়ন ছিল না, তবে এক এক বিভাগের ছাত্রদের লইয়া বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সমিতি পরিচালনা করিতেন। আমাদের সময় ইতিহাস বিভাগের ছাত্রগণ মিলিয়া Historical Society গঠন করিয়াছিলাম। আমাদের পুরোভাগে ছিলেন ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। কয়টি অধিবেশন হইয়াছিল এতদিন পরে ঠিক বলিতে পারিব না—তবে একটি অধিবেশনের কথা মনে পড়ে। ঐদিন আমি প্রধান বক্তা ছিলাম। বক্তৃতার বিষয় ছিল Mass Education বা জনশিক্ষা। আমি ইংরেজীতে বক্তৃতা দিয়াছিলাম। ওরূপ অনর্গল বলিয়া যাইতে পারি দেখিয়া ভূপেন্দ্র নাথ খুবই বিস্মিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে আমাকে এই মর্মে বলিয়াছিলেন যে, আমি যেন বক্তৃতার চেষ্টা রাখি। কিন্তু হায়! ভূপেন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যৎবাণী দীর্ঘকাল চর্চার অভাবে আর কার্যে রূপায়িত হইল না।

কলেজে তখন একটি ইকনমিক সোসাইটিও গঠিত হইয়াছিল। ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অর্থনীতির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সরকার। তিনি মিতভাষী, মুখে শব্দটি নাই; কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যকার ছাত্র-দরদী। অধ্যাপকের প্রধান গুণ অমর্গল বকিয়া যাওয়া। ইহাতে তিনি একেবারেই অপারগ ছিলেন এবং এই গুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অমন কৃতীছাত্র হইয়াও তাঁহাকে জীবনে বিস্তর কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমরা কিন্তু তাঁহাকে বড়ই শ্রদ্ধার চোখে দেখিতাম। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁহার স্নেহপ্রীতি চের পাইয়াছি। জীবনসায়াহ্নে আসিয়াও তাঁহার কথা বারবার স্মরণ হইয়া থাকে। আমি অর্থনীতির ছাত্র ছিলাম না, তথাপি তিনি অর্থনীতির সভায় আমাকে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। আমাদের সময়ে এই সভায় দুইটি বার্ষিক (?) অধিবেশন হয়। দুইটিতেই উপস্থিত থাকিয়া উহার কার্যে সক্রিয়ভাবে যোগদান করি। তখনকার রামমোহন রায় হোস্টেলের (এখন সিটি কলেজ হোস্টেল) দ্বিতলে কমন-রুমে দুইটি অধিবেশনই হইয়াছিল। প্রথম অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইংরাজীর অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন। তিনিও খুবই মিতভাষী ছিলেন, মৃদুহাসি তখন তাঁহার মুখে সেন লাগিয়াই থাকিত। এই দিনকার সভায় পাঠ ও বক্তৃতা কিছু কিছু হইয়াছিল মনে পড়িতেছে। তবে নিজের বিষয় ছাড়া আর কে কি বলিয়াছিলেন কিছুই স্মরণ নাই। আমি একটি বাংলা প্রবন্ধ এ সভায় পাঠ করি। ইহার বিষয় ছিল—আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষা। গোখলের বক্তৃতা গ্রন্থের কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। ইহার ভিতরকার প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক বক্তৃতা তিনটির তথ্যগুলিই ছিল আমার পুঁজি, তবে স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট তখন অনেকটা পড়িয়াছি। ইহা হইতে কিছু পরোক্ষ সাহায্যও পাইয়াছিলাম মনে হইতেছে। শিক্ষার প্রণালী জানিবার ঝোঁক আমার বরাবরের। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে একটি প্রাথমিক শিক্ষক-সমিতি তখন মনে হয় সরকারী আনুকূল্যে গড়িয়া উঠে। ইহার সেক্রেটারী ছিলেন বোর্ড স্কুলের প্রধান শিক্ষক। আমার বাল্যকালের গুরু মহাশয়ের প্রতি এই সেক্রেটারী-পুঙ্গব বড়ই বিরূপ ছিলেন এবং গুরু মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি ইঁহারই কারসাজীতে তাঁহার মাসোহারা অর্ধেক কমিয়া গিয়াছিল, অর্থাৎ আড়াই টাকা হইতে পাঁচসিকায়। বিকলাঙ্গ গুরু মহাশয়ের কথা বলিতে গিয়া ঐ সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট হইতে শিক্ষক-সমিতির কার্যাবলীর খোঁজ খবর লইতে চেষ্টা করি। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে উত্তর দিয়াছিলেন, "যোগেশ, তুমি এসব কিছু বুঝবে না।" এই উত্তরে তখনই আমি খানিকটা কৌতুক বোধ

করিয়াছিলাম। দীর্ঘকাল আলোচনা গবেষণার পর এখন এই জ্ঞান হইয়াছে—সাধারণ শিক্ষিত প্রতিটি মানুষই ইচ্ছা করিলে শুধু শিক্ষা বিষয় কেন সব বিষয়েই জানিতে বুঝিতে পারে।

এখন আবার পূর্বের কথায় আসি। আমাদের অধিবেশনটি বেশ ভালই হইয়াছিল। শুধু আমাদের নয় অন্যান্য কোন কোন কলেজের ছাত্রেরাও এখানে আসিয়াছিল। তাহাদের একজনের কথা এখনও আমার মনে পড়ে। প্রেসিডেন্সী কলেজের অরুণ কুমার সেন এ সভায় যোগ দিয়াছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়া সিটি কলেজের বাণিজ্য-বিভাগের উপাধ্যক্ষ পর্যন্ত হন। আমার প্রবন্ধ পাঠ সম্পর্কে সভাভঙ্গ হইবার পর ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন আমাকে এই মর্মে বলেন যে, তথ্যের উপরে আমার বেশ দখল এবং তথ্যভিত্তিক আলোচনায় যেন আমি রত থাকি। ইকনমিক সোসাইটির দ্বিতীয় অধিবেশনও হইয়াছিল ঐ একই স্থলে। এই অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়। আমি এবারে কিছু বলিয়াছিলাম কিনা মনে নাই, তবে হেরম্ববাবুর বক্তৃতার কোন কোন কথা এখনও কানে বাজিতেছে। তিনি উপনিষদের এই কথাটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন; "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।" এই কথাটির উপর নির্ভর করিয়া তিনি কিছু বলেন। অর্থনীতির সভা—অর্থনীতি তো টাকাকড়ি ভোগ বিলাসের ব্যাপার। এ সময়ে ওরূপ ত্যাগের কথা কেন? পরে বুঝিয়াছি, যেখানে ত্যাগ সেইখানেই প্রকৃত অর্থনীতির সুরু। শুধু আমার জন্যই আমি নই, পরিবার, সমাজ, দেশ, সকলের জন্যই আমি। এই বোধ জন্মিলে অর্থনীতি সার্থক হইয়া উঠিবে।

আর একটি বিষয়ের কথা বলি। তখনকার দিনে শরীর চর্চায় খুব পড়িয়াছিল খুব বেশি। ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা, প্রভৃতিও ছিল। ইহা লইয়া মাতামাতিরও কমতি ছিল না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে যাহাতে শরীরচর্চায় লিপ্ত হয় তাহারও আয়োজন হইতে থাকে এই সময়ে। দেখিতে দেখিতে আমাদের সময়েই সিটি কলেজ শরীর চর্চা তথা ব্যায়াম অনুশীলনের একটি কেন্দ্র হইয়া উঠিল। শরীর চর্চার শিক্ষক ছিলেন ব্যায়াম-কুশলী সুবিখ্যাত রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। পরবর্তীকালের বহু ব্যায়ামকুশলী যথা বিষ্টু ঘোষ, রণজিৎ মজুমদার প্রভৃতি তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। গোপালচন্দ্র চৌধুরী নামে আর এক ব্যক্তিও তাঁহার নিকট ব্যায়াম চর্চা করিয়া আমাদের সময়েই বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তিনি পরে কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল হন শুনিয়াছি। ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রেরা রাজেন্দ্রবাবুর নিকট শরীর চর্চার বিবিধ উপায় শিক্ষা করিতেন। হার্ডিঞ্জ হোস্টেলেও ছাত্রদের তিনি এই বিদ্যা শিখাইতেন। আমরা কখনও কখনও প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের ব্যায়ামাগারে কুস্তি কসরৎ দেখিতে যাইতাম। সিটি কলেজে ব্যায়াম-প্রদর্শনের একটি সাধারণ অনুষ্ঠান হইল। ইহাতে রাজেন্দ্রবাবুর ছাত্রেরা কুস্তি কসরৎ দেখাইয়া দর্শকমণ্ডলীর নিকট হইতে খুবই প্রশংসা পান। কিন্তু আমরা সকলে মুগ্ধ হইলাম রাজেন্দ্রবাবুর কৃতিত্ব দেখিয়া। তিনি চিৎ হইয়া শুইলেন—চওড়া তক্তা তাঁহার বুকের উপর দিয়া দুই পাশে লম্বা করিয়া রাখা হইল। একটি হাতী আনা হইয়াছে। হাতীটি তাঁহার বুকের উপর দিয়া একপাশ হইতে অপর পাশে মন্থর গতিতে চলিয়া গেল। আমার মত অনেকেই এ ধরণের দৃশ্য এই প্রথম দেখিলাম, তখন আমরা যে কতখানি বিস্মিত হইয়াছিলাম বলিতে পারি না।

রাজেন্দ্রনাথ অতিদীর্ঘ মানুষটি ছিলেন। তাঁহার দেহ যেন ছিপ্‌ছিপে-পেটা, হাঁটা চলার মধ্যে হইত তিনি কত শক্তিধর। কথা খুব কম বলিতেন, ছাত্রদের ব্যায়াম কসরৎ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া তিনি নিজেও যথারীতি তাহাদিগকে দেখাইয়া দিতেন। ক্রমে

তাঁহার একটি কৃতী ছাত্রদলও গড়িয়া উঠে। উপরে দুই তিন জনের নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াছি। এইরূপ কত ছাত্র যে তাঁহার নিকট শরীর চর্চা শিক্ষা করিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কেহ কেহ নিজেই ব্যায়াম কুস্তির আখড়া স্থাপন করিয়া আপনার বহুজনকে ব্যায়াম শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন। রাজেন্দ্রবাবুর অন্যতম প্রখ্যাত ছাত্র ব্যায়ামবীর বিষ্টুচরণ ঘোষের নাম ও আখড়ার কথা আজ কে না জানে! তাঁহার আর একজন প্রখ্যাত ছাত্র রমজিৎ মজুমদার দিল্লীর বিরলা মন্দিরে ব্যায়াম শিক্ষা দানে দীর্ঘকাল রত হইয়াছেন। আমরা যে সময় কলেজে পড়ি তাহার প্রায় দশ বৎসর পরে রাজেন্দ্রবাবু ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দের কুস্তি কসরতের কথা তাহাদের চিত্রসমেত আমরা 'প্রবাসী'তে ছাপাইয়াছিলাম। রাজেন্দ্রবাবু মারা গিয়াছেন বহু বৎসর পূর্বে, কিন্তু ঐ সময় তিনি যুবচিত্তে শরীর চর্চার যে প্রেরণা আনিয়া দেন তাহা অদ্যাবধি ছাত্র-সমাজে সক্রিয়ভাবে কার্য করিতেছে। ব্যক্তিগতভাবে শরীর চর্চার সুযোগ ঘটে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনার মধ্য দিয়া, আর ব্যায়াম শিক্ষার দ্বারাই ইহা সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলি। ব্যায়াম চর্চার মাধ্যমে যে জাতীয় উন্নতি ত্বরান্বিত হইতে পারে এবং শারীরিক বলের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বলও বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব, গত শতাব্দীর ষষ্ঠদশকে এই কথা বিবেচনা করিয়াই নবগোপাল মিত্র ব্যায়াম-চর্চাকে হিন্দু তথা জাতীয় মেলার একটি প্রধান অঙ্গ করিয়া লইয়াছিলেন। তখনকার যুবক ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু মেলায় কুস্তি কসরৎ দেখাইয়া বিশেষ প্রশংসা পান। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের অনুজ। সুরেন্দ্রনাথও প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে অঙ্গ-চালনা করিতেন। তিনি বার্ধক্যেও বেশ শক্তিমান ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বারাকপুর লাটভবনে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন তাঁহার সাতাত্তর বৎসর বয়স। মহাত্মা গান্ধী এই সাক্ষাৎকারের বর্ণনা ইয়ং ইণ্ডিয়ায় লিপিবদ্ধ করেন। ইহাতে তিনি সুরেন্দ্রনাথের আশ্চর্য মনোবল দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি একশত পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিবেন।

৯

আমাদের সময়েও কলিকাতায় সরস্বতী পূজার খুবই ধুমধাম ছিল। তবে ইহা প্রধানত নিবদ্ধ ছিল স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে, পূর্ববঙ্গে যেমন ঘরে ঘরে সরস্বতী পূজা হয়, এতদঞ্চলে তেমন হইতে দেখি না। কলিকাতায় সাড়ম্বর পূজা-অর্চনা দেখিতে আশে পাশের গ্রামের লোকেরাও আসিয়া ভিড় করিত। কলিকাতায় কলেজসমূহের কয়েকটি বড় বড় ছাত্রাবাস। এই ছাত্রাবাসগুলিতেই সরস্বতী পূজার ধুম পড়িত খুব বেশি। তখন লাউড-স্পীকার বা মাইকের আবির্ভাব হয় নাই। অত বেশি ধুমধাম হইলেও পূজার শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ সকলেরই চোখে পড়িত। সরস্বতীর উপাদনার একটি অঙ্গ গীতবাদ্য। ইহারও তখন প্রচুর আয়োজন করা হইত। এই সকল কথাই একটু বিশেষে বলি।

সিটি কলেজের ছাত্র আমরা। কলেজ পরিচালিত রামমোহন রায় হোস্টেল এবং অপরাপর কয়েকটি মেস-বাড়ীতে পূজা-অর্চনার আয়োজন হইত। 'রামমোহন রায় হোস্টেলের' ছাত্রেরা ছিল সংখ্যায় খুবই বেশি—প্রায় চারিশত। তাহাদের আয়োজন অপর সকলকেই ছাপাইয়া যাইত। হোস্টেলের নাম রামমোহন রায়ের সহিত যুক্ত, একারণ ছাত্রেরা ইহার হাতার মধ্যে সরস্বতী পূজা না করিয়া নিকটস্থ কোন বাড়ীর বিস্তৃতলে পূজার পর্ব সারিয়া লইত। বর্তমানে কলেজ ও কলেজ-হোস্টেলের সম্মুখে রাস্তার অপর পার্শ্বে আমহার্স্ট

ষ্ট্রীট খানা ও হরিবেল্ড পার্ক যতটা ভূমির উপর রহিয়াছে, তাহার সবটাই প্রাচীর ঘেরা ছিল। এখানে গত শতাব্দীর বিখ্যাত ভিক্টুক-আবাদ ছিল। আমরা যখন কলেজে পড়িতে আসি তখন প্রাচীর ভাঙিয়া ঐ দুইটির জন্য স্থান করা হইতেছিল। আমাদের চতুর্থ বর্ষে মনে হয় হোস্টেলের পূজা এই প্রাচীর ভাঙ্গা খোলা জায়গায় এক স্থলে হইয়াছিল। পূজার দিন হোস্টেলে ভোজনের আয়োজনও হইত প্রচুর—সে কথা যাক।

যতদূর মনে হয় 'রামমোহন রায় হোস্টেলের' ছাত্রবৃন্দ প্রতি বৎসর কোন না কোন দল বাঁধিয়া করিয়া যাত্রার আয়োজন করিত। যাত্রার দলগুলি এই সময় প্রায়ই কলিকাতায় আসিত পূর্বাঞ্চল হইতে। আপার সার্কুলার রোডস্থ বঙ্গ বিজ্ঞান মন্দিরের পিছনে, পশ্চিম দিকে সবটা জুড়িয়া ছিল একটা খোলা মাঠ। তখন ইহা ঐ অঞ্চলে 'চেরি-গ্রাউণ্ড' নামে আখ্যাত হইত। এই মাঠ এখনকার ছেলেরা আর দেখিতে পাইবে না। ইহার পূর্বদিকের কতকটা জুড়িয়া বিপ্রদী পুলিন দাসের লাঠি ও ছোরা খেলার আখড়া ছিল, পশ্চিমে বহু বৎসর যাবৎ অনেকটা জায়গা খোলা পড়িয়া ছিল। এখন এখানে কতই না ঘরবাড়ী তৈরী হইয়াছে। অতবড় খোলা মাঠ কোথায় উবিয়া গেল, এখন এখানে "স্থানং তিল ধারণম্"। এইরকম আমরা তখন কলিকাতায় বহু খোলা জায়গা দেখিতাম। এখানে ছেলেরা নানাবিধ খেলায় রত থাকিত। এখন আর খোলা জায়গা খুঁজিয়া পাইবেন না। অধুনা ছেলেরা গলি উপগলিকেই খেলার মাঠ করিয়া লইয়াছে। জনৈক প্রবীণ বন্ধু একদা এই বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন যে, রাস্তায় কর্সা জামা কাপড় পরিয়া চলার যো নাই, কোথা হইতে বল আসিয়া গায়ে পড়িবে ঠিক আছে? কথাটা ঠিক, কিন্তু ছেলেরা যায় কোথায়?

এই 'চেরি গ্রাউণ্ডে' প্রতিবৎসর হোস্টেলের ছেলেদের উদ্যোগে সরস্বতী পূজার সময় একদিন কি দুইদিন যাত্রা হইত। খোলামাঠ, টিকিটের বালাই নাই। লোকের ভিড় হইত খুব। কিন্তু তখন লোকের মন আজিকার মত এত অস্থির বা অশান্ত হইয়া উঠে নাই। অতিরিক্ত ভিড় হইলেও বেশ শান্ত সংযত চিত্তে মধ্যভাগে বসিয়া এবং পিছনে ও পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নীরবে গান শুনিত এবং উপভোগও করিত যথেষ্ট। আজিকার হৈ-হুল্লোড় পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ বৎসর পূর্বেও নিরতিশয় কমই প্রত্যক্ষ করিতাম। চেরি গ্রাউণ্ডের যাত্রার কথা বলিলাম। এইরকম আরও অনেক যায়গায় এসময় যাত্রা হইত। এসময়কার আর একটি কথা এখন বলি।

প্রেসিডেন্সী কলেজের হিন্দু হোস্টেলেও বহু ছাত্রের বাস। ইহার বিভিন্ন ব্লকের ছাত্রেরা এক-যোগে সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠান করিত। মনে হয় সেখানেও যাত্রা হইত। কিন্তু আমাদের সময়ে প্রথমবার আর একটি অনুষ্ঠান হয় গীতবাদ্যের। আমরা সন্ধ্যা-আরতির পর সেখানে যাই। সঙ্গীত-শাস্ত্র-পারঙ্গম শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের গানের ব্যবস্থা হয়। তিনি যথাসময়ে কয়েকটি তরুণ সাকরেদ সহ আসরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে পূর্বে কখনও দেখি নাই। গান শুনিবারও সৌভাগ্য হয় নাই। এবারে এই প্রথম তাঁহাকে দেখি ও গান শুনি। কি সুকণ্ঠ গায়ক তিনি। কণ্ঠের ভিতর হইতে অমৃত উৎসারিত হইয়া আমাদের কর্ণকুহরে যেন বর্ষণ করিতে লাগিল। সেদিনকার সেই আশ্চর্য অনুভূতি জীবনে কখনও ভুলিব না। দিলীপকুমারের গান পরেও একবার শুনিয়াছি—'সাহিত্য সেবক সমিতির' রৌপ্য জয়ন্তী উৎসবে। তখন তিনি শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য এবং পণ্ডিচেরীর আশ্রমভুক্ত। পূর্বদিনের মত সে অনুভূতি আর ফিরিয়া পাইলাম না। দিলীপ-কুমার সঙ্গীতের রাজা। তাঁহার সঙ্গীত কতকাল ধরিয়া গৌড়জনকে তৃপ্তি দান করিতেছে।

সরস্বতী পূজা সম্পর্কে এখানে আর একটি ঘটনার কথা বলি। ইহা কিন্তু আমাদের কলেজে অধ্যয়নকালে ঘটে নাই। কিছু পরে ঘটিয়াছিল। তথাপি নানা কারণে এখানে উল্লেখ করিতে হইতেছে। কলিকাতার বিভিন্ন কলেজের ছাত্রাবাসের চত্বরের মধ্যেই সরস্বতী পূজা আগেও হইত, এখনও হইয়া থাকে। পূর্বে 'রামমোহন রায় ছাত্রাবাসটি' ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিমা পূজা সমর্থন করেন না, কাজেই কর্তৃপক্ষ এখানে সরস্বতী পূজা হইতে দিতেন না। এই রেওয়াজ বরাবর চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ১৯২৮ সনে ছাত্রাবাসের হাতার মধ্যেই ছাত্রগণ কর্তৃপক্ষের অগোচরে বা বিনানুমতিতে সরস্বতী পূজার আয়োজন করে। ইহা লইয়া কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের মধ্যে তখনই কিছু গণ্ডগোল হয়, আর ইহার জের চলে বহুদিন যাবৎ। কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এমন কি কোন কোন অনলেতাও পক্ষাপক্ষ গ্রহণ করিলেন। গদ্য পদ্য বহু রচনায়ও এই আলোড়ন বা চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইয়াছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই আলোড়নে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। এমন একটি সমাজকল্যাণকর উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবম্বিধ বিপদে আমরা কলেজের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কবিহীন প্রাক্তন ছাত্রেরাও ইহাতে কম বিচলিত হই নাই। শেষে একটি আপোষ রফা হইয়া আন্দোলন প্রশমিত হয়। ছাত্রাবাসের নামকরণ হইল রামমোহন রায় হোস্টেলের বদলে 'সিটি কলেজ হোস্টেল।' এখন এই বাড়ীর হাতার মধ্যেই সরস্বতী পূজা হইয়া থাকে। সমাজ দাঁড়াইয়া আছে আপোষ রফার উপর। কি পারিবারিক কি সামাজিক জীবনে প্রতিনিয়ত কতই না আপোষ রফা করিয়া চলিতে হয়। ঐরূপ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মসমাজেরও আদর্শ বিচ্যুতির ভয় আর রহিল না। আবার ছেলেদেরও নির্বিঘ্নে স্বচ্ছন্দে সরস্বতী দেবীর পূজা অর্চনার ব্যবস্থা হইয়া গেল।

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলি। আমরা ছাত্রেরা সরস্বতীপূজার জন্য বাহিরে চাঁদার জন্য কাহারও নিকট হাত পাতিতাম না। নিজেদের যতটুকু সামর্থ তাহা লইয়াই আমরা পূজা অর্চনায় রত থাকিতাম। বর্তমানে কিন্তু ইহার বিপরীত লক্ষ্য করি। আসর, প্যাণ্ড, সজ্জা রাতারাতি সাজাইয়া উঠিয়া চাঁদার অজুহাতে সামাজিক জীবনকে—স্বল্প-আয়ী পরিবারকে বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। পূজা অর্চনা নিষ্ঠাসহকারে সম্পন্ন হওয়া উচিত, বিশেষ করিয়া সরস্বতীদেবীর অর্চনা তো বটেই। আজকাল মাইক, লাউডস্পীকারের উপদ্রবে বীণাপাণি সরস্বতীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবার উপক্রম! আমি প্রত্যহই সরস্বতীর কার্যত আরাধনা করিয়া থাকি, আমার কাছে চাঁদার খাতা লইয়া কেহ বড় একটা ঘেঁসে না। এবারে কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি। একটি আসর হইতে ছেলেরা আসিল। স্থানীয় কলেজ হইতেও একদল ছাত্র চাঁদা-প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল। সমুচিত কথায় তাহাদের বিদায় দিলাম বটে, কিন্তু, কথায় তো চিঁড়ে ভেজে না তাহারা হয়ত আমাকে ব্যক্তিবেক মাত্র ভাবিয়া কৃপা করিতে করিতে চলিয়া গেল। অবশ্য তাহাদের প্রতি এরূপ বাক্য ব্যবহার করিয়া আমি অবিচার করিতে চাহি না, কেহ কেহ হয়ত তাহাও মনে করিতে পারে।

গ্রীষ্মের ছুটি তখন আড়াই মাস করিয়া হইত। ছুটিতে বাড়ী চলিয়া যাই। এই সময়ে প্রথমদিকে কতকগুলি পারিবারিক কার্যে কম বেশি ব্যাপৃত হইয়া পড়ি। এ বিষয়ের উল্লেখের প্রয়োজন নাই। একদিন আমার পূর্বতন কদমতলা স্কুলের একজন শিক্ষক আসিয়া বলিলেন, তিনি এক মাসের ছুটি লইয়া বাড়ী যাইবেন। আমাকে ঐ সময়টা তাঁহার বদলী দিতে হইবে। যে স্কুলে এক্রমে আট বৎসর বেকিতে বসিয়া শিক্ষক মহাশয়দের নিকট হইতে পাঠ লইয়াছি, সেইখানে গিয়া আমি এখন ছেলেদের

পড়াইব। ইহাতে মনে একটা অভূতপূর্ব আনন্দানুভূতি হইল। একমাস যথাসময়ে গিয়া ছাত্রদের বিভিন্ন ক্লাসে শিক্ষক মহাশয়ের বদলীরূপে পড়াইয়াছিলাম। ইহার পর আর কখনও সাধারণ ক্লাসে ছেলেদের পড়াইবার সুযোগ বা সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। তখন ছেলেরা কিরূপ মনে করিয়াছিল সঠিক মনে নাই, তবে তাহাদেরই মত একজন আগেকার ছাত্রকে পাইয়া তাহারা যে উৎফুল্ল হইয়াছিল একথাটি স্মৃতির পাতায় যেন লেখা রহিয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী পূর্ব বৎসরে (ডিসেম্বর ১৯২৪) ভারতীয় কংগ্রেসের বেলগাঁও অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছেন। তিনি ইহার পর বিভিন্ন প্রদেশ পরিক্রমায় বাহির হন। গ্রীষ্মকালে তাঁহার বাংলা সফর সুরু হইল। আমরা তখন দেশের বাড়ীতে। সর্বত্র সাড়া পড়িয়া গেল, মহাত্মা গান্ধী বরিশালে আসিবেন। ও অঞ্চলে হুলার হাট একটি বড় ষ্টীমার ষ্টেশন-জংশন বলিতে যাহা বুঝায় এ তাহাই। সফর সূচীতে স্থির হইল, তিনি বরিশাল এক্সপ্রেস ষ্টীমারে আসিয়া হুলার হাটে নামিবেন এবং সেখানে দশমিনিটকাল থাকিবেন। ষ্টীমার এই সময়টুকু ওখানে অপেক্ষা করিবে। দশ মিনিট পরে ঐ ষ্টীমারেই তিনি খুলনার রওনা হইয়া যাইবেন। আমরা বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কেহ বা হাঁটাপথে, কেহ বা নৌকাযোগে আবার কেহ বা ভিন্ন লাইনের ষ্টীমার যোগে হুলার হাটে আসিয়া ভিড় করিলাম। ষ্টীমার ঘাটে পৌঁছিলে মহাত্মা গান্ধী ইহা হইতে অবতরণ করেন এবং পূর্ব নির্ধারিত মত তিনি দশমিনিটকাল হিন্দীতে বক্তৃতা দেন। তিনি এক একটি বাক্য বলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার অনুবাদ বাংলায় করিয়া দেওয়া হইতে থাকে। তাঁহার একটি কথা এখনও মনে আছে—"সরাব নেহি পিয়ো"—মদ খাইও না। তিনি তখন কংগ্রেসের গঠনমূলক বা রচনাত্মক কার্যের ভার লইয়া সর্বত্র হিন্দু মুসলমান ঐক্য, অস্পৃশ্যতা বর্জন, মাদক দ্রব্য নিবারণ এবং খদ্দর প্রচলন এই চারিটি বিষয়ে ঐকান্তিকভাবে মনঃসংযোগ করেন। ঐ ক্ষুদ্র বক্তৃতাতেও এই বিষয়গুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর পূর্বকালের এবং তখনকার চেহারা ছবিতে দেখিয়াছি। এইবার তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিলাম। তিনি ১৬ই জুন হুলারহাটে আসেন, তখন গ্রীষ্মকাল। তাঁহার গায়ে একটি ফতুয়া কি উড়নী ছিল ঠিক মনে নাই, কিন্তু কাপড় আদ্যোপান্ত খদ্দর। পরে খালি গায়েও তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি। ষ্টীমার ছাড়িয়া গেল। আমরা যে যাহার গন্তব্যস্থলে ফিরিয়া গেলাম। সেই প্রথম দর্শনেই মহাত্মাজীর প্রতিকৃতি হৃদয়পটে স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যায়।

কিন্তু হায়, আমরা কি তখন ঘুণাক্ষরেও জানিতাম যে, ঐদিনই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দার্জিলিঙে দেহত্যাগ করিয়াছেন! খুলনা ষ্টীমার-ঘাটে পৌঁছিতেই মহাত্মা গান্ধীর হাতে দেশবন্ধুর মৃত্যু-সংবাদবাহী টেলিগ্রামখানি দেওয়া হইল। তিনি খুলনার সফর তালিকা বাতিল করিয়া সরাসরি কলিকাতায় রওনা হইয়া যান। পথে প্রত্যেক বিভিন্ন ষ্টেশনে লোকজনের নিকট তাঁহার কথা সংক্ষেপে পরিবেশন করিতে করিতে গিয়াছিলেন। শুনিয়াছি ঐদিনই চিত্তরঞ্জনের শবদেহ কলিকাতায় আসে। মহাত্মা গান্ধী শব-শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। কলেজের গ্রীষ্মের ছুটি তখনও চলিতেছিল। আমরা তখন দেশের বাড়ীতে। চিত্তরঞ্জনের শব-শোভাযাত্রাকালের বিপুল জনতা এবং অপূর্ব শোকাবহ দৃশ্য আমরা দেখিতে পাই নাই। সত্য কথা বলিতে কি, চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি মহাত্মাজীর কর্মপদ্ধতিকে ছাপাইয়া তখনও আমাদের যুবক সাধারণের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই। গোলদীঘিতে কোন কোন সভায় দেশবন্ধুকে দেখিয়াছি, আইনসভায় তাঁহার

জয়লাভের কথা জানিয়াছি, অন্যান্য প্রদেশেও স্বরাজ্য দলের কৃতিত্বের কথা কাগজে পড়িয়াছি, কিন্তু কি জানি কেন, আমরা ঐ সময়ে তাঁহাকে রাজনীতিক্ষেত্রে তেমন স্থায়ী আসন দিতে পারি নাই। মহাত্মা গান্ধীকেই জাতির একমাত্র সত্যিকার নেতা বলিয়া তখন মনে হইত।

তবে চিত্তরঞ্জন শুধু রাজনীতিক ছিলেন না। তাঁহার অবিরাম সাহিত্য-সাধনা তথা বাংলা সাহিত্যের উন্নতি করে প্রায় বাঙালী মাত্রকেই বহু পূর্ব হইতে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার 'সাগর সঙ্গীতে'র ইংরেজী অনুবাদ করেন অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ)। তৎসম্পাদিত "নারায়ণ" বাংলা-দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্র হইয়া উঠে। তদুপরি চিত্তরঞ্জন ছিলেন দানবীর। তিনি ব্যারিষ্টারীতে বিস্তর অর্থ-উপার্জন করেন এবং অধিকাংশই দুই হস্তে বিলাইয়া দেন। অসহযোগের প্রাক্কালে তাঁহার অদাধারণ ত্যাগ স্বীকারে আমরা আপামর সাধারণ বিমোহিত না হইয়া পারি নাই। চিত্তরঞ্জন সাময়িক বিরূপ সমালোচনা এবং হিন্দু-মুসলমান চুক্তি-জনিত কথঞ্চিৎ অপযশ সত্ত্বেও যে জাতির চিত্তে একটি দৃঢ় স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতেই আমরা তাহা প্রথম হৃদয়ঙ্গম করিলাম। রবীন্দ্রনাথ দুইটি পংক্তিতে জাতির মর্মবেদনাকে স্পষ্ট রূপ দিলেন—

এসেছিলে "সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

মহাত্মা গান্ধী অন্যান্য জেলার সকল বন্ধ রাখিয়া চিত্তরঞ্জনের সার্থক স্মৃতি রক্ষাকল্পে অর্থ সংগ্রহে তৎপর হইলেন। দেশবন্ধু চরমপত্রে বাসভবনকে একটি মাতৃসদনে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে 'ট্রাস্ট' গঠন করিয়া যান। তখন তাঁহার বিস্তর দেনা ছিল। মহাত্মা গান্ধী এই বাংলাদেশ হইতেই বহু লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়া চিত্তরঞ্জনের বাসভবনকে দায়মুক্ত করেন। এইরূপে চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের মত এরূপ বিরাট সমাজ-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান গঠনে সুযোগ করিয়া দেওয়া হইল।

গ্রীষ্মের ছুটি অন্তে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। পাঠারম্ভ হইল পূর্ববৎ। একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পাঠ শেষে বাৎসরিক পরীক্ষা হইয়াছিল। গ্রীষ্মাবকাশের পর জানিলাম আমি উক্ত পরীক্ষায় কলা-বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া কলেজ-কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত একটি 'ষ্টাইপেণ্ড' বা বৃত্তি পাইয়াছি। ইহার পরিমাণ মাসিক ছয়টাকা এবং এক বৎসরের জন্য পাইব। "ছয়টাকা" এমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, বর্তমানে ত নহেই তবে তখন উহা পাওয়ার যে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলাম তাহা নিঃসন্দেহ। আমার অধ্যাপকগণের কথা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। কলাবিভাগের এমন বহু অধ্যাপক ছিলেন যাঁহাদের নিকট আমি পড়ি নাই, বা আমার পড়িবার কথাও নয়। বিষয়বিশেষের—যথা গণিতশাস্ত্র, দর্শন, প্রকৃতি বহু খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহাদের নিকট আমরা পাঠ লই নাই বটে, কিন্তু কাহারও কাহারও ব্যক্তিত্ব আমাদিগকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিত। কলেজের উপাধ্যক্ষ ছিলেন বয়োবৃদ্ধ নাস্তিকীর্ণ কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ। তিনি গণিতশাস্ত্রেরও প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। প্রবেশিকার মান উপযোগী তিনি একখানি বীজগণিত গ্রন্থ সংকলন করেন। এখানির একসময় বেশ প্রচলন ছিল। তিনি রাশভারী লোক ছিলেন। তবে তাঁহার মধুর ব্যবহারে ছাত্রেরা মুগ্ধ না হইয়া পারিত না। বিজ্ঞান-বিভাগের দুইজন খ্যাতনামা অধ্যাপকের নামও স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ সেন ছাত্র সমাজে বড়ই প্রিয় ছিলেন। তিনি আদর্শবাদী মানুষ, নিষ্ঠাবান হিন্দু, অমায়িক-ব্যসনে একান্তই সংযত। অধ্যাপনাকেই জিতেন্দ্রনাথ

জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছিলেন। কলেজের নিম্নতলে পদার্থবিজ্ঞান কক্ষে তিনি দিনের বেশির ভাগ সময় কাটাইতেন। ছাত্রদের সাধারণ ক্লাসে পড়াইতেন, লেবরেটরীতে বিভিন্ন পরীক্ষণ কার্য স্বহস্তে দেখাইয়া দিতেন। তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানের বক্তৃতা দিতেন বেশির ভাগই বাংলায়। তাঁহার ছাত্রদের কাহারও কাহারও মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার অধ্যাপনাগুণে কঠিন বা জটিল বিষয়ও কেমন জল হইয়া যাইত। ছাত্রেরা, বিশেষত বিজ্ঞানের ছাত্রেরা সদা-সর্বদা তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত। পড়ান বাদে তাঁহার উপদেশ শুনিত বিভিন্ন বিষয়ে এবং এই সকলের দ্বারা তাহারা অনুপ্রাণিত হইত এবং জীবনের গতিপথ ঠিক করিয়া লইত। জিতেন্দ্র নাথ ছিলেন কলুটোলার সেনপরিবারের সন্তান। সুবিখ্যাত রামকমল সেন এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও ছিলেন এই পরিবার-সম্ভূত। রসায়নের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁহার অধ্যাপনারও সুনাম ছিল। লম্বা চোহারা চেহারা। সব সময়ে পাঁতলুন পরা, মুখে মৃদু হাসি—এই রকম মানুষটি কাহারও চোখ এড়াইত না। তিনি নির্বিরোধী লোক ছিলেন। সরস্বতী পূজার গোলমালের পর শুনিয়াছি তিনি বহুদিন যাবৎ 'সিটি কলেজ হোষ্টেলের' সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। রসায়নের উপরে তাঁহার একখানি বই ছিল। ছেলেদের মধ্যে তখন এখানির খুবই প্রচলন দেখিয়াছি।

সিটি কলেজের লাইব্রেরী সম্বন্ধেও কিছু বলি। লাইব্রেরীয়ান বা গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন রমেশচন্দ্র দেব। তাঁহার খুব পড়াশুনা। তিনি বোধ হয় দর্শন শাস্ত্রে এম এ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার আকৃতি প্রকৃতিতেও বেশ একটা সৌম্যভাব লক্ষ্য করিতাম। কলেজের গ্রন্থাগারটি খুবই বড়। কত বই, কত তাক, আর কত আলমারী—সমুদয়ই তাল তাল বইয়ে ঠাসা। ইংরেজী, সংস্কৃত, ও দর্শনের বই এখানে ছিল প্রচুর। তখন এক এক বিষয়ে প্রধান অধ্যাপকের নির্দেশ মত ঐ ঐ বিষয়ে পুস্তক ক্রয় করা হইত। ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র স্বয়ং কত ইংরেজী সাহিত্যের বই, রেফারেন্স বই, অভিধান ইত্যাদি দীর্ঘকাল ধরিয়া খরিদ করাইয়াছিলেন তাহার কি ইয়ত্তা আছে। এক একটি বিষয়ের বিভিন্ন অধ্যাপক গণের পরামর্শও প্রধান অধ্যাপকেরা অবশ্যই গ্রহণ করিতেন। সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত পাঠ্য-পুস্তকাদি বাদে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ কোষগ্রন্থ, ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতির প্রামাণিক সংস্করণ সমূহও কিনাইয়া লন। দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন পূর্বে সুবিখ্যাত ভক্টর হীরালাল হালদার। তাঁহার সময়ে দর্শন শাস্ত্রের গ্রন্থাদির দ্বারাও গ্রন্থাগারটি সমৃদ্ধ হইয়াছিল। বাংলা পুস্তকও ছিল ঢের। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম না। তবে সুবিজ্ঞ বিজ্ঞান অধ্যাপকগণের নির্দেশে বিজ্ঞান পুস্তক ক্রয়ের দ্বারাও সে গ্রন্থাগারটি সমৃদ্ধ করা হয় তাহা বলাই বাহুল্য। গ্রন্থাগারটি ছিল কলেজের ত্রিতলে পূর্বদিকে। ঠিক ইহার বিপরীত দিকে অবস্থিত ছেলেদের কমনরুম; এখানে দেশ বিদেশের ইংরেজী বাংলা-কলা ও বিজ্ঞান বিষয় বহু সাময়িক পত্র রাখা হইত। ছেলেরা ঐ সব পাঠ করিয়া উপকৃত হইত। কমনরুমের ভার ছিল সহকারী গ্রন্থাধ্যক্ষের উপর। বিভিন্ন সময়ে এই কমনরুমকেই বক্তৃতার হলঘরে পরিণত করা হয়। আমি কিন্তু গ্রন্থাগারেই অবসর সময়ে বেশিরভাগ কাটাইতাম, এবং পুস্তকপাঠে রত থাকিতাম, এখানে বসিয়াই বহুখণ্ডে প্রকাশিত স্যাড লার কমিশনের রিপোর্ট ক্রমে ক্রমে পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হই। গ্রন্থাধ্যক্ষ রমেশচন্দ্র কর্মত্যাগ করিবার পরে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহার পরে তাঁহার আর কোন সংবাদ পাই নাই। তিনি জ্ঞানলাভেচ্ছু ছাত্রদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি

তাহাদিগকে প্রয়োজন হইলেই বিবিধ বিষয়ে সাহায্য করিতেন ও উপদেশ দিতেন। আমিও তাঁহার স্নেহপ্রীতি লাভে সমর্থ হই।

এই সময়কার কলেজের করনিকগণের কথাও একটু বলি। প্রথম করনিক ছিলেন দক্ষিণবাবু, খর্বাকৃতি, বৃদ্ধ উমাচরণ দেব। সকলে তাঁহাকে সংক্ষেপে ইংরেজীতে "U. C. DEVA" বলিত। তখন কাউন্টারের অত ছড়াছড়ি ছিল না। তিনি নিজের হাতে আমাদের বেতন লইতেন এবং অনেক গল্প বলিতেন। একবার তিনি বলেন, আমাকে তোমরা যে সে লোক মনে করো না, এই হাতে আজ ঘুণ্ডের মাইনে নিয়েছি। তখন সিটি কলেজে 'ল বিভাগ' ছিল। সার আশুতোষ এখানে দুই বৎসর আইন পড়িয়া বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। উমাচরণ দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধেও আমাদিগকে কখনও কখনও বলিতেন। তাঁহার মুখে সুরেন্দ্রনাথের প্রশংসা বড় একটা শুনি নাই। সুরেন্দ্রনাথ তখন রাজনীতি হইতে অপসারিত হইয়া নিরালায় জীবনযাপন করিতেছিলেন। তিনি এই বৎসর ৬ই আগষ্ট তারিখে বারাকপুর—মনিরামপুরস্থ বাসভবনে মারা গেলেন। তাঁহার মৃত্যুতে কলিকাতায় বিশেষ কোন সাড়া পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। এই সময়কার আর একজন করনিক ছিলেন,—পার্সেভৈল ক্লার্ক।— দুঃখের বিষয় তাঁহার নাম এখন আর মনে নাই। আমি প্রথমাবধি রামমোহন রায় হোস্টেলের ত্রিতলস্থ Establishment-এ আহার করিতাম বটে, কিন্তু থাকিতাম কলেজের বলাইসিংহ লেনস্থ একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীর মেসে। এই বাড়ীর দ্বিতলের এক ঘরে ঐ করনিক থাকিতেন। তিনি ছিলেন চিরকুমার। নিয়ত গঙ্গাস্নান করিতেন, স্বপাকে আহার করিতেন। চলনে বলনে খানিকটা হাস্যকর হইলেও তিনি ছিলেন সাধুপ্রকৃতির মানুষ। তিনি একদিন আমাকে বলেন, "এখানে আমার চাকরী হয় কেমন করে জান, বরিশালের আচার্য জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় হেরম্ববাবুকে একখানি চিঠিতে লিখলেন, 'You can believe him as you believe me' ; অমনি আমার চাকরী হয়ে গেল," —Percentage clerk এর পদটি খুবই দায়িত্বপূর্ণ। এখানে এইরূপ একজন সৎলোকের অধিষ্ঠান হওয়ায় তিনি অনেকের চক্ষুঃশূল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কলেজের কেশিয়ার ছিলেন কালীমোহন ঘোষাল। তিনি অধ্যক্ষ হেরম্ববাবুর নিকট-আত্মীয়। তিনি আকৃতিতে খানিকটা খর্ব হইলেও বেশ মাতব্বরী লোক ছিলেন। কেমন করিয়া জানি না, আমি তাঁহার স্নেহপ্রীতিলাভে সমর্থ হই। কলেজ ছাড়িবার পরও, যখনই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইত, তখনই তাঁহার কথাবার্তায় বুঝিতাম, আমার প্রতি তাঁহার আগেকার স্নেহ-প্রীতি অব্যাহত রহিয়াছে। তিনি এখন আর ইহজগতে নাই। ক্রমশঃ

———

ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকের ডায়েরী

শ্রীলক্ষীশ্বর সিংহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অভিভাবক সঙ্ঘ

অভিভাবক সঙ্ঘের প্রধান কাজ বিদ্যালয়ের কার্যনীতি যথাযথ চলিতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য করা। বিদ্যালয়ে যে সকল জিনিস ব্যবহার করা হয় তাহা দেখা এবং অপচয় হইলে প্রয়োজন মত জিনিস-পত্র ক্রয় সম্পর্কে বিদ্যালয়ের পরিচালককে সতর্ক করাও একটা কাজ। যে সকল বিদ্যার্থী বিদ্যালয়ে সঠিক যত্ন পায় না বা যে বিদ্যার্থী দুর্নীতি পরায়ণ হইয়া উঠে, সেই সকল বিদ্যার্থী সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণেও অভিভাবক সঙ্ঘ যত্ন লইয়া থাকেন। সঙ্ঘের অধিবেশনে বিদ্যালয়ের সকল সামাজিক সমস্যা আলোচিত হয় কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাপারে এই সঙ্ঘের কোন দায় নাই। মোট কথা ডেমোক্রেটিক ডেনমার্কে সার্বজনীন শিক্ষা পরিচালনায় অভিভাবকদের কর্তব্যের দায়ও স্বীকৃত। এই সঙ্ঘের পরিচালনা পদ্ধতি আইনসিদ্ধ।

কোপেন হাগেনের প্রতি বিদ্যালয়ে পাঁচজন সদস্যের এক একটি অভিভাবক সঙ্ঘ আছে। দুইজন সদস্য নির্বাচিত হন সিটি কাউন্সিল দ্বারা। বাকী তিনজনকে নির্বাচন করেন বিদ্যার্থীদের শিক্ষামাতা ও অভিভাবকগণ। প্রধান শিক্ষক Ex-officio সদস্য থাকেন কিন্তু তাঁহার কোন ভোট নাই। শিক্ষক-সঙ্ঘও শিক্ষকদের মধ্য হইতে দুইজন অতিরিক্ত সদস্য নির্বাচন করেন কিন্তু তাঁহারা আলোচনার মাত্র যোগ দিতে পারেন, ভোট দিবার ক্ষমতা তাঁহাদেরও থাকে না।

স্থানীয় বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যে আইন আছে তাহাও উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৯ সালের ১২ই এপ্রিলে পার্লামেন্টে পাস করা আইনের ২০০ শত মন্ত্রের ধারাগুলি এইরূপ—

স্কুল কমিটি গঠনের নিয়মকানুন

যাঁহাদের পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচনে ভোট দিবার ক্ষমতা আছে তাঁহারা এবং বিদ্যার্থীদের পিতামাতা ও অভিভাবক স্কুল-কমিটির সদস্য হইতে পারেন। মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনের সঙ্গে স্কুল-কমিটির ইলেকশন হইবে। সদস্যগণ চারি বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য একটি স্কুল-বোর্ড থাকিবে এবং এই বোর্ড স্কুল-কমিটির নির্দেশ কার্যকরী করিবেন। স্কুল-কমিটির যে কোন সদস্য স্কুল-বোর্ডের নির্বাচনপ্রার্থী হইতে পারেন। অন্ত সদস্যগণের অভিভাবক হওয়া চাই।

স্কুল-কমিটির কাজ :—

এখানে বলিতে হয় যে ডেনমার্কের আবশ্যিক বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়ে না পাঠাইয়া বাড়ীতে রাখিয়া পড়াইবার সুযোগ আইনে আছে। স্কুল-কমিটিকে দেখিতে হইবে যে সকল শিশু বিদ্যালয়ে যোগ দেয় তাহাদের শিক্ষা স্কুল টার্গেটের সমান কিনা। এই কমিটির অন্যান্য কর্তব্যগুলি এইরূপ :

(ক) চৌদ্দবৎসর পূর্ণ হইলে বিদ্যার্থী বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে পারে।

(খ) পরবর্তী শিক্ষার নির্দেশ স্থির করা।

(গ) বাৎসরিক রিপোর্ট তৈরি করা।

(ঘ) বিদ্যালয়ের স্থান বা বাড়ীঘরের সংস্কার সাধনের কাজ করা :

(৪) বিদ্যালয়ের চিকিৎসক, দাঁত চিকিৎসক ও বিদ্যালয়ে যোগ্য পরিবেশন সম্পর্কে করণীয় কালের রীতি স্থির করা।

স্কুল-বোর্ডের কাজ

(১) প্রতিটি বিদ্যার্থী বিদ্যালয়ে রীতিমত যোগ দিতেছে কিনা তাহা দেখা।

(২) বিদ্যালয়ের শিক্ষার স্কীম তৈরি করা।

(৩) নূতন আসবাবপত্র ও বিদ্যালয় গৃহের সম্প্রসারণ ও উন্নতি বিধান করা।

(৪) নূতন বই ও শিক্ষাসহায়ক সামগ্রীর লিষ্ট তৈরি করা।

(৫) ছাত্রদের টেষ্ট লওয়ার স্কীম করা।

(৬) বিদ্যালয়ের বাৎসরিক কার্য বিবরণী তৈরী করা।

(৭) শিক্ষকতার পদপ্রার্থীদের আবেদন গ্রহণ করা এবং নিজেদের মতামত স্কুল-কমিটিতে প্রেরণ করা।

(৮) নূতন শিক্ষক নির্বাচন এবং কোন শিক্ষকের পদত্যাগ ব্যাপারে কমিটি ও বোর্ড একযোগে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বোর্ডের মিটিং-এ শিক্ষকের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন কিন্তু ভোট দান করেন না।

স্কুল বোর্ডগুলি স্কুল-কমিটির অধীনে এবং স্কুল-কমিটিগুলি কাউন্টি কাউন্সিলের অধীনে আর কাউন্টি কাউন্সিল শিক্ষামন্ত্রের নির্দেশমত কাজ করেন। কাউন্টি কাউন্সিলকে সাধারণ বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য পৃথক পরামর্শ দাতা থাকেন।

অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার ও সান্ধ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

অবসর সময়ে জ্ঞানের পরিধি বাড়াইবার জন্য একাধিক রকমের সান্ধ্য-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ডেনমার্কে আছে। বহুলোক প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয় এবং নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে। এই সকল প্রতিষ্ঠানে যোগ দিবার মূলে রহিয়াছে—নিজেদের জীবনকে সমৃদ্ধতর বা পূর্ণতর করিয়া তোলার আকাঙ্ক্ষা। হলবেক্ (Holbaek) শহরে আমার বন্ধু কলেজের অধ্যাপক শ্রীহেসেলের জনসেন একটি সান্ধ্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। ডেনমার্কের শিক্ষামৈত্রিক জীবনে সান্ধ্য-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতার কথা তাঁহার মাধ্যমেই প্রথম জানিতে পারি। সাধারণত দুই প্রকারের বিদ্যালয় আছে, যথা—সান্ধ্য সাধারণ বিদ্যালয় ও সান্ধ্য উচ্চ বিদ্যালয়।

আবশ্যিক শিক্ষা সমাপ্তির পর যাহারা কোন পেশা শিখিয়া জীবনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তাহারা নিজের সাধারণ জ্ঞানের পরিসর বাড়াইবার জন্য সাধারণ সান্ধ্য বিদ্যালয়ে যোগ দেয়। বস্তুতঃ এ সকল বিদ্যালয়কে continuation evening school বলা যায়। এ সকল বিদ্যালয়ে যে সকল বিষয় শিখাইবার ব্যবস্থা আছে তাহা পুস্তিকাকারে বিনামূল্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপরের শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের দান করা হয়। ১৯৪৯-৫০ সালে প্রথম শহর কোপেন হোগেনে ৩২,৫০০ ছেলেমেয়ে সান্ধ্য বিদ্যালয়ে যোগ দিয়াছিল। এ ধরণের শিক্ষায়তনে শিক্ষণীয় বিষয় এইরূপ (১) ডেনিশ ভাষা (২) ভাষার ইতিহাস (৩) সাহিত্য (৪) জার্মান ভাষা, (৫) ইংরাজী (৬) ফরাসী (৭) রাশিয়ান (৮) ইটালিয়ান (৯) স্পেনিস (১০) সুইডিশ (১১) সর্টহ্যাণ্ড (১২) ইংরাজী ও জার্মান সর্টহ্যাণ্ড (১৩) হিসাব রক্ষকের কাজ (১৪) টাইপ রাইটিং (১৫) রন্ধনবিদ্যা ও পাক প্রস্তুত প্রণালী, (১৬) গৃহবিজ্ঞান (১৭) পোষাক তৈরি (১৮) ড্রইং ও ডিজাইনিং (১৯) জিমন্যাষ্টিক (২০) কাঠের কাজ (২১) বই বাঁধানোর কাজ। শেষোক্ত তিনটি বিষয় গৌণ। অন্য বিষয়ের সঙ্গে শিখিতে হয়। ভাষা ও ইতিহাস সকলকেই শিখিতে হয়।

সান্ধ্য উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে হইলে বয়স অন্ততঃ একুশ হওয়া চাই। এ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষণীয় বিষয় এইরূপ :—(১) ইতিহাস (২) সমাজ

বিজ্ঞান (৩) ডেনিশ সাহিত্য (৪) পরিবার তত্ত্ব (৫) মনোবিজ্ঞান (৬) শিশুর মনো-বিজ্ঞান (৭) আপন শহর ও চতুষ্পার্শ্বের পূর্ণতর জ্ঞান (৮) সংস্কৃতির ইতিহাস (৯) আর্টের ইতিহাস (১০) সঙ্গীতের ইতিহাস (১১) ধর্মের ইতিহাস (১২) সঙ্গীত-শিক্ষা (১৩) দর্শন (১৪) বিশ্ব-সাহিত্য (World Literature) (১৫) বিশ্বের রাজনীতি (world politics) (১৬) আধুনিক ইতিহাস (১৭) Atom physics (১৮) Everyday Law (১৯) Social Laws of Denmark (২০) Biology (২১) The Science of heredity etc.

অক্টোবর হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত উপরোক্ত বিষয়ে ক্লাশ হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে সান্ধ্য বিদ্যালয়ের রূপ বদলাইয়া যায়, তখন বাগবাগিচা রচনা সম্পর্কে হাতে কলমে কাজ শেখান হয়, তাত্ত্বিক জ্ঞানও দেওয়া হয়।

উপরে যে সকল বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে ইহাদের যে কোন বিষয় শিখিবার সময় অঙ্ক ও রচনা লেখার পদ্ধতিও শেখান হয়। সান্ধ্য-বিনোদন শিক্ষা পরিচালনা করা হয় পার্লামেন্টের সর্বশেষ আইন অনুসারে। এই আইন ১৯৪৮ সালের ২৪শে মে পার্লামেন্টে পাস করা হয়।

পেশাজ্ঞানবিহীন তরুণদের বিদ্যালয়

আবশ্যিক শিক্ষা সমাপ্তির পর যে সকল তরুণ পেশাজ্ঞানের অভাবে কাজকর্ম না পাইয়া বেকার হয়, তাহাদের শিক্ষার জন্য একটি কমিশন বসিয়াছিল। সেই সকল তরুণদের জীবন কর্মজ্ঞানের মাধ্যমে যাহাতে পূর্ণতর হইয়া উঠিতে পারে সেই বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সান্ধ্য সাধারণ বিদ্যালয়, সান্ধ্য উচ্চ বিদ্যালয় ও তরুণদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা, ছাত্রসংখ্যা ইত্যাদির হিসাব নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

অঞ্চল	সান্ধ্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ক্লাশের সংখ্যা	বিদ্যার্থীর সংখ্যা	পাঠের সংখ্যা	সরকারী সাহায্যের পরিমাণ
প্রধান শহরে	১১	২,২৮২	৪৮,৫১৩	১৭০,২৭০	
প্রাদেশিক শহরে	২৬৩	৫,৭১৬	৮২,৫৬১	২৩১,০৩৩	২৭৬৬,০০০ ক্রাউন
পল্লী অঞ্চলে	৪,৬৪২	৮,৮৬১	১২৯,৭৬৭	৪১৬,০২৪	
মোট	৫,১১৬	১৫,৮৫১	২৬০,৮৪১	৮৬২,৪২৭	২৭৬৬,০০০
	তরুণদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা				
	১০২	৩৪১	৬,১৪০	৪৩,৬৩১	৩৫০,০০০

স্বাধীন ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্রের সকল স্তরের শিক্ষাসৈতিক জীবনকে সজীব ও প্রগতিসম্পন্ন করিয়া তোলার উপরই দেশের সংস্কৃতির মান নির্ভর করে। ইউরোপের ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র ডেনমার্কে সার্বজনীন শিক্ষার ধারা ও প্রগতি উল্লেখযোগ্য এবং তাহা আমাদের দেশের শিক্ষাব্রতীকে অনুপ্রেরণা জাগাইতে পারে মনে করিয়াই এ বিষয়ের আলোচনা করিলাম। উপরে যে পরিসংখ্যান দেওয়া হইল তাহা ১৯৪২ সালে প্রকাশিত সরকারী রিপোর্ট হইতে গৃহীত।

———

আচার্য বাণী

"আমি বাঙ্গালী, সুজলা সুফলা বাংলা দেশকে আমি ভালবাসি। বাঙ্গালী সবল হউক, সুস্থ হউক, আপনার পায়ে আপনি নির্ভর করিয়া দাঁড়াক, ইহাই আমি নিরন্তর কামনা করি।

* * * *

"বাঙ্গালীর দৈহিক পরিশ্রমের ক্ষমতা আছে। বিদ্যাবুদ্ধিও আছে এবং অন্যান্য গুণাবলীও যাহা আছে তাহার দ্বারা বাঙ্গালী পৃথিবীর মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ জাতি হইতে পারে।"

অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ

স্বামী সিদ্ধানন্দ

সংকলিত

মূল্য ঃ ১·৫০ এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

স ৎ ক থা

স্বামী সিদ্ধানন্দ

কর্তৃক সংগৃহীত

মূল্য ঃ ২৲ দুই টাকা

উদ্বোধন কার্যালয়, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৯শ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৬৮ | ১১শ সংখ্যা

আলোচনা

শিক্ষকপ্রয়াণ

অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদারের অন্তর্ধানবার্তিকীর পর আমরা যে সকল শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ হারাইয়াছি তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কথা সবগ্রে স্মরণীয়। খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় প্রেসিডেন্সি কলেজে ও অন্যান্য কলেজে দর্শনের খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন, এবং বাংলার সংস্কৃতির এক প্রধান শাখা—কীর্তন-সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি দীনেশবাবুর মৃত্যুর পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার সৌজন্য ও বৈষ্ণবসাহিত্যে পারদর্শিতা শিক্ষকজগতে তাঁহাকে এক বিশিষ্ট স্থানে বসাইয়াছিল।

বাংলা দেশে স্যর জন সার্জেন্ট

স্যর জন সার্জেন্ট ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ পর্বে শিক্ষা বিষয়ে উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহাকে পশ্চিম বাংলার শিক্ষণব্যাপার পর্যবেক্ষণ করিয়া যথোচিত পরামর্শ দিবার জন্য পুনরায় আনা হইয়াছে। যুদ্ধোত্তরকালীন শিক্ষাসংগঠনের সময় বিশেষ করিয়া খরচের দিকটা তিনি দেখাইয়াছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি টাকার অঙ্কে হিসাব করিতেও শিখাইয়াছিলেন, অর্থাৎ পরিকল্পনার টাকার বহরটা তিনি সামান্য করিয়া দেখান নাই।

সম্প্রতি দার্জিলিং-এ সেণ্ট পল্‌স্ স্কুলে তিনি বলিয়াছেন, বহুদিন অনুপস্থিতির পর দেশময় তিনি নবজাগরণের চিহ্ন দেখিতেছেন; কিন্তু একটা হইবে সর্বত্র এইরূপ আশার সঞ্চার হইয়াছে, তাড়াতাড়ি কিছু করা চাই এইভাব জাগিয়াছে; কিন্তু প্রশ্ন এই, অগ্রগতির পথে সকলকে কি পাওয়া গিয়াছে, সকলে কি একদিকেই চলিতেছি? ভাবিতে হইবে, দেশের নেতৃবৃন্দ চিরজীবী হইয়া আসেন নাই। নূতন নূতন নেতা চাই। দেশের সমর্থ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব চাই। উচ্চশিক্ষার অন্যরূপ উদ্দেশ্য হইল এইরূপ দেশনেতা গঠন করা। যে স্কুল উচ্চশিক্ষা দানের দায়িত্বগ্রহণ করিবে, সে স্কুলের ছাত্রদের মধ্য হইতে এরূপ নেতার আবির্ভাব আশা করিব, স্কুলকেও সেজন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

লজ্জার কথা

ছাত্র-দুর্বিনয়ের অনেক কথাই আমরা শুনি, কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতার এক প্রাচীন ও প্রথমশ্রেণীর কলেজে যেরূপ দুর্বিনয়ের সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে দেশবাসী সকলের লজ্জায় মাথা হেঁট হইবার কথা। কোনও ছাত্রকে উপরের ক্লাসে নিতে হইবে এই দাবিতে অধ্যক্ষকে জোর করিয়া আটক করিয়া রাখা, এবং অধ্যাপকদের উপর বলপ্রয়োগ করা—আমাদের দেশে দুর্বিনয়ের ইতিহাসে এরূপ কখনও শোনা বা পড়া যায় নাই। অধ্যাপকেরা একজোট হইয়া ছাত্রদের ক্ষমা প্রার্থনা না করা পর্যন্ত পড়ানো বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, খুবই সমীচীন হইয়াছে। গুরু, শিক্ষক, অধ্যাপক—যদি ছাত্রদের নিকট ইঁহাদের মান সম্ভ্রমই গেল, তবে ইঁহাদের রহিল কি? ব্যাপারটি এতই গুরুতর ও লজ্জাকর যে এবিষয়ে আর কিছু লেখা বা বলাও চলে না। দেশের দুর্ভাগ্য যে কত বেশি, ভবিষ্যৎ যে কত অন্ধকারময়, ইহা ভাবিয়া বিষণ্ণ হইতে হয়।

শিক্ষক সংবর্ধনা

সেই দেশের ভবিষ্যৎ ভাল, শিক্ষকেরা যেখানে সমাদৃত। পূর্ব পূর্ব বৎসরের মত এবারও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষকেরা পুরস্কৃত হইয়াছেন। আমাদের গ্রাহকদের মধ্যে জগবন্ধু ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় পুরস্কৃত প্রধান শিক্ষকদের প্রথমে উল্লেখযোগ্য, সেজন্য আমরা বিশেষভাবে আনন্দিত। বীরভূম জেলার অবিনাশপুরের সদ্য-অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রীহরকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুরস্কার প্রাপ্তিতেও আমরা আনন্দিত—গত সংখ্যায় তাঁহার প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের সংবর্ধনার কথা আমরা প্রকাশিত করিয়াছিলাম—দেখা যাইতেছে, বীরভূম জেলার কোন কোন প্রধান শিক্ষক নিজেদের আচরণের দ্বারা ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও পূজা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন। অন্ধকারের মধ্যে এখানেই আলোক-রশ্মি দেখিতে পাওয়া যায়।

———

উচ্চশিক্ষার সঙ্কট

ডক্টর শ্রীললিত কুমার মুখোপাধ্যায়

একবার তুনিয়াহিসাম এক রোগীর কণ্ঠদেশে একটি বৃহদাকার আব হওয়ায় সে শল্য চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যায়। চারিজন খ্যাতনামা শল্য চিকিৎসক (Surgeon) তাহার চিকিৎসা করিতে উৎসুক হন, কিন্তু প্রত্যেকের প্রণালী ছিল বিভিন্ন। অবশেষে প্রত্যেককেই নিজ নিজ প্রণালী মত শল্যচিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হইল। দুঃখের বিষয়, এই সমবেত প্রচেষ্টা রোগীর সহ্য হইল না এবং অপারেশন টেবিলেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

আজ ভারতের উচ্চশিক্ষার বর্তমান সঙ্কটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমার এই গল্পটিই মনে পড়িতেছে। উচ্চ শিক্ষার প্রণালীতে যে অনেক ত্রুটি বর্তমান তাহা কেহই অস্বীকার করে না, তবে সংশয় শুধু আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের খ্যাতনামা শল্যচিকিৎসকদের ব্যবস্থা কার্যকরী হইবে কিনা।

প্রথম শ্রেণীর শল্যচিকিৎসক মনে করেন, আমরা বর্তমানে যে দুই বৎসর পড়াইয়া বি. এ ডিগ্রী দিই তাহা অনুপযুক্ত, ও তাহার সময় বাড়াইয়া তিন বৎসর করা উচিত। ডিগ্রীর সময় বাড়াইবার দাবী বহুদিন হইতে হইয়াছে। বিলাতে ও ফ্রান্সে তিন বৎসরের পর ডিগ্রী দেওয়া হয়। কাজেই স্বাধীনতালাভের পর ভারতেও ইহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত, অনেকেই এই মত প্রকাশ করিলেন। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন স্থাপিত হয়, তাহাতে এই ডিগ্রীর সময় বাড়াইয়া তিন বৎসর করিবার ব্যবস্থা হয়, তবে তাহার জন্য ডিগ্রীর পূর্ববর্তের পাঠ্যের যাদ কোন রূপে হ্রাস না করাই সিদ্ধান্ত হয়। এই নির্ধারণ হয় সাধারণ (Pass) ও বিশেষ (Honours) উভয় শ্রেণীর জন্য। ডিগ্রীর পাঠ তিন বৎসর হইবে কিন্তু বিশেষ শ্রেণীর ছাত্রেরা এক বৎসর পরে, ও অপরে দুই বৎসর পরে, এম্‌এ পাশ করিতে পারিবে। এই উপায়ে সাধারণ ছাত্রের পাঠ্য সময় এক বৎসর বৃদ্ধি পাইবে। ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উঠিতে না উঠিতেই ডাক্তার মুদালীয়ারের নেতৃত্বে অপর এক কমিশন স্থাপিত হইল, যাহা দ্বারা তাঁহারা সমগ্র পাঠ্যসময় না বাড়াইয়াই অন্যান্য সাধন করিলেন। এই কমিশনের মতে ভিত্তি হইতে কয়েকখানি ইট লইয়াই একটা উপর তলার নির্মাণ হইতে পারে। মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ এক বৎসর সংক্ষেপ করিলেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অতিরিক্ত এক বৎসরের সংস্থান করিতে পারিব।

বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে যাহাই হউক, একজন আনাড়ীর চক্ষে এই প্রচেষ্টা ফলদায়ী মনে হয় না। যদি আমাদের ছাত্র ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া বা আমেরিকার ডিগ্রীধারী হইতে কম যোগ্য প্রতিভাত হয়, তবে তাহার কারণ সমগ্র পাঠ্যসময়ের স্বল্পতা। তাহারা যতদিন বিদ্যালয়ে পড়ে আমাদের বিদ্যার্থী ততদিন পড়ে না। পাঠ্যতালিকার হেরফের করিলে কোন লাভ তো হইবেই না বরং ক্ষতি হইবার সম্ভাবনাই অধিক। ক্ষতি হইবার কথা এইজন্য বলি যে, উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য একটা পরিণত বয়সের প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ বৎসরের কম বয়সের শিক্ষার্থী ভর্তি হইতে পারিত না। বর্তমানে ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজে ভর্তি হইবার নিম্নতম বয়স ১৮। ফ্রান্সে ও আমেরিকাতেও নিম্নতম বয়স ১৮র

নীচে নহে। আজ বর্তমান ভারতে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ১৭ বা তাহারও নিম্নে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাস হইয়া বি. এ ক্লাসে ভর্তি হয় ও নবীন ব্যবস্থায় ১৬ বা তাহার নিম্নতর বয়সের বিদ্যার্থী উচ্চশিক্ষার অর্থাৎ বি. এ শিক্ষার দ্বারে প্রবেশ করিবে। এই অপরিণত বয়স উচ্চশিক্ষার পক্ষে অনুকূল হইবে কি? সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবিতে হইবে, বহুদিন ধরিয়াই ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষার পাঠক্রম এরূপ সংযোজিত হইয়াছে যে ইণ্টারমিডিয়েট পাস করা প্রয়োজন। নবীন পদ্ধতিতে তাহাতে বাধা পড়িবে, আর কোনরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থারূপ জোড়া-তালির দ্বারা তাহার সমাধান সম্ভব হইবে না। বর্তমানে যে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের পাঠক্রম দেখিলে একটা বিশৃঙ্খলারই পরিচয় পাই। কোন কোন রাজ্যে স্কুলের দশম শ্রেণীর পাঠক্রমের উপর অল্পই যোগ হইয়াছে ও ছাত্রদের এই অতিরিক্ত বৎসর একেবারেই নষ্ট হইতেছে। কোন কোন রাজ্যে আবার এত অধিক বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে যে ছাত্রেরা কিছুই শিখিতেছে না। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার মান বর্তমান উচ্চমাধ্যমিক প্রথার দ্বারা বৃদ্ধি না পাইয়া বরং হ্রাস পাইয়াছে। এই নিম্নতর মানের ভিত্তির উপর যে উচ্চশিক্ষার অট্টালিকা আমরা নির্মাণ করিতে যাইতেছি তাহা পূর্বের অপেক্ষা কম সুদৃঢ় হইবে এ আশঙ্কা অমূলক নহে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শল্যচিকিৎসক উচ্চশিক্ষার ভাষার মাধ্যম পরিবর্তনে বদ্ধপরিকর। তাঁহারা প্রথমতঃ মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদানের প্রবক্তা। জাপানের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলেন, সেখানে যদি মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রদান সম্ভব হয় তবে ভারতে কেন হইবে না। এ যুক্তির সারবত্তা তখনই স্বীকার করিব যখন দেখিব যে জাপানের অনুরূপ ভারতেও একটি মাত্র প্রচলিত ভাষা আছে ও সেই ভাষার উপযুক্ত পুস্তকের অভাব নাই। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাহা কি সত্য? সমগ্র ভারতে ১৫টি আঞ্চলিক ভাষা আছে ও তাহারা প্রত্যেকে সমানভাবে পুষ্ট নহে। তাহাদের প্রত্যেককে স্থানীয় উচ্চশিক্ষার বাহন করিলে আমরা যেমন একদিকে উপযুক্ত পুস্তকের অভাবে অধিকাংশ স্থলে শিক্ষার মান হ্রাস করিতে বাধ্য হইব, অপরদিকে আমরা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও পরস্পরের ভাব বিনিময়ে অসমর্থ হইব। ইংরাজি ভাষা অবশ্য ভেদনীতি পুষ্ট করিবার জন্যই ভারতে প্রচলন করা হয়, যাহাতে ইংরাজি শিক্ষিত ও অপর জনসাধারণের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে একটা একতা আনে, যাহার ফলে জাতীয় চেতনার উদ্ভব হয়। ভাষাভিত্তিক এই একতা কি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার পুনঃ প্রচলনে নষ্ট হইবে না?

পক্ষান্তরে একমাত্র হিন্দী ভাষাই এমন একটি ভাষা যাহা ১৬ কোটী অধিবাসীর মাতৃভাষা এবং আরও দশ বার কোটী ইহা কষ্টকটা বুঝিতে পারে। কিন্তু অন্ততঃ ১৪ কোটী লোক যাহারা অধিকাংশ দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী, ইহা একেবারে বোঝে না। তাহা ছাড়া এই ভাষার দৈন্যও সুপরিস্ফুট। সমগ্র দেশের জাতীয় ভাষা হইয়া উচ্চ-শিক্ষার মাধ্যম হইতে গেলে, একদিকে যেমন ইহার প্রচার বৃদ্ধি করিতে হইবে, অন্যদিকে তেমনি উপযুক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা ইহাকে সুপুষ্ট করিতে হইবে। সহসা শুধু ভাষার পরিবর্তন দ্বারা উচ্চশিক্ষার মান-বৃদ্ধির প্রয়াস একটা ব্যর্থ প্রহসনে পরিণত হইবে। কাজেই দ্বিতীয় শল্যচিকিৎসকের নির্দেশও উচ্চ-শিক্ষার বর্তমান রোগ দূর করিতে অসমর্থ।

তৃতীয় শ্রেণীর শল্যচিকিৎসকের মতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ত্রুটির মূলে হইল অযোগ্য ছাত্রের সমাবেশ। যাহারা উচ্চশিক্ষা পাইবার যোগ্য নহে তাহারা যদি শিক্ষারম্ভেই ভিড় জমায়

তবে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইল শিক্ষার মান হ্রাস পাওয়া। শিক্ষক শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অনুযায়ীই শিক্ষা দিবেন। অতএব এই অবস্থার প্রতিকার হইল যাহারা তৃতীয় বিভাগে পাস করিয়াছে তাহাদের জন্য পরবর্তী স্তরের শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হওয়া উচিত। এই নিয়ম অনুসারে যাহারা ইণ্টারমিডিয়েট বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীতে পাস করিল তাহারা ডিগ্রী ক্লাসে প্রবেশলাভ করিতে পারিবে না, আর যাহারা তৃতীয় শ্রেণীতে বি. এ পাস করিবে তাহারা এম্. এ পড়িবার অযোগ্য বিবেচিত হইবে।

একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কিন্তু তাহার সাধারণ বুদ্ধিতে এই নীতির মধ্যে ত্রুটি দেখিতে পায়। প্রথমত ইহার ফল হইবে, তৃতীয় শ্রেণীর সম্পূর্ণ বর্জন, কারণ তৃতীয় শ্রেণীতে যাহারা পাস করিল তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, পক্ষান্তরে ফেল করা বরং ভাল, কারণ আগামী বর্ষে হয়ত ভাল বিভাগ পাইবার আশা আছে। তাই দেখি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই তৃতীয় শ্রেণী বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তৃতীয় শ্রেণী বর্জনের ফল হইবে, পাসের সীমারেখা আপাতদৃষ্টিতে কিছু উপরে উঠিবে। আপাতদৃষ্টি এইজন্যই বলিলাম কেন, ৩৩ বা ৩৬ কিম্বা ৪০ বা ৪২ এই সংখ্যাগুলির মধ্যে বিশেষ কোন বাছবিচার নাই ও শিক্ষার গুণমের মত নির্ভুল সংখ্যা কোন পরীক্ষকই দিতে সমর্থ নহেন। পরীক্ষকের বিচার অনুযায়ী সাধারণ উত্তরের একটা মানদণ্ড থাকে। যাহারা সেই মানদণ্ডের অপেক্ষা ভাল করে তাহারাই পাস হয় ও যাহারা তাহার অপেক্ষা খারাপ লেখে তাহারাই ফেল হয়, প্রত্যেকটি প্রশ্ন বিচারের সময় এই মানদণ্ড কার্যকর হয়। পরীক্ষার ফল সংখ্যা-বিজ্ঞানের ধারা অনুযায়ী সাধারণ সম্ভাব্য চক্রেরই (Normal Probability Curve) আকার ধারণ করে, যাহার মধ্যরেখা হয় পাসের নম্বর। তাই দেখিতে পাই, পাসের নম্বরের দুই পাশে অনেকগুলি ছাত্রের সমাবেশ, যাহারা হয় অল্পের জন্য পাস করে বা অল্পের জন্য ফেল হয়। মধ্য-রেখা হইতে যতই দূরে যাইব, ততই ছাত্রের সংখ্যা বিরল হইতে থাকিবে। আজ যে সমাবেশ আমরা ৩৩ বা ৩৬ নম্বরের আশপাশে দেখিতেছি, কাল তাহাই দেখিব ৪০ বা ৪২এর কাছাকাছি। কাজেই আজ যে তৃতীয় বিভাগের বহিষ্কারের সমস্যা আছে কাল তাহাই দ্বিতীয় বিভাগের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে।

তাহা ছাড়া আরও একটা প্রশ্ন আছে। যে প্রণালীতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইতেছে তাহার বহু ত্রুটি হার্টগ (Hartog), রোডস (Rhodes), উড্ (Wood), ভ্যালেন্টাইন (Vallentine) প্রভৃতি দেখাইয়াছেন। পরীক্ষকের বিচার সর্বদা নির্ভুল নহে। এই বিচারের উপর নির্ভর করিয়া তৃতীয় বিভাগে যাহারা পাস করিল তাহাদের জন্য পরবর্তী শিক্ষার দ্বার চিরতরে রুদ্ধ করিবার নীতি কত দূর যুক্তিসঙ্গত তাহাতে মতভেদ আছে। সকল করিয়া যে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করিল ও সাধু ভাবে পরীক্ষা দিয়া যে তৃতীয় বিভাগে পাস করিল, তাহাদের মধ্যে কে যোগ্যতর তাহা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না।

চতুর্থ শ্রেণীর শত্রু চিকিৎসকের মতে আমাদের যাবতীয় রোগের মূলে হইল বিশ্বালয়ের অব্যবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অনেক অযোগ্য শিক্ষক প্রবেশ করিয়াছেন আর তাহার ফলেই শিক্ষার মান এত নীচে নামিয়াছে। ইঁহারা তাই চাহেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার যতটা সম্ভব খর্ব করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সরকারী আয়ত্তের মধ্যে আনিতে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কতটা থাকা দরকার, তাহার সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। সমাজের দাবীকে উপেক্ষা করিয়া সামাজিক

প্রয়োজন অনুসারে আপন শিক্ষা ও সংগঠনের ধারাকে উপেক্ষা করিয়া কোন সংস্থাই টিকিতে পারে না। স্বাধীনতা যতই কাম্য হউক, তাহারও সীমারেখা সুনির্দিষ্ট প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি যে পরিমাণ স্বাধীন ছিল সে পরিমাণ স্বাধীনতা কোন দেশে কোন কালে কেহ ভোগ করে নাই। ঐ সকল বিদ্যালয় শুধু রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব হইতেই মুক্ত ছিল না, আর্থিক প্রয়োজনেও জনসাধারণ বা ছাত্রদের নিকট হইতে শুল্ক লইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। শুরুশীলা বিশ্ববিদ্যালয় সামান্য শুল্ক গ্রহণ করিলেও, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১০৪টী গ্রামের আয় নির্ধারিত ছিল। এই আয় হইতেই শিক্ষক ও বিদ্যার্থীর যাবতীয় প্রয়োজন নির্বাহ হইত। বাহির হইতে সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না, আর সাহায্য না লইবার কারণে বাহিরের কোন শক্তিই অন্ততঃ শেষের দিকে তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিত না। কিন্তু এই স্বাধীনতার ফল কি হইল?

যতদিন বৌদ্ধ সংঘের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল ততদিনই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবের উচ্চ শিখরে আরূঢ় ছিল। ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম বিদায় গ্রহণ করিলেও, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থিক স্বাধীনতার জন্য টিকিয়া ছিল, কিন্তু তাহার শিল্পকলা বা দর্শনের ঘোর অবনতি দেখা যায়। গুপ্তচর্চার প্রভাবে যেমন দর্শনের অবনতি হয়, তেমনই শিল্প চর্চার মধ্যে আমরা দেখি হীন যৌন আবেদন। ১১৯৭ সালে যখন বখ্‌তিয়ার খিলজী কাশী ও নালন্দা ও নবদ্বীপের শিক্ষায়তনগুলিকে বিনষ্ট করেন তখন কাশী ও নবদ্বীপ পুনরুত্থান করিলেও নালন্দা আর উঠিতে পারিল না, কারণ তাহার প্রাণশক্তি বহু পূর্বেই বিনষ্ট হইয়াছিল। তাই অনেকে আজিকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বাধীনতা খর্ব করিয়া তাহাদের অধিক-তরভাবে রাষ্ট্রকর্তৃত্বাধীন করিতে চাহেন যাহাতে তাহাদের সহিত বর্তমান সমাজের সংযোগ অব্যাহত থাকে।

অপর পক্ষে ইহার বিরুদ্ধেও অনেক কথা বলিবার আছে। কতকটা স্বাধীনতা না দিলে, বিশ্ববিদ্যালয় নির্ভীকভাবে বর্তমানের ত্রুটিগুলির সমালোচনা করিয়া তাহাদের সংশোধন বা পরিবর্তনের ইঙ্গিত করিতে পারিবে না। বড় বেশী সরকারী নিয়ন্ত্রণ উচ্চ শিক্ষার সম্যক বিকাশের অন্তরায়। খানিকটা স্বাধীনতা দিতেই হইবে, তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহা দেখিতে হইবে, যাহাদের হাতে এই ক্ষমতা দেওয়া হইল, তাঁহারা যেন ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া দলাদলির প্রশ্রয় না দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারীবৃন্দের সুনির্বাচনের দ্বারাই এই দলাদলি ও অব্যবস্থার অবসান ঘটিতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ক্লীব বা জড় করিয়া নহে।

অতএব আমরা দেখিতেছি পূর্বোক্ত চারিশ্রেণীর শল্যচিকিৎসকের চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। একজন অনভিজ্ঞ যদি এ সময় তাহার নিজের মত ব্যক্ত করিবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে, তবে হয়ত কেহ বলিবেন "বড় বড় হাতী গেল তল, মশা বলে কত-খানি জল।" কিন্তু অনভিজ্ঞ তাহার স্বপক্ষে শতাধিক বর্ষ পূর্বে জার্মানীর লাইপ্‌জিগ (Leipzig) সহরের এক নাপিতের উদাহরণ দিতে পারে। এই নাপিতটি এনাটমী (Anatomy) না জানিয়াও এত সুন্দর শল্য চিকিৎসা করিত যে বড় বড় শল্য চিকিৎসকের ব্যবসায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহারা পরামর্শ করিয়া তাহাকে এনাটমী শিখাইলেন, যাহার ফলে তাহার শল্য চিকিৎসার শক্তি চিরতরে নষ্ট হইল।

অনভিজ্ঞ মনে করে, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির সমস্যা একমুখী নহে বহুবিধ। শিক্ষার মান বাড়াইতে হইলে আমাদের সময় বাড়াইতেই হইবে। বিদেশের বিদ্যার্থী যে বয়সে এম. এ. পাস করিয়া পাঠ সাঙ্গ করে, ভারতের বিদ্যার্থী তাহার অন্ততঃ দু'বৎসর পূর্বে তাহা সাঙ্গ করে। ইহার প্রতিকারের জন্য বি. এ. ডিগ্রী লাভের পড়াকে দুই বৎসরের স্থলে

তিন বৎসর করা যুক্তিসঙ্গত। তবে তাহার অর্থ মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠক্রম হ্রাস করিলে কোন লাভতো' হইবেই না বরং লোকসানই হইবে। ইণ্টারমিডিয়েট অবধি শিক্ষা-ধারাকে অব্যাহত রাখিয়াই এই সময় বাড়াইতে হইবে। এই বাড়তি এক বৎসর ব্যয়-সাপেক্ষ; রাষ্ট্রের ও অভিভাবক উভয় পক্ষেরই। ইহাকে প্রচলিত করিতে হইলে, প্রথমে প্রচার দ্বারা ইহার সপক্ষে জনমত সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহার পর প্রত্যেক রাজ্যে প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগে ইহার ব্যবস্থা করিবার জন্য দায়িত্ব বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ ও বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা-মন্ত্রীকে লইতে হইবে।

তাহার পর আমাদের ভাষাসমস্যার দিকে দেখিতে হইবে। ইংরাজির মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা দান করা হয়ত অস্বাভাবিক; তবে তাহার স্থানে ১৫টী আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারও দূরদর্শিতার চিহ্ন হইবে না। একটী ভাষাকে ভারতের জাতীয় ভাষা করিতে হইবে, তবে তাহাকে ঐ মর্যাদা দান করিবার পূর্বে আমাদের দেখিতে হইবে যে ঐ ভাষাটীর সম্যক সাধন হইয়াছে কিনা। যদি তাহাতে প্রামাণ্য পুস্তকের অভাব থাকে, তবে সর্ব প্রথমে প্রামাণ্য পুস্তক সঙ্কলন করিতে হইবে। রাষ্ট্র আনুকূল্যেই তাহা সম্ভব। আমরা যদি রাতারাতি একটা ভাষাকে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম করিয়া ফেলি ও তাহার পর আশা করি যে ব্যবসায়িক প্রয়োজনেই সাহিত্য সৃষ্টি হইবে, তবে শুধু নিম্ন শ্রেণীর অক্ষম অনুবাদই দেখিতে পাইব। এই অনুবাদগুলি কিন্তু বাজারে টিকিয়া যাইবে; একারণে নহে যে তাহারা ভাল, বরং এ কারণে যে তাহারা সুলভ। অর্থশাস্ত্রে গ্রেসামের (Gresham's Law) নিয়ম অনুসারে যেমন খারাপ মুদ্রাগুলির প্রচলন বাড়ে ও ভাল মুদ্রার বিলোপ সাধন হয়, তেমনি পুস্তকের বাজারে দেখা যাইবে, ভাল পুস্তক কোণঠাসা হইয়াছে ও খারাপ পুস্তক তাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

যে ভাষাকে মাধ্যম করিব তাহা অখিল ভারতীয় ভাষা যাহাতে হইতে পারে তাহার জন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রচার কার্য চালাইতে হইবে। সম্যক পুষ্টি ও ব্যাপকতা লাভ করিবার পরই আমরা উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইব। তাহার পূর্বে তাড়াতাড়ি করিলে আমাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইবে।

উচ্চ শিক্ষার মন্দিরে আজ এমন বহু ছাত্র প্রবেশ করিয়াছে যাহারা উচ্চ শিক্ষালাভের অযোগ্য, এ অভিযোগ সর্বসম্মত। ১৯৪৭ সালে উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রে যত শিক্ষার্থী ছিল বর্তমানে তাহার সংখ্যা দ্বিগুণেরও অধিক, পক্ষান্তরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাড়ে তিন গুণ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা মাত্র আড়াই গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। উচ্চ শিক্ষায় যত অধিক ছাত্র আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে সকলে যে উচ্চ শিক্ষা লাভের যোগ্য নহে, তাহা মানিতেই হইবে। তবে কেন তাহারা আসিতেছে? ইহার কারণ ইহা নয় কি যে মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তে তাহাদের জন্য উপযুক্ত রোজগারের পথ নাই? তাই বেকার হাইস্কুল বা ইণ্টারমিডিয়েটের ফলে আজ আমরা দেখিতেছি বেকার গ্রাজুয়েট বা বেকার এম. এ!

পাস নম্বরের হার বাড়াইয়া অথবা কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য প্রবেশ পথ উন্মুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিলে, এই সংখ্যার সাময়িক হ্রাস হইবে মাত্র ও কিছু সংখ্যক অনুপযোগী ছাত্র হয়ত প্রথম কিছুদিন আসিতে বাধা পাইবে, কিন্তু পরে আমরা উত্তরোত্তর নূতন নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইব। এই অবস্থার একমাত্র প্রতিকার, মাধ্যমিক শ্রেণীতেই উপযুক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া উচ্চ শিক্ষার অনুপযুক্ত বিদ্যার্থীর জন্য অন্য ব্যবস্থা করা। আজ প্রায় পঁচাত্তর লক্ষ বিদ্যার্থী মাধ্যমিক শ্রেণীগুলিতে পড়িতেছে ও অন্ততঃ সাড়ে সাত লক্ষ, স্কুলের অন্তিম পরীক্ষা দিতেছে। উচ্চ শিক্ষায় ইহার মধ্যে মাত্র

এক লক্ষের দরকার হইবে এবং নানাবিধ নিম্ন শ্রেণীর কেরাণীগিরি প্রভৃতিতে আরও দেড় লক্ষ বিদ্যার্থীর স্থান হইলেও, বাৎসরিক আমাদের দশ লক্ষ বিদ্যার্থীর জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। টেকনিক্যাল বিদ্যালয়গুলিতেও ইহাদের সকলের স্থান হইতে পারে না, ইহা ভিন্ন টেকনিক্যাল স্কুলগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত কারখানার কাজ করিবার যোগ্য নানাস্তরের কর্মী তৈয়ারী করে। দেশে এত কারখানা কবে হইবে যাহাতে প্রতি বৎসর দশলক্ষ নূতন লোকের স্থান আবশ্যক হইবে? নূতন বড় বড় কারখানা সৃষ্টি করিবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা আমাদের দেশে আছে কি? যদি আমরা ১০।১৪ বৎসরে যোগ্যতা ও অভিরুচি (aptitude) পরীক্ষার দ্বারা নির্ধারণ করি তবে দেখিব যে বার বা সাড়ে বার লক্ষ বিদ্যার্থীর মধ্যে মাত্র দুইলক্ষ বা তাহারও কম এমন হইবে যাহারা প্রচলিত উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ। অপর সকলের জন্য স্বয়ং-সম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহা মাধ্যমিক শিক্ষার পরেই জীবনে প্রবিষ্ট হইবার উপযোগী সুতরাং বৃত্তিমূলক। পক্ষান্তরে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার মত এরূপ শিক্ষাও সকলের জন্য হইবে না যাহার একমাত্র লক্ষ্য চাকুরী।

দেশে বহুবিধ শিল্প আছে, যাহাতে খুব বেশি মহার্ঘ যন্ত্রের আবশ্যক হয় না, অথচ তাহাতে লোকের নিত্য ব্যবহার্য নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। যেমন ছুরি, পেন্সিল, দিয়াশালাই, নিব, ছাতা প্রভৃতির নির্মাণ, সাইকেল মোটর বডি; টাইপরাইটার, ঘড়ি ইত্যাদি যন্ত্রের মেরামত—খুব কম মূলধনেই এই সকল ব্যবসায় সুরু করা যায়। গ্রামাঞ্চলেও কৃষিকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট নানাবিধ শিল্প আছে তাহা ছাড়া কৃষিকার্যের মধ্যেই নানারূপ উন্নতির সুযোগ আছে। এই সকলের শিক্ষার জন্য যদি সহরের মাধ্যমিক স্কুলের সহিত সংশ্লিষ্ট এক একটি ছোট ছোট কারখানা বা ওয়ার্কশপ স্থাপিত হয় ও গ্রামাঞ্চলে কোথাও ছোট কারখানা কোথাও বা আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইতে পারে, যাহাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হইবে এমন বিদ্যার্থীকে আমরা এই সকল মাধ্যমিক স্কুলে পড়াইতে পারি। অর্ধেক সময় তাহারা অন্য বিদ্যার্থী হইতে সরলতর একটা পাঠক্রম পড়িবে ও অন্য সময়ে তাহারা ঐ ওয়ার্কশপ বা কৃষিক্ষেত্রে কার্য করিবে। অর্ধেক সময় কার্যানুসারে প্রতিদিনের অর্ধেক হইতে পারে, এক সপ্তাহ একাদিক্রমে স্কুল ও একাদিক্রমে কারখানার কাজ হইতে পারে, কোন কোন স্থলে ছয় মাস একাদিক্রমে স্কুলের শিক্ষা ও অন্য ছয় মাস কারখানার কাজ হইতে পারে। ইহা যেরূপ কার্যে তাহারা নিযুক্ত হইবে তাহার উপর নির্ভর করিবে। আমেরিকা প্লেটুন প্রথা (Platoon system)ও জার্মানী ডাওইচ প্রথা কাজে লাগায়। সেখানে বিদ্যার্থী যে সময়টা কারখানা (ওয়ার্কশপ) বা কৃষিক্ষেত্রে কাজ করে তাহার উপযুক্ত বেতনও পায় ও এমনভাবে সুবন্দোবস্ত আছে যাহাতে বৎসরের প্রতিদিন কারখানায় বা কৃষিক্ষেত্রে কার্য করিবার জন্য কর্মীও পাওয়া যায়, অপরপক্ষে স্কুলেও ছাত্র সব সময়ে থাকে। কারণ অর্ধেক যখন স্কুলে পড়ে অপর অর্ধেক কারখানায় কার্য করে। এই প্রথায় এক সময়ে কেবল অর্ধেক ছাত্রেরই শিক্ষাব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের পরিকল্পিত ব্যবস্থায় ছাত্রদের বেতন না দিয়া টাকাটা তাহাদের নামে জমা রাখিতে হইবে। যদি ১৩।১৪ বৎসর বয়সের পর চারিবৎসর আমরা এইরূপ শিক্ষার মেয়াদ ধরি, তাহা হইলে প্রত্যেক বিদ্যার্থীর শ্রমের মূল্য (দুই বৎসরের সম্পূর্ণ বেতন) অন্ততঃ এক হাজার বা ততোধিক হইবে। তাহার সাহায্যে সে স্বয়ং একটা ছোট শিল্পালয় খুলিয়া তাহার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে সমর্থ হইবে। এই উপায়ে শিক্ষার দ্বারাই পর্যাপ্ত মূলধনের সৃষ্টি করিয়া আমরা বিদ্যার্থীকে শিক্ষার শেষে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে

শিখাইব। পক্ষান্তরে উচ্চশিক্ষায় কেবল তাহারাই প্রবেশ করিবে যাহাদের যোগ্যতা ও অভিরুচি উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্তির অনুকূল।

উচ্চশিক্ষার নিয়ন্ত্রণে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যোগ্যতার মানদণ্ড বাড়াইতে হইলে, আমাদের বিশেষ সাবধানতার সহিত উচ্চশিক্ষার শিক্ষক ও অধিকারী নির্বাচন করিতে হইবে। এই নির্বাচনের ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর না ছাড়িয়া যদি কোন কেন্দ্রীয় সংস্থা (যেমন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্ট কমিশন) এভার গ্রহণ করেন, তবে বর্তমানে যে সব অযোগ্য শিক্ষক দলাদলির সুযোগে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা অনেকাংশে শুধরাইবেন।

এতগুলি সংস্কার একযোগে করিলে তবেই আমরা উচ্চশিক্ষার সংস্কার সাধন করিতে সমর্থ হইব।

— — —

ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকের ডায়েরী

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

লোকশিক্ষা ও জনতা কলেজ

৪ঠা মে (১৯৫৩) হেলসিংগোর (Helsingor) যাই। সেখানকার প্রাচীন ও ঐতিহাসিক রাজ-প্রাসাদের আকর্ষণ আছে। ইংরাজ সাহিত্যিক সেক্সপীয়র হ্যামলেট রচনা করিয়া এখানের গৌরবকে স্থায়ী রূপ দিয়া গিয়াছেন। রাজ-প্রাসাদের মিউজিয়মে ডিনেমার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের ভারতীয় একাধিক স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত আছে। একসময়ে এখানকার আন্তর্জাতিক জনতা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর পেটের মানিক (Dr. Peter Manicho)-এর আমন্ত্রণে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ জনতা কলেজের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই রাজপ্রাসাদের হলের রাজমঞ্চে বসিয়াই মানবতার বাণী দিয়াছিলেন। সেই সময় আমি ন্যাপল্যাণ্ডে ছিলাম। গুরুদেবের সহযাত্রী ডক্টর প্রেমচাঁদলাল (যিনি এক সময়ে শ্রীনিকেতনের ডিরেক্টার ছিলেন) আমাকে গুরুদেব সন্দর্শনে যাওয়ার জন্য চিঠি দিয়াছিলেন কিন্তু চিঠিখানা আমার হস্তগত হওয়ার পূর্বেই গুরুদেব ডেনমার্ক হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদের হলে গুরুদেবের বক্তৃতা শুনিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রী ভিড় করিয়াছিল। গুরুদেবের বক্তৃতার মর্ম উত্তরদেশীয় কাগজে বাহির হইয়াছিল এবং একাধিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে গুরুদেবের বাণীর গুরুত্ব ও সার্থকতার কথা আলোচিত হইয়াছিল। এবার আমার এখানে আসার প্রধান কারণ, এই আন্তর্জাতিক লোকশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করা ও লোক-শিক্ষার ক্ষেত্রে জনতা কলেজের বর্তমান গুরুত্ব কতখানি তাহা জানা। বলা হয়ত নিষ্প্রয়োজন যে ১৯৩৯ সালে ডেনমার্ক পরিক্রমা কালে দেশের অধিকাংশ জনতা কলেজই পরিদর্শন করিয়াছিলাম; তখন জনতা কলেজের পরিচালক ও ছাত্রছাত্রী অনেকের সঙ্গে আমার নিজের একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয় মহাসমরের ফলে এই যোগ অনেকটা ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

কবিপ্রণাম ডেনমার্কের লোকশিক্ষা অর্থাৎ জনতা কলেজের শিক্ষা পদ্ধতি ও বিবর্তনের ইতিহাস স্বাধীন ভারতের শিক্ষানুরাগী মাত্রেরই জানিবার মত বিষয়। ডেনমার্কের সংস্কৃতির সম্পূর্ণ রূপটি জানিতে হইলে,

ইতিহাসের পটভূমিকায় জনতা কলেজের উদ্ভব ও ইহার বিস্তারের ইতিহাসও জানিতে হইবে।

ভারতবর্ষের মত ডেনমার্কও একসময়ে পল্লী-প্রধান কৃষিজীবির দেশ ছিল। আজ ডেনমার্কে ইন্ডাষ্ট্রি বিস্তার লাভ করিয়াছে সত্য কিন্তু দেশের কৃষিশিল্প এতদূর সুবিস্তৃত যে খাদ্যবস্তুর জন্য ডেনমার্ক-বাসীকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না, বরং উদ্বৃত্ত খাদ্যবস্তু ডেনমার্ক রপ্তানী করিতে সমর্থ এবং করিতেছেও। দেশের কৃষককুল স্বধর্মে অর্থাৎ কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকিয়াও লোকশিক্ষা বা জনতা কলেজের শিক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। বলা বাহুল্য ইহার ফলে সমগ্রজাতির সাংস্কৃতিক জীবনও সমৃদ্ধ হইয়াছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশের কৃষক-সমাজের উচ্চ লোকশিক্ষার এই নীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন—গ্রোন্ডবিগ্ (Grondtvig)। বলা যাইতে পারে বাংলাদেশের ইতিহাসে রাজা রাম-মোহন রায় যে স্থানটি অধিকার করিয়া আছেন, ডেনমার্কের ইতিহাসে সেরূপ একটি স্থানে গ্রোন্ডবিগ্ অধিষ্ঠিত আছেন। এই দুই মনীষিই সমসাময়িক এবং দুই জনই বার বার দেশবাসীকে নূতন আশার পথ দেখাইয়াছিলেন। রামমোহন যেরূপ ব্রাহ্মধর্ম তথা উপনিষদের শিক্ষাকে কুসংস্কারে মোহাচ্ছন্ন দেশবাসীর চিত্তে রোপন করিয়াছেন, সেইরূপ গ্রোন্ডবিগও যীশুর নির্মল প্রেমধর্মের বাণীকে ব্যক্তি ও জাতির জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। গ্রোন্ডবিগের জীবনীকার এ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—"In the light of this conception Grundtvig found that christianity to him was becoming transformed from a doctrine or knowledge into a living reality enduring through history upto the present time. ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শকে রূপ দিতে হইলে লোকচিত্ত ও চিন্তাবিকাশের পথকেও শিক্ষার মাধ্যমে প্রশস্ত করা প্রয়োজন, এই অনুভব গ্রোন্ডবিগের হইয়াছিল। লোকমানসকে জ্ঞানের ও কর্তব্যের আলোকে উদ্ভাসিত করাই জনতা কলেজী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল। মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে এই শিক্ষানীতি প্রবর্তন ও সমগ্র জাতির চিত্তকে উন্নততর মানবিক আদর্শে অনু-প্রাণিত করার ব্রত গ্রোন্ডবিগ উদ্‌যাপন করিয়া ছিলেন।

এংলো-আমেরিকান adult education এর সঙ্গে ডেনিশ জনতা কলেজী শিক্ষার সঠিক তুলনা চলে না : এই উভয়বিধ শিক্ষানীতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। আবার এও বলা চলে যে ডেন-মার্কের adult education-এর ইতিহাসে জনতা কলেজী শিক্ষা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ডেনিশ ডেমোক্রেসির ইতিহাসে জনতা কলেজী শিক্ষার মাধ্যমে দেশের লোকমানসকে উন্নততর করার গুরুত্ব সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে এও বলা যায় যে ডেনিশ ডেমোক্রেসির ইতিহাস জনতা-কলেজী শিক্ষার সঙ্গে জড়াইয়া একীভূত হইয়াছে। ডেমোক্রেসিকে সার্থকরূপ দিতে হইলে লোকমানসকে সেই উদ্দেশ্যপূরণের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে—ইহাই ছিল মনীষী গ্রোন্ডবিগের মত। ভোটারগণ যদি সমাজ, দেশ ও ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্র চালনার গুরুত্ব বুঝিতে না পারে তাহা হইলে ডেমোক্রেটিক গবর্ণমেণ্ট দ্বারা দেশের মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গল হওয়ার সম্ভাব-নাই বেশী, লোকশিক্ষক গ্রোন্ডবিগের মত এরূপ ছিল। ১৮০০ সালে গ্রোন্ডবিগ্ লোকশিক্ষার এই আদর্শকে দেশবাসীর নিকট উদ্ভাসিত করেন। চৌদ্দবৎসর পর অর্থাৎ ১৮৩৩ সালে প্রথম জনতা কলেজ Rodding নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক যে সকল কারণের সমাবেশে এই লোকশিক্ষা আন্দোলন রূপ পরিগ্রহ করে, তাহাও আমাদিগকে জানিতে বুঝিতে হইবে।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ডেনমার্ক কৃষি-

প্রধান দেশ বলিয়া খ্যাত; ১২৫০ সাল পর্য্যন্ত ডেনিশেরা প্রধানত কৃষিজীবি ছিল। দেশে ছোট বড় কৃষক ছিল, কৃষক-সমাজের প্রধান বা সর্দার ছিল। অভিজাত সম্প্রদায় বলিয়া উল্লেখযোগ্য কোন সমাজ ডেনমার্কে ছিল না। যথাবিত্ত বলিতে আজ আমরা যাহা বুঝি তেমন কিছুও ডেনমার্কে ছিল না। কৃষকেরা পল্লীতেই বাস করিত আর জমির মালিকানা কৃষকদেরই ছিল। স্থানীয় সমাজিক বৈঠকে দেহাত্র কৃষকেরা মিলিত হইত এবং সেখানেই সামাজিক সকল সমস্যার সমাধান হইত। বলা যাইতে পারে যে এরূপ সামাজিক বৈঠক অনেকটা ভারতীয় পঞ্চায়েত-প্রথার মতই ছিল। তার অন্যায়ের বিচার এইরূপ বৈঠকেই সংঘটিত হইত এবং সকলেই তাহা মানিয়া লইত। কাল-ক্রমে এই দোক সম্মিলনীই আইনসভা বলিয়া স্বীকৃত হয়। রাজা এই সভায় যোগ দিতে পারিতেন কিন্তু রাজার স্বাধীন কর্তৃত্ব ছিল না। দেশের কৃষক-সমাজের এই প্রধান ধারাকে অক্ষত রাখিয়াই দেশে রাজতন্ত্র (Absolute monarchy) দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়—১৬৮৩ সালে। রাজার নামে দেশে আইনের শাসন-প্রথাও এইভাবেই দেশে স্থিতিলাভ করিয়াছিল। তখনকার আইনের মূল ধারাটি আজও ডেনমার্কে বলবৎ আছে। ডেনিশ বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা আজও সেই আইনটি স্মরণ করে :—

"By law the country shall be built up. But would everyman but be content with what is his and let men enjoy equal right, there world be no need of law. But no law is as worthy of respect as the truth; where truth is in doubt, law must find out what justice is. Were there no law in the country, he would have most who could acquire most; therefore laws must be made in the interest of all" —"law shall be honest, just, cheap, according to the customs of the country, suitable, appropriate and clear (so that all men may know and understand what law says) and not be made or written in special favour of any man, but in the interests of all men living in the country. Nor shall any man judge against the law given by the king and agreed to by the people; but according to that law the country shall be judge and governed. Neither may law which is made by the king and accepted by all the country be repealed or altered by him without the expressed will of the country, for thereby he would evidently act against God."

আইনের এই প্রাচীন প্রথম ধারাটি পড়িলেই জানা যায় যে ন্যায়-অন্যায়, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বরাজ্য-শাসন সম্পর্কে উত্তর ইওরোপীয় দেশে কিরূপ ন্যায়-বোধের ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমি ডেনমার্ক ও অন্যান্য উত্তরদেশ সমূহ ভ্রমণ করিয়া ঘুরিয়াছি, উত্তরদেশ সমূহের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছি। প্রাচীনকাল হইতেই ন্যায়-অন্যায়, সত্যাসত্যের এই প্রখর বোধ স্কানডেনাভীয় দেশ ও সমাজকে বিশেষ ধারায় পরিচালিত করিয়াছিল; আজিকার বৃহৎ শক্তির দম্ভে উত্তর দেশের নিরপেক্ষ থাকিবার ইচ্ছা ও শক্তির উৎসও আমার মতে প্রাচীন ঐতিহ্য হইতেই উত্তরাধিকার সূত্রেই তাহারা পাইয়াছে।

এখানে প্রাচীন কৃষক-প্রধান ডেনমার্কের কথাই-আলোচনা করিতেছি। পরবর্তী যুগে ইওরোপের প্রায় সকল দেশেরই কৃষক-সমাজের অবস্থার অবনতি ঘটে। তখন ডেনমার্কের কৃষককুল দুর্দশার চরমে না পৌঁছিলেও পূর্ববর্তী যুগের ব্যক্তি-স্বাধীনতার আদর্শ অনেকখানি ম্লান হইয়া যায়। রাজতন্ত্র প্রবল হইয়া উঠে। জমির মালিকানা কৃষকেরা হারাইয়া ফেলে। ফরাসী রিভলিউশনের (১৭৮১-৮৮) পর

আবার দেশের কৃষকদের জাগরণ আরম্ভ হয়। তখন রাজা ও জমিদার (Estate-owners) মধ্যযুগীয় অবস্থার পরিবর্তন সাধনে উদ্যোগী হয় এবং ক্রমে কৃষকেরা আবার জমির মালিকানা ফিরিয়া পায়। সেই জাগরণের যুগে বহুলোক প্রাচীন আবাস ত্যাগ করিয়া আবার নূতন খামার সংগ্রহ করিয়া স্বাধীন কৃষিজীবনের পথে চলিয়া আসে। আর ঠিক এই পরিবর্তনের সময়ে শিক্ষানীতি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ১৭৯০ সালে সার্বজনীন আবশ্যিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা হয় কিন্তু ১৮১৪ সালের আবশ্যিক শিক্ষা-আইন প্রবর্তন দ্বারা তাহা সিদ্ধ ও বাস্তবে পরিণত হয়। দেশের সাত হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক শিশুদের শিক্ষা দিবার দায়িত্ব এই আইনের বলে দেশে স্থিতিলাভ করে। ডেনমার্কের এই আবশ্যিক শিক্ষার মর্মকথাটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিশুকে আবশ্যিক শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হইবে—এমন কোন বাধ্যবাধকতা আইনে অবর্তমান ; পিতামাতা বা অভিভাবক ইচ্ছা করিলে নিজেরাই নিজেদের শিশুদিগকে স্বগৃহে শিক্ষা দিতে পারেন কিন্তু সেই শিক্ষা রাষ্ট্র-নির্দ্ধারিত শিক্ষার সমতুল্য হওয়া চাই। সার্বজনীন শিক্ষা আইনের এই ধারাটি আজও ডেনমার্কে বলবৎ আছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা জানিবার বিষয়। ডেনমার্কের অনুরূপ আবশ্যিক শিক্ষা-আইন ১৮২৭ সালে নরওয়ের দেশে, ১৮৪২ সালে সুইডেনে এবং ১৮৭০ সালে ইংলণ্ডে প্রবর্তিত হয়। বলা বাহুল্য এই আবশ্যিক শিক্ষা-আইন সেই শতাব্দীর শিক্ষার আদর্শেই রচিত ও প্রবর্তিত হইয়াছিল। লোক-সাধারণ আবশ্যিক শিক্ষা পাইয়া উন্নততর পুরবাসী (good citizen) হইবে, ইহাই ছিল আবশ্যিক শিক্ষার আদর্শ ; অধিকন্তু শিক্ষকগণ বিদ্যার্থীদিগকে পরবর্তী জীবনের কর্তব্য সম্পর্কেও সচেতন করিয়া তুলিবেন, সেই নির্দেশও শিক্ষাদর্শের অঙ্গ ছিল। এই শেষোক্ত আদর্শ বা নির্দেশ তখনকার দিনে তেমন কার্যকরী হয় নাই বটে কিন্তু এই আদর্শকে কেন্দ্র করিয়াই রাষ্ট্রের অর্থে অধিকার শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ লোকসমাজে স্ফূর্তি লাভ করে। ডেনমার্কের শিক্ষাবিদ ইহার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা এইরূপ—"In the eighteen-twenties, one hears of the founding of evening schools both in towns and country districts. In the case of one of the Folk high schools, a connection can be traced back to the evening school work done in the country districts in the eighteen-twenties.

এখানে বলা প্রয়োজন যে তখনকার দিনে ইউরোপীয় দেশ সমূহের ডেমোক্রেটিক গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের ফলে ডেনমার্কের উচ্চ লোকশিক্ষার ব্যবস্থাও দ্রুততর হয়। ফরাসী দেশে ১৮৩০ সালের জুলাই রিভলিউশন ডেনমার্কের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। প্রাদেশিক প্রশাসনে (Provincial Advisory Council) ভেমিন কৃষকদের প্রতিনিধিও স্থানলাভ করে। বহুকাল পর আবার দেশের কৃষকসমাজ পৌরসভায় নিজের মত প্রকাশ করিবার সুযোগ পায়। ১৮৪১ সালে পল্লী অঞ্চলে (rural communities) স্থানীয় শাসন-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়। কৃষক সমাজ—পূর্বাঞ্চল শাসন-পদ্ধতির উন্নতি দাবী করে। তখন continuation school প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন মূর্ত হইয়া উঠে।—"The beginning of the eighteen-forties saw a number of efforts to set up new kinds of continuation schools in the country districts. It was the peasants themselves or people closely associated with them that took the initiative. They realised that if peasants were to raise themselves, further education was necessary." ১৯৪৮ সালে

ডেনিস পার্লামেন্টে "Higher education for peasants" নামে একটি বিল উত্থাপন করা হয়। কৃষকদের মেধাবী ছেলেমেয়েদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রতি কাউন্টিতে একটি করিয়া উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রশ্ন দেশবাসীর গুরুকে আন্দোলিত করে। কিন্তু তখন উচ্চ লোকশিক্ষার কোন রূপ মূর্ত হইয়া উঠে নাই, বিলটিও পার্লামেন্টে পাস করা যায় নাই। বলা বাহুল্য এই শিক্ষা-আন্দোলন নিতান্তই সামাজিক আন্দোলন ছিল। কিন্তু কৃষকদের সংখ্যা দেশে বাড়িতেছিল; বস্তুতঃ কৃষকেরাই তখন জাতির মেরুদণ্ড ছিল। সেজন্য তখনকার রাজনীতিবিশারদ, শিক্ষাবিদ ও শাসকগণ সকলেই কৃষকদিগকে দলে ভিড়াইবার চেষ্টা করিতেন। তখন উচ্চ লোকশিক্ষা মূর্ত হইলে ইহার রূপ কি হইত আজ তাহা বলা কঠিন। কৃষকদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা আন্দোলন যখন প্রবল তখন মনীষী গ্রোন্থবিগ আসরে অবতীর্ণ হন এবং উচ্চ লোকশিক্ষার প্রশ্নকে উচ্চতর আদর্শের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেন। লোকশিক্ষা এই মনীষীর পুণ্য জীবনকথা স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্রতীদের প্রেরণা যোগাইবে মনে করিয়া সংক্ষেপে সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

মনীষী গ্রোন্থবিগ

গ্রোন্থবিগের পুরা নাম নিকোলাই ফ্রেডেরিক সেবেরিন (Nikolai Frederik Severin Grundtvig)। তিনি ১৭৮৩ সালে ডেনমার্কে জন্মগ্রহণ করেন এবং নব্বই বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করেন। প্রাণ ও বুদ্ধিপ্রাচুর্যে সবল কবি, সাহিত্যিক, ধর্মবেত্তা ও লোকশিক্ষকরূপে তিনি সুদীর্ঘকাল নিরলসভাবে স্বদেশের ও মানবজাতির সেবা করিয়া গিয়াছেন। গ্রোন্থবিগের জীবনীকার তাঁহাকে মার্টিন লুথারের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। এই তুলনার একটি কারণ মনে হয় এই যে গ্রোন্থবিগ ধর্মবহুলতাময় জীবন গঠনের উপর জোর দিতেন কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার মৌলিক মতবাদ ছিল।

যৌবনারম্ভে গ্রোন্থবিগ অষ্টাদশশত শতাব্দীর প্রগতিসম্পন্ন রেশনালিজমের প্রভাবে আসিয়াছিলেন। পরে তৎকালীন জার্মান ও ডেনিশ রোমান্টিসিজমের প্রভাবে এবং নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে নিজের বিশিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তখনকার দিনের দার্শনিক ও ঐতিহাসিক হেনরিক স্টেফেন্স (Henric Steffens)-এর চিন্তাধারার প্রভাবে আসিয়া মানবজাতির উৎকর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে নূতন আলোক প্রাপ্ত হন। ইহার মূল কথা এই ছিল যে মানুষের বহির্জীবনের উপরও মানুষের সুগভীর আধ্যাত্মিক জগতের অস্তিত্ব আছে, আর মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তির অনুভূতিগুলি মানুষের সৃজনমূলক শক্তির উৎস। গ্রোন্থবিগ্ নিজেও এরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন যার ফলে ১৮১০ সাল পর্যন্ত তিনি এ সকল মতবাদের প্রচার করিয়াছিলেন। এইভাবে ক্রমশঃ গ্রোন্থবিগের অন্তর্জীবন ও চিন্তাধারা পুষ্টি লাভ করে এবং ধর্ম সম্পর্কেও তিনি নিজস্ব মত পোষণ করিতে থাকেন। তাঁহার মতে চর্চ (ধর্মসংস্থা), বিদ্যালয় ও মানুষের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার পথ প্রশস্ত থাকা প্রয়োজন। জীবনের শেষ তিন চার দশক কাল গ্রোন্থবিগ ডেনমার্কের একজন প্রধান চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছিলেন। ১৮৪৮ সালে তিনি ডেনিশ পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা নীতির একজন মূর্ত প্রতিনিধিরূপে কাজ করিয়াছেন এবং সকল প্রকার প্রগতির পরি-পন্থীদের (reactionary-দের) প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

গ্রোন্থবিগ্ মাতৃভাষার বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ লোকশিক্ষা ও সমগ্র জীবনের শিক্ষালাভের উপর জাতির সর্বাঙ্গীন বিকাশ নির্ভর করে—এ সম্পর্কে

তাঁহার মত সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। মাতৃভাষা সম্পর্কে গ্রোন্ডবিগের একটি কবিতা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Mother-tongue is as rosy wreaths,
With big and small entwining.
Only here tribal spirit breathes
The pulse of the people throbbing.
Mother-tongue is our dearest tone.
All alien speech sounds empty,
Heard or read, it has might alone
To strengthen the vigour scanty.

মাতৃভাষার উপর গ্রোন্ডবিগ্ কবিতা ও রচনা অনেক লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিজের কথাই এখানে দিতেছি :—The people's experience of a thousand years has settled in the mother-tongue, and through it the word of God will find its way to the people; and as the spoken word is the clearest expression of God's image in us, there is in the mother-tongue an echo of God's word. তাঁহার মতে মাতৃভাষা ও স্বদেশ এই দুইটি একই সূত্রে গ্রথিত। গ্রোন্ডবিগের জীবনীকার যে ভাষায় ইহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এইরূপ :—Love of the mother-tongue and the native land was, indeed, inextricably linked together with the coherence existing between things human, national and divine, which is the secret of Grundtvig's life-work."

ডেনমার্কের উচ্চ লোকশিক্ষা ও জনতা-কলেজ

গ্রোন্ডবিগ্ মাতৃভাষার মাধ্যমে উন্নততর উচ্চ লোকশিক্ষার সম্বন্ধে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন তাহা বিচার করিলে সত্যই মনে হয় তিনি মানুষের বিচিত্রভাবার প্রকাশের মধ্যে মানুষের ঐক্যের রূপও দেখিয়াছিলেন। তিনি জাতীয়তাবাদী ছিলেন, কিন্তু উৎকট জাতীয়তাবাদ মোটেই পোষণ করিতেন না; কারণ তাঁহার সকল চিন্তা, সকল রচনা, সকল কর্ম—একমাত্র লোকহিতের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।—Grundtvig saw the world full of an infinitude of peoples, each with their own mother-tongue and peculiar general spirit. These nations were not one another's enemies, but each a special expression of the human spirit's endeavour to strive on towards a solution of the mystery of life.

লোকসাধারণের মাতৃভাষাই হইবে তাহার শিক্ষার বাহন, ইহাই ছিল গ্রোন্ডবিগের প্রধান বক্তব্য। তাঁহার জীবনীকার গ্রোন্ডবিগের এই আদর্শের ব্যাখ্যা যে ভাবে করিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি।—"In finding, as Grundtvig did, that what is deepest in mankind resides in the mother-tongue and in national life, it was almost inevitable that he turned against the Protestant Latin School, whose foundations were not in the people's own life and whose language was not the mother tongue. With stern words he opposed this school for death, where instead of receiving light and clear understanding about life and love of country and humanity, the pupils were fed on Latin grammar, where they were isolated from the daily life of the people, made strangers to their own age and nation, and were poisoned in an atmosphere of academic conceit and contempt for the nation which sustained them and which they ought to serve.

তখনকার দিনে গ্রোন্ডবিগের চিন্তাধারা নিতান্তই

বিপ্লবীর আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রোন্থবিগ্ এরূপ একটি লোকশিক্ষা পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন যে শিক্ষা লোকসাধারণের জীবন হইতে উদ্ভূত হইবে, যে শিক্ষা লোকসাধারণকে মহত্তর জীবন গঠনে অনুপ্রাণিত করিবে এবং লোক-সভ্যতার প্রকাশক হইবে। একাডেমিক কালচারের বদলে তিনি লোক-কালচার চাহিয়াছিলেন। Folkelig education অর্থাৎ people's education অর্থাৎ লোকশিক্ষা সাধারণের জীবনকে সমৃদ্ধ করিবে, ডেমোক্রেসি অর্থপূর্ণ হইবে ইহাই ছিল গ্রোন্থবিগের প্রধান বক্তব্য।—"Education and efficiency for life, must come from a new school where our native country's natural and historical qualities, expressed in real life and in the demands of the present time, become the mid-point. Such a school must emerge from learning and maintain vital connection with it, but at the same time it must be independent.

গ্রোন্থবিগ্ লোকশিক্ষার মাধ্যমে একটি প্রগতি-সম্পন্ন সরল শুদ্ধীর সমাজ বা দেশ গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা চাহিয়াছিলেন যে সমাজের সকল স্তরের তরুণেরা নিজের ভাষা, বিশ্বের ইতিহাস জানিতে পারিবে, নিজের দেশের সমাজের সমস্যাগুলি জানিতে ও বিশ্লেষণ করিতে শিখিবে, জীবনের সকল সমস্যার সমাধানে নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিতে শিখিবে। লোকশিক্ষা এরূপ না হইলে যে অনর্থ ঘটিতে পারে সে সম্পর্কেও তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন—"The sign of the times and events of the day show all too clearly that without such natural, gentle and salutary enlightenment which has been shamefully neglected everywhere the hour will strike in all countries when the masses of the people who have been treated unnaturally and debased to the life of cattle, will and must sooner or later, rise like a wild beast and rend asunder all that is human." সেরূপ বীভৎস রক্তাক্ত বিপ্লব হইতে সমাজ, দেশ ও মানবতাকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি এমন একটি লোকশিক্ষা নীতি প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন যাহা লোকায়ত্ত রাষ্ট্রপরিচালনাকে অর্থপূর্ণ করিবে। গ্রোন্থবিগ্ ঠিকই অনুমান করিয়াছিলেন যে ডেমোক্রেটিক লোকায়ত্ত রাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকিবে এবং দলীয় রাজনীতি দেশের ঐক্য ও শান্তিকে বিনষ্ট করিতে পারে। সেজন্য তিনি এরূপ লোকশিক্ষা চাহিয়াছিলেন —যাহা রাজনৈতিক দলের প্রভাবের বাহিরে থাকিবে —যে প্রতিষ্ঠানে সমাজের সকল স্তরের বিদ্যার্থীরা উত্তম পুরবাসী হওয়ার শিক্ষালাভ করিবে। তিনি তৎকালীন রাজার নিকট এই আদর্শে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আবেদনও করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ সালে ডেনমার্কের রাজার মৃত্যুর পর লোকশিক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয় কিন্তু কয়েকমাস পরে লোকায়ত্ত ডেমোক্রেটিক সরকার গঠিত হওয়ার পর এই প্রস্তাবটি চাপা পড়ে। কিন্তু লোকশিক্ষা আন্দোলন প্রবল ও ব্যাপকভাবে দেশে চলিতে থাকে। ১৮৭২ সালে গ্রোন্থবিগ পরলোকে গমন করেন।

রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষা (৫)

শ্রীঅনাথনাথ বসু সংকলিত

ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাষ্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়। মাষ্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাষ্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন; ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপর মার্কা পড়িয়া যায়। কলের একটা সুবিধা, ঠিক-মাপে ঠিক ফর্মাশ দেওয়া জিনিসটা পাওয়া যায়, এক কলের সঙ্গে আর এক কলের উৎপন্ন সামগ্রীর বড়ো একটা তফাৎ থাকে না, মার্কা দিবার সুবিধা হয়।

কিন্তু এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের মনে তফাৎ। এমন-কি, একই মানুষের একদিনের সঙ্গে আর-এক দিনের ইতর-বিশেষ ঘটে।

তবু মানুষের কাছ হইতে মানুষ যাহা পায় কলের কাছ হইতে তাহা পাইতে পারে না। কল সম্মুখে উপস্থিত করে কিন্তু দান করে না, তাহা তেল দিতে পারে, কিন্তু আলো জ্বালাইবার সাধ্য তাহার নাই।

য়ুরোপে মানুষ সমাজের ভিতরে থাকিয়া মানুষ হইতেছে। ইস্কুল তাহার কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে। লোকে যে বিদ্যালাভ করে সে বিদ্যাটা সেখানকার মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। সেখানকার বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে মিশিয়া আছে, তাহা সমাজের মাটি হইতেই রস টানিতেছে এবং সমাজকেই ফল দান করিতেছে।

কিন্তু বিদ্যালয় যেখানে চারিদিকে সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিলিতে পারে নাই—যাহা বাহির হইতে সমাজের উপরে চাপাইয়া দেওয়া হয় তাহা নির্জীব। ● ● ● সে বিদ্যা প্রয়োগ করিবার বেলা কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি না।● ● ● এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এঞ্জিন মাত্র হইয়া থাকে; তাহা বহু জোগায়, প্রাণ জোগায় না।

এইজন্য বলিতেছি য়ুরোপের বিদ্যালয়ের অবিকল বাহ্য নকল করিলেই আমরা যে সেই একই জিনিস পাইব এমন নহে। সেই নকলে সেই বেঞ্চি, সেই টেবিল, সেইপ্রকার কার্যপ্রণালী সমস্তই ঠিক মিলাইয়া পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা আমাদের পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে।

পূর্বে যখন আমরা গুরুর কাছে বিদ্যা পাইতাম, শিক্ষকের কাছে নহে—মানুষের কাছে জ্ঞান চাহিতাম, কলের কাছে নয়, তখন আমাদের শিক্ষার বিষয় এত বিচিত্র ও বিস্তৃত ছিল না। এবং তখন আমাদের সমাজে-প্রচলিত ভাব ও মতের সঙ্গে পুঁথির শিক্ষার কোন বিরোধ ছিল না। ঠিক সে দিনকে আজ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে সেও একটা নকল হইবে মাত্র, তাহার বাহ্য আয়োজন বোঝা হইয়া উঠিবে, কোন কাজেই লাগিবে না।

অতএব আমাদের এখনকার প্রয়োজন যদি আমরা ঠিক বুঝি তবে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে, যাহাতে পাঠ্যবিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে, যাহাতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয়মনকে গড়িয়া তোলা দুই তারই বিদ্যালয় গ্রহণ করে।

শিক্ষাসমস্যা—১৯০৬

আদর্শ শিক্ষক জয়শঙ্কর গুপ্ত

শ্রীললিতকুমার সিংহরায়

যে শিক্ষাব্রতীর কথা আলোচনার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা তাঁহার পরিচয় কোন গ্রন্থে পাওয়া যাইবে না। পূর্ববঙ্গের এক গ্রামের শান্ত পরিবেশের মধ্যে তাঁহার কর্ম ও সাধনা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে যখন শিক্ষা-ক্ষেত্রে দারুণ বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইয়াছে এইপ্রকার কর্তব্যনিষ্ঠ ছাত্র-সমাজের অকপট সেবকের জীবন-কথা আলোচনার সার্থকতা আছে বলিয়া মনে করি। কারণ শিক্ষার উন্নতির জন্য যত প্রকার ব্যবস্থাই অবলম্বিত হউক না কেন গুণী শিক্ষকের অভাবে তাহা কখনই কার্যকরী হইবে না, ইহা নিশ্চয়।

জয়শঙ্কর গুপ্ত মহাশয়ের নিবাস ছিল ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী গোয়ী বরহীয়া গ্রামে। তিনি ঢাকা কলেজে বি. এ পড়িয়া পাস করিবার পূর্বেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। কিছুদিন তিনি পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে বি. এল স্কুলে গণিতের শিক্ষক ছিলেন। পরে সেখান হইতে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার সন্তোষ-আহবী স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন ও প্রায় ৩০ বৎসরকাল অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে ঐ বিদ্যালয়ের সেবা করেন। বর্তমান লেখক তাঁহার সঙ্গে চার বৎসর সহকর্মীরূপে ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবার সুযোগ পাইয়া গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সেই সূত্রে এই শ্রদ্ধাভাজন মহাশয়ের সম্বন্ধে যাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বর্তমান প্রবন্ধের তাহাই অবলম্বন।

গুপ্ত মহাশয় যখন সন্তোষ স্কুলে কর্ম গ্রহণ করেন তখন উহার হেডমাষ্টার ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষক ললিতচন্দ্র মজুমদার। এই বিদ্যালয়ে বহু কৃতী শিক্ষক শিক্ষকতা করিয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কালী-প্রসন্ন দাশগুপ্ত এম্, এ, গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহুজনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল বিখ্যাত শিক্ষকদের কাজের জন্য এই বিদ্যালয় ঐ অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করে। স্কুলের এই গৌরবের জন্য গুপ্তমহাশয়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

শিক্ষকতা কার্যে তিনি মনপ্রাণ একান্ততাবে নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কার্যে তাঁহার নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় ছিল। সংযম ও নিয়মানুবর্তিতার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভাল ছিল। রোগভোগ তাঁহার খুবই কম হইত। যথাসময়ে স্নানাহার করিয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে কখনই বিলম্ব হইত না। এই সকল কাজ যন্ত্রচালিতবৎ করিয়া যাইতেন।

তাঁহার সহকর্মীদের মধ্যে পণ্ডিত শিবচন্দ্র সার্বভৌম মহাশয় ও পরবর্তীকালের প্রধান শিক্ষক রামেশ্বর চক্রবর্তী মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। সকলেই নিয়মনিষ্ঠাবান ও কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন এবং সুশিক্ষক বলিয়া সমাদৃত হইতেন। তাঁহারাও আদর্শ শিক্ষক ছিলেন।

গুপ্তমহাশয় অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। সর্বাপেক্ষা বেশী লক্ষণীয় ছিল তাঁহার ছাত্রগণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। কৃতিত্বের সহিত শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নৈতিক ও শারীরিক অবস্থার উন্নতির দিকেও তিনি দৃষ্টি দিতেন। রোগীর সেবা করায়

তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। বিশেষতঃ স্কুলের সংলগ্ন ছাত্রাবাসের কোনও বালক পীড়িত হইলে তিনি তাহার জন্য বিশেষ মনোযোগ দিতেন ও প্রয়োজন মত রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার পরিচর্যা করিতেন।

তাঁহার জীবন ঘটনাবহুল ছিল না। একই কাজ তাঁহার বৎসরের পর বৎসর করিতে হইত। তাহাতে তাঁহার বিরক্তির কোন লক্ষণই ছিল না। এই কাজই তাঁহাকে আনন্দ দান করিত। তিনি অল্পে সন্তুষ্ট ছিলেন বলিয়া জীবন শান্তিতে অতিবাহিত করিতে পারিয়াছিলেন। অন্যান্যের ন্যায় তাঁহার জীবনেও অনেক দুঃখ দেখা দিয়াছিল কিন্তু তাহা যত গুরুতরই হউক কিছুতেই তিনি তাহাতে বিচলিত হইতেন না। বিপত্নীক অবস্থায় তাঁহাকে দীর্ঘদিন কাটাইতে হইয়াছিল। দুইটি কন্যার বিবাহ দিয়া একমাত্র পুত্র লইয়া স্কুল-বোর্ডিং-এই তাঁহাকে আহারের ব্যবস্থা করিতে হইত। বিবাহিতা কন্যাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার নিকট গিয়া কখনও কখনও তাঁহাকে কতকটা পারিবারিক জীবনের আনন্দ দান করিতেন। তবে সাধারণতঃ স্কুলের ছেলেদের মধ্যে থাকিয়াই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়াছিল। তিনি স্কুলে ৬০৲ টাকা বেতন পাইতেন। একবার স্কুলের ছাত্র মহিমচন্দ্র ঘোষ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করাতে কর্তৃপক্ষ তাঁহার বেতন ৫৲ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা তিনি নিজে ভোগ না করিয়া ঐ স্থানের কলেজে পাঠের সাহায্যের জন্য তাহাকে নিয়মিতভাবে দান করিতেন। এইভাবে তিনি তাঁহার অন্যান্য দরিদ্র ছাত্রদিগকেও সাহায্য করিতেন।

অবকাশসময়ে তিনি নানাস্থানে তীর্থভ্রমণে যাইতেন। নানাস্থানে ভ্রমণের ফলে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করাতে তিনি শিক্ষা কার্যে অধিকতর পারদর্শিতার পরিচয় দিতে পারিতেন।

তিনি অল্পে সন্তুষ্ট ছিলেন বলিয়া দারিদ্র্য স্বচ্ছন্দে বরণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সর্ব বিষয়ে অত্যন্ত সংযমী ছিলেন। কোনও অবস্থাতেই তাঁহাকে উত্তেজিত বা বিচলিত হইতে দেখা যাইত না। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সংযম তিনি কখনও হারাইতেন না। এই সত্যনিষ্ঠ, ধর্মপ্রাণ সাধুস্বভাব সম্পন্ন শিক্ষক সকলের দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিলেন। সর্বপ্রকার অভাব অভিযোগের মধ্যেও ভগবৎ-বিশ্বাসের বলে পরম সন্তুষ্ট চিত্তে জীবন যাপন করিতে পারিয়াছিলেন। স্থানীয় জনসাধারণও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। জাহ্নবী স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী জমিদার স্বর্গীয়া জাহ্নবী চৌধুরাণী ও তাঁহার পুত্রবধূ রাণী দিনমণি চৌধুরাণীও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিতা ছিলেন ও তাঁহার সহিত পরমাত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তিনি সন্তোষ স্কুল হইতে ৬০ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করিয়া এলাহাবাদে তাঁহার পুত্রের নিকটে বাস করিতেন। তখনও সময় সময় স্কুলের শিক্ষকতা অথবা গৃহ-শিক্ষকতা করিতেন। দীর্ঘকাল সেখানে অবস্থান করিয়া ৯০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

গুরু মহাশয়ের বহু ছাত্র পরবর্তী জীবনে সাফল্যের পরিচয় দিয়া জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্র মহিমচন্দ্র ঘোষের নাম পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইনি কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ পাশ করিয়া বিলাতে যান ও পরে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস-এ যোগদান করেন এবং অবশেষে হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আশুতোষ মৈত্র তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন। সতীশচন্দ্র মল্লিকও তাঁহার কৃতী ছাত্র ছিলেন। এইরূপ আরও বহু ছাত্র জীবনে বিশেষ গৌরব লাভ করিয়াছেন তবে এই প্রবন্ধে সে কালের উল্লেখ সম্ভবপর নহে। সকল ছাত্রই তাঁহাদের শিক্ষক মহাশয়কে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা

করিতেন। ছাত্রগণ মিলিত হইয়া গুপ্ত-মহাশয়ের প্রতিকৃতি একখানা প্রমাণাকার তৈল-চিত্র প্রস্তুত করাইয়া স্কুলের লাইব্রেরী গৃহে স্থাপন করিয়াছেন।

এইরূপ শিক্ষকের ক্রমশঃ অভাব হইতেছে। তাহাতে জাতির কল্যাণের পথ ব্যাহত হইতেছে। গভীর পরিতাপের বিষয় যে বর্তমান কালের শিক্ষক মহাশয়দিগের মধ্যে গুপ্ত মহাশয়ের জীবনে যে সকল সৎগুণ বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শুভ ইঙ্গিত নহে।

—•—

শিক্ষা ও অনুশাসন

শ্রীমতী সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়

একবার কোনো এক স্নাতকোত্তর বিদ্যালয়ে কিছু সময় কাটাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ইউনিভারসিটির এম্, এ পরীক্ষা চলছিল সেই মহা-বিদ্যালয়ে...পরীক্ষা শেষ হবার ঘন্টা বেজে উঠলো খাতাগুলি পরীক্ষার্থীদের হাত থেকে এক রকম ছিনিয়ে ছাড়িয়ে নেওয়া চল্লো। এরই মাঝে একটি অল্পবয়সী ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে চাইলে —প্রশ্নপত্র দিতে ১০ মিনিট দেরী হয়েছে সুতরাং খাতাও ১০ মিনিট পরেই নেওয়া উচিত। কিন্তু যে প্রফেসরটিকে উদ্দেশ করে এই কথাটি বলা হল তিনি তৎক্ষণাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড দাঁত খিঁচুনী সহযোগে যা বললেন তার অর্থ বোধহয় "তোমায় আর ক্যাচ ক্যাচ করতে হবে না"। ছেলেটি মুখ কাঁচু-মাঁচু করে তার কালিকলম গুছিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মনে মনে ভাবলাম, কলকাতা হলে এতক্ষণ প্রফেসর সাহেবের দাঁতকটি উৎপাটিত হয়ে যেত—এক কথায় আচ্ছা ধোলাই দিয়ে দিত ছেলেরা। ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু এর মাঝে লুকিয়ে রয়েছে শিক্ষার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এখানে প্রফেসরটির ব্যবহার, ছেলেটির ব্যবহার এবং কলকাতার ছেলেরা যা করত সেই ব্যবহার সবকটিই ভাববার বিষয় এবং বোধ হয় সব কটিই আমাদের সমস্যা। সমাজের নতুন কাঠামো তৈরী করবার দিনে পুরানো মত এবং পথ দিয়ে হয়তো সমস্যাগুলির সমাধান হবে না। তবু যে আধারভূত সত্যগুলির উপরে সমাজ-জীবনের দুর্গতোরণগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে সেগুলিকে একেবারে বাদ দেওয়াও সম্ভব নয়।

শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য যাই হোক, সকল শিক্ষার জন্যই অনুশাসন প্রয়োজন—কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্যের রকম ভেদে অনুশাসনের ধারাও বদলায়। প্রাচীন স্পার্টার লৌহ অনুশাসন এক বিশেষ উদ্দেশ্য পূর্ণ করবার জন্যেই প্রস্তুত হয়েছিল। তেমনি যদি আধুনিক গণতন্ত্রের সত্যকে স্বীকার করে শিক্ষার উদ্দেশ্য গড়তে হয়, তাহলে আবার অনুশাসনের ধারাও এক বিশেষ প্রকারের হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই অনুশাসনের সত্যগুলি কিশোর কিশোরীর মনে গেঁথে যাওয়া চাই—কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোনো অন্যায় জুলুম বা জবরদস্তির স্থান নেই। এ বিষয় Aldous Huxely একটি ভারি সুন্দর কথা বলেছেন।

If your goal is liberty and democracy then you must teach people the arts of being free and of governing

themselves. If you teach them instead the rule of bullying and passive obedience, then you will not achieve the liberty and democracy at which you are aiming. Good ends cannot be achieved by inappropriate means. (*Ends and Means*)

মানবসত্তার পূর্ণ বিকাশ শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং এই বিকাশ সমাজ-জীবনে স্বাস্থ্যকর প্রভাব বিস্তার করে, সেটা শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য। যে মানুষ স্বার্থান্ধ নয়, অসামাজিক নয়, আবার যে সমাজের রীতি-রেওয়াজের ফাঁসিতেই কেঁদে নেই ; যে মুক্ত অথচ সকলের সঙ্গে সামাজিক, আর্থিক এবং রাষ্ট্রনীতিক বন্ধনে যুক্ত ; যার নৈতিক ভাবনা এমনি মুক্ত এবং যুক্ত থাকার ভেতরেই প্রকাশ হয় ; শুধু এই নয়, যে মানুষ সৃজনশীল—নব নব সত্য এবং উপযোগিতা সৃজনের মাঝে নিজের অন্তর শক্তিগুলিকে সে অর্গলমুক্ত করে, হৃদয়, মন এবং মনীষা সবকটির বিকাশ সাধনে যে সচেতন ভাবে প্রচেষ্টা —সার্বজনীন হিতের জন্য নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দিতে পেছপা নয় আবার সময় বিশেষে নিজের সুচিন্তিত মতের বিরুদ্ধেও স্থাপন করতে পারে—অর্থাৎ তার সাহসের এবং ব্যক্তিত্বের অভাব নেই, এমনি মানুষ গড়া শিক্ষার বৃহত্তর উদ্দেশ্য। এমনিতর আদর্শ মানুষ শুধু যে কল্পনা নয় তা আমরা জানি। আমরা আরও জানি যে আমাদের ক্রমবর্ধমান গণতান্ত্রিক জীবনে এবং সমাজের বিবর্তনের গতি বৃদ্ধির জন্য সৎ, নির্ভীক এবং অনুসন্ধানী মানুষেরই প্রয়োজন। এমন মানুষ যদি তৈরী করতে হয় তার জন্য এক অতি প্রশস্ত আদর্শ সংযুক্ত উদ্দেশ্যপূর্ণ শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রয়োজন। কিন্তু এই শিক্ষা-পরিকল্পনাকে সফলতা এবং শিক্ষার্থীর সমস্ত জীবনের সম্পূর্ণতা দান অনুশাসনের সুব্যবস্থা দ্বারাই সম্ভব। অনুশাসনের দ্বারা কি হবে এবং কেমন হবে এ নিয়ে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি ভেবেছেন এবং তাঁদের বক্তব্য অনেক পরিমাণেই সত্য।

অনুশাসনের গোড়াপত্তন দার্শনিক ভিত্তির ওপরে না হয়ে মনোবিজ্ঞানের আধারের উপরেই স্থাপন করা উচিত। মানব মনের চেতন এবং অবচেতন সত্তা-গুলির অনুসন্ধানের কাজে আধুনিক মনোবিজ্ঞান অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে এবং ক্রমশঃ আরও গভীরতর সত্যের অনুসন্ধান করাও সম্ভব হবে,এমনও আশা করা যায়। শ্রীঅরবিন্দের অতিমানসের সত্যও হয়তো একদিন ব্যবহারিক কাজে আসবে। তাই শিক্ষার এবং বিশেষ করে অনুশাসনের আধার-শিলা মনোবিজ্ঞানই হওয়া উচিত। দুটি মহাযুদ্ধের কলঙ্কিত ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে ফ্রয়েড ম্যাকডুগাল প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের অবদান পাশ্চাত্যের দেশ-গুলিকে এই বিষয়ে সচেতন করে দিয়েছে। মধ্যযুগ এবং তৎপরবর্তী যুগের পাশ্চাত্য শিক্ষার 'রিপ্রেসনের' ছাপ প্রবল ভাবে আঁকা রয়েছে। শিক্ষার্থীর সমস্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ করে কেবলমাত্র ভীতির বৃত্তিকে জাগ্রত রেখে তাকে দিয়ে সকল কাজ করিয়ে নেওয়াই প্রাচীন অনুশাসনের নীতি। এই বৃত্তি নিরোধের মাঝে মার খোরের এক বিশেষ স্থান আছে এবং ভাল ভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, আদমন অমানুষিকতার পর্যায়েও পৌঁছে গিয়েছে বহুবার। রস্ তাঁর বইখানিতে এক স্কুল মাষ্টারের রেকর্ড উল্লেখ করেছেন—তাঁর ৫১ বৎসরের শিক্ষক-জীবনের ভারবীতে ১১১৫২৭ বেত্রাঘাত, ১২৪০১০ কলের আঘাত, ১৩৬৬১৫ চপেটাঘাত ইত্যাদির হিসাব রেখেছেন। এ ছাড়া নানান গালি-গালাজও তিনি ছাত্রদের দিতেন তারও সংখ্যা ৩০০০ এর কম নয়। এই ছিল পুরানো দিনের শিক্ষার পদ্ধতি। শৈশব এবং কৈশোরের দিনগুলি ছিল এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন।

'ইমপ্রেসনীজম'ও অনুশাসনের অন্য এক প্রথা। এক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রখর ব্যক্তিত্বই শিক্ষার্থীর চরিত্রকে এবং কর্মকে প্রভাবিত করে—তাঁর ইসারামাত্রেই

শিক্ষার্থী কঠিনতম কাজ সমাপ্ত করতে পারে। শিক্ষকই শিক্ষার্থীর আদর্শ এবং অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। অবদমনে যেমন ভীতির বৃত্তিকে জাগিয়ে দেওয়া হয়, এখানে তেমনি বিষয়ের বৃত্তিকে গভীর ভাবে নিংড়ানো হয়। ইংলণ্ডে কোনো এক সময় এমনি শিক্ষার প্রচলন ছিল। বোধহয় আজকে যাঁরা প্রৌঢ় তাঁদের সকলেরই মনের মাঝে কোনো এক শিক্ষক আদর্শের মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ যে শিক্ষকটি সব চাইতে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এঁদের নিজ মনে।

এরপরে আসেন স্বভাববাদীরা, ইংরাজীতে এদের বলা হয় ন্যাচারালিষ্ট। এঁদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে—বিশেষ করে ফ্রয়েডের অবচেতন মনো-বিজ্ঞানের ফলে এবং ম্যাকডুগালের বৃত্তিমূলক মনোবিজ্ঞানের প্রভাবে। এই ন্যাচারালিষ্টরা এক মুক্ত অবারিত শিক্ষা-পদ্ধতির ওপরে খুব জোর দিয়েছেন। এঁদের মতে কোন রকম শাসন বা কঠিন ব্যবহারের দ্বারা শৈশব এবং কৈশোরের কুসুম-কুমার মনের সূক্ষ্মতম বৃত্তির ওপরে চাপ পড়ে, তার ফলে মনের পূর্ণাঙ্গ গঠন হয় না—এক অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। এই অসম্পূর্ণতা থেকে যে পূর্ণবয়স্ক মানুষ তৈরী হয়—তার মনে, ব্যবহারে এবং মতে নানান খুঁত থেকে যায়। এইসব খুঁতগুলি আবার এক সুন্দর সহজ সামাজিক জীবনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মত বীভৎস প্রকাশ মানুষের সমাজে কেন হল,এর জবাব খুঁজতে গিয়ে অবচেতন মনের ওপর চাপা ভয় ইত্যাদিকেই মনোবিজ্ঞানীরা দায়ী করেছেন। তাই ন্যাচারালিস্ট-দের উদ্দেশ্য, মনের সব আগল সরিয়ে মনের মাঝে এক মেঘমুক্ত আকাশ তৈরী করে দেওয়া, যেখানে ভয় হিংসা দ্বেষ কোনো কিছুরই স্থান নেই। যে শিশু বা কিশোরকে ভয় কখনই দেখানো হয়নি, সে ভয় কখন পাবেও না, আবার যাকে কোনো অহেতুক কঠোরতার মাঝে ফেলা হয়নি, সে অন্যের প্রতি ব্যবহারেও অহেতুক কঠোর হবেনা। এমনি এক স্বপ্নই ন্যাচারালিষ্টরা দেখেছেন।

ন্যাচারালিষ্টদের এই স্বপ্ন দেখা অনেকখানিই বাস্তব বলে আমার মনে হয়। গাছ ফুল এবং প্রকৃতির আর সব কিছুই যেমন সূর্যের আলোতে সহজ সতেজ স্বাভাবিকতা নিয়ে বাড়ছে তেমনি করেই মানবশিশুরও স্বাভাবিক বৃদ্ধি হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-প্রচেষ্টার মূলেও এই ভাবই লুকানো রয়েছে। সহজ পরিবেশে মানুষ এক সহজ প্রকাশের ভেতর দিয়েই পূর্ণতা লাভ করতে পারে। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন আসে—এই যে আত্মপ্রকাশ, এই যে বিকাশের কথা আমরা বলছি—সে কোন্ বিকাশ? শান্ত শতাব্দীর সভ্যতা এবং কৃষ্টির বাইরে মানুষকে আজ আমরা ভাবতে পারি না—আজকের মানুষ এক স্রোতস্বিনী-পুষ্ট মহানদের সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ মানব-সন্তানের পূর্ণ-বিকাশের জন্য ন্যাচারা-লিজমের সঙ্গে অনুশাসনও যতটা প্রয়োজন ঠিক তেমনই প্রয়োজন অতি বিচিত্র কৃষ্টির ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ এক পরি-বেশের প্রভাব। তাই প্রভাব বা ইম্প্রেসনকে একেবারে বাদ দিয়ে চলা সম্ভব নয়। মন্টেসরীর মত অবাধ ন্যাচারালিষ্টও তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণতার জন্য এক স্কুলের বন্ধন এবং বাধ্যতার প্রয়োজন মেনে নিয়েছেন। এই স্কুলের পরিবেশে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিমূলক সব রকম উৎকৃষ্টতারই প্রভাব রয়েছে। তাই ন্যাচারালিজমের সাথে যে প্রভাবগুলি চরিত্র গঠনে সহায়ক যেমন ভাল বই, আদর্শজীবনচরিত ভাল কবিতা ইত্যাদির প্রভাব সকল সময়ই প্রয়োজন। এই প্রভাব মাত্র হয়তো শিক্ষকের মাধ্যমেই ছাত্রদের কাছে পৌঁছবে এবং সেটুকুকে মেনেই নিতে হবে।

অবশ্য অবদমনের অনুশাসনকে আমরা এক-রকম বাতিলই করে দিয়েছি। সমস্তটুকু ভাবলে মনে হয়,ছাত্রছাত্রীর জীবনে অনুশাসনের এক আধার

স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে তোলবার চেষ্টা করা শিক্ষকের কর্তব্য। ছাত্রের ব্যক্তিত্বকে সাদরে গ্রহণ করে তাকে জ্ঞানের এবং নৈতিকতার দিগ্‌দর্শন করাতে যেটুকু প্রভাবিত করা প্রয়োজন সেটুকু করা শিক্ষকের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে ভীতি বা বিনয়ের যুক্তিকে পোষণ করা অনুচিত। জীবনব্যাপী এক অনুশাসন—যার কথা রাশ্ zuebt শব্দটি ব্যবহার করে বোঝাতে চেয়েছেন, যদি সৃষ্টি করতে হয় তাহলে শিক্ষককে ছাত্রের মিত্রের আসনই গ্রহণ করতে হয় এবং এই মিত্রতার অবস্থায় আসবার আগে যত সংঘাত, যত ভুলবোঝা ছাত্র এবং শিক্ষকের মাঝে থাকুক না কেন, কেবলমাত্র ছাত্রের বুদ্ধি এবং যোগি জাগিয়েই তার অবসান ঘটানো উচিত। এরই ফলে ছাত্রের চিত্রবৃত্তির স্ফুরণ হতে পারে। কিছু বৃত্তির স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ এবং উপযোগী প্রকাশের মাঝে সকালন তখনই সম্ভব, যখন ছাত্র এবং শিক্ষক পরস্পরের একান্ত কাছে এসেছেন। এই কাছে আনা ভয় দেখিয়ে বা অত্যধিক শ্রদ্ধা দাবী ক'রে সম্ভব নয়। মিত্রতাই এর একমাত্র পথ। শিক্ষকের সাহচর্য পেলে ছাত্র তার অনেক সমস্যারই সহজ সমাধান পেতে পারে এবং তার জীবনের এক বিস্তৃত কাঠামো প্রস্তুত করতে পারে।

অল্প দিন হল ডাঃ মারগারেট এল্, করম্যাক ভারতীয় ছাত্রদের দুর্বিনীত ব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান করে আমাদের কিছু তথ্য দিয়েছেন। তাঁর মতে আমাদের উচ্চশিক্ষার প্রায় সব প্রতিষ্ঠানই রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত—বিশেষ করে উত্তর ভারতে এ সত্যটি অত্যন্ত প্রকট। তাঁর মতে এই সব বিদ্যায়তনগুলিতে কোনো স্বতন্ত্রতা না থাকার ফলেই এমন সব অঘটন ঘটে। সরকারী প্রভাব এবং বেসরকারী স্বার্থের ছাপ ছাত্রদের জীবন বিষিয়ে দেয় এবং যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া বলে সেটি সম্পূর্ণ রূপেই হারিয়ে যায়। একান্ত সাধারণ বুদ্ধিতেও একথার সত্যতা অনুভব করা যায়। এছাড়া গুরু শিষ্যের সম্পর্কের গভীরতা এবং সত্যতার ওপরেও তিনি জোর দিয়েছেন, কারণ ভারতের মাটিতে সেটা নাকি একান্তই প্রয়োজন। এর মাঝে ছাত্রদের পিতামাতার সঙ্গে একটি সংযোগ স্থাপনও তিনি প্রয়োজন মনে করেছেন। এই বিদেশিনী বেশ গভীর ভাবেই আমাদের সমস্যা-গুলিকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর কথার মূল্য আমরা ধীরে ধীরে বুঝবো বলে আশা হয়। এঁর কথাগুলি ভাবলে মনে হয়, আমাদের শিক্ষায় এবং সমাজের সকল খুঁটিরই কিছু অংশ বদলের প্রয়োজন এবং ছাত্রদের অহেতুক ইমভিসিপ্লিন বলে ছাপ দিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। সমাজ সংস্কারকেরা যতদিন সামাজিক সুস্থতা না আনতে পারেন ততদিন শিক্ষক এবং শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণকারীরা নিজেদেরও কিছু সংশোধনের প্রচেষ্টা করুন, ইত্যবসরে ছাত্রেরা পুরানো ভাঙাচোরার আওতা থেকে বেরোবার চেষ্টা করুক।

ছাত্রজীবন ঃ সিটি কলেজ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

(পূর্ব প্রকাশনের পর)

১১

বলাই সিংহ লেনস্থ সিটি কলেজের মেসের কথা একটু আগে বলিয়াছি। এই মেস দ্বিতল বাটী, দুইটি ব্লক বা ভাগ। পশ্চাৎভাগের দ্বিতলে একটি প্রকোষ্ঠে তখন থাকিতেন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ। দ্বিতল এবং নিম্নতলের এক প্রকোষ্ঠে যতদূর মনে হয় কলেজের ডিমনেসট্রেটর এবং মেসের সুপারিনটেনডেন্ট দুর্গাচরণ মিত্র সপরিবারে ছিলেন। নিম্নতলের আর একটি প্রকোষ্ঠে ছিলেন পূর্বোক্ত পারসেনটেজ ক্লার্ক। সম্মুখভাগের অংশটিই পুরাপুরি ছাত্রাবাস। বোধ হয় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন ছাত্র এখানে থাকিত। ছাত্রদের আহারাদির স্থান ছিল পশ্চাৎভাগে। আমি সম্মুখভাগের নিম্নতলে একটি ঘরে ছিলাম একবৎসর। দ্বিতীয় বৎসরে যাই অন্য একটি ঘরে। এই ঘরটির একটু ঐতিহ্য আছে। রামমোহন রায় হোস্টেলে তিনটি এস্টাবলিসমেন্টে যেমন দুইজন ছাত্রের নিঃখরচায় আহারের ব্যবস্থা ছিল, তেমনি ঐ ঘরের দুইটি সিটে বিনাভাড়ায় দুইজন ছাত্রকে থাকিতে দেওয়া হইত। আমি গিয়া দেখি, এই প্রকোষ্ঠে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত দুর্গাশরণ চক্রবর্তী রহিয়াছেন। অন্যজনের কথা এখন আর স্মরণ নাই, দুর্গাশরণ কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্র। সংস্কৃতে অনার্স লইয়া অধ্যয়নে রত। দেখিতাম কিরূপ নিষ্ঠা ও মনোযোগের সঙ্গে তিনি পাঠ্যপুস্তক সমূহ পড়িতেন, দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারি নাই। দুর্গাশরণ বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে, যতদূর মনে হয় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এম-এ পরীক্ষায় হন দ্বিতীয়। উভয় পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান লাভ করিয়াছিলেন অশোকনাথ ভট্টাচার্য্য (পরে শাস্ত্রী)। দুর্গাশরণ এম-এ পরীক্ষায় আর একটি গ্রুপে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান পাইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পরে তিনি বাংলায়ও এম-এ পাস করেন। তিনি আজীবন শিক্ষাব্রতী। বাগেরহাট কলেজে এক ক্রমে পাঁচ বৎসর অধ্যাপনা করিয়া পরে কলিকাতাস্থ বিদ্যাসাগর কলেজে কর্ম লইয়া আসেন। তিনি ক্রীড়ামোদীও বটেন। অধ্যাপনা এবং খেলাধূলায় অনুরাগ হেতু তিনি বরাবর ছাত্রদের শ্রদ্ধা প্রীতি অর্জন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া আমরা তখন বিশেষ ধন্য হই।

• ভাদ্র সংখ্যায় ২৩১ পৃষ্ঠায় "গ্রীষ্মের ছুটি তখন" হইতে ১০ শীর্ষক পরিচ্ছেদের আরম্ভ হইয়া ঐ সংখ্যাতেই শেষ হয়।

চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ শ্রেণীর আর একজন ছাত্র ছিলেন শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম পাল। তিনি বর্ধমান জিলার অধিবাসী, জাতিতে সদ্‌গোপ এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। আমাদের সময় তখন রাজনৈতিক এদল সেদল লইয়া তর্ক-বিতর্ক বা কথা কাটাকাটি খুব কমই হইত। কারণ, রাজনীতির পটভূমিকায় একমাত্র মহাত্মা গান্ধীই তখন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে বিদ্যমান। নরমপন্থী চরমপন্থী সকল দলের লোকই তখন এই জ্যোতিষ্কের আলোয় দীনপ্রভ। আমরা সমাজসংস্কার তথা সমাজের

উন্নতি কি কি উপায়ে হইতে পারে তাহা লইয়াই তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হইতাম, রাধাস্তাম ছিলেন রক্ষণশীল। তিনি আসিলেই বিতর্কটা বেশ জমিয়া উঠিত। একদিনের কথা মনে পড়ে—বিধবা-বিবাহ লইয়া কথা, রাধাস্তাম খোঁড়া লোক, তিনি ইহার বিরুদ্ধে যুক্তিজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। আমরাও নাছোড়বান্দা, তাঁহার কথার যথাবিধি উত্তর দিতে লাগিলাম। কিন্তু যখন পরস্পরের যুক্তিতে আর কুলায় না তখন সমুখস্থ টেবিল বেচারীর উপর যত আক্রোশ! টেবিল থাবড়াইয়া ভিনিও বলেন আমরাও বলি। সাধারণতঃ নৈশ ভোজনের পরই এইরূপ তর্কাতর্কি চলিত। ঐ দিনের আসর এত জমিয়াছিল যে কখন রাত্রি একটা বাজিল তাহা আমরা টেরই পাইলাম না। রাধাস্তাম বর্ত্তমানে ব্যবসা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আছেন শুনিয়াছি।

মেস বাড়ীতে প্রথম হইতে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রেরা ছিল। আমি যখন ওখানে যাই তখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর বিজ্ঞান-বিভাগের ছাত্র শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম সামন্ত ঐ মেসেরই বোর্ডার হয়। পুরুষোত্তমের পিতা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কিন্তু পুত্রের চালচলন অত্যন্ত সাদাসিধা, কথাবার্ত্তারও বেশ সরলতা ছিল। আমাদের উভয়ের মধ্যে সখ্যপ্রীতি ঘটিল কিছুদিন যাইতে না যাইতে। আমরা প্রায়ই একসঙ্গে বেড়াইতাম, এখন কৌতুক করিয়া বলি, কিন্তু তখন বাস্তবিকই গঙ্গার আউটরাম ঘাটই ছিল আমাদের বৈঠকখানা। তখন চিত্তরঞ্জন এভেন্যু (ঐ সময় নাম ছিল সেন্ট্রাল এভেন্যু) সবে মাত্র বাহির হইয়াছে। যেখানে বিডন ষ্ট্রীট ও সেন্ট্রাল এভেন্যু সংযুক্ত, তাহার ঠিক উত্তর দিকে বিডন ষ্ট্রীটের উপর ছিল মনোমোহন থিয়েটার। এই পর্য্যন্ত তখন ঐ রাস্তা খোলা হইয়াছে। আমরা প্রেসিডেন্সী কলেজের হাতার মধ্য দিয়া সোজাসুজি এডেন্যাতে পড়িতাম। সেখান হইতে ইলেকট্রিক কোম্পানীর বাড়ী পর্য্যন্ত দুই পার্শ্বে বিস্তর খোলা জায়গা ছিল, থাকে থাকে দুই একখানা বাড়ী ব্যতীত। গাছগুলির চারা তখন সবে রোপণ করা হইয়াছে। এই সব খোলা জায়গায় শীতকালে কার্ণিভাল ও সারকাস পার্টি ডেরাও করিয়া রাখিত। এখানে অদ্ভুত অদ্ভুত খেলা দেখান হইত। লোকেরও ছিল ভীষণ ভিড়। এই সব সারকাস কার্ণিভাল এখন কোথায় গেল! আমরা দুই বন্ধুতে প্রায় প্রত্যহ এই পথে গিয়া এসপ্লানেডে পড়িতাম। পরে রাজভবনের পাশ দিয়া ইডেন গার্ডেনের কাছ বরাবর রাস্তা পার হইয়া আউটরাম ঘাটে গিয়া বসিতাম। গঙ্গাবক্ষে ভাসমান জাহাজ, অগণিত নৌকা, চাটগাঁয়ে ও নোয়াখালির ভাষায় নৌকা-মাঝিদের আলাপ-আলাপন, জলস্রোতের সোঁ সোঁ শব্দ, ওপারের আলোকমালা, সব মিলিয়া আমাদের নিকট বেশ একটা মনোরম দৃশ্য বলিয়া বোধ হইত। পূর্ব্বেকার হাঁটার অভ্যাস তখনও ছাড়ি নাই। মনে পড়ে অন্য এক বন্ধুর সঙ্গে হাঁটাপথে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, চিড়িয়াখানা, কালীঘাট, যাদুঘর প্রভৃতি দেখিতে যাই এবং চার পাঁচ ঘন্টার মধ্যেই বেলে ফিরিয়া আসি। তখন লোকেও হাঁটিয়া যাইতাম। পুরুষোত্তম পরবর্ত্তীকালে আইন-ব্যবসায়ে আশাতীত সাফল্য অর্জন করিয়াছে। পিতার অন্য সম্পত্তি সত্ত্বেও উহার কিছু সে লয় নাই, আত্মনির্ভরতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পুরুষোত্তম।

(ক্রমশঃ)

শিক্ষা

স হি কল্যাণরূৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৯শ বর্ষ | কার্তিক, ১৩৬৮ | ১২শ সংখ্যা

আলোচনা

জাতীয় সংহতি ও শিক্ষা

সম্প্রতি জাতীয় সংহতির অভাব দেখিয়া চিন্তাশীল মনীষিরা উপায় খুঁজিতেছেন। কি করিয়া ধ্বংসের হাত হইতে দেশকে ও জাতিকে রক্ষা করা যায় আজ ইহাই তাঁহাদের ভাবনা। শুধু শিক্ষক মহলে বা রাজনৈতিক মহলে নয়, বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণরদের বা রাজ্যপালদের সম্মেলনেও এই চিন্তা সর্ব্বত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। সভাপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন বলিয়াছেন, জাতীয় সংহতি রক্ষা করিতে হইলে শিক্ষার মাধ্যমে তাহা সম্ভব, নেতাদের আদর্শে তাহা সম্ভব। আমাদের মনের মধ্যে কায়া-প্রাচীর নির্মাণ করিয়া রাখিয়া দিয়াছি, তাহা দুর্লঙ্ঘ্য। অতীতের ভুল ভ্রান্তি স্বীকার করিয়া নিজেদের শক্তি দেখাইতে হইবে। ঐতিহ্য হইতে রক্ষা পাইতে হইলে বৈপ্লবিক চিন্তা চাই, বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী চাই। অতীতের বজ্রভূমি হইতে অনন্ত অগ্নিশিখা আনিতে হইবে। নির্বাপিত ভস্মরাশি লইয়া থাকিলে চলিবে না।

ছাত্র-অবিনয়ের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, ছাত্রদের উপর শিক্ষকদের প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে, তাঁহাদের পরিশুদ্ধ জীবনের প্রভাব পড়িলে ছাত্র-অবিনয়ের অবসান ঘটিবে।

উপাচার্য সম্মেলন

সম্প্রতি দিল্লীতে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্যদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ শ্রীমালি বলেন যে সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে সততা, উন্নত আদর্শ, নৈতিক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি আশা করা যায়, সেজন্য বাহির হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মকর্তৃত্বে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু যদি দেখা যায় যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় ন্যায়াচারণে কোন ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থের বশে আদর্শ হইতে চ্যুত বা ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তবে তখন রাষ্ট্র আর নিরপেক্ষ দ্রষ্টা হইয়া থাকিতে পারেন না, রাষ্ট্রকে বাধ্য হইয়া হস্তক্ষেপ করিতেই হয়।

তবে যখনই এইরূপ ঘটিয়াছে, তখনই শ্রীমালি বলেন, অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ্‌গণের পরামর্শে তাহা

হইয়াছে এবং দেশের শিক্ষাবিদ্ ঐ সম্মেলনেই উপস্থিত আছেন।

ছাত্র-ধুবিনয়ের কথায় কিন্তু শ্রীমালি বলেন যে শিক্ষকেরা এজন্য কম দায়ী নহেন। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইহাই প্রধান ত্রুটি—ছাত্রদের উপদেশ বা পরামর্শ দিতে কেহ নাই। শিক্ষকেরা সেজন্য প্রস্তুত বা অগ্রসর নহেন। ছাত্রদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ করিয়া এক একজন 'টিউটর'-এর হাতে দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান হয়—সর্বদা তাঁহাদের পরামর্শ পাইলে ছাত্রদের ঠিকমত পরিচালনা হয়।

ছাত্রসমাজের আচরণে পরমতে অসহিষ্ণুতা ও গোঁড়ামি দেখা গেলে বুঝিতে হইবে, শিক্ষাব্যবস্থার গুরুতর গলদ উপস্থিত হইয়াছে। শুধু মননবৃত্তির উৎকর্ষসাধন তো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, মানুষের ভাব ও আবেগের শিক্ষাও চাই, রুচির উৎকর্ষ চাই, চরিত্র গঠন হওয়া চাই।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরও একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় খুলিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার প্রসার হইলে আমার এই প্রচেষ্টা। তবে সর্বদাই মনে রাখা চাই যে মূল পুষ্ট হইলে অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ঠিক থাকিলে তবেই উচ্চ শিক্ষার সুব্যবস্থা হওয়া সম্ভব। সেই দিক দিয়া কাজ দেখাইতে পারিলে বিশ্ববিদ্যালয় তো স্বাভাবিক পরিণতি। তবে হয়তো আমাদের অবস্থার উপর হইতে ব্যবস্থা না করিলে, নীচে শক্ত শ্যামল বসুন্ধরা হইবে না—যাহা হউক, শিক্ষার অগ্রগতি চলুক, দূরত্বের জন্য উচ্চ শিক্ষার বাধা না হউক, কিন্তু উচ্চ শিক্ষা সুফলপ্রসূ হওয়াও চাই, লোক দেখানো ব্যবস্থা না হয়—শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই ইহাতে সহানুভূতি থাকিবে। একটা ব্যবস্থা হইলে অভিজ্ঞতার আলোকে তাহার ত্রুটি সংশোধন সম্ভব। একথা ঠিক যে আমাদের দেশের বহু অংশ উপেক্ষিত হইয়া আছে। বিশ্ববিদ্যালয় নিকটবর্তী স্থানে হইলে সে সকল অংশে শিক্ষাবিস্তারের মনোযোগ পড়িবে এবং শিক্ষার উন্নতি হইবে।

স্মরণে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীকিতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্প্রতি বিয়োগ হইয়াছে। তিনি ব্রতনিষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন, বিশেষ করিয়া মূলধন-মূলক ভাষা তত্ত্বে তাঁহার অধিকার ছিল। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রচারে তাঁহার সমধিক আগ্রহ ছিল। নিজ অর্থব্যয়ে তিনি সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা মঞ্জুষা চালাইতেন। তিনি তাঁহার বিভিন্ন বিষয়ে অভিমতে অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন। আচারশীল ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের হৃদয় ছিল উদার। কাহারও কোনও সৎকার্য উৎপত্তি হইলে তিনি তাহা বিসর্জন করিতেন। তাঁহার সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল ছিল। কর্মরত অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মঞ্জুষার অর্থের অভাব সবে দূর হইয়াছে, এমন সময় তাঁহার ডাক পড়িল। যাঁহারা অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে জানিতেন তাঁহারা অধ্যাপক মহাশয়ের সরলতা, স্পষ্টবাদিতা, অমায়িকতা ও পাণ্ডিত্যের কথা শোকাতুর চিত্তে স্মরণ করিবেন।

একখানি পত্র

বর্তমান সংখ্যায় আমরা বিশেষ পর্যায়ের শিক্ষকগণের এক পত্র প্রকাশিত করিলাম। যখন ইঁহাদের নিয়োগ হয় তখন খানিকটা শিক্ষিত বাঙালীর কর্মহীনতা দূর করিবার জন্যই আপাততঃ একটা ব্যবস্থা হইয়াছিল। এখন কয়েক বৎসর হইয়া গিয়াছে। একটা সামঞ্জস্য মূলক ব্যবস্থা হওয়া যে অতি প্রয়োজন, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। ইঁহাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা বিধানের জন্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জগদীশ আশ্রম

শ্রীসগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সেদিন এনয় প্রেসে বসিয়া এ, টি, দের সঙ্কলিত মস্ত বড় নূতন বাংলা অভিধানখানি নাড়াচাড়া করিতেছি, শেষের দিকে মনীষীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে, ইচ্ছা হইল মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের নামটি দেখি, তৎসঙ্গে আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের নাম দেখা স্বাভাবিক। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা বলিলেই বিবেকানন্দ, রামমোহন বলিলেই কেশবচন্দ্রের কথা আপনা হইতেই মনে উদয় হয়। আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের নাম তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, কিন্তু তাঁর নামটি অভিধানখানিতে পাইলাম না। মনটা ব্যথিত হইল, সুযোগ হইলে উক্ত অভিধানের কর্তৃপক্ষের কানে এ বিষয় তুলিব। অন্য দিক চিন্তা করিলে কর্তৃপক্ষের ইহাতে কোন ত্রুটি নাই। আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায় আশ্চর্যরূপে কোমলে-কঠোরে গঠিত ছিলেন। তিনি এক সময়ে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারকে লিখিয়াছিলেন,

"না হব জনক কিম্বা গ্রুহকার
দীক্ষাগুরু কভু হব না আমি।"

তিনি জগতে কোন কিছু রাখিয়া যাইতে চাহেন নাই। বর্তমানে আমার আয়ুঃসূর্য পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছে। কেন যেন গুরু-ঋণ ও ঋষি-ঋণ আমাকে প্রণোদিত করিতেছে, আচার্যদেবের সান্নিধ্য লাভের ইতিহাস বর্ণনায়। কেন জানিনা, তাঁহার বিরাট ও মহৎ জীবন সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া শঙ্কিত হইতেছি, পাছে আমি আমার অক্ষমতা দ্বারা তাঁহাকে ছোট করিয়া ফেলি।

সোহাগদল বিভিল মাদ্রাসা হইতে মাইনর পরীক্ষা পাস করিয়া ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি আমার অগ্রজের সঙ্গে বরিশাল যাইতেছি ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার মানসে।

ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম হইতে শহরে যাইতেছি, মনে কত ভয়, কত আতঙ্ক, কত উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ধারণা ছিল শহরে ভাল ইংরাজি পড়ানো হয় তাই বরিশাল যাইবার নৌকায় বসিয়াও ভয়ে ভয়ে বেণীমাধব গাঙ্গুলীর ছোট ট্রানস্লেশনখানি বার বার পড়িতেছিলাম। আমার আহার ও বাসস্থান ঠিক হইল সদর রোডের কাছেই সিংহদের বাড়ীর গায়ে, এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। বরিশাল পৌঁছিয়াই বিকালে আমার অগ্রজের সঙ্গে স্যরের বাসায় গেলাম। স্যর মানে আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়। বরিশালে সকলেই স্যরের বাসা বলিত। জগদীশবাবুর বাসা বলিলে—বোঝাবুঝি হইত, এরূপ সাধারণের ধারণা ছিল, যদিও বর্তমানে ইহার নাম 'জগদীশ আশ্রম'। আমার হৃৎকম্প হইতেছিল. কোন প্রকারে আচার্যদেবের পায়ের ধূলা গ্রহণ করিলাম। তাঁহার গৌরকান্তি. প্রশান্তমূর্তি বিমোহন। শ্রীমুখনিঃসৃত দুই একটি ধীর শান্ত মিষ্ট বাণীতে প্রাণ শীতল হইল, কত আনন্দে, কত উল্লাসে যে বাসায় ফিরিলাম এই বৃদ্ধ বয়সেও সেই অপূর্ব অনুভূতির শিহরণ হয়। মাকে ছাড়িয়া এই প্রথম দূরে; অন্য দিকে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য 'কিটএকজামিনেসনে'র চিন্তা। দুই তিন দিন পরেই আমাদের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। ৫৫ জন ছাত্র ক্লাস সেভেনে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দিল। কৃতকার্য ছাত্রদের নাম টাঙ্গান হইল। লিষ্টে আমার নাম দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুলভাবে আচার্যদেবের কাছে গেলাম। তিনি বলিলেন "তুমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছ।" পুনরায়

লিষ্ট দেখিলাম, সত্যই আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছি। প্রথমবারে আমার দেখার ত্রুটি তখন বুঝিতে পারিলাম, প্রথমে পদবী তারপর নাম। এই এক নূতন শিক্ষা হইল শহরে। ক্লাস সেভেনে ৪টি সেকশন এ, বি, সি, ডি ; আমি 'এ' সেকশনে ভর্তি হইলাম। আমাদের ক্লাস-টিচার তরণীকান্ত সেন। তিনি ইংরাজি পড়াইতেন। কি সুন্দর তাঁর উচ্চারণ, কি পড়াইবার ধরন, কি ব্যবহার! বারান্তরে তাঁর জীবনী আলোচনার আকাঙ্ক্ষা রহিল। পণ্ডিতের শিক্ষক যোগেশ চট্টোপাধ্যায় (মনীদা), সংস্কৃত শরৎ ঘোষ (পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত) ইতিহাস ভূগোল পড়াইতেন মনোরঞ্জন বাবু (ডাক্তার তারিণীবাবুর পুত্র), বাংলা পড়াইতেন সলিলবাবু। নূতন স্কুল, নূতন পরিবেশ, মাকে ছাড়িয়া দূর আত্মীয়ের বাড়ী থাকা সব মিলিয়ে মন যেন উদ্বিগ্ন থাকিত। কিছুতেই মন বসিত না। সিংহদের বাড়ীর পুলের উপর সকাল বিকাল বসিয়া থাকিতাম। রাস্তার লোক চলাচল, গাড়ীঘোড়া, সাইকেল, হৈ হুল্লোড়—শহরের নূতন অভিজ্ঞতায় মন খানিকটা হালকা হইত।

একদিন আকস্মিক ভাবে চোখে পড়িল, আচার্যদেব রাস্তার পাশ ধরিয়া আসিতেছেন ; অতি ধীর পদক্ষেপে, প্রতি পদক্ষেপ যেন মাপা। তাঁর গৌরকান্তি দেহ, তার মধ্যে প্রশান্তি, তাঁর শুভ্র, তাঁর পোশাক একটি শুভ্র কোট, তার উপর শুভ্র একখানি চাদর জড়ানো। পায়ে পরিষ্কার চটি, মাথায় ছাতা। তাঁর ভাবগম্ভীর মূর্তি আমাকে আকৃষ্ট করিল। আমি কোন ছার, 'এ রূপ যে দেখেছে, সেই মজেছে'। একবার মহাত্মা অশ্বিনীকুমার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট তাঁর জগাকে (আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে করিয়া নিয়া গেলেন। ঠাকুর সে স্নিগ্ধ নবনীত মূর্তি দর্শনে বলিয়া উঠিলেন, "অশ্বিনী, এই সত্ত্ব তোলা মানুষটুকু কোথায় পাইলে?" রাস্তায় যখন অপরে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করিত, তখন তাঁহার পুষ্পহস্ত তুলিয়া তার মস্তক স্পর্শ করিতেন, ধীর শান্ত ভাবে একটু আধটু আলাপও করিতেন। আমার মনে বড় ঈর্ষা জাগিত। মনে বড় উদগ্র আকাঙ্ক্ষা হইত তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে। একদিন আমিও ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলাম। মাথায় হাত দিলেন বটে, কিন্তু কোন বাক্যালাপ করিলেন না। মনে কত অনন্ত কৌতূহলপূর্ণ আশা দোলা খাইত, উনি যদি আমাকে আশ্রমে যাইতে বলেন, দুই একটি কথা বলেন ইত্যাদি। সিংহদের বাড়ীর পুল হইতে আশ্রম দুই এক পথ মাত্র। অনেক দিন আশ্রমের নিকট মিনিটের যাই আবার ফিরিয়া আসি। আমি নির্দিষ্ট সময়ে সিংহদের বাড়ীর পুলের উপরই অপেক্ষা করিতাম। আরও কয়েকদিন পদধূলি গ্রহণ করার সুযোগ হইল বটে, কিন্তু কোন বাক্যালাপ করেন নাই বা আশ্রমে যাইতে বলেন নাই। মনে দুঃখ হইত, আচার্যদেব আমার মনের ভাব বোঝেন না এজন্য। নিজের উপর একটু ধিক্কার যে না আসিয়াছে তা নয়।

বর্তমানে জীবন-সায়াহ্নে অন্য ব্যাখ্যা করি। তিনি সবই বুঝিতেন, হয়তো বরিশালের সিদ্ধপুরুষ সোনা ঠাকুরের উপদেশ, "দেখিও তোমার যেন শেষে ভরত মুনির অবস্থা না হয়" এই উপদেশ মানিয়া চলিতেন, ছাত্রগণের প্রতি তাঁহার একান্ত সন্তানবাৎসল্য অন্তরে ফল্গুনদীর মত প্রবাহিত হইত। কিছু দিন পরে জানিতে পারিলাম, প্রতি রবিবার সকালে আশ্রমে বরিশালের তনী জানী উপাসনায় যোগদান করেন। আমি অধিকাংশ রবিবারে উপাসনাগৃহে উপস্থিত হইতাম। উপাসনার গৃহের এক পার্শ্বে পর্দার আড়ালে মহিলাদিগেরও বন্দোবস্ত ছিল। এক কোণে চুপটি করিয়া আচার্যদেবের ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিতাম। এক রবিবারে ৭ টার এমন তন্ময় হইয়া আচার্যদেবের ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম, যখন সভা ভঙ্গ হইল, বাহিরে আসিয়া দেখি সূর্যদেব প্রায় মাথার উপরে। জীবনে বোধহয় এমন মনঃ-

সংযোগ কোন দিনই হয় নাই, আর হইবেও না। এমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আবালবৃদ্ধবনিতা শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই বুঝ, সকলেরই উপভোগ্য, সকলেরই উপলব্ধ। কঠিন দুরূহ বিষয়কে সহজ সরল করিয়া কিশোর যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধকে পরিবেশন করিতেন একই ব্যাখ্যা, কিন্তু সকলেই পরিতৃপ্ত। ইহাই অসাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। আচার্যদেবের গায়ে একখানি শুভ্র চাদর জড়ানো থাকিত, তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতেন। মাঝে মাঝে গৌরকান্তি ভাবাবেশে সোনালোপের ন্যায় রক্তাভ হইত। কোন কোন সময় চক্ষু হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত, আস্তে চাদর দ্বারা মুছিয়া ফেলিতেন। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসে অধ্যয়নকালে হেরম্ব মৈত্র মহাশয়ের কারলাইল পড়াইবার সময়ে আচার্যদেবকে স্মরণ হইত।

১৯২০ সালে তমালতলার ঘরে থার্ড ক্লাশে পড়ি। দুই গ্রহ কি উপগ্রহের পরস্পর সংঘর্ষণে প্রলয় হইবে, জগৎ ধ্বংস হইবে, এই গুজব সকলের মুখে। মনে মনে বড়ই আতঙ্ক, বাড়ীর জন্য, মায়ের জন্য, আত্মীয় স্বজনের জন্য, কেবল ইচ্ছা হইত মাকে বলি "বাড়ী চলুন না, সবাই একত্র হয়ে মরি।" হঠাৎ একদিন আচার্যদেব ক্লাসে ক্লাসে ঘুরিয়া বলিয়া গেলেন, "কোন ভয় নাই, আমি গণনা করিয়া দেখিয়াছি, কোন প্রলয় হইবে না"। ছাত্রদের, সাধারণের আর কাহারও কোন আতঙ্ক রহিল না, তাঁহার বাণীতে সকলের বিশ্বাস ছিল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হইলেও তিনি বি.এ ক্লাসে জ্যোতির্বিদ্যা পড়াইতেন। তিনি নির্জনে নিভৃতে উদার আকাশতলে কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া জ্যোতিষমণ্ডলীর গতিবিধি দূরবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে নিরীক্ষণ করিতেন, এখন সে সকল খবর পাই। তখন কিন্তু এসকল খবর কিছুই রাখিতাম না, কেবল তাঁহার বাণীই সত্যপূর্ণ, তিনি সত্যময়, এই আশ্বাসই যথেষ্ট ছিল। আজ সূর্য এখন পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছে, তৃতীয় মহাসমর হইলে হাইড্রোজেন বোমা, এটম বোমা, রকেটের যুদ্ধে পৃথিবী একেবারে ধ্বংস হইবে আমি, কিন্তু এখন আর সেই কৈশোরের আতঙ্ক নাই।

১৯২১ সালে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়াছি, বেন বিল্ডিং-এর পূর্বদিকে দুইটি পাকা প্রকোষ্ঠ নির্মিত হইয়াছে; একটিতে আমাদের 'এ' সেক্শন। বরিশালে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন হইল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের মাঠে। সভাপতি ছিলেন বাগ্মীবর বিপিনচন্দ্র পাল মহোদয়। আতির অনক মহাত্মাজীর ১৯২০ সালের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সর্ব প্রথমেই যেন পুণ্যশ্লোক অশ্বিনী কুমারের প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের উপরই বিশেষভাবে পরীক্ষিত হইল! স্বর্গীয় ভুবনেশ্বর ঘোষ আমার প্রথম শিক্ষক এবং ব্যবহারিক জীবনের উপদেষ্টা; আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "নগেন, গাঙ্গাস্কুলের নূতন পাকা বাড়ী প্রস্তুতের পরই আমাকে গাঙ্গাস্কুল ত্যাগ করিতে হইল, আবার বি, এম স্কুলের এই দুইটি নূতন পাকা প্রকোষ্ঠ করিয়া এ স্কুলও ছাড়িতে হইবে, মনে হইতেছে।" দুই একদিন পরই দেখি শিক্ষকগণ আনমনা, অথচ কোন হৈ চৈ নাই, কোন টুঁ শব্দটি নাই। প্রায় ১২।১৩ শত বিদ্যালয়ের ছাত্র নীরবে আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের আশ্রমে দল বাঁধিয়া উপস্থিত। অধিকাংশেরই মুখে "গোলামখানায় পড়িব না"। বি. এম স্কুলকে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে, এই বুলি। আমার ক্ষুদ্র জীবন অন্য ধাঁচে গড়া, স্রোতের বিপরীত দিকে চলা আমার অভ্যাস। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কটক পার হইবার কালেই মনস্থ করিলাম, আমি জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়িব না, কেন যেন মনে হইল এ সাময়িক উত্তেজনা মাত্র। আবার সেই গোলামখানায়ই যাইতে হইবে। থাক, আচার্যদেব যাহাই যাহাই

ছাত্রদের ডাকিয়া তাহাদের মত গ্রহণ করিলেন। মুনিসাট গ্রামের মস্ত বড় ধনী মথুরা দাস মহাশয়ের দুই পুত্র সুরেন এবং জিতেন। ইহারা সুরেনবাবুর মেসে থাকিত। সুরেন উত্তেজনায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার বিবেক বলিতেছে আমি আর গোলামখানায় পড়িব না।" আচার্যদেব গম্ভীরভাবে বলিলেন "আমি আজ ধন্য। আমার এক ছাত্র আজ বিবেকের নির্দেশ পাইয়াছে। আমি কিন্তু আজ পর্যন্ত এরূপ বিবেকের বাণী পাই নাই।" এই সময়ে অশ্বিনীকুমার কারাবাসে ছিলেন। বি, এম স্কুল কয়েক দিনের মধ্যে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত হইল। প্রকৃত তথ্য জানিনা, এ আমার নিজস্ব অনুমিত, দিনের পড়া এত বড় প্রতিষ্ঠান, যে স্কুল পরিদর্শন করিয়া তখনকার সুপণ্ডিত অধ্যাপক কানিংহাম্ সাহেব বলিয়াছিলেন "বাংলা দেশের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের মত স্কুল থাকিতে বাঙ্গালী ছাত্ররা কেন যে অক্সফোর্ডে কেম্ব্রিজে বিদ্যাশিক্ষা করিতে যায়, আমি তাহা বুঝিনা", তাঁরই আদায় It may be called the Oxford of Bengal. যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ যেন বাছাই বিভিন্ন সুগন্ধি পুষ্পের একটি গাঁথা মালা, যে বিদ্যালয়ে প্রায় প্রতি বৎসরে ৪।৫ টা বৃত্তি লাভ করে, যে বিদ্যালয়ের ছাত্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে, যে বিদ্যালয়ের দরিদ্র বান্ধব সমিতি রেড্ ক্রশের মত সুনাম অর্জন করিয়াছে, সেই প্রতিষ্ঠানের উপর তাঁহার প্রতিষ্ঠাতার কি দরদ, কি মায়া থাকিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। একসময়ে অশ্বিনী কুমার বলিয়াছেন, এই স্কুল আমার জীবন-চরিত। কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। বরিশাল ত্যাগ করিবার প্রাক্কালে বলিয়া গেলেন —"আবার ফিরিব তার যোগে।" অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুসংবাদ আসিবে তারযোগে। অশ্বিনীকুমারের বহুমূত্র রোগে স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তদুপরি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের জন্য কি চিন্তা, কি দুঃখ, তা তাঁর আত্মাই জানিত। ভিক্টর হিউগো বলিয়াছেন, যিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি একটি জেলখানা বন্ধ করিয়া দেন। জাতীয় বিদ্যালয়ে আচার্যদেব দুই এক ঘন্টা ক্লাস নিতেন। কতক ছাত্র ফিলা স্কুলে ভর্তি হইল। স্বর্গীয় কবি জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দ দাস ভুবনেশ্বর ঘোষ যোগেশ-চন্দ্র ভরণীকান্ত সেন কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের নামজাদা শিক্ষকগণ পৃথক নূতন স্কুল খুলিলেন, ইহার নাম দেওয়া হইল 'মডেল স্কুল'। ইস্মাইল সিকদার বাড়ীর কাছে মাঠের মধ্যে এক ভাঙ্গা একতলা পাকা বাড়ীতে স্কুল। আমি মডেল স্কুলে সর্ব প্রথম ভর্তি হই। সত্যানন্দ দাস প্রধান শিক্ষক। প্রকৃত স্কুল-পরিচালনা ভুবনেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের হাতে। নদীর পারের কাঠগোলার রহমান ও আমার উপর ভার পড়িল মাইট্ (ভালা) এবং চিকনী (পাটির মত) ক্রয়ের। পরে অবশ্য চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ প্রভৃতি রহমানদের গোলায়ই প্রস্তুত হইয়াছিল। ছাত্র-সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ঐ ভাঙ্গা বাড়ীতেই স্কুল পরিদর্শন হইল। বলা বাহুল্য ১৯২২ সালেই মডেল স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইল। উত্তরপাড়া রাজা প্যারীমোহন কলেজের অধ্যক্ষ কিরণচন্দ্র গুপ্ত (গুরুদা) মহাশয় এই বৎসরই মডেল স্কুল হইতে পাস করেন। কয়েকমাস যাইতে না যাইতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ভাই এস আর দাস মহাশয়ের বাড়ীতে মডেল স্কুল স্থানান্তরিত হইল। পরে আরও দুইখানি বড় বড় টিনের ঘর তৈয়ারী হইল। স্কুলের ১৪।১৬ বৎসরের বাচ্চা দারোয়ান 'শরৎ'। শুনিয়াছি বর্তমানে সে পড়িয়াহাট বাজারে শাকসব্জীর দোকান করে। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের জাতীয়করণের প্রসঙ্গে মডেল স্কুলের উৎপত্তি, অপ্রাসঙ্গিক হইলেও না বলিয়া উপায় নাই। কয়েক বৎসর পরে মডেল স্কুলের ছাত্র এবং অধিকাংশ শিক্ষক ব্রজমোহন বিদ্যা-

সঙ্গেই পুনর্বিলিত হইয়াছিল। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের উপর এত বিপর্যয় হইয়া গেল, অথচ বর্তমান যুগের মত হৈ চৈ, শিক্ষকদের ভিতরে রেষারেষি বা দলাদলি ছিল না। ছাত্রদের মধ্যেও এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হইত না। তখন লেলাইয়া দিবার পার্টিও তেমন ছিল না।

আচার্যদেবের আশ্রমে রবিবাসরীয় অনুষ্ঠানে স্বয়ং আচার্যদেব ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। ভক্তিবিমিশ্রিত ব্যাকুল আগ্রহে রবিবারের অপেক্ষা করিত শত শত নরনারী ধনী নির্ধন শিক্ষিত অশিক্ষিত। মডেল স্কুলে পড়িলেও রবিবারের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাধা হয় নাই। এই সময়ে বৎসরে একদিন ধার্য ছিল, ধর্মরক্ষিণী সভায় আচার্যদেবের কাছে যার যে প্রশ্ন ইচ্ছা হইত জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তিনি তাহার জবাব দিতেন। আচার্য দেব চিরকুমার, পরম মাতৃভক্ত। তিনি তাঁহার মাতৃদেবীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন তিনি যেন কোন সময়ে তাঁহাকে বিবাহ করিতে না বলেন। বীরপ্রসবিনী জননীও কোন সময়ে আচার্যদেবকে বিবাহ করিতে বলেন নাই।

সাংসারিক জীবন হইতে দূরে থাকিলেও তাঁহাকে স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ অনেক সময় মিটাইতে হইত। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তাঁহার বিচার মানিয়া লইতেন। এমন কি স্নেহের একমাত্র ৪ বৎসরের পুত্তলি আচার্যদেবের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া অস্তিরোধ করিতেন। শিশু শিক্ষার পদ্ধতি দেখিয়া মনে বড় ঈর্ষা হইত কি সুন্দর বড় বড় হরপে যুক্ত অক্ষর বর্জিত উচ্চ জ্ঞানের বীজ শিশুর মস্তিষ্কে অনায়াসে অঙ্কুরিত করিতেন। আমি শিক্ষক হিসাবে আচার্যদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শিশুদের কাছ হইতে অতি অল্প সময়ে আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছি।

১৯২৯ সালে মডেল স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া আমার একণ্ঠ্রেমির অন্য অগ্রজের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় বাগেরহাটে গেলাম। স্বনামধন্য যোক্তার ৺রাধাচরণ মুখোপাধ্যায়ের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া বাগেরহাট কলেজে আই, এস, সি পড়ি, ঐ সময়ে সাইনবোর্ড ও ছবি আঁকিতাম। বাগেরহাটে আচার্যদেবের খুল্লতাত-ভ্রাতা শ্রীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় আমার অবাধ গতি ছিল, কারণ একে আমি ব্রজমোহনের ছাত্র, আর এক ঐ বাসায় এক বিবাহের পিড়ি রং করিয়াছিলাম। মাঝে মাঝে যখনই ছুটিতে বরিশাল আসিতাম জগদীশ আশ্রমে যাইতাম, আচার্যদেবের ভাগিনের আমার ভ্রাতৃস্থানীয় শিক্ষক যোগেশ চট্টোপাধ্যায়ের (ননীদা) কাছে। আসল উদ্দেশ্য আচার্যদেবের সান্নিধ্য লাভ করা, তাঁর আপন হওয়া। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারি নাই, মাধ্যম ননীদা। তখনও আমার দিদ্ধিলাভ হয় নাই। ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন মহাত্মাজী বরিশাল ত্যাগ করিয়া বরিশাল এক্সপ্রেসে খুলনা রওনা হইলেন, তৎপর রাত্রি ১০ টায় খবর আসিল—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণের। আমরা টাউন হলে শোকসভায় গেলাম। তৎপর দিন স্থির হইল, পুনরায় অগ্রজের কাছে থাকিয়া ব্রজমোহন কলেজে বি. এ, পড়া। গুরা কাঁসা ছোড়া দিলে আর আস্ত কাঁসা বলা চলেনা, আমাকে আবার স্বাধীন ভাবে অন্নের সংস্থান করিতে হইল। অনেক জায়গায় ঘুরিয়া জগদীশ আশ্রমেই আমার স্থান হইল—আমি আশ্রমবাসী হইলাম। আমার অভীষ্ট পূর্ণ হইল।

৭।৮ বৎসরের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল, আচার্যদেবের সান্নিধ্য লাভে। এই সময়ে আচার্যদেবের নলের ঘরটি পাকা বাড়ীতে পরিণত হইল। অনেক প্রাক্তন আশ্রমবাসী ছাত্র কিছু কিছু অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। আমি প্রাইভেট টুইশন্ করি, আমিও ননীদার হাতে দশটাকার একখানি নোট দিলাম। আচার্যদেব নারাজ

হইলেন। আমি ব্যথিত হইয়া রাগে বলিয়া ফেলিলাম, "কেন, আমার দশটাকা হরিদাস মজুমদার সুরেশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির তুলনায় লক্ষ গুণ বেশি।" কি জানি, আচার্যদেব আর সামান্য টাকা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা করিলেন না। খাওয়ার ঘরে ৮।১০ ইঞ্চি মাটির ডিবার উপর থালা রাখিয়া সোজা হইয়া আহার করিতেন। আমি তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট থালায় প্রায়ই খাইতাম। পাচক একদিন আমাকে বলিলেন "আপনি গুরুর থালায় কেন খান্?" আমি তাকে উত্তরে বলিলাম— "ভক্তিতে নয় স্বার্থে। গুরু হতভাগ্যের জন্য অনেককিছু ফেলিয়া যাইবেন সেই আশায়।" মাছের প্রায় সবটুকু আমার ভাগ্যে জুটিত। দুধও আধ-বাটি খাইতাম। অন্য জিনিসের কথা নাই তুলিলাম। অনেক বাড়ী হইতে মাঝে মাঝে বিবিধ পিঠা মিষ্টান্ন আসিত। আচার্যদেব বহুমূত্র রোগাক্রান্ত, উনি উহা গ্রহণ করিতেন না। পরোক্ষে উহা আশ্রমবাসীদের ভোগ্য, জানা কথা। আচার্যদেব মায়ের মত আমাদিগকে উহা বিতরণ করিতেন। মিষ্টান্ন সকলে এক হাত পাতিয়া গ্রহণ করিত। আমি একদিন দুই হাত পাতিয়া গ্রহণ করিতে যাইতেছি। আচার্যদেব বলিলেন "তুমি দুই হাত পাতিয়াছ কেন?" আমি তদ্রূপে বলিলাম "ডবল পাইবার আশায়।" আমাকে বলিলেন "নগেন বড় কিপ্‌টে, আস্কুলে একটুও ফাঁক নেই।" আমি বলিলাম 'আপনার চেয়েও, মাস মাস ২৫০৲ টাকা কালীবাড়ী পোষ্টাপিসে জমা হইতেছে। উহা খাইবে কে?" তখন তো আর তাঁর সোপন দানের কথা জানিতাম না, কেবল জমা রক্ষা করারই বয়স ছিল। আশ্রমের প্রাণকেন্দ্র-আচার্যদেবের একনিষ্ঠভক্ত সর্বদা একদিন বলিলেন, "নগেন, ভক্ত বলিলেন ননী (৺যোগেশ ব্যানার্জী) নগেনের শিক্ষক, নগেনকে লোকে এত টাকা দেয়, আর ননী বা এত কম টাকা পায় কেন?" আমি সর্বদাকে বলিলাম "সর্বদা, আমার দুধে জল বেশি, দামও হাঁকি বেশি, কাজেই খোকারা খাঁটি মনে করিয়া আর বেশি বেশি টাকা দিয়া নিজেদের লাভবান মনে করে।" বি, এ, পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, সকাল বিকাল, সন্ধ্যায় প্রাইভেট টুইশন। দুপুরে বি, এম. স্কুল, টাউন স্কুলে স্টপ্‌ গ্যাপ্‌ হিসাবে পড়াই। এক রবিবারে আশ্রমের পূর্ব দিকের গোলপাতার ঘরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। কর কিভাবে টের পাইয়াছেন জানিনা। কানটি ধরিয়া তুলিলেন এবং সম্মুখে একখানি অমৃতবাজার পত্রিকা রাখিয়া বলিলেন 'দিবানিদ্রা ভাল না।' সেই কান মলাটি যে কত আনন্দের, কত সুখস্পর্শ, বর্তমানেও স্মৃতিতে দোলা দেয়।

মহামানবদের জীবনের সর্বক্ষণই দায়িত্বে, গুরুভারে এবং কর্তব্যে সিমেন্টের মত কঠিন। পক্ষান্তরে মহামানবের চরিত্রের যেদিকটা ঈষৎ প্রসন্ন, মধুর সেই স্নিগ্ধ শীতল সরস দিকটার আস্বাদন তাহাদের ভাগ্যে জোটে না। সে দিকটার সন্ধান পায়, যাহারা কনিষ্ঠ ভক্ত, তাহারাই। প্রকৃত ভক্তই সেই স্নিগ্ধ শীতল সরস দিকটার আস্বাদনে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া থাকে। বিপুল বিরাট নিস্তব্ধ একটা গাম্ভীর্যের মেরু যেখানে ধ্বক্ ধ্বক্ করে, সত্যই গাম্ভীর্যের মেরু সেখানে ঘিরিয়া থাকে কিন্তু তাহাও ভক্তের উচ্চ উচ্চ কৌতুকের ঝাপ্‌টায় মাঝে মাঝে ছিঁড়িয়া যায় এবং ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে স্বর্ণকিরণ উঁকি মারে এবং হাসে। তাহাও প্রকৃত ভক্তই টের পায়, নতুবা কৌতুকের সাহস আসিবে কেন?

আশ্রমে দুইটি ভাই থাকিত, নাম দুইটি ভুলিয়া গিয়াছি ৩০।৩৫ বৎসর পূর্বের কথা। ইহারা বড়লোকের ছেলে, হাল চাল অন্ত চং-এর। জগদীশ আশ্রমের ছেলে হিসাবে অপরের চোখে বিসদৃশ ঠেকিবেই। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি আচার্য

দেবকে বলিলেন—উহাদের এখানে স্থান দিয়েছেন কেন? তার উত্তরে আচার্যদেব বলিলেন—ইহাদের চরিত্র সংশোধনের জন্যই কতদূর থেকে বাপ মা এখানে পাঠাইয়াছেন। মন্দ ছেলেকে ভাল করার জন্যই এই আশ্রম, অতএব ইহাদের স্থান তো এই আশ্রমেই।

একদিন আশ্রমের চাকরের অসুখ করিয়াছে, সকলে আহারান্তে নিজের থালা ধুইবে এই ব্যবস্থা হইল। আমিতো আচার্যদেবের থালায় আহার করি, আমি তাঁহার থালা ধুইবই, নলীদার থালা প্রথমে একটু বাধা দিলেন বটে কিন্তু আমি তাঁহার আপত্তি গ্রাহ্য করি নাই। নলীদা বলিলেন "দিলে পার।" সত্যই কলিকাতার ইট-কাঠ-লৌহ-সিমেন্টে যাহাদের জন্ম—হৃদয়হীন ব্যবসা ক্ষেত্রেও হৃদয়বান ছাত্রের আমার অভাব হয় নাই। মাতৃভূমিতেও মরুস্থান থাকে।

তখনকার আশ্রমবাসী আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃতুল্য দুই জনের কথা বেশি মনে পড়ে। একজন মন্টু রায় অপর জন ভরত দাশগুপ্ত। ইহারা তখন আমাকে ভালবাসিত, আদর যত্ন করিত। আমার ছোট ভাই নাই, ইহারা যেন সেই স্থান পূর্ণ করিয়াছিল। আমি উহাদের কোন উপকারে আসি নাই। মন্টুর সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয় নাই। আশ্রমের পূজা বিধি-ব্যবস্থা ভরতের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ভরত যেন আচার্যদেবের 'মানসপুত্র'। মনে হইত একদিনে ভরতই আশ্রমের অধিনায়ক হইবে। বর্তমানে কেবল আশ্রমের নয়, ব্রজমোহন বিদ্যালয়েরও প্রধান শিক্ষক। দেশ বিভাগের পরও আশ্রম ও ব্রজমোহন বিদ্যালয় আঁকড়াইয়া আছে। চিঠিপত্রে চির সারল্য, বর্তমানেও একটুও বড় চড় হয় নাই। বি. এ. পরীক্ষার খবর বাহির হইলে ভরতকে ১০ টাকা দিয়া বলিলাম, মানদাই আম খায়া হরিত লুট হইবে, মহাপুরুষের চরিত্র লুট হইল। আচার্যদেব আমাকে বলিলেন "নগেন তুমি অর্ডিনারী গ্রাজুয়েট হইলে, তোমার উচিত ছিল, পয়সায় বাতাসা কিনে হরির লুট দেওয়া।" আমার উল্লাসের কারণ আমি টুইশন করিয়া বি. এ. পরীক্ষা দিয়াছি। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হইবার জন্য কলিকাতা রওনা হইলাম। আশ্রম পরিত্যাগ করিতে প্রাণে বড় ব্যথা পাইলাম, কাঁদিয়া ফেলিলাম। আচার্যদেব মায়ের মত আম, লুচি, সন্দেশ অনেক খাবার নিজহস্তে আমার বাক্সে পুরিয়া দিলেন রাত্রের আহারের জন্য। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদধূলি গ্রহণ করিয়া কলিকাতা রওনা হইলাম। আমি পাস কোর্সের গ্রাজুয়েট হইয়াও এম. এ. ক্লাসে দুই বৎসর ফ্রি ষ্টুডেন্টশীপ পাইলাম। কলিকাতা হইতে প্রথমেই বরিশালের জগদীশ আশ্রমে যাইতাম তৎপর স্বগ্রাম ইদিলপুরে। একবার বরিশাল এক্সপ্রেস (ষ্টীমার) রাত্রে থাকিতেই বরিশাল পৌঁছিল। শীতকাল—অতি প্রত্যূষে আশ্রমে উপস্থিত। আচার্যদেব আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক যোগেশ চাটার্জিকে বলিলেন "মনী, ষ্টোভে নগেনকে চা করিয়া দাও। নগেন ক্যালকেশিয়ান হইয়াছে, ঠাণ্ডা লাগবে।"

১৯৫১ সালের ২রা জানুয়ারী চন্দ্রকান্ত ইনষ্টিটিউশনের বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা দিবসে শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় পৌরোহিত্য করেন। যখন তাঁহার এলগিন রোডস্থিত বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানাইতে যাই, তখন তিনি কথাপ্রসঙ্গে আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকল্পে বরিশালবাসী তেমন কিছুই করেন নাই বলিয়া আক্ষেপ করেন। সত্যই আচার্যদেবের শত সহস্র গুণী জ্ঞানী ছাত্রশিষ্য রহিয়াছেন, অথচ এই মহামানবের নামটি পর্যন্ত অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরও অজানা!

রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষা (৬)

শ্রীঅনাথনাথ বসু কর্তৃক সংকলিত

ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ।

গীতা বলেছেন,

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যো পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥

ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, আবার মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধির চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ তা হচ্ছেন তিনি।

ইন্দ্রিয়সকল কেন শ্রেষ্ঠ, না, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগ সাধন হয়। কিন্তু সে যোগ আংশিক। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ মনের দ্বারা যে জ্ঞানময় যোগ ঘটে তা ব্যাপকতর। কিন্তু জ্ঞানের যোগেও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ দূর হয় না। মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ বোধের দ্বারা যে চৈতন্যময় যোগ তা একেবারে পরিপূর্ণ। সেই যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

এই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দ্বারা অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা।

অতএব যদি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানার দক্ষতা শিক্ষা নয়, স্কুল কলেজে পরীক্ষায় পাস করা নয়, আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।

আমাদের স্কুল কলেজেও তপস্যা আছে, কিন্তু সে মনের তপস্যা, জ্ঞানের তপস্যা, বোধের তপস্যা নয়।

জ্ঞানের তপস্যায় মনকে বাধামুক্ত করতে হয়, যে সকল পূর্ব সংস্কার আমাদের মনের ধারণাকে এক ঝোঁকা করে রাখে তাদের ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার করে দিতে হয়। যা নিকটে আছে বলে বড়ো এবং দূরে আছে বলে ছোটো, যা বাইরে আছে বলেই প্রত্যক্ষ এবং ভিতরে আছে বলেই প্রচ্ছন্ন, যা বিচ্ছিন্ন করে দেখলে নিরর্থক এবং সংযুক্ত করে দেখলেই সার্থক—তাকে তার যাথার্থ্য রক্ষা করে দেখবার শিক্ষা দিতে হয়।

বোধের তপস্যার বাধা হচ্ছে রিপুর বাধা। প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে উঠলে চিত্তের সাম্য থাকে না। সুতরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায়। কামনার জিনিসকে আমরা শ্রেয় দেখি, সে জিনিসটা সত্যই শ্রেয় বলে নয়, আমাদের কামনা আছে বলেই। লোভের জিনিসকে আমরা বড় দেখি, সে জিনিসটা সত্যই বড় বলে নয়, আমাদের লোভ আছে বলেই।

এইজন্যে ব্রহ্মচর্যের সংযমের দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক; ভোগ বিলাসের আকর্ষণ থেকে অভ্যাসকে মুক্তি দিতে হয়। যে সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা লোভের চিত্তকে ক্ষুব্ধ ও বিচারবুদ্ধিকে সামঞ্জস্যভ্রষ্ট করে দেয় তার ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে বুদ্ধিকে সরল করে বাড়তে দিতে হয়।

যেখানে সাধনা চলছে, যেখানে জীবনযাত্রা সরল ও নির্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সংকীর্ণতা নেই, যেখানে ব্যক্তিগত, জাতিগত, বিরোধবুদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে, সেইখানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে বিদ্যা বলেছে তাই লাভ করবার স্থান।

তপোবন (১৩১৬)

বিশেষ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষক

একটি পত্র

মহাশয়,

পশ্চিমবঙ্গের কয়েক লক্ষ সরকারী কর্মচারী এবং শিক্ষক, বেতন পুনর্বিন্যাসের ফলে ছিটে ফোঁটা বেতন বৃদ্ধির সুযোগ পাইতেছেন কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের অধ্যাপনারত বিশেষ পর্যায় ভুক্ত স্নাতক এবং অবস্নাতক শিক্ষকগণ এক কপর্দক বেতন বৃদ্ধির সুযোগ পান নাই।

গভর্ণমেন্ট বিঘোষিত অন্তবর্তীকালীন ৮৲ টাকা বর্ধিত বেতনের সুযোগ হইতে এই সকল শিক্ষকগণকে বঞ্চিত না করার জন্য প্রাঃ শিক্ষক সমিতির মুখপাত্রগণ সরকারের নিকট বহু আবেদন নিবেদন করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছেন। সম্প্রতি ঐ শ্রেণীর শিক্ষকগণকে মাধ্যমিক স্কুল সমূহে যুক্ত করার যে পরিকল্পনার কথা বলা হইয়াছে তাহা বাস্তবে কার্য্যকরী করার পক্ষে নানা বাধা আছে। কয়েক সহস্র ঐ শ্রেণীর শিক্ষককে স্থান দেওয়ার মত মাধ্যমিক স্কুল ও পঃ বঙ্গে বর্ত্তমানে না থাকায় সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া তাঁহাদের এই সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকিতে হইবে।

সুতরাং সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে বর্ত্তমানে কর্মস্থল হইতে মাধ্যমিক স্কুলে বদলী না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্ত্তন নাই। এই অন্তর্বর্তী সময়ে তাঁহাদের ভাগ্যে কি শুধু অবহেলা, উপেক্ষা এবং অবিবেচনাই জুটিবে? উত্তুঙ্গ পণ্য-মূল্য বৃদ্ধির দিনে তাঁহাদের বিষয়টি কি সরকারের বিবেচনার বিষয় নহে? নিবেদন ইতি—

শ্রীস্বদেশপ্রিয় বসু	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
শ্রীসত্যব্রত দাস	শ্রীখোঁসাইদাস সরকার
শ্রীপৃথ্বীশ দাস্তাল	শ্রীনীহাররঞ্জন মিত্র
শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস	শ্রীসুকেশচন্দ্র দত্ত
শ্রীকৃত্তি বসু	শ্রীঅভয় নন্দী

পোঃ—চাকদহ
জেঃ—নদীয়া

ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকের ডায়েরী

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ডেনমার্কের জনতা-কলেজী শিক্ষার বিবর্তন

শতাব্দীব্যাপী ডেনিশ জনতা-কলেজী শিক্ষার বিবর্তনের ইতিহাস বস্তুতঃ ডেনিশজাতির সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস,—সমগ্রজাতির লোকমানসকে উন্নত ও উচ্চতর স্তরে লইয়া যাওয়ার অদ্ভুত প্রয়াসের ইতিহাস। স্কানডেনাভীয় সকলদেশেই গ্রোন্থবিগের লোকশিক্ষার আদর্শ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং অন্যান্য উত্তর দেশ স্ব স্ব ঐতিহ্যের ধারায় লোকশিক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাযন্ত্রশালয়ের আওতার বাহিরে থাকিয়া বেসরকারী ভাবে সমগ্র জাতির চিত্তদেশকে প্রবুদ্ধ ও আলোকিত করার এই অদ্ভুত প্রয়াসের ইতিহাস ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী ডেমোক্রেটিক নূতন রাষ্ট্রসমূহের শিক্ষাব্রতীমাত্রেরই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

অনুধাবনের বিষয়। এই লোকশিক্ষার প্রভাব ডেনমার্ক দেশবাসী সকলের উপরই পরোক্ষে হোক আর অপরোক্ষেই হোক পড়িয়াছে।

গ্রোন্ত্বিগ লোকশিক্ষার মাধ্যমে সমগ্রজাতির প্রাণ ও চিত্ত জাগরণের আহ্বান করিয়াছিলেন: আহ্বানে যে সকল শিক্ষাব্রতী সাড়া দিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকেরই নাম ও বাণী ডেনিশ লোক-শিক্ষার ইতিহাসে মুদ্রিত হইয়া অক্ষয় হইয়াছে। জনতা কলেজী লোকশিক্ষার ফলে ডেনমার্কবাসী প্রগতিশীল হইয়াছে বলিলেও সম্পূর্ণ বলা হয় না, এই শিক্ষার গুণে লোকসাধারণের সকল বিষয়েই বিচারক্ষমতা প্রখর হইয়াছে, সমগ্রজাতি স্থৈর্যগুণ-সম্পন্ন ও অমায়িক হইয়াছে. বাহার ফলে জাতির চরম বিপর্যয়ের দিনেও ডেনিশেরা হতবুদ্ধি হয় নাই; জার্মান অকুপেশন ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রথম জনতাকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় যুটল্যাণ্ড প্রদেশের রড্ডিঙ্গ (Rodding) নামক পল্লীতে—১৮৪৪ সালে। ডেনমার্কের সেই অঞ্চল sleesnej নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের উপর তখনকার দিনে প্রতিবেশী প্রবল রাষ্ট্র জার্মাণীর লোলুপদৃষ্টি ছিল। সেই প্রথম জনতাকলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ঔদ্যোগী ভাবণে বলিয়াছিলেন :—We founded a school, a folkhigh school for the citizen. No one is to be trained here for a future profession or be given knowledge that will enable him to secure a livelihood. It is assumed that young people desire to be and will remain peasants and citizens and all we want to do is to teach them what is necessary if they are to behave as independent and mature members of the community.

১১৪৮-৫০ সালের সময় এই জনতাকলেজটি বন্ধ হইয়া যায় এবং পরে ১৮৫০-৫১ সালে আবার খোলা হয়। এই সময়ে লোকাযত্ত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ Sofus Hogbro ১৮৫৩ সালে জনতা-কলেজী শিক্ষা সম্পর্কে যে বাণী লিখিয়াছিলেন, সেই বাণী শত বৎসর পরে জার্মান অকুপেশনের সময়েও ডেনমার্কবাসীকে শক্তি যোগাইয়াছে। "The folkhigh school shall not foster blind fanatics, but enlightened, conscientious citizens. It shall give the pupils as true a picture of actual conditions as possible; it shall draw their attention to different conceptions, emphasising the main arguments for and against them; it shall endeavour to rouse consciousnes of current problems, and stimulate interest in their solution by developing the powers of its pupils, powers of the heart as well as of the head, and thereby enable them to tackle them; but solutions themselves must not be given. Only then will their minds be really their own; Only in this way will they, as independent and active men, be able to enter upon the life of a citizen....." জনতা-কলেজী শিক্ষার প্রবর্তনে ও অগ্রগামীরা পূরধর্মী শিক্ষাগুরুর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি যতই এ বিষয়ে আলোচনা করিতেছি, ততই মনে হইতেছে যে পূরধর্মী শিক্ষাগুরুগণ সমগ্রদেশের তরুণকে বিচারপটু করিয়া উত্তম পুরবাসী করিতে চাহিয়াছিলেন। গ্রোন্ত্বিগ ভারতীয় দর্শন ও শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন কিনা আমার ঠিক জানা নাই; কিন্তু তিনি ডেনিশ জাতিকে সাত্ত্বিকী-বুদ্ধি শান্তের ও প্রেমের পথ

প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। সাত্ত্বিকী-বুদ্ধি ছাড়া যে ডেমোক্রেটিক বা লোকায়ত্ত রাষ্ট্রের কল্যাণ হয় না, তাহা তিনি নিশ্চিতই অনুভব করিয়াছিলেন এবং জাতিকে গঠন করিবার জন্য সেরূপ লোক-শিক্ষার নির্দেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা ও জীবনী পড়িয়া আমার পিতার শিক্ষাদর্শের কথা মনে হইয়াছে। যেমন :—

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে,
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।

ভক্টর পেটের খাদিকের নিকট শুনিয়াছি যে গ্রোন্ডবিগ এরূপ মত পোষণ করিতেন যে তাঁহার লোকশিক্ষার আদর্শ ভারতবর্ষও একদিন গ্রহণ করিবে; তিনি মনে করিতেন যে ভারতবাসীর চিত্ত সেই আদর্শ গ্রহণের পক্ষে প্রস্তুত হইয়া আছে; আত্মচিন্তার ধারা ভারতীয় ঐতিহ্যে বর্তমান।

১৮৪৯ সালে উলদোম (Uldum) নামক স্থানে রাসমুস সোরেনসেন (Rasmus Sorensen) নামক একজন শিক্ষক দ্বিতীয় জনতা-কলেজ স্থাপন করেন। সোরেনসেন কৃষকদের ছেলেমেয়েদের উচ্চতর শিক্ষা-ব্যবস্থা করিবার জন্য রাজ-দরবারে আবেদন পেশ করিয়াছিলেন। পরে তিনি দশটি কৃষক পরিবারের ছাত্রকে সঙ্গে করিয়া নিজেদের শ্রমে জনতা-কলেজের শিক্ষাগৃহ ও আবাস প্রস্তুত করেন।

প্রথম জনতা কলেজের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ হোগব্রো (Hogbro) উচ্চ লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যকে নিম্নোক্ত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন :—The school had been founded to advance our cause along the longer and quieter but safer and surer road of enlightenment and improvement. তিনি তখন দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে—"Everything in Denmark had come from the Government. It is sad but true ; until now the people themselves have not been capable of getting anything done." লোকজীবন হইতে লোকসাধারণের প্রয়োজনে লোকমানস বিকাশের শিক্ষার পথ আবিষ্কৃত হোক—ইহাই ছিল লোকশিক্ষক হোগব্রোর একান্ত কামনা। "He proclaimed his faith in a coming revival of the old spirit of the North, which would again appear with dignity and power, and the young would lead the way. তিনি উত্তরদেশীয় পৌরাণিক চরিত্রের শৌর্যের কথা দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন : "They were Thor's sons and would engage in the great battle between the Aesc and the Giants."

ডেনমার্কের তৃতীয় জনতা-কলেজের প্রতিষ্ঠাতা লোকশিক্ষার ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার নাম ছিল Christen Kold। ১৮৫১ সালে রিশলিঙ্গে (Ryslinge) নামক স্থানে তিনি জনতা কলেজ স্থাপন করেন। তিনি গ্রোন্ডবিগের শিক্ষার আদর্শকে জীবনে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর ডেনিশ লোকশিক্ষার ইতিহাসে গ্রোন্ডবিগের আদর্শকে সুগভীর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বিশেষত্ব দান দিয়াছিলেন। উত্তর যুটল্যাণ্ডের থিস্তেড (Thisted) নামক স্থানে ১৮১৬ সালে মুচির গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং গ্রোন্ডবিগের পূর্বেই ১৮৭০ সালে পরলোক গমন করেন। ১৯৩৪ সালে ডেনমার্ক পরিক্রমাকালে আমি Thisted-এ গিয়াছিলাম এবং লোকসভায় মহাত্মা গান্ধীর জীবনী আলোচনা করিয়াছিলাম।

যৌবনে কল্ড (Kold) শিক্ষকশিক্ষণ কলেজে যোগ দিয়াছিলেন। তখনকার দিনের মামুলি ধর্মমত সম্পর্কে তাঁহার অশ্রদ্ধা ছিল; পরে তিনি যখন অনুভব করিলেন যে God loves mankind

তখন তিনি আনন্দে এতদূর আত্মহারা হইয়াছিলেন যে সকলকেই এই কথাটি বলিয়া বেড়াইতেন এবং প্রাচীন ধর্মগুরুদের মত খালিপায়ে কলেজে যাতায়াত করিতেন; তাহার এই অদ্ভুত চালচলনের জন্য পাড়ার ছেলেরা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত, তাঁহার উপর ঢিল ছুড়িত। বস্তুতঃ কলুদ সর্ববিষয়েই অসাধারণ ছিলেন।

যুবশিক্ষক রূপে তিনি 'শব্দ-ব্রহ্মে'র স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন মনে হয়। তিনি ছেলেদিগকে বই মুখস্থ করিতে দিতেন না, মুখে মুখে ইতিহাস, বাইবেল ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন। তাঁহার এই আচরণের জন্য তাঁহার কোথাও চাকরি পাওয়া দুষ্কর ছিল। এই সময়ে তিনি দক্ষিণ ফুটল্যাণ্ডের এক পরিবারে গৃহশিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন এবং মধ্যযুগীয় সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠ করেন। নিজের দেশ ডেনমার্ককে পুনর্গঠন করিয়া তোলার প্রেরণা অনুভব করেন। প্রতি বুধবার সন্ধ্যা ছয়টা হইতে নয়টা পর্যন্ত জন পনেরো চাষী মজুরকে শিক্ষা দিতেন। মুখে মুখে ডেনমার্কের ইতিহাস, বিশ্বের ইতিহাস বলিতেন, কখনও পড়িয়া শুনাইতেন। সমাজের সাধারণলোকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত, কিন্তু প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় মজুর ছেলেরা ঠিক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। কলুদ (Kold) এ সম্পর্কে যাহার বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন।—"ছেলেগুলি সমবেত হইয়া তিনটি বিষয় আলোচনা করিত, যথা গত বৎসর কার কয়টি গাই গরু ছিল, এ বৎসর কার কয়টি আছে আর আগামী বৎসর কে কয়টি নূতন গাই কিনিবে। কিন্তু এরা অন্য বিষয়ও আলোচনা করে তাহা আমি চাই।"

কলুদ (Kold) চার্চ ও ধর্মের প্রচলিত সংস্কার মানিতেন না বলিয়া তাঁহার চাকুরীর আবেদন অগ্রাহ্য হইত। তখন তিনি প্রধানে পদব্রজে কোপেনহাগেনে যাইয়া শ্রোত্বিগের ভাষণ শুনেন। প্রধান শহরে এক ধর্মযাজকের বাড়ীতে বাসন চাকরের কাজ গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত করেন—প্রথমে বাসন চাকরীর কাজে, পরে খণ্ডরীর কাজে। পরে তিনি জাহাজ ছাড়িয়া Trieast গমন করেন। সেখানে একটি ঠেলাগাড়ী কিনিয়া নিজের জিনিস বোঝাই করিয়া ৮০০ মাইল ঠেলিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ছেলেদিগকে মামুলি ধর্মের বুলি শিখাইতে অনিচ্ছুক হওয়ায় তাঁহার পক্ষে শিক্ষকতার কাজ পাওয়া অসম্ভব ছিল; সেজন্য তিনি আমেরিকা গমনের উদ্যোগ করেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে যে কাজের জন্য সংসারে আনিয়াছিলেন তাহা ছিল নিতান্ত অন্যরূপ। ডেনমার্কের বিশিষ্ট ও অনন্যসাধারণ লোকশিক্ষকরূপে আজও সকলে তাঁহাকে স্মরণ করে। তিনি নিজের হাতে আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত জনতা কলেজের বাড়ী নির্মাণ করেন এবং এই লোকশিক্ষায়তনের প্রতিটি বিষয়ের উপর তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের ছাপ রাখিয়া যান। ১৮৪৮ সালে যখন যুদ্ধ বাধে, তখন স্বেচ্ছায় তিনি সৈন্যদলে যোগ দেন, কিন্তু বন্দুক চালনা শিক্ষা তাঁহার সম্ভব হয় নাই। ১৮৪৯ সালে লোকায়ত্ত সরকার দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই শিক্ষাগুরুর জীবনের প্রধান কাজও সুরু হয়। তিনি গ্রোত্-বিগের "বিশ্বের ইতিহাস" পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি তখনকার নিজের কথা এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন:—I became fully assured, as this book so often expresses it, that the human race shall end in triumph over death, darkness, boredom, weariness, emptiness and desolation. It was something new to me, but as soon as I had read it, it occured to me that so it was and not otherwise, and, then I thought that this was something people ought to know."

গ্রোন্থবিগ ও কলুদ্-এর জীবনী আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে গ্রোন্থবিগ যেমন নিজে উচ্চ জীবনদর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং লোক-শিক্ষার মাধ্যমে প্রথমতঃ স্বদেশের সাধারণের জীবনকে নিজের আদর্শে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, তদ্রূপ কলুদ্ও গ্রোন্থবিগের 'বিশ্বের ইতিহাস' পড়িয়া শিক্ষকরূপে একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন। অথবা একথাও বলা যায় যে কলুদ্-এর জীবনক্ষেত্রে গ্রোন্থবিগের আদর্শ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল। এই উভয় লোকশিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক যেন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মত। ১৮৪৮ সালের যুদ্ধের সময় তাহার অর্থাৎ কলুদ্এর একটা নূতন অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। দেশাত্মবোধের প্রেরণা বলিয়া আমরা যাহা কিছু মনে করি, তিনিও সেরূপ দেশপ্রীতি অনুভব করিয়াছিলেন। ডেনিশ জাতির কল্যাণচিন্তা তাঁহার মধ্যে প্রবল হইয়াছিল। ডেনিশ জাতিকে অনুপ্রাণিত বা সজীব করিয়া আলোকিত করার প্রেরণা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন।

কলুদ্ পূর্বে চাকুরি করিয়া এক হাজার ডেনিশ ক্রাউন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। (এক হাজার ক্রাউন প্রায় সমমূল্যের টাকার সমান।) সেই অর্থে বাড়ী নির্মাণের উপাদান কিনিয়া স্বহস্তে একটি বিদ্যালয় গৃহ তৈয়ির কাজ আরম্ভ করেন। গ্রোন্থবিগ ও অন্যান্য বন্ধুরা মিলিয়া আরও ১২০০ ক্রাউন সংগ্রহ করিয়া কলুদের গৃহনির্মাণ কার্যে সহায়তা করেন। এই বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য কলুদ্-এর নিজের ভাষায় এইরূপ:—"to rouse both the christian spirit and the Danish spirit and urge people to believe in God's love and Denmark's future." কলুদ্-এর অর্থসঙ্গতি সামান্যই ছিল, কিন্তু ভবগদপ্রেমে দৃঢ় নিশ্চয় এই লোকশিক্ষক ডেনমার্কের লোকশিক্ষার ইতিহাসে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির দ্বারা লোকশিক্ষার ধারাকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দিয়াছিলেন, আর সেই রূপটি এমন যে তাহার উপমা পাওয়া সহজ নয়। কলুদ্-এর জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সাধনা বা অভিজ্ঞতার দ্বারা সত্য উপলব্ধির একটি সহজ মনোবৃত্তি তাঁহার মধ্যে নিহিত ছিল। স্বহস্তে তৈয়ারী বিদ্যালয়ে ছাত্র আমন্ত্রণের পূর্বে তিনি ছয়বৎসরের জন্য গৃহ শিক্ষকের কাজ পাইয়াছিলেন; তরুণ বালকদের জীবনকে অনুপ্রাণিত ও আলোকিত (enliven and enlighten) করিতে তিনি নিজে কতখানি সমর্থ, অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহা জানাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হইয়া তিনি নিজের বিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তির আমন্ত্রণ করেন। তিনি অভিভাবকদিগকে এমন আশ্বাস দিয়াছিলেন যে তাঁহার শিক্ষায় ছেলেরা সত্যই খাঁটি মানুষ হইবে। অভিভাবক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে তাঁহার বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়া ছেলেরা চাকরি-বাকরী পাইবে কিনা বা মিলিটারী শিক্ষা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে কিনা। অনেকে বিদ্রূপও করিয়াছে।

১লা নভেম্বর ১৯৫২ সালে তিনি বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করেন। পূর্বদিনে তাঁহার চিত্ত অশান্ত ছিল, শেষ পর্যন্ত সত্যই ছাত্র ভর্তি হইতে আসিবে কিনা সেই ভাবনা তাঁহার ছিল। যাহোক ১লা নভেম্বর নির্দিষ্ট সময়ে দশটি ছেলে আসিয়া যথারীতি ভর্তি হয়। সেইদিনটি তাঁহার জীবনের একটি বিশেষ আনন্দের দিন বলিয়া তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। বিশ্বের ইতিহাস ভর্তি করিয়া তিনি বিদ্যালয়ের ক্লাস লইতে সুরু করেন। কয়েক বৎসর উচ্চ বিদ্যালয় বা কলেজটি চালনা করার পর তিনি ঘোষণা করেন যে তাঁহার প্রচেষ্টা সফল হইয়াছে। যে সকল ছাত্র শিক্ষা পাইয়াছিল এবং প্রেরণা ও জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, তাহাদের কেহই পরবর্তী জীবনে স্বধর্ম হইতে চ্যুত হয় নাই। দশ বৎসর

মধ্যে এই লোকশিক্ষায়তন বিরাট আকার ধারণ করে। তিনি বৎসরে ছেলেদের জন্য পাঁচ মাসের ও মেয়েদের জন্য তিন মাসের পৃথক গ্রীষ্মকালীন কোর্স চালাইতে থাকেন। শীতকালে পাঁচ মাসের ছেলেদের কোর্সে ৭০টি ছেলের স্থান ও গ্রীষ্মকালে তিন মাসের কোর্সে মেয়েদের জন্য ৫০টি স্থানের ব্যবস্থা করেন। অদ্যাবধি কলুদ্-নির্দিষ্ট ছেলেমেয়েদের পৃথক পৃথক কোর্স চালনার নীতি অনন্তা কলেজে চলিয়া আসিতেছে।

গৃহশিক্ষকের কাজ করিয়া তিনি ছেলেদের সঙ্গে একত্র বাস করিতে পূর্বেই অভ্যস্ত ছিলেন।

———

শিশুদের চিত্রের ক্রমবিকাশ

শ্রীদেবীপ্রসাদের

বচ্চো কী কলা ঔর শিক্ষা হইতে

(ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

প্রতীক-প্রধান অবস্থা :

পরিকল্পনা অনুযায়ী চিত্র আঁকিবার সহিত প্রতীক কাল আরম্ভ হয়। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, শিশু প্রথমে মানুষের মুখ আঁকিবার চেষ্টা করে। ইহার অন্য কারণ আর যাহাই হউক না কেন, সর্বাপেক্ষা বড় কারণ এই যে, এই সময় শিশু অন্তর্মুখী হয় ও মানুষই তখন তাহার সর্বাপেক্ষা কাছের বস্তু। মানুষের পরে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার প্রিয় বাড়ী। এইরূপে ধীরে ধীরে সে অন্যান্য বস্তুর প্রতীক আঁকিবার চেষ্টা করে। যে বস্তুর সহিত শিশুর যত নিকট সম্পর্ক থাকিবে, সে তাহা ততই বারবার আঁকিবে।

একটি প্রত্যক্ষ উদাহরণ লেওয়া যাক। 'ক' নামক একটি শিশু দুই বৎসর হইতে তিন বৎসর কাল পর্যন্ত চিত্র আঁকায় বিশেষ উৎসাহ দেখায় নাই। তিন বৎসরের পর হইতে ক্রেয়ন দিয়া সে চিত্র বানাইবার চেষ্টা করিতে সুরু করে। একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল সে কি আঁকিতেছে। প্রথমে উত্তর আসিল 'চিত্র'—কিছুক্ষণ পরে, সে বলিল 'দেখ কত বড় সাপ এঁকেছি'—পরে সে আবার সাপ আঁকিল, দুইটি সাপের মাথা একরকম আঁকা। ক্রমশঃ তাহার উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। কিছুদিন পূর্বে সে বিদ্যালয়ে রামলীলার অভিনয় দেখিয়াছিল—এক্ষণে সে রামচন্দ্রজীর তীর ধনুক মহা উৎসাহ সহকারে আঁকা সুরু করিল।

এই প্রতীক কাল উপস্থিত হইবার অর্থ ইহা নহে যে উহার পূর্বের অবস্থা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন পর্যন্ত দুইটি অবস্থা এক সাথে চলিতে থাকে, তাহার পর প্রতীক যখন একটি নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে তখন কাটা-কুটির অধ্যায় শেষ হইয়া যায়। তবে ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে কাটা-কুটির অধ্যায় শেষ হওয়ার অর্থ ইহা নহে যে চিত্র আঁকিবার সে স্বাভাবিক আনন্দ শিশু এতকাল উপভোগ করিয়াছে তাহাও শেষ হইয়া গেল। নতুন কিছু করিবার আনন্দ কখনই শেষ হয় না।

প্রতীক কি, এবং কিভাবে তাহার সৃষ্টি হয় :

শিশুর কলাবিদ্যার ক্রমবিকাশ অধ্যয়ন করিতে হইলে এই প্রশ্নটির গুরুত্ব উপলব্ধি করা দরকার।

সাধারণ ভাবে অনেক সময়েই শিশুর চিত্রের সঠিক অর্থ আমরা বুঝিতে পারিনা। তাহার মনের মধ্যে যে চিত্র ফুটিয়া উঠে ও বাহিরে তাহার যে প্রতীক সে বানায় তাহার অর্থ শিশুর নিজের কাছেও অস্পষ্ট থাকে। সেইজন্য শিক্ষক এই 'প্রতীকবাদ'কে অবহেলা করিয়া শিশুর মনে বস্তুর বাস্তবিক রূপ ফুটাইবার প্রয়াস করেন।

শিক্ষককে শিশুদের এই প্রতীকবাদ বুঝিতে হইবে। ইহা না বুঝিবার অবশ্য কারণও আছে। এক সময় ছিল যখন সমস্ত শিল্পকলাই প্রতীক-প্রধান ছিল। চিত্র, মূর্তি, সঙ্গীত সমস্ত কলাই কোন বিষয়বস্তুর প্রতীকরূপে বিকশলাভ করিত। সেইজন্য কি শিল্পী কি সাধারণ ব্যক্তি সকলেই চিত্রের অর্থ সহজে বুঝিতে পারিত, এবং যে চিত্র মূল বস্তু হইতে কিছু অন্যরকম হইত তাহা শিল্পীর অজ্ঞতা রূপে গ্রহণ করা হইত। অতএব চিত্রকলা লইয়া যদি আলোচনা করা যায় তবে কি দেখা যায়? বহু জায়গায় পর্বত যেভাবে আঁকা হইয়াছে বাস্তব হইতে তাহা বহুলাংশে অন্যরকম, কিন্তু আমরা কি বলিব যে উহা সুন্দর নহে? ইহা হইতে বুঝা যায় সাধারণ দর্শকেরা চিত্র বিচার করেন, যে চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহার সহিত নিজের কল্পনা মিশাইয়া।

প্রতীকবাদ পৃথিবীর সর্বত্র সর্বপ্রকার শিল্পে উপলব্ধ হইত। বিশেষ করিয়া ভারতীয় ও পূর্ব আঞ্চলিক দেশসমূহে কিছুদিন পূর্বেও প্রতীকের বিশেষ স্থান ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় অঞ্চলগুলিতে তের শতাব্দীর পর হইতেই প্রতীকবাদ কম হইয়া বাস্তববাদী চিত্র প্রাধান্যলাভ করিতেছে। সাধারণ লোকের মনেও ক্রমশ তাহা প্রসার লাভ করিতেছে ও বাস্তবধর্মী চিত্র বুঝিতে সহজ অনুভব হওয়ায় প্রতীকের উপযোগিতাকে লোকে ভুলিতেছে। সেইজন্য শিশুদের প্রতীক চিত্রও কম লোকেই বুঝিতে পারে। এই প্রসঙ্গে আদিবাসী সমাজের চিত্রকলা সম্বন্ধে যদি আমরা আলোচনা করি, তাহা হইলে এবিষয় খানিকটা বুঝিতে পারিব। মাউন্ট কোর্ট নামে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের বিষয় বলিয়াছেন যে তাহাদের শিশুরা অত্যন্ত অল্প বয়স হইতে চিত্র আঁকিতে পারে। আদিবাসীদের নিজেদের চিত্রও প্রতীকধর্মী, সুতরাং সে ক্ষেত্রে বাস্তববাদ আসিয়া শিশুদের চিত্রকলায় প্রভাব বিস্তার করিবে এমন আশঙ্কা নাই।

প্রতীকের অর্থ বুঝিবার জন্য কোন বিশেষ শিক্ষার দরকার নাই, কেননা সাধারণভাবে প্রতিদিন আমরা কত কাজে কি ভাবে প্রতীকের ব্যবহার করিয়া থাকি তাহার হিসাব নাই। তাই এইজন্য শিক্ষার দরকার হয় না, হয় বিশেষ দৃষ্টি-কোণের। শিশুদের চিত্র বিচার করিতে সকল সময় মনে রাখিতে হইবে উহা প্রতীকমাত্র—কোন দার্শনিক তত্ত্ব বা বিচার ধারার উপর উহার ভিত্তি নহে। তৎকালীন বস্তু ও ভাবের প্রতীক হইতেছে সেই চিত্র। ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য জগতকে যে ভাবে গ্রহণ করিবে চিত্র তাহার চিহ্নমাত্র। শিক্ষক যদি শিশুর মন ঠিক মতন বুঝিতে পারেন তবে তাহার চিত্রের অর্থ খুঁজিয়া বাহির করিতেও বেশি পরিশ্রম হইবে না।

শিশু কোনও স্থায়ী প্রতীক নির্মাণ করে না। তাহার প্রতীক সর্বদাই পরিবর্তিত হয়। একই আকারে সে একাধিক বস্তুর চিত্র অঙ্কিত করে। কোন বস্তুবিশেষের সঙ্গে কোনও নির্দিষ্ট প্রতীকের সম্বন্ধ থাকিবেই এমন কোন নিশ্চয়তাও থাকে না। এমন কি আজ যে প্রতীকে একটি বস্তু আঁকা হইয়াছে, কালও যে সেই বস্তু সেই প্রতীকেই অঙ্কিত হইবে তাহাও বলা যায় না। কিন্তু এই প্রতীক সব শিশুদের অঙ্কিত চিত্রেই প্রায় একই রূপ পাইয়া থাকে, তাহার কারণ শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটা সার্বজনীনতা আছে। এই সার্বজনীনতার জন্য এই চিত্র প্রতীকগুলি এক বুনিয়াদী ভাবার স্বরূপ লাভ করে এবং এই ভাবার বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে

বুঝিয়া লওয়া শিক্ষকের প্রয়োজন। উপরোক্ত ঐ সকল চিত্রাঙ্কনের সময়ে শিশুদের মানসিক প্রক্রিয়াগুলিও শিক্ষকের জানা দরকার।

প্রতীক নির্মাণ একটি সামাজিক প্রবৃত্তি। একজন যাহা দেখিয়াছে বা অনুভব করিয়াছে, তাহা অপরকে দেখাইতে বা জানাইতে চায় এবং সেজন্য একটি মাধ্যমের প্রয়োজন। এই মাধ্যম শব্দ, মুদ্রা বা চিত্র হইতে পারে। শব্দের মাধ্যমে মুখের ভাষা, কিন্তু এই ভাষার প্রতীক আবার অক্ষর বা এমন শব্দ যাহা সকলের কাছে সহজভাবে পরিচিত। যেমন 'কলম' শব্দ—একই ভাষার লোকেরা এই শব্দটির সম্বন্ধে জানে যে ইহা দ্বারা লেখা হয়; যেখানেই ঐ শব্দ (কলম) দেখিবে, তখনই উহার অর্থ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে। শব্দের দ্বিতীয় ভাষা সঙ্গীত। উহা অক্ষর বা শব্দপ্রতীকের অপেক্ষা সূক্ষ্মতর। এইরূপ মুদ্রার ভাষা নৃত্য, নাট্য। ভারতীয় নৃত্যের ভাষা সম্পূর্ণ প্রতীকময়। প্রত্যেক মুদ্রার বিশিষ্ট অর্থ আছে এবং এই নৃত্য বুঝিতে হইলে এই সকল মুদ্রার প্রত্যেকটির অর্থ জানা দরকার।

চিত্রের ভাষা রেখা, রঙ, আকার ইত্যাদির মধ্যে চিত্রকরের মনের ভাব প্রতিফলিত হয়। চিত্রের আকার দুইরকমের হইতে পারে; বাস্তবে যে বস্তুকে যেইরূপে দেখা যায়, অথবা উহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতির। এই দ্বিতীয় প্রকার চিত্র অধিক ভাবাত্মক বা প্রতীক-প্রধান হয়। যে বস্তুর রূপ অঙ্কিত হইবে তাহার বাস্তবানুগ প্রতিকৃতি হওয়ার প্রয়োজন নাই, অলঙ্করণরূপে উহা প্রতীক-প্রধান বা সূক্ষ্মভাবাত্মক চিত্র, আধুনিক কলাতেও ইহা দেখা যায়। বাস্তবানুগ আকৃতি নির্মাণ উচ্চ-কলার নিদর্শন নয়। প্রাচীন কলার প্রতীকের বৈশিষ্ট্য এই যে উহা পরম্পরাগত, কিন্তু আধুনিক কলার প্রতীক ব্যক্তিগত। আগেই বলিয়াছি, শিশুর চিত্রকলার প্রতীকও ব্যক্তিগত।

শিশু যখন চিত্রাঙ্কন করে, তখন সে মনে করে না যে, যে বস্তুর যেমন আকৃতি ঠিক সেইরূপ আঁকিতে হইবে। যে বস্তুর চিত্র সে আঁকিতে চায় তাহার সঙ্গে অন্য প্রত্যক্ষ দৃষ্টবস্তুর বা মনের কোনও ভাবের একটা মানসিক সম্বন্ধ (association) গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ভাবে তাহার মনের ভিতরে একটি কাল্পনিক প্রতিবিম্ব থাকে যাহা তাহার অন্তর্মুখীন চিত্তে বাস্তবরূপই পায়। সেইজন্য চিত্র অঙ্কিত করার সময়ে শিশুর অন্তরঙ্কিত এই প্রতীক একটি স্পষ্টরূপ পায়।

শিশুদের এই প্রবৃত্তি শিল্প-প্রবৃত্তি তো বটেই, ইহা নিজেকে প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তিও বটে। সেইজন্য শিশুদের চিত্র ভাবিয়া চিন্তিয়া একটি প্যাটার্ন গড়িবার প্রয়াস নহে, ইহা তাহার মনের ভাব প্রকাশের একটি ভাষা। তবে ইহার মধ্যে কোনটি গৌণ, কোনটি মুখ্য তাহা বলা যায় না। আসলে শিল্পপ্রবৃত্তি শিশুদের ব্যক্তিত্বের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত ও নিজেকে জাহির করিবার প্রবল ইচ্ছার দ্বারা ইহা বাহ্যরূপ পায়। না জানিয়া শিশু যাহা অঙ্কন করে তাহাও শিল্পকলার অন্তর্গত হয় এই কারণে যে শিশুর প্রকৃতি ছন্দোময়। যখন আত্ম-প্রকাশের মাধ্যম চিত্র তখন যে আকার বা চিহ্ন দ্বারা তাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই প্রতীক।

শিশুদের মন যুক্তিতর্ক জানে না—তাহার মনের অনুভূতি ব্যক্তিগত, বাহিরের জগতের বাস্তবতার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। নিজের মনের কল্পনা দ্বারা সে তাহার মনের চিন্তাকে গড়িয়া তুলে। যখন সে সেই মনের ভাবনাকে বাহিরে প্রকাশ করিতে চাহে তখন সে প্রতীক চিহ্নদ্বারা তাহা প্রকাশ করে।

বয়সের সহিত তাহার চিন্তাশক্তি যত বাড়িতে থাকে ততই তাহার এ্যাবস্ট্রাক্টের (ভাবাত্মক) দিকে ঝোঁক বেশী হয় ও ক্রমে কাল্পনিকবস্তু বা প্রতীক কঠিন হইয়া যায়।

অল্পবয়সের চিত্র হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শিশু যাহা আঁকে তাহা তাহার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার পরিচয় নহে, তাহা তাহার কাল্পনিক মনের প্রতিচ্ছবি। অল্পবয়সের শিশুদের মানুষের ছবি আঁকিবার ঝোঁক দেখা যায় আঁকিবার পর যদি সে তাহার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার সহিত নিজের চিত্রের প্রভেদ বুঝিতে পারিত তাহা হইলে সে দ্বিতীয়বার উহা আঁকিবার সাহস পাইত না। কিন্তু মানুষ আঁকিয়া শিশু সন্তুষ্ট হয়, এবং বারবার তাহা আঁকে—কেননা তাহার কল্পনার মানুষকে সে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

অল্পবয়সে শিশুদের মন—চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি সরল থাকে বলিয়া তাহাদের চিত্রের আকারও সরল হয়। ক্রমশঃ যত বয়স বাড়িতে থাকে, বাস্তবের সহিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হইতে থাকে, বিচার-বুদ্ধি বাড়িতে থাকে, চিত্রের আকারও তত অটিলরূপ ধারণ করিতে থাকে, অনেক সময় সম্পূর্ণ নূতন আকৃতি ধারণ করে। বাস্তবের সহিত মিল থাকুক আর নাই থাকুক, শিশু যাহা আঁকে তাহা সবই প্রতীক।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, কত বৎসর পর্যন্ত এই প্রতীক-কাল চলে। প্রত্যেক শিশুর মানসিক স্তর এক প্রকারের নহে—কল্পনার শক্তি এক এক শিশুর এক এক প্রকার। কখনও বার বৎসরের শিশুর চিত্র দেখিয়াও মনে হয় সাত আট বৎসরের শিশুর অঙ্কিত চিত্র। সাধারণতঃ দেখা যায় যে বয়সের শিশু চিত্র আঁকিতেছে তাহার চিত্র সেই বয়সের উপযোগীই হয়, তবে দুই এক বৎসরের তফাৎ হইলেও হইতে পারে।

কাটাকুটির বয়স সাধারণত চার বৎসর পর্যন্ত চলে। চার বৎসরের পর হইতেই প্রতীক কাল সুরু হয়। নূতন অধ্যায় হঠাৎ একদিন সুরু হয় না—স্পষ্ট-ভাবে বাহিরে না বুঝা গেলেও ভিতরে ভিতরে পূর্ব হইতে এই পরিবর্তন আসিতে থাকে এবং একদিন সে আত্মপ্রকাশ করে।

ছাত্র জীবন : সিটি কলেজ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিয়া আমি ঐ ঐতিহ্যপূর্ণ প্রকোষ্ঠে বিনা তাড়ায় থাকিতে পাইলাম। অন্ত সিটে ছিলেন আমার সহপাঠী শ্রীযুক্ত শ্রীধরনাথ ভট্টাচার্য। শ্রীধরনাথ স্থির-ধীর, মিতভাষী, খুঁটিয়া খুঁটিয়া পাঠ্য-বইগুলি পড়িতেন। তাঁহার বিষয় ছিল বোধহয় গণিত ও সংস্কৃত। ইংরেজীতে তিনি অনার্স লইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিভাগে অনার্স লাভে তাঁহার পরিশ্রম পুরস্কৃত হয়, তিনি আইনশাস্ত্র তিন বৎসর অধ্যয়ন করেন এবং শেষ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথমস্থান অধিকার করিয়া অতীব কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। অল্পকালের মধ্যে প্রাইভেটে ইংরেজীতে এম-এ পরীক্ষা দিয়া তাহাতেও সাফল্যলাভ করেন। শ্রীধরনাথ মুন্সেফ হইলেন এবং ধাপে ধাপে পদোন্নতি হইয়া শেষে এডিশনাল সেসন জজ পর্যন্ত হন। এখনও তিনি কর্মে ব্রত আছেন কিনা বলিতে পারি না।

মেসবাসী নন অথচ কলেজের আরও কয়েকজন ছাত্র-সহপাঠীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। এতদিন পরে সকলের কথা স্মরণ হইতেছে না, তিন চার-জনের কথামাত্র এখানে কিছু কিছু বলিতে পারি। শ্রীযুক্ত প্রেমকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার এত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল যে, তাহার বাড়ীতেও আমি কখনও কখনও যাইতাম এবং তাহার ত্রিতলে পড়িবার ঘরে বসিয়া দুইজনে ইংরেজী পাঠ সম্বন্ধে আলোচনা করিতাম। প্রেমকুমার বি-এ পাস করিয়া অল্পকাল পরেই সরকারী কর্ম গ্রহণ করে। রেল বিভাগে বহুদিন কৃতিত্বের সহিত কর্ম করিয়া বর্তমানে অবসর লইয়াছে। সেখাপড়ার দিকে তাহার বরাবর ঝোঁক, ইহার চর্চা অব্যাহত রাখিয়াছে দেখিয়া আমি খুব আনন্দিত। তাহার গভীরতর রচনা বহু পত্রিকায় এখনও বাহির হইতেছে। শ্রীযুক্ত স্নেহচন্দ্র বাগচী আমাদের আর একজন সতীর্থ, বি-এ অধ্যয়নকালেই তাঁহার কবিতা 'প্রবাসী'র মত প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায়ও স্থান পাইয়াছিল। কবি-খ্যাতিও তাহার পরে প্রচুর হয়। শিক্ষাব্রত ও অন্যান্য কর্মে লিপ্ত থাকিবার পর সে একটি প্রকাশালয় ও প্রেসও স্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মতির বিকৃতি ঘটায় তাহার কোন প্রচেষ্টাই শেষ পর্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে নাই। শ্রীযুক্ত বিজয়-মাধব মণ্ডল ও মাখনলাল দাস্ট এর কথা বড়ই মনে পড়ে। বিজয়মাধব পূর্ব বন্ধুত্ব অব্যাহত রাখিয়াছে। তাহার কয়েকখানি কবিতাপুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার সেই বৃহদ্দেহ মুখ কখনও ভুলিতে পারিব না। আরও কয়েকজনের চেহারা কি হাবভাব মনে পড়িতেছে, কিন্তু স্মৃতির তল হইতে তাঁহাদের নাম কিছুতেই মনে টানিয়া আনিতে পারিতেছি না।

সিটি কলেজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলিয়া আমরা শিক্ষক ও ছাত্র অধিকাংশই যে ব্রাহ্ম ছিলাম, একথা কেহ যেন মনে না করেন। তবে ইহার উন্নতিমূলক বিবিধ আদর্শ আমাদের মনের কোণে অজ্ঞাতসারেই যেন শিকড় গাড়িতেছিল। কৈশোর হইতে 'প্রবাসী' পড়িয়াছি, এমন সময় ছিল যখন স্কুলের প্রথম চার পাঁচজন শিক্ষক বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ বা কলিকাতায়

সিটি কলেজ অথবা উভয়েরই ছাত্র ছিলেন। তাঁহাদের সেবা-পরায়ণ প্রীতিপূর্ণ আচার আচরণে তখন আকৃষ্ট না হইয়া পারি নাই। বাগেরহাট কলেজের অধ্যক্ষ কামাখ্যাবাবুর উচ্চ নৈতিক আদর্শও আমাদের জীবনের উপর গভীর ছাপ রাখিয়া যায়। সিটি কলেজে আসিয়া যে ধরনের অধ্যাপকদের সংস্পর্শে আসিলাম তাঁহাদের অধিকাংশের মধ্যেই আগেকার উচ্চাদর্শের অনুভূতি হইতে লাগিল। নিকটেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির। এখানে প্রতি রবিবারে সকালে ও সন্ধ্যায় সঙ্গীতসহ উপাসনা হইত। মধ্যে মধ্যে অন্য দিনে বক্তৃতাদিরও ব্যবস্থা ছিল। ঐ ধরনের বক্তৃতার কিছু আভাস পূর্বে দিয়াছি। এখানকার আর একটি বক্তৃতার কথা মনে পড়িতেছে। বক্তা অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ—মহাভারতের অংশ বিশেষ তাঁহার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল। তিনি কৃষ্ণ রাজসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার কথা উল্লেখ করিয়া পাণ্ডব ভ্রাতাদের এবং তৎকালীন সমাজের যৎপরোনাস্তি নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। আমরা মহাভারতের ভক্ত, পাণ্ডবদের প্রতি ভক্তিমান; রজনীবাবুর বক্তৃতার সঙ্গে আমাদের মনের সায় ছিল না মোটেই। রবিবার সন্ধ্যায় উপাসনা কালে মন্দিরে যুবকদের খুব ভিড় হইত। মাঝে মাঝে কণ্ঠ-সংগীত হইত। এই সঙ্গীত শুনিতেই তাহারা অনেকেই আসিত এবং এক একটি সংগীতের পর দলে দলে বাহির হইয়া যাইত। ইহাতে উপাসনায় খুবই বিঘ্ন ঘটিত। বেদি আড়ম্বরে বসাইয়া এইরূপ অনবরত আগমন-নির্গম বন্ধ করিতে চেষ্টা করা হয়। ঐ সময়কার অনেক প্রধান ব্যক্তির উপাসনা-বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে আচার্য প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের উপাসনা-বক্তৃতা আমাদের বড়ই মধুর লাগিত। 'মা' 'মা' বলিয়া জগৎ পিতাকে উদাত্তকণ্ঠে ডাকিতেন তিনি। এই ডাক উপস্থিত প্রত্যেকেরই মর্মস্থলে পৌঁছিয়া বেশ একটা ভাবের উদ্রেক করিত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রায়শ সাধু-ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। পূর্বে বক্তৃতার ভাষাও নাকি এইরূপ ছিল। আমাদের সময় ইহা কেমন বেসুরো ঠেকিতে থাকে।

এই দুই বৎসরের আর একটি বিষয়ের কথা এখনও বলা হয় নাই। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর নাম আমরা কৈশোর হইতেই শুনিয়াছি। তাঁহার অদ্ভুত আবিষ্কার সম্বন্ধে বিস্তর গল্পও শিক্ষক মহাশয়ের প্রমুখাৎ শুনিতে পাইতাম। আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বসুবিজ্ঞানমন্দির কলিকাতার একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। মন্দিরটি ভারতীয় স্থাপত্য-রীতিতে গড়া। ভিতরে অজন্তার চিত্রাবলীর প্রতিলিপি। এ মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া জগদীশচন্দ্রের নিজের এবং তাঁহার সহকারী গবেষকগণের বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে গবেষণা কার্য ইহার পূর্বেই চলিতে সুরু হইয়াছিল। ৩০শে নভেম্বর আচার্য বসুর জন্মদিনে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি সদ্যবৎসরের গবেষণা কার্য সম্বন্ধে এদিনকার অনুষ্ঠিত সভায় প্রতি বৎসর ইংরেজীতে একটি বক্তৃতা দিতেন। কলেজে পড়িবার সময় দুই বৎসরই এই প্রতিষ্ঠা-দিবসে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে পাই। পূর্বে টিকিট সংগ্রহ করিতে হইত। প্রথমবারে গোল হলঘরের নিম্নের একটি আসনে স্থান লাভ করি। দ্বিতীয়বার ব্যালকনিতে আমরা ছেলেরা বসিয়াছিলাম। পরে অবশ্য টিকিটের মূল্য বাবদ কিছু শ্রোতাদের দিতে হইত। প্রথম-বারের নূতন অভিজ্ঞতার কথা এখনও মনে জল জল করিতেছে। যাঁহার নাম এতদিন শুনিয়াছি এখন তাঁহাকে চোখের সম্মুখে দেখিয়া নিজেকে ধন্য বোধ করিলাম। আচার্য জগদীশচন্দ্র আলোক-চিত্র সহযোগে গাছপালার জীবন স্পন্দন ও অসাড়ত্ব সম্পাদনের প্রক্রিয়া পরীক্ষণ সহকারে দর্শকমণ্ডলীকে দেখাইতে লাগিলেন। আমরা

দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। দ্বিতীয়বারে যাহা কি ব্যাঙের উপরেও পরীক্ষা দেখাইলেন।

আমি যেবার কলিকাতায় আসি, এর সেই বৎসর নতুবা পূর্ব বৎসরে কলিকাতায় প্রথম বাসের আমদানী হয়। প্রথম প্রথম ইহার নামকরণ হইত চমৎকার—অন্নপূর্ণা, উর্ব্বশী, প্রশান্ত, আরও কত কি। বাসের ভাড়া স্বভাবতঃই বেশি ছিল, ট্রামের ভাড়া ছিল অপেক্ষাকৃত কম। আমরা কিন্তু কি বাস কি ট্রাম কোনটাতেই তখন চড়িতাম না। ট্রাম কখন আসে কখন ছাড়ে ঠিক বুঝিয়া ওঠাও কঠিন ছিল। কলিকাতায় কত অঞ্চল যে হাঁটিয়া বেড়াইয়াছি তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। কিছু কিছু তো আগেই বলা হইয়াছে। অনেকের মুখে তখন শুনিতাম কলিকাতায় আসিয়া কলের জলে ডিস্‌পেপসিয়া হইয়া থাকে। কাহাকেও কাহাকেও একেবারে কীপকায় হইতেও দেখিয়াছি। আমরা কিন্তু ইহার বিপরীতই প্রমাণ করিয়া দিলাম। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত শরীর চর্চার আয়োজন খুবই কম। ফুটবল বা ক্রিকেট খেলায় খেলোয়াড় থাকে মাত্র কয়েকজন। অন্য সকলেই অলস দর্শক, ইহা আমোদ-প্রমোদের মতই একটা ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। তখন আমাদের কলেজে ব্যায়াম-চর্চার খুবই আয়োজন ছিল, কিন্তু অত ছাত্রের মধ্যে ক'জনই বা ইহাতে রীতিমত লিপ্ত থাকিত? ইংরেজীতে একটি কথা আছে—Walking is the best exercise—হাঁটা বা হাঁটা শরীর চর্চার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। যতই বাস ট্রামে যাতায়াতের সুযোগ হইতেছে ততই আমরা হাঁটার অভ্যাসটিকে বিসর্জন দিতেছি। কাজের তাগিদে তাড়া-তাড়ি যাতায়াত আবশ্যক বটে, কিন্তু বিনা প্রয়োজনেও আমরা ট্রাম-বাসের আশ্রয় লই। এইরূপ অভ্যাস ছড়ানোয় ব্যক্তিগতভাবে আমাদের শরীর অপটু হইয়া পড়িতেছে। কায়িক পরিশ্রম আমরা যেন ভুলিতেই বসিয়াছি। ছাত্রদের বিশেষ করিয়া কোন না কোন উপায়ে স্বাস্থ্যরক্ষা করা প্রয়োজন, কেননা তরুণ বয়সেই তো দেহ গঠন হইয়া থাকে। আমরা দেখিতাম যুদ্ধেরাও ফ্রেন্ড্‌স বা গোলদীঘিতে ভোর বেলা অনেকক্ষণ ধরিয়া চক্র দিতেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রত্যহ সূর্যোদয়ের পূর্বেই গড়ের মাঠে বাহির হইয়া পড়িতেন। অধ্যাপক রজনীকান্তও এইরূপ প্রতিদিন সকালে গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতেন বলিয়া তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। "শরীরমাদ্যম্, খলু ধর্মসাধনম্" এই কথাটির যাথার্থ্য প্রমাণ করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য।

১২

দেখিতে দেখিতে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর শেষে আসিয়া পড়িলাম। এই বৎসর ১৯১৫ ডিসেম্বর মাসে বড় দিনের ছুটিতে আমাদের নিকটেই বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে দেখি বেজায় ভীড়। একটি সুবৃহৎ বাড়ীতে লোকের আগম-নির্গম এবং কীর্তনাদি চলিতেছে। ভিতরে ঢুকিয়া জানিলাম, সুবিখ্যাত সন্ন্যাসী ভোলা গিরি আসিয়াছেন। ভোলা গিরি সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলকর কাহিনী শুনিতাম। তাঁহার বয়স নাকি একশত বৎসরের উপর। এইবার তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ আর ছাড়িলাম না। আমরা কয়বন্ধুতে মিলিয়া দ্বিতলের যে প্রকোষ্ঠে তিনি ছিলেন সেইখানে গেলাম। সেখানেও লোকের কী ভিড়। ফরাসের উপর চাদর পাতা, তার একদিকে তাকিয়ায় ঠেস দেওয়া ভোলা গিরি। দেখিয়া মনে হইল তিনি প্রবীণ নিশ্চয়ই। তবে তাঁহার দেহে বার্ধক্যের ছাপ যেন পড়েই নাই। রক্তাভ শুভ্র কান্তি, ললাটে মুখ এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে হিন্দী ভাষায় কথা বলিয়া যাইতেছেন। তিনি এখানে বোধ হয় দু'তিন দিন ছিলেন। আমরা তাঁহাকে ঐ একবারই দেখিয়া

কৌতূহল চরিতার্থ করিলাম। বাংলাদেশের মফঃস্বলেও বিভিন্ন জেলায় তোলা গিরি পর্যটন করিয়াছেন ; তাঁহার শিষ্য সংখ্যাও বিস্তর ছিল।

এই দুই বৎসরে চাঞ্চল্যকর ঘটনা বিশেষ কিছু ঘটিতে দেখি নাই। কি কর্পোরেশন, কি আইন সভা, কোন কিছুরই নির্বাচন এই সময়ে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় মানুষের মনে উত্তাপ-উত্তেজনাও তেমন ছিল না। গান্ধী-নীতি লইয়া যে বিরোধ চলিতেছিল তাহারও অবসান হইল এসময়। মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ্যদলের উপর রাজনৈতিক কর্ম্ম পরিচালনা ভার দিয়া নিজে রচনাত্মক কার্য নির্বাহে ব্যাপৃত রহিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দুইটি কার্যে তখন তীব্র সমালোচনার উদ্রেক করিয়াছিল। চাকরী বাটোয়ারার ভিত্তিতে হিন্দু মুসলমান চুক্তি নিষ্পন্ন হওয়ায় ঘোরতর বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। আগেই বলিয়াছি তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের ফরিদপুর অধিবেশনের সভাপতিরূপে যে ভাষণ দেন তাহাতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষরফার প্রস্তাব ছিল, আর ইহা লইয়াও তখন বিতণ্ডা চলে প্রচুর। কিন্তু এই অধিবেশনের দুই তিন মাস পরে দেশবন্ধুর মৃত্যুতে এ সকল বিতণ্ডার অবসান হইয়া গেল। তবে ঐ হিন্দু ও মুসলমান চুক্তিজনিত বাদানুবাদের তীব্রতা কিন্তু দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমেই ঘুণায়িত হইতেছিল। ইহার ফলাফল পরে বলিতেছি।

ঐ সময় এলবার্ট হলে এবং অন্যান্য স্থলেও সাধারণ সভা সমিতি হইত এবং তাহাতেও আমরা ছেলের দল গিয়া ভিড় করিতাম। একটি সভার কথা বিশেষভাবে মনে হইতেছে। কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীটস্থ ওয়াই-এম-সি-এ'র ওতারটুন হলে গান্ধীনীতি সম্পর্কে একটি সাধারণ সভা হয়। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী "সার্ভেন্ট" পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। এদিনকার প্রধান বক্তা সেন্ট পলস কলেজের অধ্যক্ষ রেভাঃ পি. জিন্স গান্ধী-নীতির ব্যাখ্যা করিয়া যে সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে আমরা বড়ই মুগ্ধ হই। শ্যামসুন্দরবাবুও বক্তার বক্তব্য বিষয় আমাদের পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

টেষ্ট পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। আজিকার মত তখন পরীক্ষার এত কড়াকড়ি ছিল না। পার্সেন্টেজ থাকিলেই মনে হয় সকলকে পরীক্ষার অনুমতি দেওয়া হইত। পার্সেন্টেজ পুরাপুরি না থাকিলে মন-কলেজিয়েট হইবারও ব্যবস্থা ছিল। আমার বৃত্তির টাকা তুলিয়া লইলাম। এই টাকা এবং শিক্ষকের দেশ হইতে যাহা পাঠাইলেন দুইয়ে মিলাইয়া কলেজের বেতন ও পরীক্ষার ফিস্ চুকাইয়া দিলাম। ইহার পর আমাদের পাঠে মনোনিবেশের পালা। এবারে দুইটি ব্যাপারে শরীর অবসন্ন এবং মন বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। প্রায় বেড় মাস কাল এত অসুস্থ হইয়া পড়ি যে পড়ায় বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করা কঠিন হইয়া পড়িল। দ্বিতীয় কারণটি কোন মতেই ব্যক্তিগত নয়। কিন্তু ইহার দ্বারা আমাদের বিশেষতঃ আমাদের মধ্যে যাহারা সাধারণ বিষয়াদি লইয়া মাতামাতি করি তাহাদের মধ্যে খুবই চাঞ্চল্য দেখা দিল। একথাই এখন বলি।

একদিন বেলা অনুমান দশটার সময় শুনিলাম, হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধিয়াছে। আহারান্তে দুই বন্ধুতে মিলিয়া রাস্তায় বাহির হইলাম। আমাদের অভিপ্রায় প্রেসিডেন্সী কলেজের হাতার মধ্য দিয়া কলুটোলায় গিয়া পড়ি, কিন্তু কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজে ঢুকিতেই দেখি একদল হিন্দুস্থানী বংশদণ্ড লইয়া পশ্চিমদিকে অপর এক দলকে খাদাইতেছে। বেকার লেবরেটরির পূর্ব্বপ্রান্তে পৌঁছিতেই দেখি, মাঠের পশ্চিমদিক হইতে মুসলমানেরা খান ইট ছুড়িতে ছুড়িতে আগাইয়া আসিতেছে। পিছন ফিরিয়া দেখি বন্ধুটি নাই। আমি হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া। মুসলমানেরা কয়েকজন একেবারে আসিয়া পড়িয়াছে। একজনের হাতে দেখি হস্তপরিমিত একটকে একখানি ছোরা।

পার্শ্ববর্ত্তী একটি ঘরের মধ্য হইতে একটি লোক বলিল "বাবু শীঘ্র এইদিকে আসুন।" আমার সহিৎ যেন ফিরিয়া আসিল, আমি তৎক্ষণাৎ পিছু হাঁটিয়া রেলিং টপকাইয়া সেনেটের দিকে রাস্তায় পড়িলাম। কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজের কতক বরাবর আসিতেই দেখি মুসলমান অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ আরও কয়েকজনের সঙ্গে হতদন্ত হইয়া বাহিরে আসিতেছেন। আমি এলবার্ট হল ভবনের নিম্নস দিকে একটি ঘরে গিয়া আশ্রয় লইলাম। মিনিট পাঁচেক পরে ফের বাহির হইয়া বড় রাস্তায় আসি, তখন রাস্তার উপর পর্যন্ত ইটের খণ্ড ছড়াইয়া আছে। কটকের মধ্যে ছোরার আঘাতে একব্যক্তির দেহে রক্তগঙ্গা বহিতেছে। এই ব্যক্তি কলেজের দারোয়ান। পেটে ছোরা বসাইয়া মুসলমানেরা তখন পলাইয়া গিয়াছে। বন্ধুটি কলেজ ভবনের ছিতলে আশ্রয় লইয়াছিল, পরে আসিয়া আমার সঙ্গে যোগ দেয়। এবার এই দে দাঙ্গা সুরু হইল ইহার জের বহু দিন চলে। বোমে ফিরিয়া আসিলাম। অপরাহ্নে বাহির হইয়া শুনি মুসলমানেরা ঠনঠনিয়া কালীতলাও আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কি জানি কেন, দাঙ্গা দেখার হজুক আমাকে পাইয়া বসিল। একাকীও কোন কোন দিন রাস্তা দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে যাইতাম, কোন কিছু ঘটিতেছে কিনা তাহা দেখিবার ও জানিবার উদ্দেশ্যে। এইভাবে অনেক দিন কাটিয়া গেল।

পরীক্ষার দিন ঘনাইয়া আসিল। অবসর দেহ-মন লইয়া পরীক্ষা দিতে বসিলাম। অনার্স পেপার-গুলিই খারাপ হইয়া গেল। পাস পেপারগুলি বেশ ভালই দিয়াছিলাম বলিয়া মনে হইতেছে। পরীক্ষা শেষে ফলাফল ভবিতব্যের হাতে ছাড়িয়া দিয়া দেশের বাড়ীতে চলিয়া গেলাম। সিটি কলেজে পড়াশুনায় দুই বৎসর ভালভাবেই কাটে। আগে খুব আশঙ্কা করিয়াছিলাম, কলিকাতায় কলেজে পড়ার খরচ চলিবে কিরূপে, কিন্তু এই আশঙ্কা অচিরেই দূরীকৃত হয়। এসময়ে আমাকে ছেলে পড়াইতে হয় নাই। পিতৃদেব প্রতি মাসে যে মাসোহারা পাঠাইতেন তাহাতে কলেজের বেতন, সিট ভাড়া ইত্যাদি চলিয়া যাইত। আহারাদির সংস্থান কিরূপে হয় তাহা ও পূর্বেই বলিয়াছি। এই সময়ে পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের প্রীতিপূর্ণ সহানুভূতির কথা বারবার স্মরণ হয়। তাঁহার সদিচ্ছা এবং সহানুভূতির বদৌলতেই কলেজে পড়ার যা কিছু সুবিধা আমার হইয়াছিল। কলিকাতার কলেজে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে আরও বহু বিষয়ে বিস্তর অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ ঘটে। এখানে কত লাইব্রেরী, কত পাঠাগার, কলেজের লাইব্রেরীও পুস্তকে পূর্ণ। পড়াশুনায় প্রবৃত্তি থাকিলে বিবিধ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান আহরণের কতই না সুযোগ। এইরূপে দুই বৎসর সিটি কলেজে নির্বিঘ্নে বি-এ পড়া সাঙ্গ করি।